ISSN 1813-0402

গবেষণা পত্রিকা

৩৬তম সংখ্যা ■ ডিসেম্বর ২০২৩

কলা অনুষদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

A Research Journal

Faculty of Arts

University of Rajshahi

গবেষণা পত্রিকা ৩৬তম সংখ্যা ■ ডিসেম্বর ২০২৩
কলা অনুষদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা পত্রিকা

৩৬তম সংখ্যা ❑ ডিসেম্বর ২০২৩

A Research Journal
Faculty of Arts
Rajshahi University

A Research Journal
Faculty of Arts
Rajshahi University

Vol. 36
December 2023

Published by
Professor Dr. Md. Fazlul Haque
Dean, Faculty of Arts
University of Rajshahi
Rajshahi-6205

Cover Design
Rashed Sukhon

Printed by
Uttoran Offset Printing Press
Kadirgonj, Rajshahi - 6100

Price : Tk. 400.00 $ 6

Contact Address
Chief Editor, *A Research Journal* (Faculty of Arts)
Deans Complex
Rajshahi University, Rajshahi-6205, Bangladesh

E-mail: dean.arts@ru.ac.bd
www.ru.ac.bd/arts

EDITORIAL BOARD

Chief Editor

Professor Dr. Md. Fazlul Haque
Dean, Faculty of Arts
Rajshahi University

Members

Professor Dr. Nilufar Ahmed
Chairman
Department of Philosophy

Professor Dr. Mahmuda Khatun
Chairman
Department of History

Rubaida Akhter
Chairman
Department of English

Professor Dr. Shahid Iqbal
Chairman
Department of Bangla

Professor Dr. Mohammad Fayek Uzzaman
Chairman
Dept. of Islamic History & Culture

Professor Dr. Mohammad Sabirul Islam Hawlader
Chairman
Department of Arabic

Professor Dr. Md. Ashraf- Uz- Zaman
Chairman
Department of Islamic Studies

Shaila Tasmeen
Chairman
Department of Music

Professor Dr. Mir Mehbub Alam
Chairman
Department of Theatre

Professor Dr. Md. Shafiullah
Chairman
Department of Persian Language & Literature

Professor Dr. Sheikh Md. Nuruzzaman
Chairman
Department of Sanskrit

Professor Dr. Md. Ataur Rahman
Chairman
Department of Urdu

Message from the Chief Editor

The 36th volume of *A Research Journal,* Faculty of Arts, is being published with as many as 28 research articles contributed by the faculty members of Philosophy, History, English, Bengali, Islamic History & Culture, Arabic, Islamic Studies, Persian Language & Literature and Sanskrit Departments. The articles are of diverse characters and will come to the use of the students and researchers of various disciplines, specially of the Faculty of Arts.

The publication of the journal is the result of collective efforts of all the scholar members of the editorial board. They have ungrudgingly helped me in its publication. I am grateful to them for their cooperation. I thank the concerned officers of the Faculty for their assistance and also the employees of the Uttoran Offset Printing Press for their support.

Professor Dr. Md. Fazlul Haque
Chief Editor and Dean
Faculty of Arts
University of Rajshahi
Rajshahi-6205

সূচিপত্র

ড. মো. গোলাম সারওয়ার	প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক অবস্থানে নদ নদী: একটি পর্যালোচনা	১
ড. মোসা. শামসুন নাহার	আহমদ বশীরের *তিনি* : এক মহানায়কের পরিভ্রমণ	১৫
ড. মো. আরিফুর রহমান	চণ্ডিপুর গণহত্যা ও নির্যাতন	২৫
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মতিউর রহমান ড. মুহাম্মদ সোলাইমান	আধুনিক আরবী ভাষা ও সাহিত্যে জুরজী যায়দান: একটি পর্যালোচনা	৩৯
ড. মুহা. উবায়দুল্লাহ	হাফিজ ইব্রাহীমের কবিতায় জাতীয় জাগরণ	৫১
ড. মো. মতিউর রহমান	আরবী কবিতার শব্দালংকার : একটি পর্যালোচনা	৬১
ড. মো. মনিরুজ্জামান	নাজিক আল মালায়িকার কবিতার বিষয় ও বৈশিষ্ট্য	৭৩
ড. জিয়াউর রহমান খান	আহমদ মুহাররামের কবিতায় 'ইফ্‌ক' প্রসঙ্গ : একটি পর্যালোচনা	৮৭
রুমানা ফেরদৌসী	আবূ নুওয়াসের কবিতা : একটি পর্যালোচনা	৯৭
গোলাম কিবরিয়া	তাফসীর আস-সা'দীর ভাষাশৈলী ও বৈশিষ্ট্য	১০৭
মো. জয়নুল আবেদীন	আল-কুরআনে ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞান : একটি পর্যালোচনা	১২৩
মোহাম্মদ মহসিন	ভারতীয় উপমহাদেশে রাসূল(সা.)-এর প্রশস্তিমূলক আরবী কবিতার ক্রমবিকাশ	১৩৩
মো. বাশিরুল্লাহ	ইবন 'আব্দ রাব্বিহ ও তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু	১৪৭
ড. এফ.এম.এ.এইচ. তাকী	ইয়াহুদী ধর্ম ও বিশ্বাস	১৫৭
ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান	কুরআন ও হাদীসের আলোকে মৃতদের জন্য জীবিতদের করণীয় : একটি পর্যালোচনা	১৬৭
মাইনুল ইসলাম	সুন্নাহর আলোকে মুসলমানদের সামাজিক জীবন	১৮৩
মো. মোজাফ্ফার হুসাইন	ইসলামে শিষ্টাচার ও সংস্কৃতি	১৯১
মো. আশরাফুল ইসলাম	যাকাতের শরয়ী ভিত্তি : একটি পর্যালোচনা	২০৫
গুলশান আকতার	আব্বাসীয় খিলাফত: সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট	২১৯
ড. মীর মেহবুব আলম	A Complete and Unique Guide to Space Design for Theatre	২৩৭
ড. সুমনা সরকার	বাংলাদেশের মঞ্চে *কোকিলারা* : পাণ্ডুলিপি থেকে প্রযোজনা	২৫১
মো. মোহসিন আলী	বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে উন্নয়ন-নাট্যের প্রয়োগ	২৬৫
ড. মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম	হাফিজের কাব্যদর্শনে প্রেম ও শরাব	২৭৫
মো. রাব্বি সরকার	শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা ও তাঁর ফারসি গ্রন্থ *নামে হক* : একটি পর্যালোচনা	২৮৭
ড. শেখ মো. নূরুজ্জামান	ভাস ও ভাসের নাটকচক্র	২৯৯
মোসা. নাহিদা আক্তার	শিবলী নুমানী ও উর্দু গদ্য সাহিত্য : একটি পর্যালোচনা	৩১১
ড. মো. মতিউর রহমান	আল-হাদীছের অর্থালংকার : একটি পর্যালোচনা	৩২৭
ড. আবু সালেহ মুহাম্মদ তোহা	'বঙ্গবন্ধু' বিষয়ক রচনাবলির আরবি অনুবাদ : একটি পর্যালোচনা	৩৪১

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক অবস্থানে নদ নদী : একটি পর্যালোচনা
(Rivers in The Geography of Ancient Bengal : A Review)

ড. মো. গোলাম সারওয়ার*

Abstract: Bengal is the largest riverine country in South Aaia.This countryis having more than 800 rivers. So, rivers played a vital role in socio- economic, environmental and cultural life of Bengal.So The most prominent physical features of Bengal are its rivers. Rivers of Bengal have cleft it asunder into four major divisions has a geographical entity quite distinct from others. The central division is formed by deltaic portion on the Ganges. The whole of Bengal is a fertile alluvial plain but this can be divided into natural regions according to the extent to which the soil is enriched by silt deposited when the rivers are in flood. Whole country including the Sundarbans proper lying between the Hoogly on the West and Meghna on the East is only the delta caused by the deposition of debris carried down by the rivers Ganges and Brahmaputra and their tributaries and distributaries.

ভূমিকা

পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক অতি নিবিড়। তাই কোনো দেশের ইতিহাস আলোচনার পূর্বে সেই দেশের ভূগোল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন একান্ত প্রয়োজনীয় বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। কারণ মানুষের সমগ্র জীবন এবং তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।[১] মানুষের কর্মকাণ্ড এক বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশে সংঘটিত হয়, এজন্য ভূগোলকে ইতিহাসের ভিত্তি বলা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক পরিচয় দানের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। তবে এই কাজটি কঠিন ও কষ্টসাধ্য। কারণ আমাদের কাছে এমন কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সূত্র নাই যা থেকে প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক রূপরেখা রচনা করা সহজ হয়। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সাহিত্যিক উপকরণ ও ভূমিদান সংক্রান্ত তাম্রলিপিসমূহকে প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক অবস্থার রূপরেখা চিত্রণের সূত্র হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রাচীন যুগে যেসব সাহিত্য রচিত হয়েছিল সেসবের মধ্যে ইতিহাস ভিত্তিক ভূগোলের অভাব দেখা যায়। মহাকাব্য, পুরাণ বা *বৃহৎসংহিতা* ইত্যাদি গ্রন্থে ভৌগোলিক তথ্য রয়েছে কিন্তু এতে বর্ণিত তথ্যের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। আর ঐসব তথ্য শনাক্ত করাও সমস্যা সংকুল। এতসব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এসব উপাদানে জাতিসমূহের নাম ও আবাসস্থল, জনপদসমূহের তালিকা ও অবস্থিতি সম্বন্ধে যেসব তথ্য রয়েছে তার মূল্য অপরিসীম। তবে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এসব তথ্য যতখানি সাহায্য করে তা বাংলার মতো বিশেষ এলাকার জন্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই অভিলেখমালার উপরই আমাদের অনেক বেশি নির্ভরশীল হতে হয়। কেননা এই লিপিমালার অধিকাংশই ভূমি লেনদেন সম্পর্কিত। তাই লিপিমালায় সন্নিবেশিত তথ্যের একটা বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। তবে দুঃখের বিষয় সব সময়ে এসব তথ্য সন্দেহাতীতভাবে শনাক্ত করা যায় না। কারণ অনেক প্রাচীন ভৌগোলিক নাম বর্তমানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। তবু যতটুকু শনাক্ত করা সম্ভব তা আমাদের সাহায্য করে। তবে এটি অনেকাংশেই অপ্রতুল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই অপ্রতুল তথ্যের উপর নির্ভর করেই বাংলার প্রাথমিক যুগের ভৌগোলিক পরিচয় পুনর্গঠনের প্রয়াস করা যায়।[২] প্রাচীন যুগের 'বাংলা' বলতে কোন ভূ-খণ্ডকে বোঝায় তা স্পষ্ট করে নেয়া প্রয়োজন। বাংলায় প্রাথমিক পর্যায়ে একই ভূখণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন ভৌগোলিক নামের অবস্থিতি ছিল। মোটামুটিভাবে ১৯৪৭ এর পূর্বে ব্রিটিশ ভারতের

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

'বেঙ্গল' প্রদেশের ভূ-খণ্ডই আমাদের আলোচনার বিষয়। বর্তমানে এটি প্রধানত বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ। ইতিহাসের দৃষ্টিতে এই ভূ-খণ্ডের একটি আঞ্চলিক সত্ত্বা ছিল। ভূগোলবিদগণও এই ভারত উপমহাদেশের মধ্যে 'বাংলা'কে একটি ভৌগোলিক অঞ্চল বলে স্বীকার করেছেন।[৩] প্রায় ৮০,০০০ বর্গমাইল বিস্তৃত নদী বিধৌত পলি দ্বারা গঠিত এক বিশাল সমভূমি এই বাংলা। এর পূর্বে রয়েছে ত্রিপুরা, গারো ও লুসাই পর্বতমালা; উত্তরে শিলংমালভূমি ও নেপাল তরাই অঞ্চল; পশ্চিমে রাজমহল ও ছোটনাগপুর পর্বতমালার উচ্চভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই বিস্তৃত সমভূমির দক্ষিণদিক সাগরাভিমুখে ঢালু। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনার জলরাশি দ্বারা বয়ে আনা বিপুল পরিমাণ পলি সাগরে উৎসারিত হচ্ছে। সমুদ্রোপকূলবর্তী নিম্নভূমি জঙ্গলাকীর্ণ। এই সমভূমির পেছনেই প্রায় ৫০,০০০ বর্গমাইল যার গঠনে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা প্রবাহের অবদান রয়েছে। এই বিস্তৃত সমতলভূমির মধ্যে ত্রিপুরা অঞ্চল নিকটবর্তী প্লাবন ভূমির তুলনায় গড়ে ৬ ফুট উঁচু এবং এর মাঝামাঝিই রয়েছে ময়নামতি পাহাড়। সিলেট অঞ্চলও গড়ে প্রায় ১০ ফুট উঁচু। সিলেট অঞ্চলের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত প্লাইস্টোসিন যুগে সুগঠিত মধুপুর উচ্চভূমি। এই মধুপুর উচ্চভূমির উত্তর-পশ্চিমমুখী বিস্তৃতি'বরেন্দ্র' বা বারিন্দ এলাকা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদী বরেন্দ্রের পূর্ব সীমা । এই নদীর প্রবাহই বরেন্দ্রের উচ্চভূমিকে মধুপুরের উচ্চভূমি থেকে ভাগ করেছে। পশ্চিমে রয়েছে রাজমহল ও ছোট নাগপুর পাহাড়। রাজমহল ও ছোট নাগপুর পাহাড়ের উত্তর থেকে দক্ষিণাভিমুখে বিস্তৃত প্লাইটোসিন ভূভাগ রয়েছে।[৪]

নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায়:

> এই প্রাকৃতিক সীমাবিবৃত ভূমি খণ্ডের মধ্যেই প্রাচীন বাংলার গৌড়-পুণ্ড্র-বরেন্দ্রী-রাঢ়া-সুহ্ম-তাম্রলিপ্তি-সমতট-বঙ্গ-বঙ্গাল হরিকেল প্রভৃতি জনপদ; ভাগীরথী-করতোয়া-ব্রহ্মপুত্র-পদ্মা-মেঘনা এবং আরও অসংখ্য নদনদী বিধৌত বাংলার গ্রাম, নগর, প্রান্তর, পাহাড়, কান্তার। এই ভূ-খণ্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙালির কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্ম-কর্ম-নর্মভূমি। একদিকে সুউচ্চ পর্বত, দুই দিকে কঠিন শৈলভূমি আর একদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র; মাঝখানে সমভূমির সাম্য-ইহাই বাঙালির ভৌগোলিক ভাগ্য।[৫]

বাংলা নামের উৎপত্তি

প্রাচীন যুগে বাংলা বলতে সমগ্রদেশকে এর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন নামে পরিচিত ভূখণ্ডকে বোঝায়। এগুলো হল বঙ্গ, সমতট, পুণ্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র সুহ্ম, রাঢ়, গৌড়, পট্টিকেরা প্রভৃতি। নামগুলো বেশিরভাগই প্রাচীন জনগোষ্ঠীর নামানুসারে প্রচলিত নাম। এদের ভৌগোলিক পরিমণ্ডল প্রাকৃতিক পরিবর্তনের বিশেষ করে নদীর পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। আবার রাজনৈতিক ক্ষমতার বিস্তার বা হ্রাসও এদের পরিমণ্ডল পরিবর্তন করেছে।[৬]

এখন 'বাংলা' নামটির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, ইংরেজ শাসনকালের 'বেঙ্গল' (Bengal) ১৯৪৭ পর্যন্ত ব্যবহৃত ছিল। এটি উপরে আলোচিত ভূ-খণ্ডকেই বোঝাতো।

মোগল আমলে এই ভূ-ভাগই 'সুবা বাঙ্গালা' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। আবুল ফজল এই প্রদেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, বাঙ্গালা পূর্ব-পশ্চিমে অর্থাৎ চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়াগড় পর্যন্ত ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তর-দক্ষিণে, অর্থাৎ উত্তরে পর্বতমালা হতে দক্ষিণে হুগলী জেলার মন্দারণ পর্যন্ত ২০০ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। এই 'সুবা' পূর্বে ও উত্তরে পর্বতবেষ্টিত এবং দক্ষিণে সমুদ্রবেষ্টিত ছিল। এর পশ্চিমে সুবা বিহার। কামরূপ ও আসাম সুবা বাঙ্গালার সীমান্তে অবস্থিত ছিল। আবুল ফজল বাঙ্গালাহ্ নামের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন। বাঙ্গালাহ'র আদিনাম ছিল 'বঙ্গ'। প্রাচীনকালে এখানকার রাজারা ১০ গজ উচুঁ ও ২০ গজ বিস্তৃত প্রকাণ্ড 'আল' নির্মাণ করতেন। আর এ থেকেই 'বাঙ্গাল' এবং 'বাঙ্গালাহ' নামের উৎপত্তি।[৭]

তাছাড়া নীহাররঞ্জন রায় আবুল ফজলের ব্যাখ্যাটি অযৌক্তিক মনে করেননি। নদীমাতৃক বৃষ্টিবহুল দেশের বন্যা ও জোয়ারের স্রোত রোধের জন্য ছোট বড় বাঁধ (আল) বাধা কৃষি ও বাস্তুভূমির যথার্থ পরিপালনের পক্ষে অনিবার্য। তাই তিনি বলেছেন:

> আবুল ফজলের ব্যাখ্যার অর্থ এই যে, বঙ্গদেশ আল্ বা আলিবহুল, যে বঙ্গদেশের উপরিভূমির বৈশিষ্ট্যই হইতেছে আল সে দেশই বাঙ্গালা বা বাংলাদেশ। এই আলগুলিই আবুল ফজলের সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছিল। তাঁহার ব্যাখ্যা পড়িলে এই কথাই মনে হয়।[৮]

মোগলদের প্রদত্ত নামের অনুকরণে পর্তুগীজরা বাংলাদেশকে বেঙ্গালা নামে অভিহিত করত। পরবর্তীকালে এই বাংলাদেশ অথবা বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলটি ইংরেজ শাসন কবলিত হওয়ার পর বেঙ্গল নামে পরিচিত হয়। এ সময় থেকেই বাংলা ভাষায় বাংলাদেশ ও বাংলা উভয় নামই ব্যবহৃত হতো। এই প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের অভিমত প্রণিধানযোগ্য । তিনি মনে করেন, যে, 'বঙ্গ হতে বাঙ্গালা, বাঙ্গালা হতে বেঙ্গালা এবং শেষত এই বেঙ্গালাই বেঙ্গল হয়েছে'।[৯]

তবে কি করে এবং কখন থেকে 'বাঙ্গালা' নামের প্রচলন হয়েছে এবং এই নামেই সারা দেশকে বোঝানো হতো তা অনুসন্ধান করা যেতে পারে। আকবরের রাজত্বকালে এই অঞ্চল 'বাঙ্গালা' নামে অভিহিত হয়েছে। আকবর পরবর্তী যুগে তাই বিদেশীরা এই নামই ব্যবহার করেছে। 'বাঙ্গালা'ই তাঁদের ভাষায় 'বেঙ্গালা' বা 'বেঙ্গল'। আকবর পূর্ব যুগেও বেঙ্গলার উল্লেখ পাওয়া যায় মার্কোপোলোর লেখনীতে। সুতরাং 'বেঙ্গালা' বা 'বাঙ্গালা' নাম মুগলপূর্ব যুগেই খ্যাতিলাভ করেছিল তা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত। মোগলপূর্ব যুগ থেকেই এর বহুল প্রচার এবং ইউরোপীয়দের মাধ্যমেই এই নাম রূপ নিয়েছে 'বেঙ্গালা', 'বেঙ্গলা' বা 'বেঙ্গল' হিসেবে।[১০]

মোগলপূর্ব যুগে 'বাঙ্গালাহ' বলতে বাংলার সমস্ত ভূখণ্ডের নাম সূচনা করতো কিনা অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, বখতিয়ার খলজী কর্তৃক নদীয়া বিজয়ের সময় 'বাঙ্গালা' নামে কোন একক দেশ ছিল না। ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের ইতিহাস রচনার সময় 'বাঙ্গালা' নামের উল্লেখ করেননি। তিনি বরেন্দ্র, রাঢ়, বঙ্গ নামে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলকে চিহ্নিত করেন। মিনহাজের বর্ণনায় বাংলা সম্বন্ধে তাঁর ভৌগোলিক জ্ঞানের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লখনৌতি ও বঙ্গকে পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখ করেছেন। মিনহাজ লখনৌতি বলতে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম বাংলা এবং বঙ্গ বলতে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব বাংলাকে বুঝিয়েছেন। এছাড়া বঙ্গের সাথে সমতটের উল্লেখও তিনি করেছেন।[১১]

মিনহাজের পরবর্তী ঐতিহাসিক জিয়া-উদ্-দীন বরণী সর্বপ্রথম 'বাঙ্গালা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। বরণী বাঙ্গলা বলতে পূর্ব বাংলাকেই নির্দেশ করেছেন।[১২] পরবর্তী ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আফীফ সুলতান শামস্-উদ্-দীন ইলিয়াস শাহ্‌কে 'শাহ-ই-বাঙ্গালা,' 'শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান' বা 'সুলতান-ই-বাঙ্গালা' রূপে আখ্যা দিয়েছেন। সুলতান ইলিয়াস শাহ সমস্ত 'বাংলাদেশে' একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন। ইলিয়াস শাহ বাংলার তিনটি শাসন কেন্দ্রেই লখনৌতি, সাতগাঁও এবং সোনারগাঁও এ নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন। এভাবে তিনি বাংলায় স্বাধীন সালতানতের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করেন। বাংলার এই স্বাধীনতা প্রায় দুইশত বছর ধরে অক্ষুণ্ণ ছিল। সুতরাং ইলিয়াস শাহ মুসলমান সুলতানদের মধ্যে প্রকৃত অর্থেই প্রথম 'শাহ-ই-বাঙ্গালা' বা 'সুলতান-ই-বাঙ্গালা'।[১৩]

সুতরাং একথা বলা চলে যে, আফীফ 'বাঙ্গালা' বলতে সারা বাংলাদেশকে অর্থাৎ আবুল ফজলের 'বাঙ্গালা' বা ইউরোপীয়দের 'বেঙ্গালা' বা 'বেঙ্গলকে' বুঝিয়েছেন। তাই বলা যায় যে, ইলিয়াস শাহের সময় থেকেই 'বাঙ্গালা' ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর পূর্বে এই ব্যাপক অর্থে বাংলা বা বাঙ্গালার ব্যবহার পাওয়া যায়

না। বঙ্গ বা বঙ্গাল দ্বারা বাংলার অংশ বিশেষকে নির্দেশ করা হতো। তাই বাঙ্গালা নামের প্রচলন ইলিয়াস শাহের সময় থেকেই শুরু হয়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।[১৪]

নদ ও নদী

নদ ও নদী বলতে কী বুঝায় বা এর মধ্যে পার্থক্য কি? এই বিষয়ে অধিকাংশই এই মত দেন যে, নদীর শাখা আছে, নদের শাখা থাকে না। সাধারণত বলা হয়, যে জলস্রোত কোনো পর্বত, হ্রদ, প্রস্রবণ ইত্যাদি হতে উৎপত্তি লাভ করে ও বিভিন্ন জনপদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে বা নদীতে বা হ্রদে পতিত হয়, তাকে নদী বলে। যেমন, গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, মেঘনা ইত্যাদি। আবার যখন কোন নদী হতে কোন শাখার সৃষ্টি হয় না, তখন তাকে বলা হয় নদ। যেমন, অজয়, কপোতাক্ষ, ব্রহ্মপুত্র, নীল ইত্যাদি নদ।

জলধারার এরকম লিঙ্গ বিভাজন পৃথিবীর অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। একমাত্র উপমহাদেশের সংস্কৃতিতেই জলধারার লিঙ্গ বিভাজন রয়েছে। ভারতীয় চৈতন্যে ব্রহ্মপুত্র নদ কিন্তু গঙ্গা নদী। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী রয়েছে। যেমন,শীতলক্ষা, যমুনা ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী। সুতরাং এজন্য ব্রহ্মপুত্র নদী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার কথা, কিন্তু ব্রহ্মপুত্রকে তো নদ হিসেবে ধরা হয়। প্রকৃত পক্ষে নদ ও নদীর সাথে শাখা থাকা না থাকার সম্পর্ক নেই। নদ ও নদীর মাঝে যা পার্থক্য আছে তা হলো ব্যাকরণগত। বাংলা, হিন্দি ও ফার্সি ইত্যাদি ভাষার ক্ষেত্রে পুরুষবাচক শব্দ সাধারণত অ-কারন্ত এবং নারী বাচক শব্দ আ-কারন্ত বা ই, ঈ কারন্ত হয়। যেমন- পদ্মজ (অ-কারন্ত), পদ্মজা (আ- কারন্ত, নামের শেষে আ আছে), রজক (অ-কারন্ত), রজকী (ঈ-কারন্ত, নামের শেষে ঈ আছে)। তাই যে সকল নদীর নাম পুরুষবাচক অর্থাৎ অ-কারন্ত তারা নদ। আর যে সকল নদীর নাম নারীবাচক অর্থাৎ আ- কারন্ত বা ঈ, ই- কারন্ত তারা নদী। একারণে বাংলাদেশের আড়িয়াল খাঁ, এটি পুরুষ নাম জ্ঞাপক হলেও যেহেতু শেষে আকার রয়েছে সে জন্য এটি নদ না হয়ে নদী। আবার মিশরের নীল স্ত্রী নাম জ্ঞাপক একটি প্রবাহ। কিন্তু এর শেষে আকার, একার কিছু নেই, তাই সেই সূত্রে এটি নদ।

প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক অবস্থানে নদ নদী

সুজলা সুফলা বাংলা পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ অঞ্চল। এর অধিকাংশ ভূ-ভাগই গঙ্গা-ভাগীরথী-পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র নদী বাহিত পলিমাটিতে গড়ে উঠেছে। এজন্য বাংলার ভূ-ভাগের বেশি অংশই নবসৃষ্ট ভূমি। অবশ্য এর পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রাচীন বা পুরাভূমির বন্ধনীও রয়েছে। বাংলার পশ্চিমাংশের প্রাচীনভূমি রাজমহল থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এই পুরাভূমির অন্তর্গত রাজমহল, সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, সিংভূম, ধলভূমের জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চল অবস্থিত। তবে অবশ্য মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের উচ্চতর অঞ্চলও এর অন্তর্গত। আবার এই প্রাচীনভূমির একটি শাখা উত্তর বাংলায় বিস্তৃত হয়েছে। এটা মালদহ, রাজশাহী, দিনাজপুর ও রংপুরের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের তীর সংলগ্ন অঞ্চল ধরে আসামের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে। পূর্বদিকে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল উত্তর হতে দক্ষিণে নেমে গেছে। এই তিন দিকের প্রাচীন ভূমির বন্ধনী বাদ দিলে মধ্যবর্তী অংশ, যা সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এর সবটুকুই নবসৃষ্ট। এই অঞ্চলই প্লাবন সমভূমি এবং বদ্বীপ বা ডেল্টা নামে পরিচিত। বাংলার এই প্রাকৃতিক ভূমি বৈশিষ্ট্যের আলোকে ড. মমিন চৌধুরী এই অঞ্চলকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। এটা যথাক্রমে: ১. উত্তর বাংলার সমভূমি, ২. ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা মধ্যবর্তী অঞ্চল, ৩. ভাগীরথী মেঘনা মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ, ৪. চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনুচ্চ পার্বত্য এলাকা এবং ৫. বর্ধমান অঞ্চলের অনুচ্চ পার্বত্যভূমি হিসেবে উল্লেখিত।[১৫] এই সকল বিষয় বিশ্লেষণ করে বলা সম্ভব যে, বাংলার চতুর্দিকে একটি সীমান্তবর্তী অংশ ছাড়া প্রায় সবটাই ভূ-তত্ত্বের আলোকে নবসৃষ্ট সমতল ভূমি।

বাংলার এই সমতলভূমি গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র ও এদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বাহিত পলিমাটি দ্বারা গড়ে উঠেছে। নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায়:

> বাংলার ইতিহাস রচনা করিয়াছে বাংলার ছোট বড় অসংখ্য নদনদী। এই নদনদীগুলোই বাংলার প্রাণ; ইহারাই বাংলাকে গড়িয়াছে, বাংলার আকৃতি-প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছে যুগে যুগে, এখনও করিতেছে। এই নদনদীগুলিই বাংলার আর্শীবাদ; এবং প্রকৃতির তাড়নায়, মানুষের অবহেলায় কখনও কখনও বোধ হয় বাংলার অভিশাপ।[১৬]

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। বাংলার নদনদীসমূহ এই অঞ্চলকে ভৌগোলিক বৈচিত্র্য দান করেছে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং এদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা ও অন্যান্য প্রধান নদী বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও এর বিভিন্ন অংশের সীমা নির্দেশ করেছে। এভাবে প্রধান নদীগুলোর স্রোতধারাসমূহ বাংলাকে উত্তর, পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব এই চারটি বিভাগে বিভক্ত করেছে। এই প্রত্যেকটি বিভাগ একদিকে যেমন বিশিষ্ট ভৌগোলিক সত্ত্বা বিশিষ্ট, অপরদিকে তেমনি ঐতিহ্যেপূর্ণ। এগুলো যথাক্রমে, (১) গঙ্গার প্রধান প্রবাহ পদ্মার উত্তরে এবং ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন অঞ্চল, বরেন্দ্র ছিল পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত মণ্ডল, (২) গঙ্গার অপর প্রবাহ ভাগীরথী নদীর পশ্চিম পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ছিল প্রাচীন রাঢ়, (৩) ভাগীরথী, পদ্মা, নিম্নগামী ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার মধ্যবর্তী বিভাগ ‘বঙ্গ’ নামে খ্যাত ছিল এবং ৪. মেঘনার পূর্ববর্তী অঞ্চলে সমতট রাজ্য অবস্থিত ছিল।[১৭] সুতরাং নদীই যে প্রাচীন বাংলার প্রাকৃতিক সীমা নির্দেশ করত তা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়।

প্রাচীনকালে এই নদীসমূহের খাতের গতিপথ পরিবর্তিত হতো। এর সামান্য ইঙ্গিত ষোড়শ শতকের জ্যাও দ্যা ব্যারোসের, সপ্তদশ শতকের ফান্‌ডেন্ ব্রোকের এবং অষ্টাদশ শতকের রেনেলের অঙ্কিত মানচিত্রে দেখা যায়। এসব অঙ্কিত নদীপথের প্রবাহ হতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীনকালেও গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, তিস্তা প্রভৃতি নদীর প্রবাহপথ বর্তমান কালের প্রবাহপথগুলোর চেয়ে ভিন্নতর ছিল। বর্তমানে এসকল নদীর গতি ও প্রকৃতি অষ্টাদশ শতাব্দীর গতিপথ হতে অনেকাংশ ভিন্নতর হয়েছে। অবশ্য নদীমাতৃক বাংলার নদীর প্রবাহপথ ক্রমশ ভিন্নতর হওয়া স্বাভাবিক হলেও এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব সর্বাধিক। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন:

> বাংলার নদনদীর গতি পরিবর্তনের ফলে একদিকে যেমন বহু নতুন জনপদের সৃষ্টি ও পুরাতন জনপদের (বিশেষত নগরীর) সমৃদ্ধি হইয়াছে, তেমনি বহু নগরীও জনশূন্য, শ্রীহীন অথবা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে।[১৮]

এই সকল নদীর ক্রমপরিবর্তনের রূপ ও আকৃতি, প্রকৃতি সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে আমাদের নিকট প্রায়ই অস্পষ্ট। যদিও প্রাচীন সাহিত্য ও লিপিমালায় এদের অবস্থান ও গতি প্রকৃতির সামান্য ইঙ্গিত বর্তমান কিন্তু এতে আমাদের জানার আগ্রহ পূরণ হয় না। তবে এই নদীমালাই যে বাংলার ইতিহাসের গতিধারাকে প্রভাবিত করেছে তা অবশ্যই স্বীকার্য। নিম্নে বাংলার নদীমালা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো:

গঙ্গা

গঙ্গা নদী বাংলার নদনদীর মধ্যে সর্বপ্রধান। গঙ্গা হিমালয় পর্বত হতে উৎপন্ন হয়ে রাজমহলকে স্পর্শ করে বাংলায় প্রবেশ করেছে। বাংলায় প্রবেশ করে গঙ্গা নদী মুর্শিদাবাদ জেলায় ছবঘটির নিকটবর্তী স্থানে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে একটি প্রবাহ পূর্ব দক্ষিণ অভিমুখে ‘পদ্মা’ এবং অপরটি সোজা দক্ষিণ দিকে ‘ভাগীরথী’ নামে প্রবাহিত হয়েছে। বর্তমানে এই ভাগীরথী জঙ্গীপুর, লালবাগ, কাটোয়া, নবদ্বীপ ও কলিকাতা নগরীর পাশ দিয়ে ডায়মণ্ড হারবারের নিকট সমুদ্রে পতিত হয়েছে। আর পদ্মা নদী পূর্ব-দক্ষিণ অভিমুখে অগ্রসর হয়ে বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করে চাঁদপুরের নিকটবর্তী মেঘনা নদীর প্রবাহকে বেগবান করে বঙ্গোপসাগরে মিলিত

হয়েছে। এই পদ্মা ও ভাগীরথী নদীর মধ্যে ভাগীরথী নদীই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং পুণ্যবতী। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য লিপিমালায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৯] উদাহরণস্বরূপ রাজা লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রলিপিতে সম্ভবত: গঙ্গার ভাগীরথী প্রবাহকেই 'দেবনদী' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[২০] অষ্টম ও নবম শতাব্দীর লিপিমালায় ও সংস্কৃত সাহিত্যে গঙ্গার সমস্ত পানি হিমালয় হতে সমুদ্র পর্যন্ত ভাগীরথী নদী বহন করত বলে উল্লেখ আছে।[২১] কিন্তু পদ্মা নদী সম্পর্কে এরূপ কোন তথ্য আমরা পাই না।

পঞ্চদশ শতকে ভাগীরথী নদী খুব প্রভাবশালী নদী না হলেও সে সময় এই নদীপথে সমুদ্রতীর হতে ভাগলপুর পর্যন্ত বড় বড় বাণিজ্যতরী চলাচল করত। তখন ভাগীরথীই ছিল গঙ্গার মূল প্রবাহ।[২২] জলবিজ্ঞানের প্রমাণযোগ্য তথ্যে ভাগীরথীকে গঙ্গার প্রথম ও প্রাচীন প্রবাহ বলা হয়েছে।[২৩] অপরদিকে রেনেলের, ফান্‌ডেন ব্রোকের অঙ্কিত চিত্রে এবং বিপ্রদাশের বর্ণনায় জানা যায় যে, পঞ্চদশ হতে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত কলিকাতা অবধি এর প্রবাহ পথ একই ছিল; কিন্তু সমুদ্রে পতিত হওয়ার পথ ছিল বিভিন্ন। এটি বিপ্রদাসের ও ফান্‌ডেন্ ব্রোকের সাথে রেনেলের মানচিত্রের বৈসাদৃশ্য থেকেই উপলব্ধি সম্ভব। এই তথ্য হতে এটি দেখা যায় যে, এই ভাগীরথী নদী কালের ব্যবধানে অতিশয় ক্ষীণ হয়ে পড়েছে।[২৪]

প্রাচীনকালে ত্রিবেণীর নিকট ভাগীরথী নদী ত্রিধারায় বিভক্ত হতো। এই সম্পর্কে বিপ্রদাস তাঁর *মনসা বিজয়* কাব্যে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনায় সরস্বতী ও যমুনা নদী প্রতাপশালী নদী এবং সপ্তগ্রাম একটি সমৃদ্ধশালী বন্দর হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে।[২৫] তখন সরস্বতী নদী সপ্তগ্রামের নিকট ভাগীরথী হতে নির্গত হয়ে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দরের কাছে রূপনারায়ণ নদীর সাথে মিলিত হতো এবং এর মাঝে দামোদর ও সাঁওতাল পরগণার বহু ছোট-বড় নদীর সাথে সংযুক্ত হয়ে এর স্রোত বৃদ্ধি করে সমুদ্র-সোপান স্পর্শ করতো। পরবর্তীকালে এই স্বরস্বতী নদীর খাত পরিবর্তিত হওয়ায় প্রথমেই তাম্রলিপ্তি ও পরে সপ্তগ্রামের মতো বিখ্যাত বন্দর দুটির অবনতি ঘটেছে এবং নতুন প্রবাহপথের সৃষ্টি হওয়ায় হুগলী বন্দরের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে সরস্বতীর উর্দ্ধাংশ মৃতপ্রায় এবং অপর প্রভাবশালী নদী যমুনাও ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। কিন্তু বিপ্রদাসের বর্ণনায় যমুনা ও সরস্বতী নদী প্রতাপশালী হিসাবে উল্লেখি করা হয়েছে।

ভাগীরথী নদীর খাতেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। প্রাচীনকালে এই নদী রাজমহল অতিক্রম করে সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর, মানভূম, বলভূম হয়ে সাগরে পতিত হতো। ভাগীরথীর এই স্রোতের সাথে অজয়, দামোদর এবং রূপনারায়ণ নদী মিলিত হতো। ভাগীরথীরর দক্ষিণাংশে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দরের অবস্থান ছিল। অষ্টম শতাব্দীর পূর্বেই এই প্রবাহের অবনতি ঘটে। এসময়ের পর থেকে ভাগীরথী বর্তমান কালিন্দী মহানন্দা খাতে প্রবাহিত হয়ে গৌড় নগরী অতিক্রম করতো। এতে প্রবাহ প্রথম পর্যায়ে খাতের সামান্য পূর্বদিক হতে প্রবাহিত হতে থাকে। যার ফলে তাম্রলিপ্ত বন্দরের পতন ঘটে। ভাগীরথীর স্রোতধারা কলিকাতা বেতড় হয়ে দক্ষিণে আদিগঙ্গা দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। পরবর্তীতে আদিগঙ্গা প্রবাহ চলাচলের অযোগ্য হয়ে পরিত্যক্ত হলে পুরাতন সরস্বতী খাতে ভাগীরথীর জলপ্রবাহ সমুদ্রে যেতে শুরু করে।[২৬]

গঙ্গার অপর প্রবাহ হলো পদ্মা। অষ্টাদশ শতকে রেনেলের মানচিত্রে (১৭৬৪ খ্রী.-১৭৭৭খ্রী.) দেখা যায় যে, পদ্মা প্রবাহ আত্রাই ও করতোয়ার মিলিত প্রবাহের সাথে জাফরগঞ্জের নিকট মিলিত হচ্ছে। এই প্রবাহ দক্ষিণ অভিমুখে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরের প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত দক্ষিণ শাহবাজপুর দ্বীপের কাছে মেঘনা নদীতে মিলিত হয়ে সাগরে পতিত হয়েছে।[২৭] ভনডেন ব্রুকের মানচিত্রে (১৬৬০) দেখা যায় যে, পদ্মার প্রধান স্রোত ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জের পশ্চিম দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ধারণা করা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গড়াই-মধুমতি প্রবাহই পদ্মার প্রধান প্রবাহ ছিল। এর একশতাব্দী পূর্বে দ্যা ব্যারোসের নকশা অনুসারে পদ্মা রামপুর বোয়ালিয়া হয়ে ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গা প্রবাহ ধরে ঢাকা হয়ে মেঘনাতে পতিত হতো।[২৮]

ট্রাভার্ণিয়ার[২৯] ও মির্যা নাথানের[৩০] বিবরণে দেখা যায় যে, সতেরো শতকে পদ্মা ধলেশ্বরীর খাতে বা এর সমান্তরালে প্রবাহিত কোন এক খাতে প্রবাহিত হতো।[৩১]

প্রাচীন সাহিত্যিক উৎসসমূহেও পদ্মার উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। *দেবীভাগবত পুরাণ*[৩২], *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* ও কৃত্তিবাসের *রামায়ণে*[৩৩] পদ্মার প্রাচীন প্রবাহ সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। *দেবীভাগবতে*[৩৪] গঙ্গা ও পদ্মার পৃথক বর্ণনা দেয়া হয়েছে। শ্রীচন্দ্রের (৯৩০-৯৭৫ খ্রী.) কেদারপুর তাম্রশাসনে[৩৫] 'সতত-পদ্মাবতী' বিষয়ের অন্তর্গত 'কুমার তালক' মণ্ডলে ভূমিদান করা হয়েছে। কেদারপুর লেখই পদ্মার অন্যতম প্রাচীনতম উল্লেখ। দশম শতাব্দীর পূর্বে পদ্মার কোন উল্লেখ না পেলেও এর অবস্থিতি অনুমান করা যায়। টলেমি গঙ্গার পাঁচটি প্রবাহের উল্লেখ করেছেন এগুলো হলো:[৩৬]

(১) ক্যাম্বেসিন (The Kambyson),

(২) মেগা (The Mega),

(৩) কাম্বেরীখন (The Kambrrikhon),

(৪) পেসুদোস্তামন (The Pseudostomon) ও

(৫) এ্যন্টিবোল (The Antibole)।

এর মধ্যে তৃতীয় প্রবাহটি কাম্বেরীখন ও কুমার নদীর প্রবাহ অভিন্ন বলে অনুমান করা হয়েছে। প্রাচীনকালে গঙ্গার দক্ষিণমুখী ভাগীরথী প্রবাহই অধিক প্রবল ছিল। টলেমি গঙ্গার পাঁচটি প্রবাহের মধ্যে সর্বপশ্চিমের প্রবাহ মুখ ক্যাম্বেসিন থেকে সর্বপূর্বের এন্টিবোল প্রবাহমুখের দূরত্ব প্রায় ৪°অক্ষাংশ নিরূপণ করেছেন।[৩৭] ভাগীরথী ও পদ্মার পদ্মার প্রবাহ মুখের দূরত্ব টলেমি বর্ণিত উক্ত ৪° অক্ষাংশ দূরত্বের সমান। এছাড়া তমলুক ও চট্টগ্রামের মধ্যেও একই দূরত্ব লক্ষ্য করা যায়।গঙ্গার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বের দুটি প্রবাহকেই কৃত্তিবাস যথাক্রমে ছোটগঙ্গা ও বড়গঙ্গা বলে উল্লেখ করেছেন। তবে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও লিপিমালার প্রমাণে গঙ্গার ভাগীরথী প্রবাহই প্রাচীনতর ও পুণ্যতোয়া নদী তা বলা যায়।

প্রাচীনকাল থেকেই পদ্মার উপস্থিতি ছিল। কিন্তু প্রাচীন যুগের শুরুর দিকে এর নাম উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি আদি মধ্যযুগেও পদ্মাকে গঙ্গার প্রবাহ হিসেবে সার্বিকভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। ভাগীরথী প্রবাহ যেভাবে পবিত্রতার উৎস হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে প্রাচীন উৎসসমূহে পদ্মা সে রকম মর্যাদা কখনই পায়নি। এর কারণ হতে পারে যে ভাগীরথী পদ্মার চেয়ে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, বেশি প্রশস্ত ও বেশি পরিচিত ছিল। যদিও বর্তমানে পদ্মার প্রবাহই বেশি গতিশীল।[৩৮]

ভনডেন ব্রুকের (১৬৬০) ও রেনেলের মানচিত্র থেকে দেখা যায় যে, পদ্মাই হলো গঙ্গার প্রধান প্রবাহ। এখানে ভাগীরথীকে অপেক্ষাকৃত সরু প্রবাহ হিসেবে দেখানো হয়েছে। তাছাড়া মেজর রেনেল তাঁর বর্ণনাতে গঙ্গার স্থলে পদ্মা নদীর নামোল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন:

> The proper name of this river (The Ganges) in the language of Hindoostan (or Indestan) is Padda. It is also called Baragang or the great river.[39]

তাছাড়া কৃত্তিবাসের সাক্ষ্যের আলোকে বলা যায় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই পদ্মা গঙ্গার বৃহৎ প্রবাহে পরিণত হয়।[৪০] ১৫৫০ খ্রী. দ্যা ব্যারেজ এর অঙ্কিত নকশাতেও পদ্মাকে বৃহৎ প্রবাহ হিসেবে লক্ষ্য করা যায়। ষোড়শ শতকে আবুল ফজলের বর্ণনায়ও পদ্মাকে গঙ্গার প্রবাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪১] চতুর্দশ শতাব্দীর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা তাঁর বর্ণনাতে লিখেছেন,

> The first city of Bengala that we entered was called Sadkawan, a large town on the coast of the great sea. Close by itthe river Ganges, to which the Hindus go on pilgrimage and the river Jun unite and discharge together into the sea.[42]

ইবনে বতুতা বর্ণিত সোদকাওয়ানকে চট্টগ্রাম নগরী বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়া তাঁর বর্ণিত গঙ্গা বর্তমানের পদ্মা এবং যুন বা যমুনা বলতে ব্রহ্মপুত্রকে বোঝান হয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীর কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর '*রামচরিত*' কাব্যেও গঙ্গার এই প্রবাহের কথা উল্লিখিত হয়েছে। কবি বরেন্দ্রের সীমা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, করতোয়া বরেন্দ্রের পূর্বসীমায় এবং গঙ্গা বরেন্দ্রের দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।[৪৩] রামপাল গঙ্গা অতিক্রম করেই বরেন্দ্রে প্রবেশ করেছিলেন।[৪৪] সন্ধ্যাকরনন্দীর স্থান বিবরণের নিরিখে তাঁর বর্ণিত গঙ্গা বলতে যে পদ্মা প্রবাহকেই বুঝিয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীতেই যে পদ্মার প্রবাহ শক্তিশালীভাবে অস্তিত্বশীল ছিল তা *রামচরিত* এর সাক্ষ্যের আলোকেই বলা যায়। একদশ শতাব্দীর সিদ্ধাচার্য চর্যাপদের পদকর্তা ভুসুকুর রচনাতেও পদ্মার উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়।[৪৫]

ভৈরব, কুমার ও মাথাভাঙ্গা

গঙ্গা-পদ্মা প্রবাহ বাংলার ভূ-প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর এই প্রবাহের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে আরও অনেক নদ-নদী। বিস্তীর্ণ সমতল ভূমির উপর প্রবাহকালে নদীর গতি পরিবর্তন স্বাভাবিক। এভাবে নতুন নতুন প্রবাহ দ্বারা শাখা নদী সৃষ্টি করাও স্বাভাবিক বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এককালের ভৈরব প্রবাহ তেমনি একটি শাখা নদী। ভৈরব রাজশাহীর রামপুর বোয়ালিয়ার কাছে পদ্মা থেকে নির্গত হয়ে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হয়ে হরিণঘাটা মোহনায় বঙ্গোপসাগরে পড়তো। এখন অবশ্য জলঙ্গী নদী ও মাথাভাঙ্গা ভৈরবের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে একে তিন ভাগে ভাগ করেছে।

মাথাভাঙ্গা, কুমার, নবগঙ্গা ও চিত্রা পদ্মার অন্যতম শাখা নদী।[৪৬] এ সমস্ত শাখা সমূহের মধ্যে কুমার প্রবাহকে অধিকতর চিহ্নিত করা যায়। কুমার নদী মাথাভাঙ্গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বর্তমানে গড়াই এর সাথে মিলিত হয়েছে। কুমার ও গড়াই এর মিলিত প্রবাহ গড়াই নামে প্রবাহিত হয়ে কুষ্টিয়ার শিলাইদহের সন্নিকটে মধুমতির সাথে মিলিত হয়েছে। এই প্রবাহ বঙ্গোপসাগরের সাগরের সন্নিকটে বালেশ্বর নদীর সাথে মিলিত হয়ে হরিণঘাটা মোহনায় পতিত হয়েছে। রেনেলের মানচিত্রে কুমার নদীয়া, যশোর এবং ফরিদপুর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এরপর আরো কিছুটা নিম্নভূমিতে গড়াই এর সাথে সংযোগ ঘটেছে। এরপর বারাশিয়া নামক দক্ষিণবাহী এক শাখা নদী উক্ত প্রবাহ থেকে উৎসারিত হয়েছে। শ্রীচন্দ্রেরকেদারপুর তাম্রশাসনের আলোকে দেখা যায় যে, এখানে 'কুমার তালক' মণ্ডলে ভূমিদান করা হয়েছে।[৪৭] ধারণা করা হয় যে, উক্ত প্রশাসনিক বিভাগটি ভৌগোলিকভাবে কুমার নদীর সাথে সম্পর্কিত।[৪৮] কুমার প্রবাহকে দ্বিতীয় শতকের টলেমির বিবরণের আলোকেও চিহ্নিত করা যায়।[৪৯] টলেমির বর্ণিত গঙ্গার তৃতীয় প্রবাহমুখের নাম কাম্বেরিখান। এই কাম্বেরীখান প্রবাহমুখকে কুমার প্রবাহের হরিণঘাটা মুখের সাথে অভিন্ন বলে মনে করা হয়।[৫০] এভাবে বলা যায় যে, দ্বিতীয় শতকের মধ্যেই কুমার গঙ্গার অন্যতম প্রবাহ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

যমুনা

মধ্যযুগে মধ্য বাংলায় গতিশীল প্রবাহ হিসেবে ভাগীরথীর শাখা যমুনা নদীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বর্তমানে এই নদী একেবারে শুকিয়ে গেছে। রেনেলের মানচিত্রে যমুনাকে অত্যন্ত সরু নদী হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু পঞ্চদশ শতকে যমুনা ত্রিবেণী সঙ্গমের অন্যতম নদী ছিল।সপ্তগ্রামের বর্ণনায় বিপ্রদাস বলেছেন,

গঙ্গা আর সরস্বতী যমুনার বিশাল অতি

অধিষ্ঠান উমা মহেশ্বরী।[৫১]

ধোয়ীর *'পবনদূত'*কাব্যেও যমুনার ভাগীরথী থেকে নির্গত হওয়ার উল্লেখ আছে।[৫২] পঞ্চদশ শতাব্দীর যমুনা ক্ষীণ হতে ক্রমান্বয়ে ক্ষীণতর প্রবাহে রূপান্তরিত হয়েছে।

তিস্তা, করতোয়া, আত্রাই, পুনর্ভবা

উত্তর বাংলার ভূমি গঠনের ক্ষেত্রে তিস্তার নাম উল্লেখ্য। বর্তমানে তিস্তার প্রবাহ জলপাইগুড়ি ও রংপুর অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। রেনেলের মানচিত্রে তিস্তার তিনটি দক্ষিণবাহী প্রবাহ দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে পূর্ব স্রোতের নাম করতোয়া, মধ্যবর্তী স্রোতধারা আত্রাই এবং পশ্চিম স্রোত পুনর্ভবা। তিন স্রোতে প্রবাহিত বলেই এর নাম সম্ভবত ত্রিস্রোতা বা তিস্তা।[৫৩] এই প্রবাহসমূহ উত্তরবঙ্গের নিচের দিকে মিলিত হয়ে হুরাসাগর নাম ধারণ করে গোয়ালন্দের সন্নিকটে জাফরগঞ্জে পদ্মায় মিলিত হতো। বর্তমানেও আত্রাই, করতোয়া, বড়াল ও যমুনেশ্বরী নদীর মিলিত প্রবাহ হুরাসাগর নামেই পরিচিত। তবে এটি পদ্মার পরিবর্তে গোয়ালন্দের উপরের দিকে যমুনার সাথে মিলিত হচ্ছে।

রেনেলের মানচিত্রে 'তিস্তা সি' নামে একটি ক্ষীণ প্রবাহ দেখানো হয়েছে। এই প্রবাহ জলপাইগুড়ি শহরের অল্প দক্ষিণে তিস্তা থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ-পূর্বমুখী স্রোত রংপুরের ভেতর দিয়ে কালিগঞ্জের নিকটে ব্রহ্মপুত্রে পড়েছে। বর্তমানের তিস্তা এই খাতেই প্রবাহিত হচ্ছে। অনুমান করা যায় যে, ১৭৮৭ সালের এর প্রলয়ঙ্কারী বন্যার কারণে এই পরিবর্তন ঘটেছে।[৫৪]

করতোয়া বর্তমানে মৃতপ্রায় ক্ষীণ প্রবাহ। রেনেলের নকশাতে করতোয়াকে ভালোভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বর্ণনা মতে করতোয়ার বিশাল খাত প্রথমে দক্ষিণ ও পরে দক্ষিণ পূর্বমুখী হয়ে ঘোড়াঘাট, শিবগঞ্জ, ও বগুড়ার পাশ দিয়ে প্রবাহিত শাহজাদপুরের দক্ষিণে আত্রাই এর সাথে মিলিত হতো। সপ্তদশ শতকের জ্যোও দ্যা ব্যারোসের ও ক্যানটিল্যাডি ভ্যানিলার মানচিত্রে দেখানো হয়েছে যে 'কোঅর' নামক একটি নদী সোজা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। এই মানচিত্রে দেখানো হয়েছে এই নদী সরাসরি রেনিও ডি কোমোটাহ্ রাজ্যের মধ্য দিয়ে উক্ত রাজ্যের নিম্নাঞ্চলে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত অপর একটি স্রোতধারায় সাথে মিলিত হচ্ছে। এখানে রংপুর ও কোচবিচার অঞ্চল রেনিও ডি কোমোটাহ্ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এই অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত নদীকে সহজেই করতোয়া হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অপর দিকে উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রবাহটিকে ব্রহ্মপুত্রের উর্ধ্বস্থ প্রবাহ হিসেবে ধারণা করা যায়। ডাব্লুউ ডাব্লুউ হান্টারের বিবরণে এই মতকেই সমর্থন দেয়া হয়েছে। হান্টার উল্লেখ করেছেন যে, করতোয়া তীরে বসবাসরত জনগণ বিশ্বাস করতেন যে, ব্রহ্মপুত্র ও করতোয়া অভিন্ন নদী।[৫৫] টেভরনিয়ার তাঁর বিবরণে 'চ্যাটিভর' নামক বিশাল নদীর উত্তর দিক হতে প্রবাহের কথা বলেছেন।[৫৬] টেভরনিয়ার বর্ণিত এই নদীকে করতোয়ার সাথে অভিন্ন হিসেবে ধরা যায়। ভনডেন ব্রুকের মানচিত্রেও করতোয়ার বিশাল প্রবাহ দেখানো হয়েছে। মির্যা নাথান ঘোড়াঘাটের নিকটে করতোয়ার উল্লেখ করে বলেছেন যে, বর্ষাকালে এই নদী অনতিক্রমনীয়।[৫৭] সন্ধ্যাকরনন্দী *রামচরিত* কাব্যে করতোয়াকে বরেন্দ্রের পূর্ব সীমা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৫৮] সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক ভ্রমণকারী হিউয়েন সাঙ্ পুণ্ড্রবর্ধন থেকে কামরূপ যাওয়ার পথে যে বড় নদী পার হয়েছিলেন তা করতোয়া বলেই অনুমান করা হয়।[৫৯] সুতরাং প্রাচীনকালে করতোয়া যে এক বিশাল জল প্রবাহ ছিল তা আমরা বলতে পারি। *পদ্মপুরাণ*[৬০], *মার্কণ্ডেয় পুরাণ*[৬১] ও *মহাভারতে*[৬২], পুণ্যা করতোয়ার পবিত্রতার পরিচয় রয়েছে। ১১০০ খ্রী. এর পূর্বে রচিত *করতোয়া মাহাত্ম্য* গ্রন্থে করতোয়ার বিপুল প্রবাহ এবং তীর্থমহিমার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।[৬৩]

বর্তমানে আত্রাই প্রবাহ পুনর্ভবা থেকে নির্গত হয়ে রাজশাহী বিভাগের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যমুনা নদীতে মিলিত হয়েছে। কিন্তু রেনেলের মানচিত্র অনুযায়ী আত্রাই দক্ষিণ দিকে দিনাজপুরের পাশ দিয়ে পুটিরাম, জঙ্গিপুর হয়ে দক্ষিণ পূর্ব দিক বাঁক নিয়ে চলনবিলের মধ্যদিয়ে শাহজাদপুরের নিম্নে করতোয়ার সাথে মিলিত হয়েছে। ভনডেন ব্রুকের মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, আত্রাই থেকে একটি ছোট শাখা বের হয়ে পদ্মাতে পতিত হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নদী হলো পুনর্ভবা। ঊনবিংশ শতাব্দী হতে পুনর্ভবা চাপাই নবাবগঞ্জের রোহনপুরের ঠিক দক্ষিণে মহানন্দার সাথে একত্রিত হয়ে পদ্মায় পতিত হচ্ছে। রেনেলের মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, মহানন্দা করতোয়া থেকে নির্গত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, উত্তরবঙ্গের নদী সমূহের মধ্যে করতোয়া ছাড়া অন্য সব নদীর বিবরণ মধ্যযুগের শেষ পর্বে পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মধ্যযুগের শেষপর্বে চিহ্নিত এসব নদীর প্রবাহের সাথে বর্তমান কালের প্রবাহের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। এর কারণ হিসেবে ছোট পরিসরে ১৭৮৭ সালের মহাপ্লাবনকে চিহ্নিত করা যায়। তিস্তার মূল প্রবাহ গতিপথ পরিবর্তনের ফলে তিস্তার প্রবাহের সাথে সংশ্লিষ্ট শাখা নদী সমূহে পানি প্রবাহ কমে আসতে থাকে। এর ফলে স্বাভাবিক ভাবেই করতোয়া, পুনর্ভবা ও আত্রাই নদীতে পানি প্রবাহ কমে পলি জমতে থাকে এবং এই নদীগুলো ধীরে ধীরে মৃতপ্রায় হতে থাকে।

ব্রহ্মপুত্র, যমুনা

বাংলার নদীসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় প্রধান প্রবাহ ব্রহ্মপুত্র বাংলার উত্তর পূর্ব ও পূর্বাঞ্চলের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি তিব্বতের মানস সরোবরে। ব্রহ্মপুত্র উৎপত্তিস্থল থেকে প্রথমে পূর্বগামী হয়েছে। এরপর ব্রহ্মপুত্র দক্ষিণ দিকে বাঁক দিয়ে আসামে প্রবেশ করেছে। আসামের ভিতর দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ কিছুটা দক্ষিণ-পশ্চিমগামী হয়ে কোচবিহার ও রংপুরের পাশ দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করেছে। বাংলা পর্যন্ত পৌছাতে ব্রহ্মপুত্র ১৮০০ মাইল পথ অতিক্রম করেছে। ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন নাম লৌহিত্য। ব্রহ্মপুত্র বেশ কয়েকবার গতিপথ পরিবর্তন করেছে। বর্তমানে এর মূলপ্রবাহ যমুনা-পদ্মা পথে চাঁদপুরে মেঘনার সাথে মিলিত হয়ে সমুদ্রে পড়ছে। এর আরেকটি প্রবাহ এখনো ব্রহ্মপুত্র নামে যমুনা থেকে বেরিয়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মেঘনাতে পতিত হয়েছে। রেনেলের নকশা অনুযায়ী ব্রহ্মপুত্র গারো পাহাড়ের পূর্ব-দক্ষিণভাগ ঘেঁষে দেওয়ানগঞ্জের পাশ দিয়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলের শেরপুর, বেগুনবাড়ির মধ্য দিয়ে মধুপুর জঙ্গলের পূর্বপাশ দিয়ে ঢাকা জেলার পূর্বাঞ্চল দিয়ে মেঘনাতে মিলিত হয়েছে। রেনেলের মানচিত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, ব্রহ্মপুত্রের একটি প্রবাহ মেঘনাতে পতিত হচ্ছে এবং অপর একটি প্রবাহ বর্তমানে যমুনা প্রবাহ যেখানে থেকে আলাদা হয়েছে সেই পথ ধরে প্রবাহিত হয়ে ধলেশ্বরীতে পতিত হচ্ছে। এই দ্বিতীয় প্রবাহটিকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পূণ্যভূমি লাঙ্গলবন্দ পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত। আমরা এভাবে ব্রহ্মপুত্রের তিনটি প্রধান প্রবাহকে চিহ্নিত করতে পারি। এগুলো হলো:

১. যমুনা প্রবাহ,
২. ময়মনসিংহ অঞ্চলের মধ্যকার প্রবাহ,
৩. রেনেল বর্ণিত পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ।

রেনেলের মানচিত্রের যমুনা প্রবাহের উল্লেখ দেখা যায় না। রেনেল পরবর্তী কোন সময়ে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন সময়ে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ হয়েছে বর্তমানের যমুনা। বগুড়া-পাবনার পূর্ব সীমা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যমুনা ব্রহ্মপুত্রের বিপুল জলরাশি গোয়ালন্দের কাছে এনে পদ্মায় মিলিত হয়েছে। প্রাচীন বাংলার লিপিমালায়

শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ[৬৪] তাম্রলিপিতে লৌহিত্যের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য লৌহিত্য হলো ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন নাম।

মেঘনা

মেঘনা বাংলার পূর্বাঞ্চলের অন্যতম প্রধান নদী। গঙ্গা বা ব্রহ্মপুত্র নদী অপেক্ষা মেঘনা নদী ছোট হলেও উপমহাদেশের সর্বাপেক্ষা বারিবহুল অঞ্চলের পানি এই নদী দিয়ে নিষ্কাশিত হচ্ছে। খাসিয়া-জয়ন্তিয়া শৈলমালা থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রথমত আসামের কুশিয়ারা ও সুরমা নদীর মিলিত ধারা মেঘনা নদীর প্রধান অংশ গঠন করেছে। উত্তর প্রবাহে মেঘনার প্রাচীন নাম সুরমা। এই সুরমা নদী সিলেট জেলা অতিক্রম করে নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ স্পর্শ করে ভৈরব বাজারে ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়ে সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করেছে। ভৈরব বাজারের নিকট হতে সমুদ্র পর্যন্ত এই বিশাল বেগবতী প্রবাহটিই প্রধানত মেঘনা নামে অধিক পরিচিত। ভৈরব বাজারে ব্রহ্মপুত্রের, মুন্সীগঞ্জের নিকট বুড়ীগঙ্গা, ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষ্যা এবং শেষত চাঁদপুরে পদ্মা নদীর মিলিত ধারা এই নদীকে বেগবান নদীতে পরিণত করেছে। তাছাড়া এই নদীর নামের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় দ্বিতীয় শতকে টলেমী কর্তৃক উল্লেখিত গঙ্গার অন্যতম প্রবাহমুখের নাম 'মেঘা' হতে মেঘনা নামের উদ্ভব বলে মতপ্রকাশ করেছেন।[৬৫]

বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য নদীর মধ্যে যথাক্রমে: অজয়, দামোদর, দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ, কাঁসাই ও সুবর্ণরেখ নদী উল্লেখযোগ্য। এই নদী সমূহের মধ্যে কাঁসাই ও সুবর্ণরেখ নদীদ্বয় ছাড়া অন্যগুলো বিহারের পার্বত্য অঞ্চলে উদ্ভব হয়েছে। রেনেলের মানচিত্রে এসকল নদীর গতিপথের যে বিবরণ দেয়া হয়েছে তা থেকে এই নদীগুলোর বর্তমান গতিপথের খুব বেশি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না।[৬৬] অজয় নদী বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার উচ্চভূমি অতিক্রম করে কটোয়ায় ভাগীরথীর সাথে মিলিত হয়েছে। দামোদর নদী ছোট নাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল হতে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে বালিগঞ্জ ও বর্ধমানের পার্শ্বদিয়ে ভাগীরথী রূপনায়নের মিলিত ধারার সামান্য উত্তরে হুগলী নদীতে মিশেছে। দ্বারকেশ্বর ও শিলাবতী নদীদ্বয় রূপনারায়ণ নদীর শাখা। এই দুটি প্রবাহ হলদিয়ার নিকটবর্তী হুগলী নদীতে প্রবাহিত হয়েছে। কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদী দুটি উড়িষ্যার পার্বত্য এলাকা হতে উৎপন্ন হয়েছে। এই নদী দুটি উড়িষ্যা ও পশ্চিম বাংলার সীমা নির্ধারণ করেছে।[৬৭]

উত্তর বাংলার অপর একটি নদী হলো কোশী নদী। এককালে এই নদী উত্তরবঙ্গের মধ্যদিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হতো। বর্তমানে এটা বাংলার বাইরে প্রবাহিত হচ্ছে। এটা বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মধ্যদিয়ে রাজমহলের সামান্য উত্তরে গঙ্গানদীর সাথে মিলিত হচ্ছে। এই কোশী নদীর খাত পরিবর্তন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই নদী এক সময় পূর্বগামী ও ব্রহ্মপুত্র অভিমুখী ছিল। কিন্তু কালের ব্যবধানে এর গতি প্রবাহ ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়েছে এবং একেবারে পশ্চিম দিকে সরে গেছে। কোশী নদীর এই খাত পরিবর্তনের ফলে গৌড়, লক্ষণাবতী, পাণ্ডুয়ার মত ঐতিহাসিক স্থান এর মর্যাদা হারিয়েছে।[৬৮]

বাংলার নদীমালা সম্পর্কিত উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, নদী বাংলার ভূ-প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। নদীর গতিপথ নিঃসন্দেহে এই অঞ্চলের প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি। আদিকাল থেকে এদের গতিপথের ধারাবাহিক চিত্র পুনর্গঠন করা সম্ভব নয়। তবে যেসব পরিবর্তন চিহ্নিত করা সম্ভব তা এই সত্যেরই ইঙ্গিত বহন করে যে, যুগে যুগে নদীসমূহের যাত্রাপথের পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষ করে নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলে এই পরিবর্তন বেশি ক্রিয়াশীল থেকেছে। নদীর পরিবর্তন বাংলার মানুষের জীবন যাত্রায় ও সামগ্রিক কার্যকলাপে গভীর প্রভাব রেখেছে। প্রাচীন গ্রিক ও লাতিন লেখনীতে গঙ্গার অববাহিকায় যে, 'গঙ্গারিডাই' রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, তা 'গঙ্গা-হৃদয়' এর রূপান্তর বলে মমিন চৌধুরী মত দিয়েছেন।[৬৯]

ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তীভূভাগ 'গঙ্গা-হৃদয়' বলে পরিচিত হবে এমন অনুমান খুব অযৌক্তিক নয়। এই গ্রিক লাতিন নাম হয়তো বাংলার ভূ-প্রকৃতিতে নদীর গুরুত্বের কথাই প্রমাণ করে। এই গুরুত্ব সুপ্রাচীন কালেই স্বীকৃতি পেয়েছিল বলে ধরতে পারি।

বাংলার প্রাচীন জনপদসমূহের ভৌগোলিক অবস্থিতি অনেকাংশে ভূ-প্রকৃতি এবং বিশেষ করে নদী স্রোতধারা দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রাচীন যুগে বাংলা বলতে সমগ্রদেশকে এর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন নামে পরিচিত ভূখণ্ডকে বোঝায়। নামগুলো বেশির ভাগই প্রাচীন জনগোষ্ঠীর নামানুসারে প্রচলিত নাম। এদের ভৌগোলিক পরিমণ্ডল প্রাকৃতিক পরিবর্তনের বিশেষ করে নদীর পরিবর্তনের সঙ্গেও পরিবর্তিত হয়েছে। আবার রাজনৈতিক ক্ষমতার বিস্তার বা হ্রাসও এদের পরিমণ্ডল পরিবর্তন করেছে।

তথ্যনির্দেশ

১ এস.এম. রফিকুল ইসলাম, *প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস, সেনযুগ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১), পৃ. ১।

২ আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: বর্ণায়ণ, ২০০২), পৃ. ১১-১২।

৩ O.H. Spate, A.T. Learmonth and B.H. Farmer, *India, Pakistan and Ceylon,The Region* (Bombay: B. I. Publication, 1960), pp. 571-599.

৪ আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২।

৫ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, (কলিকাতা:দে'জ পাবলিশিং, ১৪০০), পৃ. ৮৬।

৬ আবদুল মমিন চৌধুরী, 'বাংলার ভৌগোলিক পরিচয়,' আনিসুজ্জামান (সম্পা.), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ১২-১৩।

৭ H.S. Jarrett (trans.), *The Ain-I-Aklari by Abul Fazal Allami,* Vol.II (Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1891), pp. 115-120.

৮ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮।

৯ সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা দেশের নামের পুরাতত্ত্ব', *ইতিহাস*, কলিকাতা, নবম সংখ্যা, ১৩৬৫, পৃ. ১৭-২০।

১০ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস,আদিপর্ব, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪-১৩৫।

১১ আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ১৩-১৪।

১২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪।

১৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫-১৬, ১৯৮-১৯৯।

১৪ Hari Ram Gupta (ed.),*Sir Jadunath Sarkar Commemoration Volume*(Hasiarpur: Dept. of History, Punjab University, , 1957), pp. 56-57.

১৫ আনিসুজ্জামান (সম্পা.), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ৫।

১৬ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২।

১৭ R.C Majumdar (ed.), *History of Bengal*, Vol.1 (Dacca: University of Dacca, 1943), p. 2.

১৮ রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রাচীনযুগ* (কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৯৮১), পৃ. ৬।

১৯ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫।

২০ Ramaranjan Mukherji & Sachindra Kumar Maity, *Corpus of Bengal Inscriptions Bearing on History and Civilization of Bengal* (Calcutta: Firma K.L.M, 1967), p. 283.

২১ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪-৭৭।

২২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫।

২৩ K. Bagchi, *The Ganges Delta* (Calcutta: University of Calcutta, 1944), pp. 18-35.

২৪ Amitabha Bhattacharyya, *Historical Geography of Ancient and Early Mediaeval Bengal*, (Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar, 1977), pp. 16-17.

২৫ বিপ্রদাস, *মনসা বিজয়*, সুকুমার সেন (সম্পা.), (কলিকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৯৫৩), পৃ. ১৪২।

২৬ আনিসুজ্জামান (সম্পা.), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯।

২৭ Amitabha Bhattacharryya, *op.cit*, p. 21.

২৮ W. Hamilton, *Geographical Statistical and Historical Description of Hindostan*, Vol.I (London: John Murry, 1820), p. 188.
২৯ V. Ball, *Travels in India by Jean Baptist Tavernier,* Vol.I (London: Macmillan and Co.,1889), pp. 127-129.
৩০ M.I. Borah (Trans.) *Baharistan-i-Ghyabi,* Vol.I (Gauhati: Government of Assam in the Dept. of Historical and Antiquarian Studies, 1937), p. 56.
৩১ Bimala Churn Law (ed.), *D.R. Bhandarkar Volume* (Calcutta: Indian Research Institute, 1940), p. 351.
৩২ Swami Vijnananda (Trans.), *The Srimad Devi Bhagavatam, The Sacred Books of the Hindus,* Vol.XXVI, Part-3 (Allahbad: Panini office, 1922), p. 831.
৩৩ কৃত্তিবাসের *রামায়ণ* (নাথানিয়েল হ্যাসি হ্যালহেড সাহেবের সংগৃহীত পুঁথি ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য পুঁথি অবলম্বনে), (কলিকাতা: ভারবি, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৩।
৩৪ Swami Vijnananda, *op.cit,*p. 832.
৩৫ Ramaranjan Mukherji & Sachindra Kumar Maity,*op.cit*, pp. 231-232.
৩৬ J.W. Mccridle (ed.), *Ancient India as Described by Ptolemy* (London: Trubner & Co. 1885), pp.72-73
৩৭ টলেমির মতে গঙ্গার পশ্চিমমুখ ক্যাম্বেসিন ১৪৪° ১৩′, ১৮°১৫′ পূর্বমুখ এ্যান্টিবোল ১৪৮°৩০′, ১৮°১৫′ দূরত্বে অবস্থিত।
৩৮ ক্যাপ্টেন শেরিউইল ফরাসী পর্যটক ট্যাভেরনিয়ারের ১৬৬৬ সালে লিখিত একটি পত্র থেকে উল্লেখ করেছেন যে, এ সময়কালেই ভাগীরথী প্রবাহে পলি জমে প্রবাহ সংকুচিত হয়ে গিয়েছে। W.W Hunter, *A Statistical Account of Bengal,* Vol.IX,(Delhi: DK Publishing House, 1974), p. 26.
৩৯ Rennel, *Memoirs of a Map of Himdoostan*, London, 1783*,* p. 255.
৪০ কৃত্তিবাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩।
৪১ H. Beveridge, *The Akbar-nama of Abul-Fazl,* Vol.III (Calcutta: The Asiatic Society, 1939), p. 153
৪২ H. A. R. Gill, *Ibn Battuta Travels in Asia and Africa 1325-1354*, (London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1963), p. 267.
৪৩ R.G. Majumdar, R.G. Basak & N.G Banerji, *Ramacaritam of Sandhyakaranandin,* (Rajshahi: The Varendra Research Museum, 1939), pp. 84-85.
৪৪ *Ibid*, p. 47.
৪৫ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সম্পা.), *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা* (কলিকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০০০), পৃ. ১১৬।
৪৬ K. Bagchi, *op.cit,* pp. 52-54.
৪৭ *Epigraphia Indica,* Vol.XVII, 1923-24 (Delhi: The Director General Archaeological Survey of India, 1983), p. 190.
৪৮ R.C Majumdar (ed.), *History of Bengal*, Vol.1 (Dacca: University of Dacca, 1943), p. 196.
৪৯ J.W. Mccridle (ed.), *Ptolemy*, *op.cit*, p. 18.
৫০ R.C Majumdar (ed.), *History of Bengal,* Vol. I, *op.cit,*p. 11.
৫১ বিপ্রদাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২।
৫২ Amitabha Bhattacharyya, *op.cit,*p. 28.
৫৩ Bimala Churn Law (ed.), *op.cit*, p. 343.
৫৪ W.W. Hunter, *Statistical Account of Bengal,* Vol. VII (London: Trubner & Co. 1876), p. 165.
৫৫ *Ibid*, p. 167.
৫৬ V. Ball, *op.cit,* p.185.
৫৭ M.I. Borah, *Baharistan-i-Ghyabi,op.cit*, p. 53.
৫৮ R.C. Majumdar & others, *The Ramacaritam*, *op.cit,*p. 84.
৫৯ Thomas Watters, *On Yuan Chwang's Travels in India (A.D. 629-645),* Vol. II (Delhi: Low Price Publication), p. 185.
৬০ Amitabha Bhattacharyya, *op.cit,*p. 30.
৬১ F.E Pargiter (trans.), *Markandeya Purana* (Calcutta: Asiatic Society, 1904), pp. 7-8.

৬২ রাজশেখর বসু (অনূদিত), *মহাভারত* (কলিকাতা: এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লি:, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৮৭।

৬৩ C Sen (ed.), *Karatoya-Mahatmya,* Varendra Research Society, Monograph no. 2, Rajshahi.

৬৪ K.K. Gupta, *Copper-Plates of Sylhet,* Vol. I, (Sylhet: Lipika Enterprise,1967) pp. 87-91.

৬৫ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব,প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮।

৬৬ Amitabha Bhattacharyya, *op.cit,* pp. 34-35.

৬৭ আনিসুজ্জামান (সম্পা.) *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩।

৬৮ R.C Majumder (ed.), *History of Bengal,* Vol.I, *op.cit,* p. 6.

৬৯ আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

আহমদ বশীরের *তিনি* : এক মহানায়কের পরিভ্রমণ
(Ahmed Basheer's *Tini* : Journey of a Great Hero)

ড. মোসা. শামসুন নাহার*

Abstract: Ahmed Basheer is one of the stirring fiction writers of the 1980s. He is seen to return as a more productive writer from his self exiled life away from the world of literature long after twenty to twenty five years. In the golden jubilee of independence as a traveler of history he wrote *Tini*(2021). In the four stories of the volume*Tini*, different episodes of the political history of the Bangali from the years 1946 to 2015 have been presented. In the book, the dreamer of the independent Bangla, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rehman is delineated in a different light. In one sense, *Tini* is the journey of Bangabandhu from the period of his childhood "Khoka" to the leader of the nation "Bangabandhu". From the reading of these four stories, readers can get a picture of Sheikh Mujib's political philosophy, his struggle, rise and sacrifice. Also, it could be known from the stories as to what he did and what he could do for the country from which the Bangali have been deprived for good. Though history is the subject matter of these stories, the awareness regarding the writing style, the use of language, characterization and the context of the events have pleased the readers. Ahmed Basheer's *Tini* is indeed a great homage to the tremendous work of a great hero.

সারসংক্ষেপ
আশির দশকের আলোড়ন সৃষ্টিকারী কথাসাহিত্যিক আহমদ বশীর (জ. ১৯৫৫)। সাহিত্যজগৎ থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসনে গিয়ে দীর্ঘ ২০-২৫ বছর পর আবারও অধিক উৎপাদনশীল হয়ে তাঁকে প্রত্যাবর্তন করতে দেখা যায়। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে একজন ইতিহাসের যাত্রী হিসেবে রচনা করেন *তিনি* (২০২১)। *তিনি* গ্রন্থের চারটি গল্পে স্থান পেয়েছে ১৯৪৬ থেকে ২০১৬ কালপর্বে বাঙালির টালমাটাল রাজনৈতিক ইতিহাসের খণ্ড খণ্ড চিত্র। যেখানে স্বাধীন বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখা হয়েছে অন্য আলোয়। এক অর্থে *তিনি* বঙ্গবন্ধুর খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠার পরিভ্রমণ। গ্রন্থের চারটি গল্প পাঠ শেষে 'তিনি' অর্থাৎ শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনবীক্ষা, সংগ্রাম, উত্থান এবং জীবনদান বিষয়ক একটি চিত্র পাওয়া যায়। যা সামনে নিয়ে পাঠক উপলব্ধি করতে পারবেন 'তিনি' আমাদের জন্য কী কী করেছেন এবং আরও কী কী করতে পারতেন যার ফললাভ থেকে বাঙালিকে বঞ্চিত হতে হয়েছে চিরতরে। ইতিহাসের দলিল গল্পের বিষয় হলেও গল্পগুলোর নির্মাণশৈলী, ভাষার ব্যবহার, চরিত্রায়ন, প্রেক্ষিতের অবস্থান ইত্যাদির ক্ষেত্রে লেখকের সচেতনতা পাঠককে তৃপ্ত করেছে। আহমদ বশীরের *তিনি* যেন এক মহানায়কের অসামান্য কীর্তির প্রতি সামান্য শ্রদ্ধার্ঘ।

সত্তর দশকের বাংলাদেশের কথা সাহিত্যের বাঁক পরিবর্তনকে এবং আশি দশকের আলোড়ন সৃষ্টি করা সাহিত্য আন্দোলনকে তরান্বিত করতে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন কথা সাহিত্যিক আহমদ বশীর (জ. ১৯৫৫)। সাহিত্যিক খ্যাতিও তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যার এমন অন্তরঙ্গতা তিনি হঠাৎ-ই অন্তরালে চলে যান সাহিত্য-জগৎ থেকে। লেখকের কাছে এর কারণ জানতে চাইলে তিনি অকপটে নিজেই সব দায় নিয়ে বলেন, তখন তিনি উৎপাদনশীল ছিলেন না। 'এটা তাঁর ব্যক্তিগত অপূর্ণতা, অপারগতা বা ক্ষমতাহীনতা।'[১] এরপর দীর্ঘ প্রায় ২০-২৫ বছর পর আবার তাঁর লিখতে হচ্ছে হলো। তিনি ফিরলেন লেখায়। তাঁর এই ফেরা শুধু প্রত্যাবর্তন নয়, অধিক উৎপাদনশীল ও ক্ষমতাবান হয়ে প্রত্যাগমন। এ যেন উর্বরা শক্তি বাড়াতে তাঁর মস্তিষ্ক ভূমিকে কিছুদিন পতিত রাখা। ফলস্বরূপ বিরতির পর তাঁর উর্বর সৃষ্টিভূমি

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

(মস্তিষ্ক) থেকে বাংলা সাহিত্যে আবারও সংযোজিত হয়েছে *অবাস্তব-বাস্তব* (২০১৫), *তিথিডোর: মুক্তিযুদ্ধের একটা উপন্যাস হতে পারতো* (২০১৬), *মুদ্রা-রাক্ষস* (২০১৯), *স্বাধীনতার পরের এক পরাধীনতা* (২০১৭) এবং *তিনি* (২০২১) এর মতো অনন্য কিছু সৃষ্টি।

সাহিত্যজগৎ থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসনে থাকার দীর্ঘ সময়পরিসরে তিনি হয়তো লেখেননি কিন্তু অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ করেছেন তাঁর মস্তিষ্ক-ভূমিকে। চেতনায় ধারণ করেছেন অজস্র মানুষ, তাদের জীবনধারা ও ইতিহাস-ঐতিহ্যকে। এ সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব স্বীকারক্তি হলো, 'এই সময় পরিসরে হয়তো লিখিনি, কিন্তু দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অজস্র মানুষ মানুষীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, তাদের জীবনধারার বহতা স্রোতে নিজেকে সংযুক্ত করতে চেষ্টা করেছি। এদের জীবনের সুখদুঃখগুলো সারাক্ষণ আমাকে উত্যক্তকরত। মনে হতো ওদের জীবনের কাহিনীগুলো লেখার দায়িত্ব আমার। এগুলো না লিখলে আমার রেহাই নেই।'[২] সত্যি বলতে কি, রেহাই তিনি চাননি এবং একজন জাত সাহিত্যিক কখনোই এভাবে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন না। তাই তো তিনি ফিরতে বাধ্য হয়েছেন নতুন প্রেরণা নিয়ে। আবার মেতে উঠেছেন নতুন নতুন সৃষ্টিতে।

আহমদ বশীর তাঁর জীবদ্দশাতেই একটি জাতিকে প্রসবযন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে জন্মলাভ করতে দেখেছেন। আবার সেই সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া জাতি মাথা তুলে দাঁড়াতেই কিভাবে সামরিক শাসনের চোরাবালিতে নিমজ্জিত হয়েছে সেটাও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন খুব কাছ থেকে। কাজেই যে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় বাঙালি স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছিল সেই মহান নেতৃত্বের বলি হতে দেখেছেন আহমদ বশীর ইতিহাসের যাত্রী হিসেবে। এরপর দেশের চালচিত্র বদলেছে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জন্ম নিয়েছে নানা ঘটনার। এসব ঘটনা তাঁর অভিজ্ঞতাকে যেমন ঋদ্ধ করেছিল তেমন প্রভাব ফেলেছিল তাঁর ব্যক্তিজীবনেও। এ কারণে হয়তো তিনি নিজেকে দীর্ঘদিন সরিয়ে রেখেছিলেন লেখালেখি থেকে। তবে সময়ের চরিত্রগুলো ছিল তাঁর স্মৃতিতে জীবন্ত। স্মৃতিতে জীবন্ত থাকলেও সময়ের চরিত্র নিয়ে সাহিত্য করা এবং তাকে শিল্পমান দেওয়া দুরূহ কাজ। সুদূর অতীত অপেক্ষা অদূর অতীতের চরিত্র নিয়ে কাজ করতে গেলে লেখককে আরও বেশি সচেতন হতে হয়। কারণ অনতি অতীতের রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের কর্ম-চিন্তা ও ঘটনার স্বরূপ ইতিহাস সচেতন মানুষের কমবেশি জানা থাকে। আবার ইতিহাসের চরিত্রগুলো 'বাস্তবে চোখের সামনে হাঁটাচলা করলে তাঁদের নিয়ে লেখা বিব্রতকর কিংবা বিপদজনক হতে পারে। কেননা অতীতের কোনো সত্য প্রকাশ পেলে কারও কারও বর্তমান ঝুঁকিতে পড়তে পারে।'[৩] এতে লেখক ও পাঠকের মধ্যে একটা অসন্তোষের জায়গা তৈরি হয়। এসব কিছুকে বিবেচনা করেই হয়তো লেখক আহমদ বশীর তাঁর নিকট-অতীত ও সেই ইতিহাসের চরিত্র নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন স্বাধীনতার দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর। এ প্রেক্ষিতে ২০২১ সালে রচনা করলেন*তিনি*। এতে স্থান পেয়েছে ১৯৪৬ থেকে ২০১৬ কালপর্বে বাঙালির সমাজ-রাজনৈতিক ইতিহাসের খণ্ড খণ্ড চিত্র। যেখানে বাঙালির ইতিহাসের টালমাটাল সুদীর্ঘ সময় ক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলার স্বপ্নদ্রস্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখা হয়েছে অন্য আলোয়।

আহমদ বশীরের *তিনি*-তে চারটি গল্প রয়েছে। এই গল্পগুলোতে 'একজন শেখ মুজিব কখনো মানবিক, কখনো জীবনকে মৃত্যুর মুখে রেখে নিজ আদর্শে অবিচল থেকে রাজনৈতিক নেতা, কখনো ভবিষ্যতে একটি স্বাধীন ভূমির স্বপ্ন দেখা স্বাপ্নিক'।[৪] মধুমালা, গৌরাঙ্গ, সোহরাওয়ার্দী, খোকা; বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা; তিনি এবং প্রামাণিক উকিলের শত্রুমিত্র এই চারটি গল্পের মাধ্যমে লেখক একজন রাষ্ট্রনায়কের খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠার পরিভ্রমণ দেখিয়েছেন। এই পরিভ্রমণের সঙ্গে ধীরে ধীরে সমান্তরালে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একটি জাতি ও রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ।

ক.

তিনি গ্রন্থের প্রথম গল্প 'মধুমালা, গৌরাঙ্গ, সোহরাওয়ার্দী, খোকা'। এই গল্পে 'খোকা'-র রাজনৈতিক জীবনের নানা কর্ম-তৎপরতা, দেশত্ববোধ ও দেশের মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। গল্পের 'নামগুলির মধ্যে মাত্র একটি নাম সোহরাওয়ার্দী আমাদের পরিচিত। এবং যার নাম খোকা তাকে চিনতে, জানতে ও বুঝতে পরের তিনটি গল্প না অধ্যয়ন করলে কেউ জানতেই পারবে না, খোকা শেখ মুজিবুর রহমান।'[৫] এই খোকা তথা শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' স্লোগান দিয়ে কিন্তু তাঁর অন্তরে লালিত ছিল অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদ। তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে আন্দোলন করলেও বাংলা ও বাঙালির বিভক্তি তিনি মনে প্রাণে কখনো চাননি। গল্পে লেখক খোকার এই মনোভাবের দিকটি স্পষ্ট ভাবে দেখিয়েছেন:

১. 'ধ্যাৎ! রাখো তোমার প্যাঁচাল। বলতে চাচ্ছো হিন্দুরা আমাদের মিছিলে আক্রমণ করবে? ওদের কাছে অস্ত্র আছে? ...
... কিন্তু তোমার কী মনে আছে এবছরের ফেব্রুয়ারিতে নেতাজী সুভাষের আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার রশীদ আলীর ফাঁসি বন্ধ করার জন্য হিন্দুরা কেমন আন্দোলন করেছে।[৬]

২. শরৎ বসু একমত হয়েছে? স্যার, দারুণ খবর।
হ্যাঁ, আর বলছি কী! গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট। তাহলে হয়তো আজকের যুদ্ধটা এড়িয়ে যাওয়া যায়।[৭]

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'-র ১৯৪৬ সালের কয়েকটি ঘটনাসূত্র ধরে লেখক এ গল্পে খোকাকে এঁকেছেন। ছোটগল্পের স্বল্প পরিসর অবয়বে মাত্র তিনটি দিনের ঘটনার বর্ণনায় উঠে এসেছে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগষ্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-র ভয়াবহতা, পাকিস্তান আন্দোলন নিয়ে খোকা ও খোকার মতো লাখো বাঙালির (হিন্দু ও মুসলিম) স্বপ্নভঙ্গ, ক্ষোভ ও হতাশা এবং দেশ-জাতি ও রাজনীতি বিষয়ে সাধারণ মানুষের চিন্তা ও আবেগের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃবর্গের অসম্পৃক্ততা।

> খোকা বিস্ময়ের সঙ্গে বলে, আমাগো নেতা মুসলমান বইলা গৌরাঙ্গ তোরে বকা দেছে !
>
> পাগলি! গৌরাঙ্গ তোকে ঠিক কয় নাই। হিন্দু-মুসলমান আমরা সবাই ভাই।[৮]

হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই এই কনসেপ্ট নিয়ে সাধারণ বাঙালিরা মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দিলেও কেন্দ্রিয় নেতাদের দূরভিসন্ধি চক্রান্তে খোকা ও তার সঙ্গিরা সেদিন বাঙালি ও বাংলার বিভক্তি রোধ করতে পারেনি। ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-র দাঙ্গার ভয়াবহতায় সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা সম্পর্কে খোকা কামরুদ্দিনের কাছে জানতে পারে:

> কী বলছিস? পুলিশ যায়নি?
>
> পুলিশ? পুলিশকে তো সোহরাওয়ার্দী থামাইয়া রাখছে। আগো নাকি নিরপেক্ষ রাখতে হইবে। সোহরাওয়ার্দী যে বাংলা প্রভিন্সের প্রিমিয়ার।[৯]

ইতিহাসের অন্তর্নিহিত প্রকৃত সত্য শুধু গল্পেই উঠে আসেনি। এসম্পর্ক বিশিষ্ট সাংবাদিক আমানউল্লাহ এক সাক্ষাতকারে বলেছেন 'সোহরাওয়ার্দীর বিভিন্ন কাজ যদি আপনে দেখেন, বেঙ্গলি ইন্টারেস্টকে উনি কাট করেছেন ওনার পার্সোনাল কনসিডারেশনের জন্য। আর শেখ সাহেবের প্রয়োজন ছিল এই টাইমে ওনার মতো একটা নেতার সান্নিধ্য। আর শেখ সাহবকেও প্রয়োজন ছিল তাঁর।[১০]' 'মধুমালা, গৌরাঙ্গ, সোহরাওয়ার্দী, খোকা' গল্পটি পুরোপুরি রাজনৈতিক আবহে লিখিত। ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে ও তার পরবর্তী

সময়ের রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি গল্পে যে বিষয়টিতে বিশেষভাবে পাঠকের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে তা হলো খোকার অসাম্প্রদায়িক ও উদার মনোবৃত্তি। খোকার এই মানবিক বৈশিষ্ট্যকে রূপ দিতে লেখক ফ্ল্যাস ব্যকে সাত বছর পেছনে খোকার জন্মভূমি গোপালগঞ্জের একটি ঘটনাকে মূল ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। যেখানে খোকা ও তার বন্ধু গৌরাঙ্গ একসঙ্গে নেতা সোহরাওয়ার্দীকে গ্রামে স্বাগত জানিয়েছিল। সেদিন মুসলিম নেতা শেরে বাংলা ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দীর গলায় উঠেছিল হিন্দু মধুমালার হাতে তৈরি, মধুমালার হাতে পরিয়ে দেওয়া গাঁদা ফুলের মালা। সাত বছর পর ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-র দাঙ্গায় নির্যাতিত ও বন্দি হওয়া সেই গৌরাঙ্গ ও মধুমালাকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার করে খোকা এবং পরস্পরকে মিলিয়ে দেয়। খোকা এখানে যতটা দায়িত্ববোধসম্পন্ন রাজনৈতিক কর্মী তার চেয়ে অনেক বেশি একজন মানবিক মানুষ। মানবিক মানুষ বলেই খোকা বন্ধু ইয়াকুবের সহযোগিতায় ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-তে মুসলমানের ওপর হিন্দুদের নির্যাতনের ছবি তুলে গান্ধীকে উপহার দিয়ে আসে। সাম্প্রদায়িকতার বীজে যে বিষবৃক্ষের জন্ম নেবে এবং তার ফল যে সকলকেই ভোগ করতে হবে খোকা এটা সেদিনই উপলব্ধি করতে পেরেছিল। উদ্দেশমূলক রাজনীতির অন্তরালে খোকা দেখতে পায় আগামীদিনের ভারতবর্ষের রূপ।

> আমার মনে হয় এই পাকিস্তান হইলেও আমাগো আজাদী বুঝি সবটা পাওয়া যাইবে না।
>
> ...
>
> ভবিষ্যতে আমাগো যেমন ওই উর্দুওয়ালা জিন্না সাহেব, লিয়াকত আলী, খাজা নাজিমুদ্দিনগো লগে লড়াই করতে হইবে, তেমনি এই বাঙালি হিন্দু ভাইদের লড়তে হইবে দিল্লী গুজরাটওয়ালাদের লগে।[১১]

খ.

তিনি গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প 'বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা'। এ গল্পে লেখক ১৯৬২ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের উত্তাল রাজনৈতিক সময়াবর্তে ঘটে যাওয়া বেশ কিছু ঘটনার ডকুমেন্ট ব্যবহার করেছেন এবং ডকুমেন্টগুলোর পরস্পরের ভেতরগত সম্পর্ক তৈরি করে গল্প সাজিয়েছেন।

১. ডকুমেন্ট নং-৭০১২ ॥ তারিখ জুলাই ১৯৬৪: মোহাম্মদ বিন কাশিম থেকে দৈনিক ডন অফিস।
২. ডকুমেন্ট নং-৭০১২ ॥ তারিখ জুলাই ১৮-২৭, ১৯৬২, নোয়াখালি বর্ডার।
৩. ডকুমেন্ট নং-৮১৯ ॥ তারিখ ১১ জুন, ১৯৯৬, বিমান যোগাযোগ।
৪. ডকুমেন্ট নং-৮২৯ ॥ নভেম্বর ২৯, ১৯৬৩: করাচীর হোটেল মেট্রোপলিটন লবিতে সংলাপ।
৫. ডকুমেন্ট নং-৮০৯ ॥ টেলিফোন সংলাপ। ॥ তারিখ ৯ মার্চ, ১৯৬৭।
৬. ডকুমেন্ট নং-৮০১ ॥ একজন আসামি ডাইরির একটি অংশ ॥ মে, ১৯৬২।
৭. ডকুমেন্ট নং-৮০৭/১৭ জানুয়ারি ১৯৬৮/পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাড়াঁও ... ঢাকা সেন্ট্রাল জেল।
পরিশিষ্ট: রাওয়ালপিন্ডি, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর হেডকোয়ার্টার ডিসেম্বর ১৯৬৭।

'বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা' গল্পে ডকুমেন্টগুলো মিলিয়ে যে কাহিনীর অবয়ব গড়ে উঠেছে তা হলো পূর্ববঙ্গের মানুষদের ১৯৬২ থেকে ১৯৬৮ সময় পর্বের রাজনৈতিক আয়নারূপ। গল্পটি লিখতে গিয়ে আহমদ বশীর গোয়েন্দা আবহ সৃষ্টি করেছেন। কারণ 'গল্পটির বীক্ষণই দাবি করে এই আঙ্গিকে লিখতে। ... গল্পটি পড়বার সময় পাঠককে এক নাট্যিক ও গোয়েন্দা রহস্যের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। কেননা যে ঘটনা পরে ঘটছে তার ভেতরসূত্র আগের ডকুমেন্ট, সংলাপ ও পরিস্থিতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত।'[১২] বিশেষ করে গল্পটিতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার একটা প্রেক্ষাপট স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। গল্পে ব্যবহৃত ডকুমেন্টগুলোর ভেতরগত সম্পর্কের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, প্রথম ডকুমেন্ট 'মোহাম্মদ বিন কাশিম থেকে দৈনিক ডন অফিস'-এ একজন বাঙালি নৌসেনা মোয়াজ্জেম নিজের ও স্বজাতির বঞ্চনা এবং অপমান সহ্য করতে না পেরে সেখান

থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় এক নেতার সন্ধান করতে থাকেন গোপনে। যাঁর নেতৃত্বে জাতি পরিাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির সঠিক পথ খুঁজে পাবে।

১. 'বাপ-মা তুলে গালি দিলেও ভালো। যখন তুমি কোনো জাতি নিয়ে গালি দেবে তা কি সহ্য করা যায়। মোয়াজ্জেম আর্তকণ্ঠে বলে।'[১৩]
২. স্যার, সেইজন্যই তো আমি এতদূরে এগিয়ে এসেছি। আয়োজন তো প্রায় শুরু করলাম। ... এখন আমাদের দরকার একজন ... নেতা।
চুপ! বলেছি এসব কথা এখন নয়। চতুর্দিকে গোয়েন্দা ঘুরছে।[১৪]

৩. ... লোকটা তোমাদের খুব দরকার। তিনি যেমন 'না' করতে পারেন- তেমনি 'হ্যাঁ' করতেও পারেন। ... কোলকাতা থেকে আমি তাইনেরি দেহি ... তার সাহস, অর্গানাইজিং ক্যাপাসিটি সবচেয়ে বড় কথা হি ক্যান সাক্রিফাইস... অ্যান্ড অলসো হি ক্যান মোটিভেট পিপুল টু সাক্রিফাইস... যেটা কিনা একজন নেতার বড় গুণ।[১৫]

প্রথম ডকুমেন্টে বিভিন্ন সংলাপ ও ঘটনার মাধ্যমে যে নেতা-র ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় ডকুমেন্ট 'নোয়াখালী বর্ডার'-এ আমরা সে নেতাকেই দেখি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অদম্য সাহসিকতায় বর্ডার পার হয়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কুটনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে।

১. নেতা বললো, প্রিয়ব্রত, আইয়ুব খাঁ আর আমাদের রাজনীতি করতে দিবে না। সব নেতাগুলান বন্দি। আমাদের এই বোধহয় সময় হইছে– একটা কিছু করণ লাগবো, দ্যাশের মানুষ জাগাইলেই শুধু হইবো না। আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের একটা পলিটিক্যাল শেল্টার দরকার।[১৬]
২. নেতা একটা নিশ্বাস নিলেন। দ্যাখেন, আমরা কোনো মিলিটারি সাপোর্ট চাই না। আমাদের দেশের জনগণই তাদের ভাগ্য নিধারর্ণের জন্য লড়াই করতে পারে। সে বিশ্বাস আমার আছে।... আমরা শুধু চাই আপনাদের পলিটিক্যাল সাপোর্ট।[১৭]

নেতা এখানে গোপনে পাশ্ববর্তী রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক আলোচনা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বজাতিকে মুক্তির পথে এগিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর।

পরের ডকুমেন্ট 'বিমানে যোগাযোগ'-এর দেখা যায় বিমানে খুব গোপনে ও শুধুমাত্র ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে হ্যারোল্ড রবিন্সের দ্যা কার্পেটব্যাগার্স বইটি বিমান বালার সাহায্যে প্রতিবেশি দেশ ভারতের একদল কূটনীতিবিদের হস্তগত হওয়ার ঘটনার বর্ণনা আছে। এখানে সেই বই এর মধ্যে কি আছে সে রহস্য লেখক উন্মোচন করেননি।

এরপর চতুর্থ ডকুমেন্ট 'করাচীর হোটেল মেট্রোপলের লবিতে সংলাপ' অংশে সেই সংগ্রামী নেতা ও তার সহযোগী এক ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথন দেখানো হয়েছে। এই সংলাপ চলেছে কৌশলে ও গোপনে।

> করাচীর হোটেল মেট্রোপলের লবিতে দুজন ভদ্রলোক পাশাপাশি বসে ইংরেজি ডন পত্রিকা পড়ছিলো। দূর থেকে দেখলে মনে হবে দুজন দুটো পত্রিকা পড়ছে। আসলে দুজন পত্রিকার কাগজটা মুখের সামনে নিয়ে কেউ কারো দিকে না তাকিয়ে কথাবার্তা বলে যাচ্ছে।[১৮]

এ কথাবার্তায় দেশের তৎকালীন পরিস্থিতি, রাজনৈতিক অবস্থা, বিশ্ব রাজনীতি প্রভৃতি আলোচনার

পাশাপাশি নেতার দেশ ও জাতি নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পঞ্চম ডকুমেন্ট 'টেলিফোনে সংলাপ' অংশে দুজন ব্যক্তির মধ্যে রূপকের মাধ্যমে কিছু কথা হয়। রূপক হিসেবে এখানে শেক্সপিয়ার ও রর্বাট বার্নসের কবিতাকে ব্যবহার করা হয়। এর অর্থ লেখক এখানে স্পষ্ট করেননি তবে সেই নেতা ও তাঁর সহযোগিরা একটা কর্মপন্থা নিয়ে যে এগিয়ে যাচ্ছেন তার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ষষ্ঠ ডকুমেন্ট 'একজন আসামি ডাইরির একটি অংশ'-এ লেখক দ্বিতীয় ডকুমেন্টে নেতার পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনার যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তার একটা ফলাফল ও সিদ্ধান্তের বিষয় স্পষ্ট করেছেন।

> শচীন বললো, দাদা, পণ্ডিতজীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি আপনাদের জন্য দুটি বার্তা দিয়েছেন।
>
> ...
>
> আর দ্বিতীয় বার্তা? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।
>
> শচীন্দ্র বললো, দ্বিতীয়ত পৃথিবীর যে কোনো দেশের মুক্তিকামী মানুষের জন্য তার দেশের সমর্থন রয়েছে। সময় ও সুযোগ পেলে প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের সহযোগিতা করতে আমরা প্রস্তুত থাকবো...।[১৯]

এরপর সপ্তম ডকুমেন্ট 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও... ঢাকা সেন্ট্রাল জেল'-এ দেখা যায় সেই অবিসংবাদিত নেতা বন্দি অবস্থা থেকে রাত সাড়ে বারোটার সময় মুক্তি পেয়ে আবার জেলের গেট থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার হন।

> একজন সৈনিক পরোয়ানা পড়ে শোনায়। আপনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর আইনে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হলো।[২০]

অবশেষে 'পরশিষ্ট: রাওয়ালপিন্ডি, পাকিস্তান সাময়িক বাহিনীর হেডকোয়াটার'-এ গিয়ে লেখক পূর্বের সমস্ত ডকুমেন্টগুলোর গল্পের ভেতরের রহস্য জাল সরিয়ে পাঠককে সত্যের মুখোমুখি করেছেন। পাঠক এখানে জানতে পারে পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ দুটো ষড়যন্ত্রের তথ্য উদঘাটন করেছে।

> অবশ্যই যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের তথ্য দিয়েছে তাদেরকেও ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।
> দুটো গ্রুপ? ...
> হ্যাঁ, দুটো গ্রুপ। একটা গ্রুপ নৌবাহিনীর অফিসারগুলো, সরাসরি প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে সহায়তা নিয়ে বিপ্লব করতে চেয়েছে।
> অন্যটা?
> অন্যটা হলো ওই যে নেতা, যে চোঙ্গা ফুঁকাইয়া দেশ স্বাধীন করতে চায়। সে সরাসরি গণতন্ত্র দিয়ে বিপ্লব করতে চায়।[২১]

পাঠক বুঝতে পারে এ কারণেই নেতাকে রাত বারোটায় জেল থেকে মুক্তি দিয়ে আবার জেলের গেট থেকে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলায় গ্রেফতার করা হয়। আবার নৌসেনা বাঙালি মোয়াজ্জেমের সঙ্গে আইয়ুব খানের শিল্পমন্ত্রী আলতাফ হোসেনের গোপন যোগাযোগের তথ্য ফাঁস করে মোয়াজ্জেমেরই বন্ধু, নেভাল অফিসার গুজরাটি পাঠান আজমল খাঁ। এজন্য আলতাফের মন্ত্রীত্ব কেড়ে নিয়ে সাত দিনের মাথায় তাকে কৌশলে হত্যা করা হয়। অন্যদিকে হ্যারোল্ড রবিন্সের লেখা কার্পেটব্যাগার্স বইয়ের কভারের ভেতর আসলে অন্য একটা ফাইল ছিল। যেখানে ছিলো সামরিক অভ্যুত্থানের জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাপত্র। ফাইলটা এয়ার হোস্টেসের মাধ্যমে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কূটনীতিবিদদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু বেলুচিস্তানের মেয়ে এয়ার হোস্টেস সুরাইয়া বিশ্বাসঘাতকতা করলে তা গোয়েন্দাদের হাতে পড়ে। এছাড়া টেলিফোনে বলা শেক্সপীয়র ও রবার্ট বার্নসের কবিতার অর্থও আমরা এখানে অবগত হতে পারি।

> ওগুলো শেক্সপীয়র, তারপর রবার্ট বার্নসের কবিতা। "Compare thee to a summar's Day শেক্সপীয়র সনেট ১৮, আর রবার্ট বার্নসের newly sprung in june?" মানে ওরা গ্রীষ্মকাল বা বর্ষাকালে, মে-জুন মাসে অভ্যুত্থানের চেষ্টা করতে চেয়েছিলো। ওই সময় পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত জেনারেলরা ছুটিতে পশ্চিম পাকিস্তানে যায়। ওরা ওই কবিতা দিয়ে সংলাপগুলো বলে যাতে কেউ কিছু না বোঝে।[২২]

অবশেষে সরকারি সিদ্ধান্ত হয় এরূপ:

> প্রেসিডেন্টকে বলো সবাইকে কোর্ট মার্শাল করে ফিনিশ করে দিতে হবে।... পাগল নাকি চুঙ্গ ফুকাইয়া দেশ স্বাধীন করবে! ওটা একটা পাগল।[২৩]

'বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা' গল্পটিতে লেখক খুব কৌশলে সাতটি ডকুমেন্টকে বিনুনীর মতো গেঁথে অনেকগুলো বিষয়কে পাঠকের সামনে নিয়ে এসেছেন। ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে পূর্ববাংলার মানুষের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও হেয় আচরণ; পূর্ববঙ্গের মানুষের বঞ্চনা, অপমান ও শোষণ থেকে জন্ম নেয়া ক্ষোভ; ক্ষোভ থেকে বাঙালির অধিকার সচেতন হয়ে ওঠা; অধিকার আদায়ে সংগঠিত হওয়া ও এক বলিষ্ঠ নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা; ক্রমে এক অদম্য সাহসী আপোসহীন নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় বাঙালিদের বিপ্লব সংঘটনের জন্য প্রস্তুত হতে থাকা প্রভৃতি ঘটনার আবর্তে পাঠক নিজেকে খনন করতে পারে এই ভেবে যে, আমার এই দেশ পেতে একজন শেখ মুজিবুর গোয়েন্দাদের কত প্রকার দুরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনার মধ্যে রাজনীতি করেছেন। মুক্তিকামী বাঙালির কাঙ্ক্ষিত নেতৃত্বের জায়গায় শেখ মুজিব যে আস্থা অর্জন করে দাঁড়াতে পেরেছিলেন তার জন্য তাঁকে কত ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি হতে হয়েছে, কত কৌশল করতে হয়েছে, পরিবারকে বঞ্চিত করে কতবার জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়েছে। একটি জাতীয় বিপ্লব সংঘটনের জন্য একজন নেতা শেখ মুজিব ও অসংখ্য বাঙালি দেশপ্রেমিককে কত ত্যাগ স্বীকার করে, কত সময় অপেক্ষার প্রহর গুনে, কত সতকর্তার সঙ্গে পরিকল্পনা মাফিক সামনে এগোতে হয়েছে তার রূপরেখা এ গল্পে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রপক্ষের গোয়েন্দা তৎপরতা ও বন্ধুরুপী শত্রুর বিশ্বাসঘাতকতার মাঝেও বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা শেখ মুজিব সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সমস্ত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে এগিয়ে গেছেন বলিষ্ঠচিত্তে।

গ.

তিনি গ্রন্থের তৃতীয় গল্প 'তিনি'। প্রথম এবং দ্বিতীয় গল্পে আমরা যে নেতাকে মানুষের হয়ে কাজ করতে দেখেছি, বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়ে যে নেতাকে স্বদেশ ও স্বজাতির মুক্তির জন্য সংগ্রামে বদ্ধপরিকর হতে দেখেছি এ গল্পে সে নেতা পুরোপুরি দৃশ্যমান। তিনি আর কেউ নন মুক্তিকামী বাঙালির মানসপুত্র, অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

'তিনি' গল্পের সময়কাল ১৯৭১-এর প্রথম অংশ। মাত্র ৩/৪ দিন অর্থাৎ ৪ মার্চ থেকে ৭ মার্চ রাত্রি সাড়ে আটটা পর্যন্ত ঘটনার বর্ণনা থাকলেও লেখক কাহিনির প্রযোজনে ৭০ এর নির্বাচন, বিশ্ব রাজনীতি, ৬৬-এর ছয় দফা ৪৭-এর দেশ ভাগ প্রভৃতি প্রসঙ্গ সংযোজন করেছেন। এতে গল্পের রাজনৈতিক মেজাজটি সমুন্নত থেকেছে। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণকে কেন্দ্র করে গল্পের কাহিনী এগিয়ে গেলেও এখানে সেই ঐতিহাসিক ভাষণের কোনো আড়ম্বরতা নাই। বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে লেখক বইয়ে পড়া ইতিহাস ও রাজনীতির অন্দরে নিয়ে গেছেন পাঠককে। এখানে দুটি ঘটনা সমান্তরালে এগিয়ে গিয়ে এক বিন্দুতে মিলেছে। এক: ৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়লাভের পরও ক্ষমতা হস্তান্তর ও বাঙালির অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলা পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের এক কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রস্তুতি ও তাঁর মানসিক অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গ। দুই: ৭ মার্চ ভাষণ চলা অবস্থায় নেতাকে হত্যা করার জন্য নেতা তথা বাঙালির বিরুদ্ধপক্ষের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার বর্ণনা প্রসঙ্গ। গল্পে শেষ পর্যন্ত বিরুদ্ধপক্ষের এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবতা পায়না। বিষয়টি ঐতিহাসিক সত্য না হলেও লেখকের এ কল্পিত সত্যের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গল্পে বর্ণিত বিহারী আবদুল হকের (হাক্কা) বদরুলকে দিয়ে সভা মধ্যে নেতাকে হত্যার চেষ্টা এবং ৬ মার্চ রাতে টেলিফোনে নেতাকে হুমকি দিয়ে তাঁকে হত্যার জন্য তাঁর বাড়িতে লুকায়িত বোমাসহ ফুলের মালা প্রেরণ প্রভৃতি ঘটনা প্রমাণ করে যে, কতটা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, কী কঠিন বাস্তবতায় মুক্তিকামী বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি জানেন তাঁর প্রতিপক্ষ আছে এবং 'পাকিস্তানীদের বন্ধুক ও কামানের সামনে তাঁকে এক সত্য স্বপ্নের উচ্চারণ করতে হবে। সে কারণে তাঁর মৃত্যু হতে পারে।'[২৪] কিন্তু স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি ভালোবাসা এতই গভীর ছিল যে কখনও তাঁর হৃদয় কাঁপেনি। তাই বিবিসি'র মার্ক টালির মোক্ষম প্রশ্নের উত্তরে তিনি নির্ভীকচিত্তে বলেছেন বাংলার মানুষের মুক্তির কথা।

> বিবিসি'র মার্ক টালি যেন ঠিক সেই সময় মোক্ষম প্রশ্নটি করলেন। আগামীকাল ৭ তারিখে আপনি রমনা রেসকোর্স ময়দানে সভা ডেকেছেন। দেশের জনগণই শুধু নয়, সমগ্র বিশ্ব অপেক্ষা করছে আপনি কী বলবেন– তা শোনার জন্য। অনুগ্রহ করে ওই সম্ভাব্য বক্তব্য বলবেন কি?
> নেতার মুখটি আনন্দে উদ্ভাসিত হলো; কিন্তু পরক্ষণেই আবার গভীর দুশ্চিন্তায় মগ্ন হলেন তিনি। ওই ভাষণটি সম্পর্কে কী আর বলবো। ওই ভাষণটি হয়তো আমার জীবনের শেষ বক্তৃতা হতে পারে। আপনারা জানেন দেশের মানুষকে এখন মুক্তি পেতে হবে। এই নির্যাতন থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচতে হবে, এটাই তো এখনকার বাস্তবতা। আমাকে এই বাস্তবতার কথাই বলতে হবে।[২৫]

এ গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র বদরুল। ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুকে খুন করার জন্য দায়িত্ব পাওয়া বদরুল প্রস্তুতি নিয়েও শেষ পর্যন্ত গুলি করতে পারে না। ভাষণরত বঙ্গবন্ধুকে দেখে চকিতে তার মধ্যে এক উপলব্ধি তৈরি হয়। তার বাবা নাকি ঠিক এরকম নেতার কথাই তাকে বলেছিল।

> বাবা ঠিক এরকম নেতার কথাই বলতো। তিনি নাকি বাবাকে বলেছিলেন, পাকিস্তানের কাছ থেকে একদিন পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হবে। এই দেশের মানুষকে আর না খেয়ে থাকতে হবে না। এই নেতার জন্যই নাকি বাবা সবকিছু ভুলে... তিনি... তিনি... তিনি... কাবা এই নেতার কথা বলতো... তিনি...।
>
> বদরুল বাক্যটা সম্পূর্ণ কতে পারে না। শীতল একটা বিভলবারের নল ওর মাথা স্পর্শ করে।[২৬]

নেতাকে গুলি করতে না পারার কারণে বদরুলকেই খুন হতে হয়। এই নেতার সাথে সংশ্রব থাকার কারণে বদরুলের বাবাকেও খুন হতে হয়েছিল। এরপরই বালক বদরুলের পরিবার পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ৪৭ পরবর্তী সময়ে পশ্চিম বাংলায় চলে যায়। বদরুলের স্মৃতিচারণায় এসব ঘটনা আমরা জানতে পারি। বদরুল চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন স্বদেশ থেকে উন্মুলিত হয়ে অন্য দেশে প্রথিত হলেও মানুষ মনের গভীরে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি গভীর মমতা সন্তর্পণে লালন করতে থাকে। বদরুল চরিত্রের বাল্যকালের স্মৃতিচারণা, কথা ও কাজের মাধ্যমে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১. আপনে ইন্ডিয়া থেইক্যা আমাদের পূর্ব পাকিস্তানরে বেশি বালোবাসেন। না?[২৭]

২. কী সুবাস! মহেশপুরের কুসুমীর কথা মনে হয়েছিল তখন? কুসুমীর সেই স্মৃতিময় শরীর, পানের বরজের ভিতর সাপ! আমার বাবাকে যখন ওরা খুন করে, বাবা ওইরকম একটা পানের বরজের ভিতর শুয়ে ছিলো। তারপর বাবাকে যারা খুন করেছিলো তাদেরকে সে আবার ওইরকম পানের বরজের ভিতর ঘুমাতে বলবে– ঘুমাও, ঘুমাও, তোমরা... মহেশপুরের পানের বরজে।[২৮]

বাবা খুন হবার ঘটনা বাল্যকালে বদরুলের অবচেতনে যে প্রতিশোধ স্পৃহার জন্ম দেয় তা-ই তাকে একজন পেশাদার খুনিতে পরিণত করে। সে কখনও অকৃতকার্য হয়নি। কিন্তু শৈশবে বাবার সংস্পর্শে তার অন্তরে বাঙালির মুক্তিদূত হিসেবে যে মহানায়কের চিত্র মুদ্রিত হয়েছিল ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর মুখোমুখি দাঁড়ালে তা যেন মূর্ত হয়ে ওঠে। নেতার সেদিনের সেই মহান বাণী 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম' বদরুলের অন্তরে লুক্কায়িত বাঙালিত্বকে জাগিয়ে তোলে। নেতা শেখ মুজিব ও লক্ষ লক্ষ বাঙালির অনুভূতির সঙ্গে বদরুলের অনুভূতি মিলে মিশে এক হয়ে যায়। *তিনি* গ্রন্থের প্রথম দুটি গল্প যে ফর্মে লেখা 'তিনি' গল্পটি লেখক সেই ফর্মে লেখেননি। প্রথম গল্প দুটিতে পাঠককে সর্বদা এক তাড়নার মধ্যে থাকতে হয়েছে এই ভেবে যে কী হচ্ছে বা কী হতে যাচ্ছে। সেই বিচারে 'তিনি' গল্পের নির্মাণ-কৌশল বেশ সহজ। গল্পটি রাজনৈতিক ঘটনানির্ভর হলেও একেবারেই স্লোগান-সর্বস্ব গল্প হয়ে ওঠেনি।

ঘ.

‘প্রামাণিক উকিলের শত্রুমিত্র’ *তিনি* গ্রন্থের চতুর্থ গল্প। আহমদ বশীরের গল্প বলার বৈশিষ্ট্য হলো ফ্ল্যাসব্যাকে বা স্মৃতিচারণার মাধ্যমে পেছনের ঘটনাকে গল্পের চলমান ঘটনার সঙ্গে গেঁথে গেঁথে এগিয়ে যাওয়া। ‘প্রমাণিক উকিলের শত্রুমিত্র’ গল্পটি পড়বার সময়ও পাঠককে গল্পের পূর্বাপর ঘটনা সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকতে হয়। কেননা ঘটনা ও সময়কে আগে ও পেছনে এনে এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা যেমন- ভাষা আন্দোলন, শেখ মুজিবের ছয় দফা, সামরিক শাসন, একাত্তরের যুদ্ধ, বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধাদের অপমান ও পরাজয়, বঙ্গবন্ধুর হত্যা- এইসব ‘অতি জরুরী বিষয়গুলোর মিথষ্ক্রিয়া-প্রভাব সম্পর্কে আহমদ বশীর পাঠককে সবসময় সচেতন রাখেন। এই রাখবার ব্যাপারটা আরোপিত নয়। যারা বাংলাদেশের উত্থান ও স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনীতির ইতিহাস পৃষ্ঠা সম্পর্কে সচেতন তারা এই গল্পটির পাঠ শেষে একটা আর্তনাদপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলতে বাধ্য হবেন।[২৯] গল্পের শেষে প্রামাণিক উকিলের উচ্চারিত দুটি প্রশ্ন, ‘মুজিব তোমার শত্রু কে? কোন শত্রু তোমাক মারলু?[৩০] এই প্রশ্ন দুটি বাঙালি জাতিকে আজন্ম তাড়া করছে। প্রামাণিকের বড় ছেলে শাহাবুদিন মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয় এবং ছোট ছেলে জয় বাংলা স্লোগান দেওয়ার কারণে গুলিবিদ্ধ হয়। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর প্রামাণিক উকিলকেও আর এলাকায় দেখা যায় না। অর্থাৎ পিতা ও দুই পুত্র বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শের কর্মী ও বিশ্বাসী বলে বাঁচতে পারে না। এমনকি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কর্মী ও বিশ্বাসী যারা বেঁচে আছে তাদের জীবনও যে নিরাপদ নয় সে আশঙ্কাও গল্পে প্রকাশ পেয়েছে।

> কিন্তু আপনারা জানেন লক্ষীমন্ত ফুল্লী আর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিনের ছেলেটা এখনও বেঁচে আছে? শেখ মুজিবের শত্রুরা তারও শত্রু।[৩১]

১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এ যে অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে তা সমগ্র দেশকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। সেদিনের সেই বাস্তবতা ও সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়ার বিবরণ সামন্য হলেও লেখক গল্পে তুলে ধরেছেন।

> কী বলছেন? মিলিটারি মানে? বাংলাদেশের মিলিটারি? আমাদের সৈনিক? হঁ স্যার, আমাদের সোলজার। কী যা-তা বকছেন? জাতির পিতাকে মারবে? পাগল? এরা কি ইন্ডিয়ান? পাকিস্তানি? আমেরিকান? বহিঃশত্রু? না স্যার ওরা আমাদের দেশেরই। হঁ-স্যার। বঙ্গবন্ধু আর নাই।[৩২]

বঙ্গবন্ধু না থাকার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাও প্রামাণিক উকিলের মতো চিরতরে হারিয়ে যায়। ধূলিসাৎ হয়ে যায় সাঁওতাল মেয়ে ফুল্লীর মতো মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অনেক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা-ভবিষ্যৎ। একটি জতির স্বপ্নপূরণে অসংখ্য প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করতে এক মহানায়কের অবির্ভাব হয়েছিল। যিনি তাঁর অসীম সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা, ত্যাগ ও মমত্ববোধ দিয়ে জাতিকে মুক্তির স্বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজনীতির হিংস্র রুপ আর ক্ষমতার লোভ যখন বড় হয়ে ওঠে তখন মনুষ্যত্ব পরাজিত হতে বাধ্য। সেই বাস্তবতায় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে এক মহানায়কের।

তিনি গ্রন্থে (১৯৪৬ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত সময় পরিধির মধ্যে) একটি বড় সময়ের মধ্যে গল্পের ভেতর-বুনন করা হয়েছে। কাজেই গল্পগুলোতে ঘুরে ফিরে এসেছে উপমহাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা, সামরিক শাসন, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ, ক্ষমতার জন্য হত্যা, ঔপনিবেশিক শাসনের ক্ষত ইত্যাদি। এসব ঘটনা গল্পগুলোতে এসেছে প্রসঙ্গের দাবী নিয়েই। এবং ঐ ‘অবস্থাগুলির মধ্যে সক্রিয় অস্তিত্বে সর্বদা জয়মান আছেন শেখ মুজিবুর রহমান, আমাদের বঙ্গবন্ধু। *তিনি* গ্রন্থের চারটি গল্পের পাঠ শেষে, এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস সচেতন একজন পাঠক “তিনি” অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনবীক্ষা, সংগ্রাম, উত্থান ও জীবনদান বিষয়ক একটি চিত্র পাবেন। যা সামনে নিয়ে পাঠক উপলব্ধি করবেন, “তিনি” আমাদের জন্য কী কী করেছেন’[৩৩]এবং আরও কী কী করতে পারতেন যার ফল লাভ থেকে বাঙালিকে চিরতরে বঞ্চিত হতে হয়েছে। *তিনি* গ্রন্থের গল্পগুলোর নির্মাণশৈলী, ভাষার ব্যবহার, চরিত্রায়ন, প্রেক্ষিতের অবস্থান ইত্যাদির ক্ষেত্রে আহমদ বশীর খুব সচেতন ছিলেন। ইতিহাস থেকে দলিল নিয়ে গল্প চারটি লিখিত হলেও কাহিনী কোথাও শিথিল হয়নি। বরং চারটি গল্পে লেখক যে বিশেষ দিকে আলো ফেলতে চেয়েছেন সেই আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছেন ‘তিনি’ (আমাদের বঙ্গবন্ধু)।

তথ্যনির্দেশ

১ ফয়সাল আহমেদ (সম্পা.), ‘এবং বই’(ত্রৈমাসিক) চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ২০২২, পৃ. ৫৯
২ তদেব, পৃ. ৫৯-৬০
৩ মহিউদ্দিন আহমেদ ‘বেলা অবেলা: বাংলাদেশ ১৯৭২-১৯৭৫’ ৩য় সং., বাতিঘর, বিশ্বসাহিত্যকেন্দ্র ভবন, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ১০
৪ জাহিদ হায়দার ‘আহমদ বশীরের “তিনি”: অন্য আলোয় বঙ্গবন্ধু’ bdnews24.com, Published: 20 October 2021, 10:10 pm, Update: 20 October 2021, 10:10 pm, Visited: 10 January 2022, 9:00 pm
৫ তদেব
৬ আহমদ বশীর ‘তিনি’ উত্তরণ, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০২১, পৃ. ১৬
৭ তদেব, পৃ.১৭
৮ তদেব
৯ তদেব, পৃ. ২১
১০ মহিউদ্দিন আহমদ ‘ইতিহাসের যাত্রী’, ৩য় মুদ্রণ, বাতিঘর, বিশ্বসাহিত্যকেন্দ্র ভবন, ঢাকা, ২০২১, পৃ. ১০
১১ আহমদ বশীর ‘তিনি’ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০
১২ জাহিদ হায়দার ‘আহমদ বশীরের “তিনি”: অন্য আলোয় বসঙ্গবন্ধু’ পূর্বোক্ত।
১৩ আহমদ বশীর ‘তিনি’ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২
১৪ তদেব, পৃ. ৩৫
১৫ তদেব, পৃ. ৩৬
১৬ তদেব, পৃ. ৩৯
১৭ তদেব, পৃ. ৪৪
১৮ তদেব, পৃ. ৪৮
১৯ তদেব, পৃ. ৫২-৫৩
২০ তদেব, পৃ. ৫৫
২১ তদেব, পৃ. ৬৮
২২ তদেব, পৃ. ৫৯
২৩ তদেব
২৪ জাহিদ হায়দার ‘আহমদ বশীরের “তিনি”: অন্য আলোয় বঙ্গবন্ধু, পূর্বোক্ত।
২৫ আহমদ বশীর ‘তিনি’ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭
২৬ তদেব, পৃ. ৮০
২৭ তদেব, পৃ. ৭৪
২৮ তদেব, পৃ. ৭৩
২৯ জাহিদ হায়দার ‘আহমদ বশীরের “তিনি”: অন্য আলোয় বঙ্গবন্ধু, পূর্বোক্ত।
৩০ তদেব, পৃ. ১১২
৩১ তদেব
৩২ তদেব, পৃ. ১০৫
৩৩ জাহিদ হায়দার ‘আহমদ বশীরের “তিনি”: অন্য আলোয় বঙ্গবন্ধু’ পূর্বোক্ত।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

চণ্ডিপুর গণহত্যা ও নির্যাতন
(Chandipur Massacre and Torture)

ড. মো. আরিফুর রহমান*

Abstract: The genocide of Bangladesh also known as the Gonohotta, which was occurred during the liberation war of Bangladesh. It began on 25 March 1971 with the name of operation Searchlight. Chandipur is a village of Bheramara upazila of Kushtia district. People of chandipur village played an important role in other previous democratic movement. That period is very important stage in the history of Bengalees liberation struggle from 1947 to 1971.The movement resulted from long 21 years of torture and extortion by Pakistan Army .Chandipur village was a torture and extortion center of Pakistani army in liberation period. People of Chandipur village played a vital role in the liberation war of Bangladesh.

ভূমিকা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ‘অপারেশন সার্স লাইট’[১] এর অংশ হিসেবে সারাদেশে নির্যাতন ও গণহত্যা শুরু করে। অপারেশন সার্স লাইটের মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালি জাতিকে নির্মূল করার জন্য যে পরিকল্পনা করেছিল তা গণহত্যা নামে পরিচিত।[২] মূলত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকার বাহিনী বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করতে যে গণহত্যা ও নির্যাতন চালিয়েছে তা তাদের বিকৃত মানসিকতারই পরিচায়ক। তাদের নিষ্ঠুরতা শুধু গণহত্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ ছিল তাদের নিষ্ঠুরতার অন্যতম দিক। ১৬ ডিসেম্বর (১৯৭১) বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তারা এ হত্যাকাণ্ড চালায়। এ সময় তারা বাংলাদেশের প্রায় ৩০ লক্ষ নারী,পুরুষ ও শিশু হত্যা করে। দুই লক্ষের অধিক নারী পাকিস্তানি ও তাদের এদেশীয় দোসরদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হন। এছাড়া বাংলাদেশেকে মেধাশূন্য করার লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে দেশের বরেণ্য শিক্ষক, ছাত্র, চিকিৎসক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, কবি ও বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।[৩] পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এই নৃশংস হত্যাযজ্ঞে এদেশীয় শান্তিকমিটি, রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনী মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় ২৫ মার্চ রাতেই যশোর সেনানিবাস থেকে এসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কুষ্টিয়া জেলাতে নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড শুরু করে। এ সময় তারা এই জেলার নিরীহ ও নিরপরাধ মানুষের উপর নির্মম অত্যাচার চালায়। যদিও মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে কুষ্টিয়া জেলার সামরিক, বেসামরিক সব শ্রেণি-পেশার মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে কুষ্টিয়াকে মুক্ত (৩১ মার্চ) করা সম্ভব হয়। কিন্তু এপ্রিল মাসে পুনরায় এই জেলা পাকিস্তানি বাহিনীর দখলে চলে যায়। পরবর্তীতে জেলার বিভিন্ন মহকুমা, থানা ও গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা গণহত্যা, নির্যাতন, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর, ধর্মান্তকরণ ও নারী নির্যাতন চালায়। দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে হত্যা, গণহত্যা বা সম্মুখ যুদ্ধে জেলার প্রায় ৪০/৪২ হাজার মানুষ নিহত হয়।[৪] লক্ষ লক্ষ মানুষ বাড়িঘর ছাড়া হয়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে পাকিস্তানি বাহিনী যে বর্বরতা ও নৃশংসতা চালিয়েছে তা হিটলারের নাৎসী বাহিনীর বর্বরতাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ১৯৭১ সালে মার্চের শুরু থেকেই কুষ্টিয়ার জনগণ মিছিল, প্রতিবাদ, হরতালসহ বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনমুখী কর্মসূচি পালন করে।[৫]

* প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যশোর সেনানিবাস থেকে এসে কুষ্টিয়া শহর দখল করে নেয়। একই সময়ে তারা পরবর্তী ৩০ ঘণ্টার জন্য কারফিউ জারি করে।[৬] কিন্তু মুক্তিকামী সাধারণ জনতা সেই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ২৬ মার্চ থেকে কুষ্টিয়াকে শত্রুমুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। সেদিন আবু ওসমান চৌধুরীর নেতৃত্বে কুষ্টিয়ার স্থানীয় রাজনীতিবিদ, পুলিশ কর্মকর্তা ও সিভিল প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি বৈঠক হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে কুষ্টিয়া মুক্ত করতে হবে। ২৮ মার্চ চুয়াডাঙ্গাতে কুষ্টিয়া জেলার কোম্পানি কমান্ডাররা উপস্থিত হন। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় ২৯ মার্চ কুষ্টিয়া শহর আক্রমণ করার। কিন্তু প্রস্তুতি সম্পন্ন না হওয়ায় ৩০ মার্চ কুষ্টিয়া জিলা হাইস্কুলে আক্রমণ চালানো হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যরা এখানকার যুগপৎ আন্দোলনে শরিক হন। এছাড়া কুষ্টিয়ার মুক্তিযুদ্ধে কিছু সংখ্যক পাকিস্তানপন্থী দালাল ব্যতীত সব শ্রেণি-পেশার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার ১ নং চাঁদপুর ইউনিয়ন পরিষদের একটি গ্রাম চণ্ডিপুর। ভেড়ামারা পৌরসভার পাশে গ্রামটির অবস্থান। গ্রামটি মুক্তিযুদ্ধের সময় ৮ নং সেক্টরের অধীনে ছিল। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী যুদ্ধের সময় গ্রামের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিকামী জনতার বাড়িঘর লুটপাট করে এবং ব্যাপকভাবে নির্যাতন ও গণহত্যা চালায়। যুদ্ধের সময় পাকিস্তানিদের চেয়ে স্থানীয় রাজাকার ও শান্তিকমিটির লোকজন এখানে বেশি অত্যাচার চালায়। হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নিকটবর্তী হওয়ায় গ্রামটিতে পাকিস্তানি হানাদারদের আনাগোনাও বেশি ছিল। তবু এই গ্রামের সাধারণ মানুষ দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে নিজেরা হাজারো ত্যাগ স্বীকার করেছে।

উদ্দেশ্য

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক লেখনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধে তৃণমূল বা প্রান্তিক মানুষের ভূমিকা সেভাবে স্থান পায়নি। একইসঙ্গে তৃণমূল মানুষের নির্যাতন ও গণহত্যার প্রকৃত চিত্রও ফুটে উঠেনি। তাই তৃণমূল মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার, বধ্যভূমি, গণকবর, স্মৃতিসৌধ ও মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে অনুসন্ধান চালালে মানবিক বিপর্যয়ের অনেক নতুন সত্য বেরিয়ে আসবে। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গবেষণা প্রবন্ধটি হাতে নেয়া হয়েছে। যথা:

ক) চণ্ডিপুরের মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতন ও গণহত্যার পটভূমি পর্যালোচনা করা;

খ) লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর, নির্যাতন, ধর্মান্তকরণ ও শরণার্থী জীবনসহ মানবিক বিপর্যয়ের অন্য অনুষঙ্গগুলো পর্যালোচনা করা;

গ) পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের হাতে চণ্ডিপুরে হত্যা ও গণহত্যা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য উন্মোচিত করা।

যৌক্তিকতা

মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি ব্যাপক ও বহুমুখী ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্যমণ্ডিত চিত্র স্থানীয় ইতিহাসচর্চা ছাড়া সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ইতিহাসচর্চার ফলে জাতীয় ইতিহাস আরো সমৃদ্ধ হবে। **চণ্ডিপুর গণহত্যা ও নির্যাতন** শিরোনামে সম্পন্ন গবেষণা প্রবন্ধটি বেছে নেয়ার কতিপয় যুক্তি রয়েছে।

ক. ভৌগোলিক দিক দিয়ে ভেড়ামারা উপজেলা ও হার্ডিঞ্জ ব্রিজের পার্শ্ববর্তী হওয়ায় স্থানটি কৌশলগত কারণে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান করছিলো;

খ. মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় পর্যায়ের প্রাথমিক তথ্য ও উৎসসমূহ দ্রুত বিলীয়মান। তাই যত দ্রুত সম্ভব এগুলি সংগ্রহ করে ইতিহাস নির্মাণ না করলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অনেকটা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে;

গ. মুক্তিযুদ্ধকালে নির্যাতন ও মানবিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া ব্যক্তিদের বড় একটা অংশ এখনও জীবিত। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ এখনও শোনা সম্ভব। কিন্তু এসব ব্যক্তিরা গত হলে তা আর সম্ভব হবে না। তখন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নানাবিধ বিকৃতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে। তাই গবেষণা প্রবন্ধটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিচারে অতীব যৌক্তিক বলে মনে হবে।

প্রত্যাশিত ফলাফল

উপর্যুক্ত শিরোনামে গবেষণা প্রবন্ধটি সম্পাদিত হলে প্রত্যাশিত কয়েকটি ফলাফল পাওয়া যাবে। যথা:

ক. চণ্ডিপুর তথা ভেড়ামারা উপজেলার প্রান্তিক মানুষের দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে;

খ. গবেষণাকর্মটি সাক্ষাৎকারভিত্তিক হওয়ার মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক উৎস ও বাচনিক ইতিহাস আরো সমৃদ্ধ হবে;

গ. চণ্ডিপুর তথা কুষ্টিয়া জেলার মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতন ও গণহত্যার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

বাচনিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রাপত তথ্যের সত্যতা যাচাই খুবই দুরুহ কাজ। তাই একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে নির্যাতন ও গণহত্যার মতো বিশাল তথ্যারাজি অনুসন্ধান, অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর নয়।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা প্রবন্ধটি সম্পাদন করার জন্য মূলত দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। যথা- ১. ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method) ২. পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি (Emperical Method)। আঞ্চলিক মুক্তিযুদ্ধের গবেষণার ক্ষেত্রে লিখিত তথ্যের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই প্রথমার্ধের পদ্ধতিতে এটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরপর সাক্ষাৎকারভিত্তিক কথ্য সাক্ষ্যকে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির আওতায় পর্যালোচনা করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার জন্য চণ্ডিপুর গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ফিল্ড ওয়ার্ক সম্পন্ন করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকারভিত্তিক কথ্য সাক্ষ্যকে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে মিলিয়ে ও পর্যবেক্ষণ করে প্রবন্ধটিতে ব্যবহার করা হয়েছে।

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি

গবেষণা প্রবন্ধটি মূলত প্রাথমিক ও সহায়ক দু'ধরনের উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস বলতে মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট সরকারি দলিলপত্র, তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের অর্ডিন্যান্স ও আইন, সমসাময়িক কালের পত্র-পত্রিকা, আত্মজীবনী, সরকারি গেজেট ও গেজেটিয়ার, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার জারিকৃত বিভিন্ন অর্ডিন্যান্স এবং মুক্তিযোদ্ধা ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার প্রভৃতিকে বোঝানো হয়েছে। আর সহায়ক উৎস হলো পরবর্তীকালে প্রকাশিত বই, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, প্রবন্ধ ও অন্য কোন লিখিত তথ্য প্রভৃতি।

তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাথমিক ও সহায়ক উৎসগুলো অধ্যয়নপূর্বক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এটি সাক্ষাৎকারভিত্তিক গবেষণাকর্ম হওয়ায় ক্রস-চেকিং এর মাধ্যমে তুলনা করা হয়েছে। কোন তথ্যে অসঙ্গতি ধরা পড়লে পুনরায় উত্তরদাতাদের নিকট গমন করা হয়েছে এবং তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমন্বয় করা হয়েছে। তাছাড়া সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত আলোচনা ও পর্যালোচনা এবং পারস্পরিক তুলনামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষার আলোকে সন্নিবেশ করা হয়েছে। অতঃপর প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সংগতিপূর্ণ যথার্থ সিদ্ধান্তটি গবেষণাকর্মে ব্যবহার করা হয়েছে।

চণ্ডিপুর গ্রামের নামকরণ ও ভৌগোলিক অবস্থান

ভেড়ামারার স্থানীয় বইপুস্তকে এই গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে স্থানীয় শিক্ষিত প্রবীণ লোকদের কাছে চণ্ডিপুর গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। ১৯৪৭ সালের পূর্বে গ্রামটি হিন্দু প্রধান ছিল।[৭] এই গ্রামের মধ্যপাড়ায় অধিকাংশ হিন্দু ব্যবসায়ী লোকজন বসবাস করতো। তাদের সকলের বাড়িতে চণ্ডিমণ্ডপ ছিল। এখানকার প্রায় প্রতিটি বাড়িতে চণ্ডিমণ্ডপ থাকায় পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজন এটাকে চণ্ডিপাড়া বলে ডাকতো। পরবর্তীতে এই চণ্ডিপাড়া থেকে চণ্ডিপুর হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।[৮] এই গ্রামের নামকরণের অপর একটি তথ্য পাওয়া যায়। চণ্ডিপুর গ্রামের রেললাইন পাড়াটি (মধ্যপাড়া) হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা ছিল। সেখানে হিন্দু মন্দির ও অবস্থাসম্পন্ন লোকদের বাড়ি ছিল। তাই হিন্দুদের ধর্মীয় রীতিনীতি এখানে বেশি হতো। হিন্দুদের চণ্ডিচরণ রীতি অনুসারে পাড়াটি বিবর্তনের ধারায় চণ্ডিপুর নামধারণ করেছে।[৯] উপরের উভয় তথ্য থেকেই এটি প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দুদের ধর্মীয় রীতিনীতি থেকে গ্রামটির নাম চণ্ডিপুর হয়েছে।

পদ্মার শাখা নদী হিসনা (চন্দনা নদী নামেও পরিচিত) গ্রামটির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। ফলে হিসনা নদীর উর্বর অববাহিকায় অবস্থিত। তবে বর্তমানে নদীটি খরস্রোতা। পাকিস্তান আমলের ১৯৫১ সালের জরিপ অনুযায়ী চণ্ডিপুর গ্রামের আয়তন ছিল ৬০৩ একর।[১০] তখন গ্রামটি ভেড়ামারা ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্গত ছিল। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ হবার পর গ্রামটির আয়তন ছিল আগের মতই অর্থাৎ ৬০২.৯৩ একর।[১১] বর্তমানেও গ্রামটির আয়তন আগের মতই আছে। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এই গ্রামের লোকসংখ্যা ছিল ৯১০ জন।[১২] আর ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী লোকসংখ্যা ছিল ১৭৬৯ জন।[১৩] বর্তমানে এই গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ৩৫০০ জন। বর্তমানে চণ্ডিপুর গ্রামটি মুসলিম অধ্যুষিত। তবে ১৯৪৭ সালের পূর্বে গ্রামটি হিন্দু অধ্যুষিত ছিল।[১৪] বর্তমানে গ্রামে শতকরা ১ ভাগ হিন্দু বাসিন্দা রয়েছে বলে স্থানীয় অধিবাসীদের অভিমত। চণ্ডিপুর গ্রামের উত্তরে চাঁদগ্রাম, দক্ষিণে খাড়ারা ও নওদা খাড়ারা, পূর্বে খুলনা-রাজশাহী মহাসড়ক ও পদ্মার চর, পশ্চিমে চন্দনা নদী ও হিড়িমদিয়া গ্রাম অবস্থিত।[১৫]

পাকিস্তান আমলে এই গ্রামের লোকজনের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না। এখানে কৃষি উৎপাদনে সরকারের যথেষ্ট সাহায্য-সহযোগিতা ছিল না। তবে বর্তমানে এই গ্রামের মানুষের কর্মসংস্থানের অনেক সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই গ্রামের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ কৃষিজীবী ছিলেন।[১৬] আর বাকি ১০ ভাগ মানুষ বিভিন্ন ধরনের চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ীর সংখ্যা বাড়লেও এখনও গ্রামটি কৃষিপ্রধান হিসেবে পরিচিত। বহুপূর্ব থেকেই এই গ্রামের মানুষের আয় ও কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস ছিল কৃষি। জলবায়ুর উপর ভিত্তি করে এখানে কৃষি আবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্র হচ্ছে- ধান, পাট, তামাক, গম সরিষা, আলু, ছোলা, মসুরি, টমেটো, মূলা, বেগুন, ভুট্টা ও যব প্রভৃতি। চণ্ডিপুর গ্রামে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও বৃক্ষরাজি দেখা যায়। এর মধ্যে বাবলা, কাঁঠাল, আম, কড়ই ও রেইনট্রি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই গ্রামে বিভিন্ন ধরনের ফলফলাদির গাছ লক্ষ করা যায। আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বাতাবি লেবু, জাম, জামরুল, খেজুর ও কতবেল প্রভৃতি ফলের গাছ বেশি দেখা যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হওয়ায় বেশ পূর্ব থেকেই এই গ্রামে কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য হতো। তবে বর্তমানে কৃষি ও ব্যবসার পাশাপাশি গ্রামের অধিবাসীরা বিভিন্ন ধরনের চাকরি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। ব্রিটিশ আমলে চণ্ডিপুরের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মূলত পরিবার কেন্দ্রিক। এছাড়া গুরুগৃহেও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পাকিস্তান আমলে মাদ্রাসা ও মক্তব কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল। তবে এসময় ধর্মীয় শিক্ষার বাইরে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠতে দেখা যায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় গ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে ১টি মাত্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল।[১৭] বর্তমানে গ্রামটিতে ১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১টি হাইস্কুল রয়েছে। এছাড়া ব্র্যাক স্কুল, আনন্দ স্কুল ও

কয়েকটি নার্সারি স্কুল রয়েছে। চণ্ডিপুর গ্রামে যোগাযোগের ক্ষেত্রে একমাত্র সড়ক পথই রয়েছে। স্থানীয় বিভিন্ন বাহনে করে গ্রামে যাতায়াত করা যায়। তবে এক সময় পার্শ্ববর্তী হিসনা নদীতে নৌকা চলতো।[১৮]

চণ্ডিপুরের গণহত্যা-নির্যাতনের পটভূমি

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাত থেকেই পাকিবাহিনী কুষ্টিয়ায় তাদের অপতৎপরতা শুরু করে। এপ্রিল মাস থেকেই পাকিস্তানি বাহিনী এই থানার উপর ব্যাপক নির্যাতন ও গণহত্যা চালায়। যুদ্ধের নয় মাসে পাকিস্তানি বাহিনীর তুলনায় তাদের সহযোগী রাজাকার, শান্তিকমিটি ও আলবদররাই বেশি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। ২৫ মার্চের (১৯৭১) কালো রাত থেকেই কুষ্টিয়া থানার অধিবাসীরা পাকিস্তানিদের নির্যাতন ও গণহত্যার শিকার হন। এদিন ২৭ বেলুচ রেজিমেন্টের ডেলটা কোম্পানি যশোর সেনানিবাস থেকে এসে কুষ্টিয়াতে পুলিশ লাইন, ওয়ারলেস অফিস ও জিলা স্কুলে অবস্থান নেয়। ২৬ মার্চ তারিখে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালায়। সে সময় থানার কিছু যুবক-তরুণরা পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ২৭ মার্চ তারিখে পাকিস্তানি বাহিনীর উপর প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলা প্রসঙ্গে আব্দুল জলিল বলেন:

> ২৭ মার্চ তারিখে শামসুল হাদি, মাসুম, আনিস, রনি রহমান, রাজা, মতি ও জিল্লু আনুমানিক বেলা ১১ টার দিকে নিজামতুল্লাহ সংসদের (বর্তমান নুরুল ইসলাম মার্কেট) উপর থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর টহল গাড়ির উপর রনি[১৯] ককটেল হামলা করতে গেলে পাকিস্তানি বাহিনী তার উপর গুলি চালালে সে নিহত হয়। পরবর্তীতে বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী সদর থানায় অসংখ্য নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। এসব হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞে পাকিস্তানিদের সঙ্গে তাদের এদেশীয় দোসররা যুক্ত হয়।[২০]

১৭ এপ্রিলের পরপরই কুষ্টিয়া জেলার অন্যান্য থানার ন্যায় ভেড়ামারা থানাতে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের গণহত্যা কর্মসূচিগুলোতে লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগকে আনুষঙ্গিক উপসর্গ হিসেবে বহাল রাখা হয়। ভেড়ামারা থানার যে সব অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণ বেশি এবং যে সব এলাকায় তাদের শক্ত অবস্থান রয়েছে সেগুলি ছাড়া এই থানার অধিকাংশ স্থানে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুর চালানো হয়। তাছাড়া এলাকার সাধারণ মুসলমানদেরকে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে পার্শ্ববর্তী হিন্দু বাড়িঘর জ্বালানো, হামলা, ভাংচুর ও লুটতরাজ ঘটানোর মতো বিষয়ও লক্ষ করা যায়। তাছাড়া যেসব মুসলমান মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিতো তাদের বাড়িঘরেও ভাংচুর লুটতরাজের মতো ঘটনা দেখা যায়। ৩১ মার্চে কুষ্টিয়া জিলা স্কুলের পরাজয়ের পর পাকিস্তানিরা পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে এপ্রিল মাসেই শহরে প্রবেশ করে। পাকিস্তানি বাহিনী এপ্রিল মাসের মধ্যবর্তী সময়ে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ হয়ে কুষ্টিয়া শহরের দিকে আসতে থাকে তখন তারা কুষ্টিয়া শহর, বারখাদা, জুগিয়া, হরিপুর প্রভৃতি স্থানে ব্যাপক অগ্নিসংযোগ করে।[২১] একই সময়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অপর একটি দল যশোর সেনানিবাস থেকে কুষ্টিয়া শহরে প্রবেশের মুখে বিত্তিপাড়া, মধুপুর, লক্ষীপুর, ভাদালি, বটতলীসহ রাস্তার দুপাশের প্রায় সব বাড়িঘর ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে।[২২] এছাড়া যেসব এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা ভারতে প্রশিক্ষণ নিতে গেছে এবং যারা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিল তাদের প্রায় সকলের বাড়িঘর ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় তাদের এদেশীয় দোসরারা লুটতরাজ চালাতো।

১৯৫১ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে ভেড়ামারা থানার লোকজন অধিকার আদায়ে সচেতন ছিলেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভেড়ামারা থানার মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা লক্ষ করা যায়। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে চণ্ডিপুর গ্রামের মানুষ ’৫৪ এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে অবস্থান নেয়।[২৩] তবে ষাটের দশকের আন্দোলনে এখানকার মানুষের সম্পৃক্ততা বেশি লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে ৬ দফার সময় থেকে ভেড়ামারা শহরে মিটিং-মিছিল ও সভা-সমাবেশ বেশি হতো। তখন ৬ দফার সমর্থনে চণ্ডিপুর গ্রামের ছাত্ররা ভেড়ামারা পাইলট হাইস্কুল মাঠের আন্দোলনে শরিক হতো।[২৪] তখন এই সব আন্দোলনে গ্রামের সাধারণ মানুষও সমর্থন জানাতো। ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে ভেড়ামারায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদী সমাবেশে চণ্ডিপুর গ্রামের লোকজন অংশ নেয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে (১৯৬৯)

গণআন্দোলনের সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহা পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে নিহত হন। প্রতিবাদে ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে ভেড়ামারা পাইলট হাইস্কুল মাঠে প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ঐ প্রতিবাদ সমাবেশে চণ্ডিপুর গ্রামের ছাত্ররা সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়।[২৫] চণ্ডিপুরের গিয়াস উদ্দিন, মোয়াজ্জেম হোসেন, হাবিবুর রহমান, আবু বকর সিদ্দিক, মুক্তার হোসেন প্রমুখ এসব আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে চণ্ডিপুর গ্রামের মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তারা একচেটিয়াভাবে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে।

১৯৭১ সালে মার্চের অসহযোগ আন্দোলনে এই গ্রামের প্রায় প্রতিটি মানুষ প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। তবে ৭ মার্চে রেডিও খবরের মাধ্যমে স্বাধিকার আন্দোলনের নেতা বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে এই গ্রামের মানুষ উজ্জীবিত হয়। ফতেহ আলী পণ্ডিতের বাড়িতে গ্রামের শত শত লোক ৭ মার্চের ভাষণ শোনেন।[২৬] বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার পর গ্রামের মানুষ যুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শারীরিক কসরত ও লাঠি প্রশিক্ষণ চলতে থাকে।[২৭] ২৩ মার্চ তারিখে ভেড়ামারা পাইলট হাইস্কুল মাঠে এই থানায় প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।[২৮] সেদিনের পতাকা উত্তোলন ও প্রতিবাদ সমাবেশে চণ্ডিপুর গ্রামের ছাত্র, রাজনৈতিকভাবে সচেতন ব্যক্তি ও কিছু সংখ্যক সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।[২৯] পরে কুষ্টিয়া জিলা হাইস্কুল মাঠের যুদ্ধে (৩০-৩১ মার্চ) এই গ্রামের অনেক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে নজরুল ইসলাম বলেন:

> আমি মাঠে কাজ করছিলাম এ সময় গ্রামের ছাত্ররা এসে বললো কুষ্টিয়ার প্রতিরোধ যুদ্ধে যেতে হবে। তখন আমরা গ্রামের অনেক মানুষ লাঠি, ফালা, হাসুয়া, দাসহ দেশীয় অন্যান্য অস্ত্র হাতে রওনা হই। সেদিন রাস্তায় দেখি হাজার হাজার মানুষ কুষ্টিয়া শহরের দিকে যাচ্ছে। বিভিন্ন গ্রামের পথে পথে মা-বোনেরা ও সাধারণ মানুষ যোদ্ধাদের সাহায্য করার জন্য ভাত, রুটি, ডাবসহ বিভিন্ন ধরনের খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।[৩০]

৩১ মার্চ কুষ্টিয়া শহর মুক্ত করতে চণ্ডিপুর গ্রামের মানুষও যথাসম্ভব সাহায্য করেছে। যাহোক ৩১ মার্চ থেকে পরবর্তী ১৬ দিন কুষ্টিয়া শহর মুক্ত ছিল। এরই মধ্যে পাকিস্তানি হানাদাররা পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে কুষ্টিয়া জেলার তিন দিক দিয়ে আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। ১৪ এপ্রিল তারিখে ভেড়ামারা পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে চলে যায়।[৩১] ১৬ এপ্রিল হার্ডিঞ্জ ব্রিজ হয়ে কুষ্টিয়া অভিমুখে যাত্রার সময় রাস্তার দু'ধারে প্রায় সব বাড়িঘর তারা ভাংচুর ও ভস্মীভূত করে।[৩২] চণ্ডিপুর, ফারাকপুর, গোলাপনগর, সাতবাড়ীয়া ও ভেড়ামারা থানার প্রায় গ্রামে অগ্নিসংযোগ করা হয়। যে সব বাড়ি থেকে মুক্তিযুদ্ধে প্রশিক্ষণের জন্য গেছে; যারা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে: যারা রাজাকার বা পাকিস্তানি বাহিনীকে সাহায্য করেনি এমন ব্যাক্তিদের বাড়িতেও লুটতরাজ ও গান পাউডার দিয়ে অগ্নিসংযোগ করা হয়।[৩৩] ভেড়ামারা থানাতেও পাকিস্তানি বাহিনী নির্যাতন ক্যাম্প খোলে। ভেড়ামারা ভিআইপি রেষ্ট হাউস, পাওয়ার হাউজ রেষ্ট হাউস, ভেড়ামারা হাইস্কুল ও সাতবাড়ীয়া মডেল হাইস্কুলে পাকিস্তানি বাহিনী ক্যাম্প স্থাপন করে।[৩৪] এই সব ক্যাম্পে নারী পুরুষদের ধরে এনে নির্যাতন করা হতো। স্থানীয় রাজাকাররা এসব কাজে সহায়তা করতো। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজাকারগণ ছিলেন- আজিজ চেয়ারম্যান, শামসুল হক, শরিয়তউল্লাহ, মো. মসলেম উদ্দিন ও গিয়াস উদ্দিন।

চণ্ডিপুরের সিরাজউদ্দীনকে ধরে পাওয়ার হাউজ রেষ্ট হাউসে নিয়ে নির্মম অত্যাচার চালানো হয়। তাকে গরম পানিতে চুবিয়ে বেদম প্রহার করা হয়।[৩৫] যুদ্ধের পুরোটা সময় রাজাকার কমান্ডার কামাল হাজির নেতৃত্বে ভেড়ামারায় নির্যাতন চলে। এ সময় নারীদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়। ভেড়ামারার কাপড় ব্যবসায়ী মান্নানের দুই কন্যাকে রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানিরা ধর্ষণ করে। সেদিন বারো মাইলে আরো কয়েকজন নারীকে ধর্ষণ করা হয়।[৩৬] থানার মোকাররমপুর, নওদাপাড়া, ধরমপুর প্রভৃতি গ্রামে বেশ কয়েকজন বীরাঙ্গনা নারী রয়েছে। ১৫ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী হার্ডিঞ্জ ব্রিজের ঈশ্বরদী অংশে অবস্থান নেয়। চুয়াডাঙ্গা ইপিআর ৪নং উইং এর অধিনায়ক মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (পরবর্তীতে সেক্টর কমান্ডার) ও উপ-অধিনায়ক এআর আজম চৌধুরী হাবিলদার মজিবর রহমান সীমান্তের সকল বিওপি এর বাঙ্গালী ইপিআর, পুলিশ, আনসার, এলাকার যুবক ও কিশোরদের সমন্বয়ে বিশাল বাহিনী নিয়ে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের ভেড়ামারা পাড়ে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। হার্ডিঞ্জ ব্রিজের পাকশী পাড়ে পাকিস্থানি হানাদার বাহিনীর

সাথে যোগ দেয় ঈশ্বরদী থেকে বিহারীরা আর হার্ডিঞ্জ ব্রিজের ভেড়ামারা পাড়ে প্রতিরোধ বাহিনীকে সহযোগিতার জন্য এপারের গ্রাম ষোলদাগ, বাহিরচর, ফারাকপুর, চাঁদগ্রাম, চণ্ডিপুর, বাড়াদি হতে হাজার হাজার কৃষক ও যুবক প্রতিরোধ বাহিনীকে সাহায্য করে। ১৫ই এপ্রিল প্রতিরোধ বাহিনীর সঙ্গে পাকহানাদার বাহিনীর প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। আধুনিক অস্ত্রের মুখে সামান্য গোলবারুদ নিয়ে টিকতে না পেরে প্রতিরোধ বাহিনী হার্ডিঞ্জ ব্রিজের ফ্রন্ট ছেড়ে পিছনের দিকে ভেড়ামারার পশ্চিমে আরও একটি শক্ত ফ্রন্ট তৈরির জন্য চেষ্টা করে। পাকহানাদার বাহিনী হার্ডিঞ্জ ব্রিজের পার হয়ে পদ্মা নদীর পশ্চিম পাড়ে ভেড়ামারায় উপস্থিত হয় এবং রাত্রে অবস্থান করে। ১৬ এপ্রিল ভেড়ামারায় অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধা ও ইপিআর বাহিনীর সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর তুমুল সংঘর্ষ হয়।[৩৭]পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে মুক্তিবাহিনী পেছনে সরে যায়। ফলে ঐদিনই পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ভেড়ামারার পতন ঘটে। ভেড়ামারা সামরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[৩৮] ভেড়ামারা পতনের পর পরই তারা দুটি পথ ধরে কুষ্টিয়া শহরের অভিমুখে যাত্রা করে। একটি রাস্তা পাবনা-কুষ্টিয়া মহাসড়ক ধরে, অন্যটি ভেড়ামারা থেকে চণ্ডিপুর গ্রাম দিয়ে জি.কে. ক্যানেল ও রেললাইন ধরে মিরপুর-পোড়াদহ হয়ে কুষ্টিয়ার দিকে অগ্রসর হয়।[৩৯] চণ্ডিপুর অভিমুখে যাওয়ার সময় এই গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনী নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালায়।

চণ্ডিপুর গণহত্যার বিবরণ

অসহযোগ আন্দোলন ও প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় ভেড়ামারা উপজেলার অধিবাসীরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। যে কারণে পাকিস্তানি ও রাজাকাররা এই উপজেলার উপর সীমাহীন নির্যাতন ও গণহত্যা চালায়। এখানকার সবচেয়ে হৃদয়বিদারক গণহত্যা ছিল চণ্ডিপুর গ্রামে। ১৫ এপ্রিল তারিখে পাকশী হার্ডিঞ্জ ব্রিজের কাছে পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থানের কথা শুনে ভেড়ামারা ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকজন এলাকা ছেড়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে যায়। ১৫ এপ্রিল সন্ধ্যায় চণ্ডিপুরের পণ্ডিত বাড়ির সদস্যরা হিসনা নদী পার হওয়ার জন্য নদীর তীরে উপস্থিত হন।[৪০] কিন্তু নৌকা না পাওয়ায় তারা আর যেতে পারেনি। ঐ পরিবারের ২০/২২ জন সদস্য নদীর পাড়ে একটি গর্তের মধ্যে সারারাত নির্ঘুম রাত কাটায়। ১৬ এপ্রিল তারিখে ভেড়ামারা থেকে দুটি পথে কুষ্টিয়া যাওয়ার পথে পাকিস্তানি বাহিনী পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো গান পাউডার দিয়ে পুড়িয়ে দেয়।[৪১] সে সময় তারা নির্বিচারে সাধারণ মানুষের উপর গুলি চালায়। ঐদিন চণ্ডিপুর হয়ে যাওয়ার সময় পাকিস্তানি বাহিনী চিরুনি অভিযান চালায়। সে সময় তারা গ্রামে বেশ কিছু বাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় আব্দুল খালেক, গোবিন্দ সর্দার, মুক্তার হোসেন ও আশরাফ উদ্দিনের বাড়িসহ গ্রামের কয়েকটি পাড়া সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করা হয়।[৪২] তখন পাকিস্তানি মিলিটারিরা চিরুনি অভিযানের অংশ হিসেবে ঝোপঝাড় পর্যন্ত তল্লাশি চালাতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা পণ্ডিত পরিবারের লোকজন নদীর তীরে যে গর্তে লুকিয়ে ছিল সেখানে চলে আসে। তারপর পাকিস্তানি বাহিনী পৈশাচিকতার আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে তাদের উপর ব্রাশ ফায়ার করে।[৪৩] সেদিনের পৈশাচিকতার আরো বর্ণনা পাওয়া যায় ঘটনার শিকার হওয়া আফরোজা বানু লুসির নিকট থেকে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

> ১৬ এপ্রিল তারিখে চন্দনা নদীর তীরে আমরা এটি গর্তে লুকিয়ে ছিলাম। পাকিস্তানি বাহিনী গুলি শুরু করলে প্রথমে আমার ফুপা ও চাচাতো ভাই নিহত হন। এ সময় ব্রাশ ফায়ার করলে আমার সন্তান সম্ভবা ফুফুর গুলি লাগে। একই সময়ে ফুপুর সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমার ফুফু ও সদ্যজাত সন্তানটিও মারা যায়। সেদিন আমার আম্মার গুলি লেগেও বেঁচেছিল। পরে ২৬ এপ্রিল তিনিও মারা যান। এভাবে সেদিনের ঘটনায় ১৪ জন মারা যান। ঐদিন আমার কপালে গুলি লাগে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমি বেঁচে যাই।[৪৪]

গণহত্যা সংঘটিত হওয়ার সময়ের আরো বর্ণনা পাওয়া যায় সেদিন গুরুতর আহত হওয়া মোঃ আমীর খসরুর নিকট থেকে। তিনি বলেন:

> ভেড়ামারা ও আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে লোকজন পূর্বেই নিরাপদ দুরত্বে সরে গিয়েছিল। ভেড়ামারার পাশ্ববর্তী গ্রামে ফতেহ আলী পণ্ডিত পরিবারের বসবাস ছিলো।

> ফতেহ আলী পণ্ডিত ব্রিটিশ আমল থেকে একাধারে শিক্ষক ছিলেন ও শিক্ষার প্রসারে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ভেড়ামারা ইউনিয়ন বোর্ডের টানা পঁচিশ বছর প্রেসিডেন্ট হওয়ায় সুবাদে পণ্ডিত পরিবারটির যথেষ্ট পরিচিতি ছিলো। পণ্ডিত বাড়ির মহিলাদের কয়েকজন সন্তানসম্ভবা হওয়ায় দ্যোদুল্যমান ভাবনায় বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়। পাকহানাদাদের ব্যাপক গণহত্যা ও অগ্নি সংযোগের প্রকোপ দেখে ১৫ই এপ্রিল সন্ধায় নিরাপদ দুরত্বে চলে যাওয়ার জন্য জিকে ক্যানেল ও রেললাইন পার হয়ে পশ্চিমে চন্দনা নদীর তীরে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু ঐদিন সন্ধ্যায় চন্দনা নদী পার না হতে না পেরে পরদিন সকালের জন্য অর্থাৎ ১৬ই এপ্রিল শুক্রবার সকালে নদীর ওপারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। এমন সময় সংবাদ পাওয়া যায় পাকহানাদার বাহিনী ভেড়ামারা থেকে দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং মানুষ দেখামাত্র গুলি ও ঘরবাড়ি গান পাউডার দিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। তখন পণ্ডিত বাড়ির লোকজন চন্দনা নদীর পাড়ে জঙ্গলে ঢাকা একটি গর্তে আশ্রয় গ্রহণ করে। পাক মিলিটারিরা ঝোপঝাড় তল্লাশী করতে করতে গর্তের কাছে এসে হাজির হয় এবং পৈশাচিক আনন্দে ব্রাশ ফায়ার শুরু করে। সবার মৃত্যু নিশ্চিত জেনে মিলিটারিরা সেখান থেকে চলে যায়। পণ্ডিত বাড়ির ঐ দলে ২০/২২ জন লোক ছিল। এর মাঝে মাত্র কয়েকজন আহত ও গুরতর আহত হন। আহতদের মধ্যে এখনও ৩ জন জীবিত আছেন।[৪৫]

১৬ এপ্রিল শুক্রবার সকালের দিকে কুষ্টিয়া জেলার অন্যতম এই গণহত্যা সংঘটিত হয়।[৪৬] এই গণহত্যায় ১৪ জন[৪৭] শহিদ হন। হত্যাকাণ্ডের পর লাশগুলো একই স্থানে দাফন করা হয়।[৪৮] পরবর্তীতে লাশগুলো সরিয়ে অন্যত্র দাফন করা হয়। এই হত্যাকাণ্ড কুষ্টিয়া জেলার অন্যতম বড় গণহত্যা ছিল।

যুদ্ধের সময় এপ্রিল মাসে চণ্ডিপুর গ্রাম থেকে বেশ কিছু তরুণ, যুবক ও ছাত্ররা যুদ্ধের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ভারত যান। যুদ্ধের প্রশিক্ষণ শেষে তারা আবার গ্রামে ফিরে আসেন। তখন তারা পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করার লক্ষ্যে ভেড়ামারা থানার বিভিন্ন যুদ্ধে লিপ্ত হন। ভেড়ামারা উত্তর রেলগেটের যুদ্ধে চণ্ডিপুরের বেশ কয়েকজন যোদ্ধা অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে মুক্তার হোসেন ঐ যুদ্ধে আহত হন।[৪৯] বর্তমানে তিনি একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা। চণ্ডিপুর গ্রামে বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা আছে। চণ্ডিপুর গ্রামের কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার নাম উল্লেখ করা হলো: ১. মুক্তার হোসেন ২. আব্দুল খালেক ৩. পিয়ার আলী ৪. ওসমান আলী ৫. মো. আজগর আলী ৬. সাইফুদ্দিন মোল্লা ৭. নজরুল ইসলাম ৮. নবীর উদ্দিন ও ৯. সাইতাল মণ্ডল।[৫০]

চণ্ডিপুর গ্রামে মুক্তার হোসেন মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্ব দিতেন। একই সময়ে গ্রামের কয়েকজন রাজাকার পাকিস্তানিদের পক্ষাবলম্বন করে। চণ্ডিপুর গ্রামের কয়েকজন রাজাকারের নামের তালিকা দেয়া হলো-[৫১] ১. রইজুল ২. সলিম উদ্দিন ৩. গিয়াস উদ্দিন ৪. মোফাজ্জেল ৫. সাধু ও ৬. জৈরব।

সে সময় চণ্ডিপুরে কোন শান্তিকমিটি গঠিত হয়নি। ভেড়ামারা শান্তিকমিটির নেতৃত্বে এই গ্রামের রাজাকাররা এখানে অপতৎপরতা চালাতো। তবে এই গ্রামের তিনজন ভেড়ামারা শান্তিকমিটিতে যোগ দেয়।[৫২] তারা হলো- ১. মোঃ মোসলেম উদ্দিন ২. মোঃ লুৎফর রহমান ৩. মোঃ সাহাব উদ্দিন। এইসব রাজাকার ও শান্তিকমিটির লোকজন চণ্ডিপুর গ্রামে ব্যাপক লুটতরাজ ও নির্যাতন চালায়। পাকিস্তানি বাহিনী স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় এই গ্রামের লোকজনকে ভেড়ামারা ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যেত। তারপর তাদের উপর সীমাহীন নির্যাতন চালানো হতো। তখন গ্রামের মেয়েদের উপরও নির্যাতন চালানো হয়। যুদ্ধের কোন এক সময় গ্রামের দেল মোহাম্মদের বাড়িতে ঢুকে তার স্ত্রীর উপর পাকিস্তানি বাহিনী নির্যাতন চালায়।[৫৩] এভাবে যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত এই গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনী হামলা, ভাংচুর ও নির্যাতন চালায়। তবে প্রথম দিকে গ্রামের মানুষ শরণার্থী হয়ে চলে গেলেও পরে আবার ফিরে আসে। সে সময় সাধারণ লোকজন মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা করেছে।[৫৪] এভাবে যুদ্ধের পুরোটা সময় চণ্ডিপুরবাসী তাদের ত্যাগ স্বীকার করেছে। এপ্রিল মাসে চণ্ডিপুরের গণহত্যার পর কুষ্টিয়াবাসী অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো জেগে উঠে। পাকিস্তানি

বাহিনীর এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের পর যে সকল সাধারণ মানুষ ট্রেনিং-এ যায়নি তারাও হাতে অস্ত্র তুলে নেয় এবং পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে দেশকে মুক্ত করার শপথগ্রহণ করে।

শহীদ সনাক্তকরণ

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক ১৯৭১ সালের ১৬ এপ্রিল চণ্ডিপুর গণহত্যায় শহীদদের তালিকা নিম্নরূপ:

ক্রম নং.	নাম	পিতা/স্বামী	বয়স	ঠিকানা
১.	শফিউদ্দিন	মৃত ফতেহ আলী পন্ডীত	৫২	চণ্ডিপুর, ভেড়ামারা
২.	মশিউর রহমান	শফিউদ্দিন	১৮	চণ্ডিপুর, ভেড়ামারা
৩.	মীর রাবেয়া খাতুন	স্বামী- মৃত মীর আবুল হোসেন	৪৫	চণ্ডিপুর, ভেড়ামারা
৪.	মীর ডায়মন্ড	মৃত মীর আবুল হোসেন	১৯	চণ্ডিপুর, ভেড়ামারা
৫.	মীর আক্তারজ্জামান	মৃত মীর আবুল হোসেন	২২	চণ্ডিপুর, ভেড়ামারা
৬.	মীর নুতন	মৃত মীর আবুল হোসেন	০৮	চণ্ডিপুর, ভেড়ামারা
৭.	মিস নীলা	আব্দুস ছাত্তার	১৪	চণ্ডিপুর, ভেড়ামারা
৮.	জালালউদ্দিন	মীর ফকির আহম্মেদ	৫৪	চণ্ডিপুর, ভেড়ামারা
৯.	মীর সহিদা আহমেদ রুবী	মীর জালাল উদ্দিন	২২	চণ্ডিপুর, ভেড়ামারা
১০.	মীর নবীণ	মীর জালাল উদ্দিন	০১দিন	চণ্ডিপুর, ভেড়ামারা
১১.	জাহেদা খাতুন	স্বামী- মো: দলিল উদ্দিন	৫৪	চণ্ডিপুর, ভেড়ামারা
১২.	সেলিনা খাতুন	মো: দলিল উদ্দিন	১৬	চণ্ডিপুর, ভেড়ামারা
১৩.	ফাতেমা খাতুন	স্বামী:- মো: আতিয়ার রহমান	৩৪	চণ্ডিপুর, ভেড়ামারা
১৪.	ছদরল ইসলাম	মৃত শামসুদ্দিন	২২	চণ্ডিপুর, ভেড়ামারা

উৎস: মোঃ আমীর খসরু (৫৭), *পূর্বোক্ত*।

আহতদের সনাক্তকরণ

চণ্ডিপুর গণহত্যায় ৭/৮ জন আহত হন। আহতদের মধ্যে ৩ জন এখনও জীবিত রয়েছেন। উক্ত ৩ জনের তালিকা নিম্নরূপ:

ক্রম নং.	নাম	পিতা/স্বামী	বয়স	ঠিকানা
১.	মোছা: আফরোজা বেগম	মো: আতিয়ার রহমান	৫৯	চণ্ডিপুর, ভেড়ামারা
২.	মোছা: জাহানারা বেগম মায়া	শহীদ শফিউদ্দিন	৬০	চণ্ডিপুর, ভেড়ামারা
৩.	মো: আমির খসরু	মো: আতিয়ার রহমান	৫৭	চণ্ডিপুর, ভেড়ামারা

উৎস: মোঃ আমীর খসরু (৫৭), *পূর্বোক্ত*।

১৬ এপ্রিল গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া আহতদের ছবি

মো: আমির খসরু

মোছা: আফরোজা বেগম

স্মৃতিসৌধের ছবিসমূহ

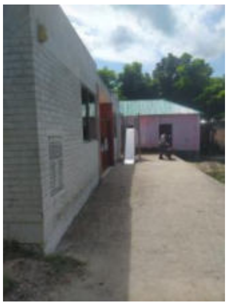

সাক্ষাতকার গ্রহণের প্রশ্নের নমুনা

চণ্ডিপুর গণহত্যা ও নির্যাতন

সাক্ষাৎ প্রদানকারী কর্তৃক তথ্য

১. নাম:
২. পিতার নাম:
৩. স্থায়ী ঠিকানা:
৪. বর্তমান ঠিকানা:
৫. পেশা:
৬. বর্তমান বয়স (মুক্তিযুদ্ধের সময় বয়স):
৭. মুক্তিযোদ্ধা সনদ নং (গেজেটসহ):
৮. মোবাইল নাম্বার (যদি থাকে):
৯. সাক্ষাতকারের স্থান ও সময়:
১০. আপনার গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে জানেন কি?
১১. গ্রামের অবস্থান ও পরিচিতি সম্পর্কে বলুন?
১২. আপনি কোন দলের বা ছাত্র সংগঠনের কর্মী ছিলেন কি না?
১৩. ভাষা আন্দোলন বা সমসাময়িক কোন আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন কি না?
১৪. আইয়ুব সরকারের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে আপনার কি ভূমিকা ছিল?
১৫. ৬২' বা ৬৪' এর ছাত্র আন্দোলনে আপনার কি ভূমিকা ছিল?
১৬. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ৬ দফা আন্দোলনে আপনার সমর্থন ছিল কি না?
১৭. ৬৯' এর গণঅভ্যুত্থানে আপনার সম্পৃক্ততা ছিল কি?
১৮. ৭০' এর নির্বাচন সম্পর্কে কিছু বলুন:
১৯. পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন ও প্রতিরোধ যুদ্ধে আপনার কী ভূমিকা ছিল?
২০. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ সম্পর্ক আপনি কি জানেন?
২১. সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছিল কি?
২২. মুক্তিযুদ্ধকালীন আপনি কীভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন?
২৩. মুক্তিযুদ্ধে কেন অংশগ্রহণ করলেন?
২৪. ট্রেনিং-এ কখন অংশগ্রহণ করলেন (তারিখ/মাস সহ):
২৫. যুদ্ধের ঘটনা ও যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার স্থান:
২৬. কোন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন এবং ঐ এলাকার কারও পরিচয় জানেন কি?
২৭. হতাহত'র সংখ্যা:
২৮. সহযোদ্ধা করা ছিল?
২৯. যুদ্ধ সরঞ্জাম কি কি ছিল?
৩০. অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল কি না?
৩১. স্থানীয় বাসিন্দাদের সাহায্য-সহযোগিতা কেমন ছিল বা বিরোধিতা ছিল কি না?
৩২. যুদ্ধের প্রশিক্ষণ কোথায় এবং কিভাবে নিলেন?
৩৩. কোন কমান্ডারের অধীনে ছিলেন কি না?
৩৪. কোন সংগঠন বা কোন বাহিনীর সদস্য ছিলেন কি না?

৩৫. লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর ও নির্যাতন সম্পর্কে কি জানেন?
৩৬. চণ্ডিপুর নির্যাতন,গণহত্যা, গণকবর ও বধ্যভূমি সম্পর্কে বলুন:
৩৭. শত্রুপক্ষের (পাকিস্তানি সৈন্য বা এদেশীয় পাকিস্তানি দোসর) প্রস্তুতি কেমন ছিল?
৩৮. স্থানীয় পাকিস্তানি দোসর কারা ছিল (নাম যদি জানা থাকে):
৩৯. পাকিস্তানিদের দোসরদের কর্মকাণ্ড কেমন ছিল?
৪০. গণহত্যার সাথে যারা যুক্ত ছিল কারো নাম বলতে পারবেন কিনা?
৪১. যাদের হত্যা করা হয়েছিল তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয় ছিল কি?
৪২. যুদ্ধের আগে ও বর্তমান আপনার এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার কি পরিবর্তন লক্ষ করেন?
৪৩. যে উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অংশ নেন তা কতটুকু অর্জিত হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?
৪৪. ৭১' সালের মানবতা বিরোধী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?
৪৫. অতিরিক্ত তথ্যাবলি:

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর স্বাক্ষর সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর স্বাক্ষর

ড. মো. আরিফুর রহমান

মূল্যায়ন

চণ্ডিপুর গণহত্যা ১৯৭১ সালে কুষ্টিয়া জেলার গণহত্যাগুলির মধ্যে অন্যতম। এই গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনী জাতিগত নিধন (Ethric cleansing) পদ্ধতিতে গণহত্যা চালায়।[৫৫] গণহত্যার দিন পাকিস্তানি বাহিনী কুষ্টিয়া অভিমুখে যাত্রার সময় রাস্তার দু'ধারের ঘরবাড়ি গান পাউডার দিয়ে পুড়িয়ে দেয় ও লোকজন দেখা মাত্র পাখির মত গুলি করে হত্যা করে। চণ্ডিপুর গ্রামে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণে দেশীয় ও স্থানীয় দালালদের সহায়তা ছিল। এই গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন বেশি ছিল। যার ফলে পাকিস্তানিরা এই গ্রামে পৈশাচিকতার নিকৃষ্ঠতম পর্যায়ে চলে যায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রোশের মাত্রা বেশি থাকার কারণে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পূর্ব পর্যন্ত তারা এলাকায় ফিরতে পারেনি। গণহত্যা চালানোর সময় এই গ্রামে বাড়িঘরে লুটপাট ও আগুন দেয়া হয়। এই গ্রামে যারা গণহত্যা-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তারা নিরপরাধ মানুষ। এই গণহত্যায় সহযোগিতা করে এদেশের রাজাকার ও দালালচক্র। চণ্ডিপুরসহ বাংলাদেশের সকল গণহত্যার পাশবিক তথ্য বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে হবে। আর গণকরব ও গণহত্যার স্থানগুলি সংরক্ষণের দ্রুত ব্যবস্থা করতে হবে। সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে আগামী প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে হবে।

উপসংহার

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি বাহিনী এবং তাদের দোসরদের নির্যাতন ও গণহত্যা ছিল বিশ্বের ইতিহাসে বর্বরোচিত ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তারা এ নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। এমনকি দেশকে মেধাশূন্য করতে যুদ্ধের শেষ দিকে এসে বুদ্ধিজীবীদের ধরে ধরে হত্যা করে। সে সময় সারাদেশের ন্যায় ভেড়ামারা উপজেলার চণ্ডিপুরেও তারা নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায। দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে হত্যা, গণহত্যা বা সম্মুখ যুদ্ধে কুষ্টিয়া জেলার প্রায় ৪০/৪২ হাজার মানুষ নিহত হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ বাড়িঘর ছাড়া হয়। পাকিস্তানি বাহিনীর এই ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেও চণ্ডিপুরের তৃণমূল মানুষ লক্ষে অবিচল ছিল। অসংখ্য মানুষের প্রাণের বিনিময়ে এবং নারীদের সম্ভ্রম ও ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে চণ্ডিপুর তথা কুষ্টিয়াকে পাকিস্তানি হানাদার মুক্ত করা সম্ভব হয়।

তথ্যনির্দেশ

১ ‘অপারেশন সার্স লাইট’-১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে বাঙালি নিধন অভিযানের সাংকেতিক নাম। বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ধ্বংস এবং ছত্রভঙ্গ করাই ছিল এ অভিযানের লক্ষ্য। সেটি রাজারবাগ পুলিশলাইন, বিডিআর পিলখানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা শহরের অন্যান্য স্থানসহ বাংলাদেশের বিভিন্নপ্রান্তে নিরস্ত্র- নিরীহ বাঙালির উপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হত্যযজ্ঞ চালায়।

২ মো. হেলাল উদ্দিন, *কাতোলমারী গণহত্যা* (খুলনা: গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, ২০১৮), পৃ. ৮৬

৩ সুকুমার বিশ্বাস, *একাত্তরে বধ্যভূমি ও গণকবর* (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০০০), পৃ. ১৫।

৪ কুমুদনাথ মল্লিক, বিলু কবীর (সম্পা.), *নদীয়া কাহিনী* (ঢাকা: বইপত্র, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৮, প্রথম প্রকাশ ১৩১৭ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৪৫৯।

৫ আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৫), পৃ. ২১৩।

৬ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, ৯ম খণ্ড (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২), পৃ. ৩৩০।

৭ সাক্ষাৎকার: মোঃ হাবিবুর রহমান (বয়স-৭৬), ১৯৭১ সালে কুষ্টিয়া সুগার মিল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ও চণ্ডিপুরে গণহত্যার শিকার ১৪ জনের পরিবারের অন্যতম সদস্য, চণ্ডিপুর, ভেড়ামারা, তারিখ: ১৪.০৭.২০১৫।

৮ *ঐ*।

৯ সাক্ষাৎকার: মোঃ হাসিবুর রহমান (বয়স-৫৭), চণ্ডিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক ও ১৯৭১ সালে চণ্ডিপুরে গণহত্যার শিকার শহিদ শফিউদ্দিনের পুত্র, চণ্ডিপুর, ভেড়ামারা, তারিখ: ০৭.০৯.২০১৫।

১০ *Population Census of Pakistan 1951, Kushtia District: village lists*, *op. cit.*, p. 15.

১১ *Bangladesh Population Census 1974, Village population statistics: Kushtia District*, *op. cit.*, p. 4.

১২ *Population Census of Pakistan 1951, Kushtia District: village lists,op. cit.*, p. 15.

১৩ *Bangladesh Population Census 1974, village population statistics: Kushtia District*, *op. cit.*, p. 6.

১৪ সাক্ষাৎকার: মোঃ পিয়ার আলী (বয়স-৬৭), মুক্তিযোদ্ধা, বামনপাড়া, চণ্ডিপুর, ভেড়ামারা, তারিখ: ০৭.০৯.২০১৫।

১৫ সাক্ষাৎকার: মোঃ হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*; সাক্ষাৎকার: মোঃ হাসিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*।

১৬ সাক্ষাৎকার: মোঃ মুক্তার হোসেন (বয়স-৬৬), চণ্ডিপুর গ্রামের একজন মুক্তিযোদ্ধা, চণ্ডিপুর, ভেড়ামারা, তারিখ: ১৪.০৭.২০১৫।

১৭ সাক্ষাৎকার: মোঃ নূরুল ইসলাম (বয়স-৬২), চণ্ডিপুর গ্রামের একজন মুক্তিযোদ্ধা, চণ্ডিপুর, ভেড়ামারা, তারিখ: ০৭.০৯.২০১৫।

১৮ সাক্ষাৎকার: মোঃ মহিউদ্দিন (বয়স-৬৪), চণ্ডিপুর গ্রামের একজন মুক্তিযোদ্ধা, পূর্ব নওদাপাড়া, ভেড়ামারা, তারিখ: ০৭.০৯.২০১৫।

১৯ রনি রহমান কুষ্টিয়া জেলার মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহিদ।

২০ সাক্ষাৎকার: আব্দুল জলিল (বয়স-৬৬), মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, কুষ্টিয়া, তারিখ: ০৭.০৪.২০১৪।

২১ সাক্ষাৎকার: মোঃ আতিয়ার রহমান, মুক্তিযোদ্ধা, কুষ্টিয়া, তারিখ: ১৬.০৭.১৫; মোঃ মোশাররফ হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা, কুষ্টিয়া, তারিখ: ১৬.০৭.১৫।

২২ সাক্ষাৎকার: মোঃ সিরাজুল হক, মুক্তিযোদ্ধা, কুষ্টিয়া, তারিখ: ১৬.০৭.১৫।

২৩ সাক্ষাৎকার: মোঃ নূরুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*।

২৪ সাক্ষাৎকার: মোঃ মহিউদ্দিন, *পূর্বোক্ত*।

২৫ সাক্ষাৎকার: মোঃ দলিল উদ্দিন (বয়স-৬৫), চণ্ডিপুর গ্রামের একজন মুক্তিযোদ্ধা, চণ্ডিপুর, ভেড়ামারা, তারিখ: ০৭.০৯.২০১৫।

২৬ সাক্ষাৎকার: মোঃ হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*।

২৭ সাক্ষাৎকার: মোঃ নজরুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*।

২৮ সাক্ষাৎকার: মোঃ রুহুল ইসলাম (বয়স- ৭৭), ১৯৭১ সালে ভেড়ামারা পাইলট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, ভেড়ামারা, তারিখ: ১৪.০৮.২০১৩।

২৯ সাক্ষাৎকার: মোঃ দলিল উদ্দিন, *পূর্বোক্ত*।

৩০ সাক্ষাৎকার: মোঃ নজরুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*।

৩১ আবু ওসমান চৌধুরী, *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম* (ঢাকা: সেবা পাবলিশার্স, ১৯৯১), পৃ. ২৩৪।

৩২ সাক্ষাৎকার: মোঃ মুক্তার হোসেন, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, ভেড়ামারা, তারিখ: ১৪.০৭.২০১৫।

৩৩ সাক্ষাৎকার: গোলাম জাকারিয়া (টিপু), মুক্তিযোদ্ধা, ভেড়ামারা, তারিখ: ০৬.০৪.২০১৪।

৩৪ *ঐ।*

৩৫ সাক্ষাৎকার: মোঃ মুক্তার হোসেন, *পূর্বোক্ত*।

৩৬ *ঐ।*

৩৭ সাক্ষাৎকার: আবু বকর সিদ্দিক (বয়স- ৬১), মুক্তিযোদ্ধা, বাহিরচর, ভেড়ামারা, তারিখ: ০৬.০৫.২০১৪।

৩৮ সুকুমার বিশ্বাস, মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯), পৃ. ১৭২।

৩৯ সাক্ষাৎকার: মোঃ হেদায়েত উল্লাহ (বয়স- ৬৪), মুক্তিযোদ্ধা, ষোলদাগ, ভেড়ামারা, তারিখ: ০৭.০৮.২০১৩।

৪০ রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৯।

৪১ সাক্ষাৎকার: মোঃ সেকেন্দার আলী (বয়স- ৭৮), মুক্তিযোদ্ধা, ভেড়ামারা হল বাজার, তারিখ: ২১.০৪.২০১৪।

৪২ সাক্ষাৎকার: মোঃ মুক্তার হোসেন, *পূর্বোক্ত*; সাক্ষাৎকার: হাসিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*।

৪৩ সাক্ষাৎকার: মোছাঃ আফরোজা বানু লুসি (বয়স- ৫০), ১৯৭১ সালের ১৬ এপ্রিল চণ্ডিপুর গণহত্যার শিকার ফাতেমা খাতুনের কন্যা, চণ্ডিপুর, ভেড়ামারা, তারিখ: ১৪.০৭.২০১৫।

৪৪ *ঐ*।

৪৫ সাক্ষাৎকার: মোঃ আমীর খসরু (৫৭), ১৯৭১ সালের ১৬ই এপ্রিল চণ্ডিপুর গণহত্যার শিকার মোঃ আতিয়ার রহমানের পুত্র (বর্তমানে রুপালী ব্যাংক লিমিটেড-এ কুষ্টিয়ার জোনাল অফিসে এসপিও হিসেবে কর্মরত), ভেড়ামারা, তারিখ: ০৯.১০.২০২২

৪৬ সাক্ষাৎকার: মোঃ হাসিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*।

৪৭ চণ্ডিপুর গণহত্যার ১৪ জন শহিদের নামের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো: ১. শফিউদ্দিন ২. মশিউর রহমান ৩. মীর রাবেয়া খাতুন ৪. মীর আখতারুজ্জামান ৫. মীর ডাইমণ্ড ৬. মীর নূতন ৭. নীলা ৮. মীর জালাল উদ্দিন ৯. মীর সহিদা বেগম রুবী ১০. মীর নবীন ১১. জায়েদা খাতুন ১২. সেলিনা খাতুন ১৩. ফাতেমা খাতুন ১৪. ছদরুল ইসলাম।

৪৮ সাক্ষাৎকার: মোঃ হাসিবুর রহমান।

৪৯ সাক্ষাৎকার: মোঃ মহিউদ্দিন, *পূর্বোক্ত*; সাক্ষাৎকার: মোঃ মুক্তার হোসেন, *পূর্বোক্ত*।

৫০ সাক্ষাৎকার: নজরুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*; সাক্ষাৎকার: মোঃ মুক্তার হোসেন, *পূর্বোক্ত*।

৫১ *ঐ*।

৫২ *ঐ*।

৫৩ সাক্ষাৎকার: নজরুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*।

৫৪ সাক্ষাৎকার: মোঃ পিয়ার আলী, *পূর্বোক্ত*।

৫৫ মো. গোলাম সারওয়ার, *হরিপুর গণহত্যা* (খুলনা: গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, ২০১৮), পৃ. ৭১

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

আধুনিক আরবি ভাষা ও সাহিত্যে জুরজী যায়দান : একটি পর্যালোচনা
(Jurji Zaidan in Modern Arabic Language and Literature: A Review)

ড. মুহাম্মদ মতিউর রহমান*
ড. মুহাম্মদ সোলাইমান*

Abstract: Jurji Zaidan was born on December 14, 1861 in Beirut to an Eastern Orthodox Christian family and died on July 21, 1914 at Cairo in Egypt. He was the greatest writer, journalist, novelist, teacher and editor. He had a large contribution to Modern Arabic language and literature, though he was born in a Lebanese Christian family. He devoted himself for development of Arabic language and literature. He was a distinguished historian of Islamic civilization. He undoubtedly read western sources and admired the precision and method that European Orientalism brought to the task of interpreting history. But while, like other Arab intellectuals in the 19th and early 20th century, he was profoundly influenced by the methods of European research, he also had enormous mastery of Arab and Muslim History and his historical knowledge came often from Arab writers, whom he also criticized severely. The balance of these various influences is best seen in his writing, and it is amazing that this largely self-taught man should have produced the first major history of Islamic civilization. We know that, he was a self-made man, culturally as well as in matters of finance. He was the first who, in our modern age, devoted his life to studying Islamic history; he wrote a great many historical novels, in addition to his major work The History of Islamic Civilization. His master work on Islamic Civilization it would be as novelist that he would introduce Islamic and Arab History to a very wide public. He was a truly founding figure and considered one of the greatest guides of Arab culture in its modem renaissance.

ভূমিকা

খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী হয়েও অমুসলিম ঘরানার যে ক'জন পণ্ডিত আরবি ভাষা ও সাহিত্যে অভূতপূর্ব অবদান রেখে চিরভাস্বর হয়ে আছেন, লেবাননের বৈরুতে জন্ম গ্রহণকারী জুরজী যায়দান তাঁদের মধ্যে অন্যতম। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর আরবি ভাষা ও সাহিত্য পরিবারের এক প্রোজ্জ্বল নক্ষত্র। দরিদ্র পরিবারে জন্ম নিয়েও নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গভীর দক্ষতা অর্জন করেন। বাবার আর্থিক দীনতার কারণে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে না পারলেও, তাঁর জ্ঞানার্জনের অদম্য স্পৃহা তাঁকে আরব জাতির ইতিহাস চর্চায়, আরবি ভাষা ও সাহিত্যে, এবং উপন্যাস রচনায় মর্যাদার উচ্চ শিখরে সমাসীন করে। প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখার সৌভাগ্য না হলেও তাঁর জ্ঞানস্পৃহা তাঁকে থামাতে পারেনি। প্রতিকূল পরিবেশে গড়ে ওঠেও অনেক ইতিহাস গ্রন্থ, ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে তিনি আরবি সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির উচ্চমার্গে পৌঁছে দিয়েছেন। ঐতিহাসিক আনীস আল-মাকদিসী তাঁকে উপন্যাসের অগ্রদূত হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন,

"كان جرجي زيدان رائد هذا الفن في العالم العربي"

'জুরজী যায়দান আরব বিশ্বে এই শিল্পের (উপন্যাস) অগ্রদূত ছিলেন'।[১]

---

* প্রফেসর, আরবি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

পরিচিতি

মূল নাম জুরজী। হাবিব ইবন যায়দান তাঁর পিতা। দাদা যায়দান এর দিকে সম্পর্ক করে তাঁকে জুরজী যায়দান বলা হয়। তিনি ১৪ ডিসেম্বর ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে বৈরুতের একটি দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।[২]

শিক্ষা জীবন

মাত্র পাঁচ বছর বয়সে পিতা তাঁকে খ্রীষ্টান পাদ্রী ইলিয়াছ শফীক এর পাঠশালায় প্রেরণ করেন। অতঃপর সেখান থেকে 'সুআম' নামক বিদ্যাকেন্দ্রে পাঠান। সেখানে তিনি ফরাসী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর মাসউদ আল-মুয়াল্লিম এর বিদ্যা নিকেতনে পাঠালেন। সেখানে তিনি ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করেন।[৩] প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করে অভাবের কারণে তাঁর উচ্চ শিক্ষা লাভ ব্যাহত হয়। J.A.Haywood এ প্রসঙ্গে বলেন,

"He was born in Beirut, but only completed the primary stage of his education, having to leave school to work for his father".[4]

কর্মজীবন

অভাবের তাড়নায় মাত্র বার বছর বয়সে তিনি পাদুকা কারখানায় যোগদান করেন। সেখানে দুই বছর কর্মরত থেকে পিতার পরিচালিত রেস্টুরেন্ট এ যোগ দেন।[৫] পিতার সাথে খুব দুঃখবোধ নিয়ে কাজ করতেন। রেস্টুরেন্ট পরিচালনায় মা-বাবার কঠোর পরিশ্রমের কথা তার স্বীয় মুখেই পরিস্ফুটিত হয়। তিনি বলেন,

نشأت فى صباى وأنا أرى والدي يخرج إلى دكانه فى الفجر ولا يعود إلا فى نحو منتصف الليل أو قبيله...وأرى والدتى لا تهدأ لحظة من الصباح إلى المساء.

'আমি আমার শৈশবে বেড়ে উঠেছি এমতাবস্থায় যে, আমার পিতা প্রত্যুষে তাঁর দোকানের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যেতেন। মাঝ রাতে কিংবা তার সামান্য পূর্বে বাড়ী প্রত্যাবর্তন করতেন। আর মাকে দেখতাম সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্ষণিকের জন্যও বিশ্রাম নিতেন না'।[৬]

মূলত কৈশোরের গণ্ডি পেরোনোর আগেই তাঁর কর্মজীবনের সূচনা ঘটে। জীবন জীবিকার তাগিদে তাঁর পিতার রেস্টুরেন্ট এ তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। আর রেস্টুরেন্ট এ পিতার সাথে কাজ করার সময় আমেরিকান কলেজ স্টুডেন্ট এবং সাংবাদিকদের সাথে তাঁর সখ্যতা গড়ে উঠে। যা তাকে বৈরুতের 'শামশুল বারর' এসোসিয়েশন এর সাথে যোগদানের পথ সুগম করে দেয়। আর এটি ছিল ইংল্যান্ড ক্রাইস্ট যুব এসোসিয়েশন এর শাখা। এ সংস্থার সাথে যুক্ত হয়ে লেখাপড়ার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এর সদস্যগণ তাঁকে আমেরিকান বিদ্যালয় থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণের সুযোগ প্রদান করত। সুযোগ পেলেও তাঁর হৃদয়ে অপ্রাপ্তির শূন্যতা বিরাজ করতো। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছে ছিল উচ্চ শিক্ষা অর্জন করা। এখানে তিনি সালিম বুস্তানী, বুতরুস বুস্তানী ও ইয়াকুব সাররুফ প্রমূখ বিশিষ্ট ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়ে যান। যাঁদের সহচার্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করার সৌভাগ্য হয়।[৭]

প্রটেস্ট্যান্ট কলেজে অধ্যয়ন

প্রাথমিক শিক্ষা শেষে অর্থনৈতিক দৈনতার কারণে নিয়মতান্ত্রিকভাবে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ লাভ করতে পারেননি। তবে সৌভাগ্যবশত প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও প্রটেস্ট্যান্ট কলেজে কিছুদিন লেখাপড়া করার মোক্ষম সুযোগ লাভ করেন।[৮]

চিকিৎসা বিজ্ঞানে মনোনিবেশ

জ্ঞান চর্চার এক পর্যায়ে তাঁর মধ্যে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রেষণা সৃষ্টি হয়। মাত্র আড়াই মাসের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রাথমিক বিষয়গুলো রপ্ত করে নেন। অতঃপর ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন খ্যাতনামা আমেরিকান কলেজে ভর্তি হন। প্রথম বর্ষে তিনি কৃতিত্বের সাথে সহপাঠিদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। আর দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম দিকে চিকিৎসা বিভাগে গণ্ডগোল দেখা দিলে, তিনি অন্যান্য সহপাঠিদের সাথে ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে ফার্মেসী বিভাগে চলে আসেন। আর অতি অল্প দিনের মধ্যে ল্যাটিন ভাষা, পদার্থ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা, রসায়ন এবং আরো অনেক মৌলিক বিষয়ের উপর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।[৯]

কায়রোতে হিজরত

জুরজী যায়দান চিকিৎসা বিদ্যার অধ্যয়নকে পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে বৈরুত হতে মিসরের রাজধানী কায়রোতে হিজরত করেন। কিন্তু কায়রোতে এসে তাঁর মন পরিবর্তন হয়ে যায়। চিকিৎসক হওয়ার বাসনা পরিত্যাগ করে চাকরির সন্ধান করতে থাকেন।

সম্পাদক রূপে জুরজী

আরমেনীয় বংশোদ্ভুত আলাকসান সাররাফিয়া কর্তৃক প্রকাশিত দৈনিক 'আয-যমান' পত্রিকার সম্পাদক পদে ১৮৮৩ সালে যোগদান করেন। এটি ছিল আরাবিয়্যাহ বিপ্লবের[১০] পর ইংরেজ দখল দারিত্বের কারণে সাংবাদিকদের কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতার সময়ের একমাত্র পত্রিকা। এ পদে তিনি প্রায় এক বছর পর্যন্ত দায়িত্বরত ছিলেন।[১১]

অনুবাদক পদে যোগদান

১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে কায়রোর বৃটিশ সংবাদ সংস্থার অফিসে মুতারজিম বা অনুবাদক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। অতঃপর আহমাদ মুতামাহদীর বাহিনীর হাতে অবরুদ্ধ ইংরেজ সেনাপতি গর্ডন বাহিনীকে মুক্ত করার জন্য প্রেরিত সৈন্যবাহিনীর সাথে দোভাষী হিসেবে সুদানে গমন করেন। সেখানে তিনি দশ মাস দায়িত্ব পালন শেষে ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে বৈরুতে ফিরে আসেন। বৈরুতে মাত্র দশ মাসের মধ্যে হিব্রু ও সিরীয় ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। এই দুই ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ফলে তিনি 'ফালসাফাতুল লুগাতিল 'আরবিয়্যা' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তীতে তিনি এটিকে আরো পরিমার্জন করে ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে 'তারীখুল লুগাতিল 'আরবিয়্যাহ' নামে প্রকাশ করেন।[১২]

১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন সফর করেন। বৃটেনের বিভিন্ন সাহিত্য সভায় যোগদান করেন এবং বৃটিশ যাদুঘর পরিদর্শন করেন।[১৩]

মাসিক 'আল-মুকতাতাফ' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে জুরজী

১৮৮৬ সালে শীতকালে মিসরে ফিরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'আল-মুকতাতাফ'[১৪] এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতীব দক্ষতার সাথে তিনি মিসরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ রচনা করে পত্রিকাটির অগ্রগতি সাধনে অবদান রাখেন। ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[১৫]

শিক্ষক হিসেবে জুরজী

পত্রিকার সম্পাদক পদ হতে ইস্তফা প্রদান করে তিনি ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে 'আল-'আবীদিয়্যাহ আল-কুবরা' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরবি ভাষার শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। একটানা ১৮৯১ সাল পর্যন্ত দুই বছর শিক্ষকতা করেন। এই দুই বছরে তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'আল-মামলূক আশ-শারীদ' রচনা করেন।

ছাপাখানা স্থাপন

লেখালেখি এবং প্রকাশনার ব্যস্ততায় অধ্যাপনা পেশা ছেড়ে তিনি ছাপাখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নাজীব মিতরীর সাথে যৌথ মালিকানায় একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। এক বছরেই উভয়ের মধ্যে ফাটল তৈরি হয়। জুরজী যায়দান 'আল-হেলাল' নামে এবং নাজীব মিতরী 'আল-মা'রিফ' নামে আলাদা আলাদা ছাপাখানা স্থাপন করেন।[১৬]

মুজাল্লাতুল হিলাল সম্পাদনা

তাঁর প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানা 'আল-হিলাল' এর নামানুসারে ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর সম্পাদনায় মাসিক 'আল-হিলাল' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর বড়ো পুত্র সম্পাদনা কাজে তাঁকে সহোযোগিতা করতেন।[১৭]

তাঁর প্রাণবন্ত চিন্তাধারা

তিনি আরবি ভাষার পাশাপাশি ইংরেজী এবং ফরাসী ভাষায় সুদক্ষ ছিলেন। বিশেষভাবে সাহিত্য ইতিহাস ও ঐতিহ্য সন্ধানী লেখক ছিলেন। তাঁর প্রথম দিকের লেখাগুলোতে সাহিত্য ও ইতিহাস কেন্দ্রিক বিষয়ের প্রাধান্য ছিল। তিনি ১৮৮৯ সালে "তারীখূ মিসর আল-হাদীসা", "তারীখূল মাসূনিয়্যাহ ওয়াত তারীখূল'আম" ও "জিগরাফিয়্যাতু মিসর ওয়া তাবকাতুল উমাম" ইত্যাদি প্রকাশ করেন। সেগুলো পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়নি। 'আল-হিলাল' পত্রিকার প্রকাশের পর তাঁর প্রাণবন্ত ক্ষুরধার লেখনি দ্বারা মানুষের হৃদয়ে সহজেই স্থান করে নেন।

'আল-হিলাল' এর জনপ্রিয়তা

১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর নিজস্ব সম্পাদনায় আল-হিলাল পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশ করেন। জন. এ. হেউড বলেন, In 1892, he founded the famous literary monthly, Al-Hilal. তিনি অত্যন্ত সুনিপুণভাবে তাঁর পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে সম্পাদকীয় কলাম লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণবন্ত লেখায় পাঠক সমাজ হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তাঁর বিভিন্ন বই অনুচ্ছেদ করে তাতে প্রকাশ করতেন। পত্রিকাটি মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে জনপ্রিয়তায় সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকার স্থান দখল করে নেয়। প্রায় একযুগ পর্যন্ত তিনি পত্রিকাটির সম্পাদনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। মিসর ও আরব বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় চিন্তাবিদগণ তাতে লিখতেন। বড়ো বড়ো লেখক ও সাহিত্যিকগণ পত্রিকাটির সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন। তন্মধ্যে ড. আহমাদ যাকী, ড. হোসাইন মু'নাস, ড. 'আলী রা'ঈ, ও কবি সালেহ জওদত প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১৮]

বৃটেনের এশীয় শিক্ষা সমিতির স্থায়ী সদস্য পদ লাভ

তিনি ১৮৯৭ সালে যুক্তরাজ্যের এশীয় শিক্ষা সমিতির একজন স্থায়ী সদস্য হওয়ার গৌরব অর্জন করেন এবং باي تونس বা তিউনিসিয়ার সর্বশেষ আমীর মুহাম্মদ আল-আমীন পাশা আল-বাঈ[১৯] জুরজী যায়দানের অনন্য প্রতিভা এবং অবদানে বিমুগ্ধ হয়ে তাঁকে প্রথম সারির 'বিসামুল ইফতিখার' পদকে[২০] ভূষিত করেছিলেন।[২১]

ইন্তেকাল

তিনি ১৯১৪ সালের ২১ শে জুলাই তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারে বই ও কাগজের মাঝখানে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পরলোক গমন করেন।[২২] তাঁর মৃত্যুতে মিসরের কবি সম্রাট আহমাদ শওকী, মিসরের জাতীয় কবি হাফিজ ইবরাহীম এবং খলীল মুতরান মরসিয়া বা শোকগাঁথা রচনা করেন। জুরজী যায়দান দুই ছেলে যথাক্রমে ইময়াল ও শুকরী এবং আসমা নামক এক কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন। তিনি আধুনিক যুগের প্রথম পাশ্চাত্যবাসী, যিনি স্বীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে আপন প্রতিভা ও প্রচেষ্টায় মর্যাদাবান হওয়ার গৌরব লাভে ধন্য হয়েছেন। আর একজন খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী হয়েও ইসলামি ইতিহাস চর্চায় নিজের জীবনকে সম্পৃক্ত করেছেন।[২৩]

মিসরের জাতীয় কবি হাফিজ ইবরাহীম তাঁর মরসিয়ায় বলেন,

لك الأثر الباقي وإن كنت نائيا * فأنت على رغم المنية دائي

ويا قبر زيدان طويت مؤرخا * تجلى له ما أضمر الفتيان

তব অবদানে ভরা এই ধরা
যদিও তুমি অনেক দূরে।
মরণের পরেও রয়েছ তুমি
সদা মোদের হৃদয় কন্দরে।
যায়দানের কবর! বুকে জড়ালে
তুমি এক ইতিহাস গবেষক।
দিবারাত্রির সকল গোপন বিষয়ের
যিনি এক দীপ্ত প্রকাশক।

জুরজী যায়দানের রচনাসমগ্র

তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্য ভাণ্ডারকে তাঁর অনুপম অবদান দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। বহুমাতৃক গুণের অধিকারী এই জ্ঞান বিদগ্ধ পণ্ডিত একাধারে একজন সুসাহিত্যিক, ভাষাবিদ, গবেষক, ঐতিহাসিক ও খ্যাতনামা উপন্যাসিক ছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন অঙ্গনে তাঁর অনুপম অবদানের একটি বিবরণ পেশ করা হলো।

‘আল-হিলাল’ পত্রিকার মাধ্যমে জুরজী যায়দানের বিস্ময়কর প্রতিভা মানুষের নিকট অতিদ্রুত প্রতিভাত হতে আরম্ভ করে। ইতোপূর্বে কিছু কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও তা তেমন একটা সাড়া ফেলতে পারেনি। আল-হিলাল পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর রচনা সমগ্র ধীরে ধীরে পাঠক প্রিয়তা লাভ করতে লাগলো।

ক. ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাবলী

১. تاريخ التمدن الإسلامى : গ্রন্থটি ১৯০২ সাল থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ফার্সি, তুর্কী ও ইংরেজী সহ বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়।[২৪] তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিতে জুরজী যায়দান তাঁর ঐতিহাসিক অনুভূতি ও উপলব্ধি দ্বারা ইসলামি সভ্যতার তামুদ্দুনিক ইতিহাস চিত্রায়িত করেছেন। এ গ্রন্থটি প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে দিয়েছে। আরব জাতির তামুদ্দুনিক ইতিহাস ও ইসলাম পূর্বযুগে তাদের অবস্থার বিবরণ সম্বলিত ভূমিকা দ্বারা গ্রন্থটির সূচনা করেছেন। প্রাচীন ইসলামি সাম্রাজ্যের কৃষ্টি কালচার, প্রাচুর্য এবং সমকালীন রাষ্ট্রের সাথে সেগুলোর সম্পর্কের বর্ণনা দিয়েছেন। বিভিন্ন যুগের খলীফা এবং তাঁদের সাথে সমকালীন বিজ্ঞ পণ্ডিতদের সম্পর্কেরও বর্ণনা রয়েছে।

২. تاريخ مصر الحديث من الفتح الإسلامي إلى الآن : এ গ্রন্থটি ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে মিসর থেকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তাঁর সমকাল পর্যন্ত আধুনিক মিসরের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

৩. العرب قبل الإسلام : এ গ্রন্থটিতে ইসলাম পূর্ব যুগের আরব জাতির ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। ১৯০৮ সালে এটির প্রথম খণ্ড মিসর থেকে প্রকাশিত হয়। বাকী খণ্ডগুলো প্রকাশিত হয়নি।

৪. التاريخ العام منذ الخليقة إلى الآن : ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে এর প্রথম খণ্ডটি বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়। বাকী খণ্ডগুলো তিনি পরিপূর্ণ করতে পারেননি।

৫. تاريخ انكلترة منذ نشأتها إلى هذه الأيام এ গ্রন্থটি ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৬. تاريخ الماسونية العام منذ نشأتها إلى هذه الأيام এটি ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয়।

৭. تاريخ اليونان والرومان (وهو جزء من تاريخ أوربة) এটি ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৮. طبقات الأمم أو السلائل البشرية ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত।

৯. أنساب العرب القدماء (وهو رد على القائلين بالأمومة والطوطمية عند العرب بالجاهلية) ৪২ পৃষ্টার এ গ্রন্থটি ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে 'আল-হিলাল' পত্রিকায় প্রকাশিত

খ. জীবনী ও সী'রাত জাতীয় গ্রন্থাবলী

১০. تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر ١٩٠٢ খ্রিষ্টাব্দে দুই খণ্ডে প্রকাশিত। উনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক, লেখক, গবেষক, রাজনীতিবিদ ও অপরাপর প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের জীবনী সন্নিবেশ করা হয়েছে।

১১. بناة النهضة العربية আল-হিলাল পত্রিকার ৭২ তম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

১২. رحلة جرجي زيدان إلى أوربة عام ١٩١٢صدر في الهلال عام ١٩٢٣ ১৯১২ সালে জুরজী যায়দানের ইউরোপ ভ্রমনের উপর ভিত্তি করে রচিত। যা তাঁর ইন্তেকালের পরে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে আল-হিলাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

গ. ভূগোল বিষয়ক রচনাবলী

১৩. عجائب الخلق، الهلال: ١٩١٢ ১৯১২ সালে আল-হিলাল পত্রিকায় প্রকাশিত।

১৪. مختصر جغرافية مصر মিসরের ভৌগলিক অবস্থানের সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে এতে। ١٨٧١ সালে প্রকাশিত।

ঘ. আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক রচনাবলী

১৫. **الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية،** এটি ছিল তাঁর প্রথম সাহিত্যকর্ম। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে আল-হিলাল পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ভাষাগত দর্শন ও আরবি শব্দাবলীর গতিপ্রকৃতির তুলনামূলক দর্শন নীতির প্রথম সফল প্রয়াস। Encyclopedia of Islam গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, "His first work of a Linguiation nature ; philosophy of Language and the Arabic Language.[25]

১৬. تاريخ اللغة العربية باعتبارها كائنا حيا ناميا خاضع لناموس الارتقاء আল-হিলাল পত্রিকায় ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

১৭. **تاريخ آداب اللغة العربية** এই সেই গ্রন্থ যে গ্রন্থটির বদৌলতে জুরজী যায়দান যুগ যুগান্তরে আরবি সাহিত্য পিপাসুদের হৃদয় কন্দরে চিরভাস্বর ও অম্লান হয়ে থাকবে। তাঁর অনেক পরিশ্রমের ফসল। এ গ্রন্থটি ১৯১১-১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চাকারীদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র হিসেবে পরিগণিত করা হয়। আল-হিলাল পত্রিকায় ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে এই শিরোনামে কয়েকটি অনুচ্ছেদ প্রকাশিত হয়। অতঃপর এই অনুচ্ছেদগুলোকে আরো সম্প্রসারিত করে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের রূপ দান করেন। জুরজী যায়দানকে এই ময়দানের অগ্রদূত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি প্রাচ্যবিদদের বিশেষত ব্রুকলম্যান এর 'আল-আদাবুল 'আরবি' গ্রন্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই বৃহত্তম কাজটি সুসম্পন্ন করেন। এটি তাঁর অমর সৃষ্টি। Encyclopedia of Islam-এ উল্লেখ করা হয়েছে, "No less important for the east was his last great work 'History of Arabic Literature, This was the first work in Arabic, Designed on European principles.[26]

১৮. الألفاظ العربية والفلسفة اللغوية، بيروت مطبعة القديس جاورجيوس

১৯. وذكر يوسف أسعد داغر كتابا لجرجي بعنوان " البلغة فى أصول اللغة" ولكنه غير موجود

ঙ. সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাবলী

২০. علم الفراسة الحديث وموضوع الاستدلال على أخلاق الناس وقواهم ومواهبهم من النظر إلى أشكال أعضائهم

২১. مختارات جرجي في فلسفة الاجتماع والعمران এটি ١٩٢٠ খ্রিষ্টাব্দে আল-হিলাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

উপন্যাসিক হিসেবে জুরজী যায়দান

আরবি সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় জুরজী যায়দান উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। ইসলামের ইতিহাস অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করে তিনি সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। একজন খ্রীষ্টান হয়েও ইসলামি ইতিহাস চর্চার পেছনে তাঁর দুরভিসন্ধিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কথাও তুলে ধরেছেন অনেক সচেতন মহল। আরবি সাহিত্যে অবদান রাখার কারণে তাঁকে নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে যেমন শ্রদ্ধা রয়েছে, ঠিক তেমনি তাঁর উপন্যাসগুলোতে মুসলমানদের প্রতি বিদ্রোপাত্মক ও তীর্যক মন্তব্যের কারণে সমালোচিতও হয়েছেন তিনি।

জুরজী তাঁর উপন্যাসগুলোকে কালানুসারে বিভাজন করেছেন। প্রথমে জাহেলি যুগ, খোলাফায়ে রাশেদীন এর যুগ, উমাইয়া যুগ, আব্বাসী যুগ, মোগল যুগ, ওসমানী যুগ এবং আধুনিক যুগ।[২৭] উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি ইউরোপের উপন্যাসের জনক Walter Scott এর অনুসরণ করেছিলেন। ওয়ালটার স্কট ইতিহাসকে উপজীব্য করে উপন্যাস রচনা করেছিলেন। আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য বর্ণনা দ্বারা তাঁর উপন্যাসকে চিত্তাকর্ষক করে গড়ে তুলেছিলেন। আরবি সাহিত্যে জুরজী যায়দানকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের অগ্রদূত হিসেবে অভিহিত করা হয়। উমার আদ-দাসূকী বলেন,

"وكان من الطبيعي بعد أن كثرت هذه الروايات في أيدي الشباب والرجال، أن يبدأ الأدباء في محاكاتها، وكان أول المقلدين وأنشطهم جرجي زيدان، فنحا في تأليف الروايات منحى ((ولترسكوت)) الانجليزي."[28]

আরবি ইতিহাস ভিত্তিক উপন্যাসের ময়দানে জুরজী যায়দানকে উদ্ভাবক বলা হলেও আমি এ মতের সাথে একমত নই। কেননা তাঁর প্রায় বিশ বছর পূর্বে সালিম আল-বুস্তানী ইতিহাস ভিত্তিক উপন্যাস করেছেন বলে তথ্য পাওয়া যায়। যেমন শওকী আবূ খলীল বলেন,

مع أن سليم البستاني قدم روايتين تاريختين، سبقتا روايات جرجي زيدان بأكثر من عشرين عاما، ففي سنة ١٨٧١م ظهر قصة ((زينوبيا)) وفي سنة ١٨٧٤م تلاها ظهور روايته الثانية ((الهيام في فتوح الشام)).[29]

তাঁর রচিত উপন্যাস এর সংখ্যা সর্বমোট ২২ টি

১. فتاة غسان
২. أرمانوسة المصرية
৩. عذراء قريش
৪. ١٧رمضان
৫. غادة كربلا
৬. الحجاج بن يوسف
৭. فتح الأندلس
৮. شارل وعبد الرحمن
৯. أبو مسلم الخراسانى
১০. العباسة أخت رشيد
১১. الأمين والمأمون
১২. عروس فرغانة
১৩. أحمد بن طولون
১৪. عبد الرحمن الناصر
১৫. الإنقلاب العثمانى
১৬. فتاة القيروان
১৭. صلاح الدين ومكائد الحشاشين
১৮. شجرة الدر
১৯. المملوك الشارد
২০. استبداد المماليك
২১. أسير المتمهدى
২২. جهاد المحبين

(গাসসানী যুবতী) এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস। এটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। এতে ইসলামের আবির্ভাব এবং ইরাক ও সিরিয়া বিজয়ের কাহিনীসমূহকে মূল উপজীব্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় উপন্যাস 'আরমানূসাতুল মিসরিয়্যাহ' এর মধ্যে ১৮ হিজরী সনে হযরত 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) কর্তৃক মিসর বিজয়ের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে। এ ভাবে প্রায় উপন্যাসে ইসলামের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর অবতারণা করে তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'ফাতহুল আন্দুলুস' ও 'আল-মামলূকুশ শারিদ' দ্বারা ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। 'ফাতহুল আন্দুলুস' উপন্যাসটি ৯৭ হিজরী সালে

প্রখ্যাত দিগ্‌বিজয়ী বার্বারিয়ান সেনাপতি তারিক ইবন যিয়াদের হাতে মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের ইতিহাস অবলম্বনে রচিত হয়েছে। ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। আর ১৯০৯ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়।[৩০] 'আল-মামলূকুশ শারিদ' উপন্যাসে মামলূকদের প্রতি তুর্কী ও মুহাম্মদ আলী পাশার নির্যাতনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। ব্যাপক প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি লাভের কারণে তাঁর উপন্যাসগুলো ফ্রান্স, জার্মান, ফার্সী, তুর্কী, হিন্দী, সিরীয় ও রুশীয়সহ অন্যান্য বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তরিত হয়। জন. এ. হেইউড বলেন,

His historical romances were papular, and many have been frequently reprinted. Several have been translated in french, german and into other oriental language.[31]

জুরজী যায়দান সম্পর্কে বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের দৃষ্টিভঙ্গি

গবেষক, চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও জ্ঞান বিদগ্ধ পণ্ডিত সমাজ তাঁর সম্পর্কে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরণের মন্তব্য পোষণ করেছেন। একদল আরবি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর বিরল অবদানে বিমুগ্ধ হয়ে ভূয়সী প্রশংসায় মেতে উঠেন। অন্যদল জুরজী যায়দান ঈসায়ী ধর্মাবলম্বী হয়েও ইসলামের ইতিহাস, তাহযীব ও তমুদ্দুনকে উপজীব্য করে লেখালেখির পেছনে ষড়যন্ত্রের গন্ধ অন্বেষণ করে তাঁর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করেন। নিম্নে পক্ষদ্বয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অভিমত উপস্থাপন করা হলো:

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারীদের অভিমত

১. আব্দুল মুহসিন ত্বাহা বদর তাঁর تطور الرواية العربية الحديثة في مصر গ্রন্থে বলেন,

" وقد حاول جرجي زيدان في ميدان الرواية ما حاوله مطران في ميدان الشعر."

"উপন্যাস অঙ্গনে জুরজী যায়দান সেই ভূমিকা পালন করেছেন, যে ভূমিকা মুতরান কবিতাঙ্গনে পালন করেছিলেন।"[৩২]

২. ড. মুস্তফা হাদারাহ জুরজী যায়দান বিরচিত 'আল-আসীর' উপন্যাসের ভূমিকায় বলেন,

"إن جرجي زيدان كان متعدد المواهب، وباحث أصيل في التاريخ والأدب، ولكنه يتميز بكتابة الرواية التاريخية بحيث يتسنم مكانة الريادة فيها في تاريخ الأدب العربي الحديث."

"নিশ্চয় জুরজী যায়দান বহুমাতৃক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ইতিহাস ও সাহিত্যের একজন মৌলিক গবেষক ছিলেন। কিন্তু তিনি ইতিহাস নির্ভর উপন্যাস রচনা করে আধুনিক আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে অগ্রদূতের স্থান দখল করেছেন।"[৩৩]

৩. মুহাম্মদ আব্দুল গনী হাসান জুরজী যায়দান সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন,

"واستخلص من ذلك كتبا ممتعا في آدابها، تشهد له بسعة الإطلاع، وأصالة الرأي، والبراعة في التبويب والتنسيق، فكان لهذه الكتب شأن كبير شرقا وغربا."

"আমি তাঁর কিছু উপভোগ্য বই গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করেছি। যা তাঁর ব্যাপক লেখাপড়া, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অধ্যায় ও ধারা বিন্যাসে দক্ষতার সাক্ষ্য প্রদান করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর বিরল সম্মান রয়েছে।"[৩৪]

নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণদের অভিমত

একজন খ্রীষ্টান হয়েও জুরজী যায়দান ইসলামকে ভালবেসে ইসলামি তাহজিব তমদ্দুন নিয়ে তাঁর লেখনি শক্তি প্রয়োগ করেননি, বরং ইসলামের প্রকৃত রূপ ও সৌন্দর্যকে বিকৃতি করার মানসিকতা নিয়েই কলম চালিয়েছেন তিনি। তাঁর উপন্যাসগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে শওকী আবূ খলীল তাঁর রচিত 'জুরজী যায়দান ফিল মী'যান' গ্রন্থে চমৎকার বিবরণ পেশ করেছেন।

আর তাতে মনে হয় আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চার আড়ালে জুরজী মূলত একজন ইসলাম বিদ্বেষী। পাশ্চাত্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে অতি সুচতুরতার সঙ্গে ইসলামের উপর তিনি চরম আঘাত হেনেছেন। উপন্যাসে নায়ক নায়িকার সংলাপের মধ্য দিয়ে মূলত লেখকের ধ্যান ধারণা ও মন মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠে। বিভিন্ন উপন্যাসে তাঁর সৃষ্ট কিছু সংলাপ উপস্থাপন করা হলো, যাতে বুঝা যায় তিনি একজন ইসলাম বিদ্বেষী।

আসীরুল মুতামাহদী উপন্যাসের সংলাপে বলেছেন,

"يا للعجب منك يا صاح ! كيف تكون شابا زكيا عاقلا تعيش في عصر التمدن، ثم لا ترتاح للتكلم باللغة الفرنسية؟ إن جميع المواطنين المتمدنين لا يتكلمون إلا بها الآن، وقد أهملوا اللغة العربية لتعقدها وصعوبة التلفظ بها، فلا يتكلم بها الآن إلا البسطاء الذين لم يتثقفوا"

“হে সাহ! তা‘জ্জব ব্যাপর! সভ্যতার এই যুগে বসবাসকারী একজন ধীমান যুবক কি ভাবে হতে পারো অথচ ফরাসী ভাষায় কথা বলে শান্তি পাচ্ছো না? নিশ্চয় সকল সভ্য নাগরিক ঐ ভাষাতে কথা বলে। আর উচ্চারণগত জটিলতার কারণে তারা তো আরবি ভাষা বলাই ছেড়ে দিয়েছে। বর্তমানে তো ঐ ভাষাতে বড়ো কর্ণধারী অসভ্য লোকেরাই কথা বলে থাকে।”[৩৫]

এখানে তিনি আরবি ভাষার উপর ফরাসী ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে তার শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা দিয়েছেন। আরব জাতিকে অসভ্য জাতি হিসেবে চিত্রিত করার অপ প্রয়াস চালিয়েছেন। যা তাঁর বিকৃত ও নিকৃষ্ট রুচিবোধের পরিচয় বহন করে।

‘আরুসু ফারগানাহ’ উপন্যাসে বলেন,

"والعربي بمنزلة الكلب، اطرح له كسرة واضرب رأسه."

“আরবরা কুকুরের মতো, তার জন্য এক টুকরা গোস্ত ছুঁড়ে মারো এবং তার মাথায় আঘাত কর।”[৩৬]

তাঁর প্রায় উপন্যাসে এরকম আরো অসংখ্য আপত্তিকর কটুক্তি পাওয়া যায়, যাতে প্রমানিত হয় তিনি একজন ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী। এতদ্ব্যতীত তিনি সাহাবীদের বিভিন্ন উক্তির মধ্যে বিকৃতি ঘটিয়েছেন। মুসলিম খলিফা ও মহৎ ব্যক্তিদের চরিত্রে কালিমা লেপন করেছেন।

সুরুর নায়েফ যায়নুল ‘আবেদীন বলেন,

"لا أعرف أحدا من الصليبيين فى دنيا العرب عمل على تلويث تاريخنا الإسلامى كما فعل جرجي زيدان. لقد أمضي سني عمره يكتب، وكان ممزقا كذابا في معظم ما حشده من أخبار وتعليقات في كتبه، وكان مهمته في هذه الحياة تلخيص أقوال الباطنين الحاقدين والمستشرقين الماكرين، وإخراجها باسم تاريخ التمدن الإسلامى، وأخرى باسم روايات الإسلام".

“আরব দুনিয়ায় খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে জুরজী যায়দানের মতো আর কেউ আমাদের ইসলামি ইতিহাসকে কলুষিত করেনি। তিনি তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের তথ্য ও টীকা সংযোজনের ক্ষেত্রে ডাহা মিথ্যাবাদী ছিলেন। ষড়যন্ত্রকারী প্রাচ্যবীদ ও মিথ্যাবাদীদের উদ্ধৃতিগুলোকে ইসলামের বর্ণনা এবং ইসলামি তাহজিব তমদ্দুনের নামে চালিয়ে দেয়াই ছিল তাঁর মূল কাজ।”[৩৭]

উপসংহার

জুরজী যায়দান আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জন্য অবদান রাখলেও তাঁর লিখিত গ্রন্থ ও উপন্যাসসমূহের পর্যালোচনায় তাঁর আসল রূপ উদঘাটিত হয়। খ্রীষ্টান ধর্মের অনুসারী হয়েও তিনি ইসলাম প্রীতির জন্য মূলত ইসলামি কৃষ্টি, কালচার ও সভ্যতাকে স্বীয় রচনার উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেননি। প্রকৃতার্থে বৈরুত থেকে মিসরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলে তিনি ইসলামি সংস্কৃতি ও সভ্যতার নিকটবর্তী হন। তৎকালীন

সাহিত্য সমাজে নিজের অবস্থানকে সুসংহত করার লক্ষ্যে তিনি ইসলামি বিষয়বস্তুসমূহকে উপলক্ষ বানিয়েছিলেন। ফলে অতি অল্প সময়ে খ্রীষ্টান হয়েও মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হন। আর এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তিনি ইসলামি তাহজিব ও তমদ্দুনের বিকৃতি করে হীনস্বার্থ চরিতার্থ করেছেন। আর এ ক্ষেত্রে তিনি ষড়যন্ত্রকারী প্রাচ্যবিদদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সুযোগ বুঝে ইসলামের মর্মমূলে কুঠারাঘাত করে মুসলমানদের নিকট নিন্দিত হয়েছেন। অনেক জ্ঞানবিদগ্ধ মুসলিম পণ্ডিত সমাজ তাঁর মুখোশ উন্মোচনে পরিশ্রম করে গবেষণালব্ধ বই লিখে মুসলমানদেরকে সজাগ করেছেন। তাঁরা গবেষণা করে প্রমান করেছেন, বাহ্যত ইসলামের খোলস পরিধান করলেও মূলত ইসলামের উপর আঘাত করাই ছিল তার মূল লক্ষ্য। এতদসত্বেও তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে আরবি ভাষা ও সাহিত্যাঙ্গনে এক অনন্য উচ্চতায় উপনীত হয়েছেন।

তথ্যনির্দেশ

১. আল-মাকদিসী, আনীস, *আল-ফুনূনুল আদাবিয়্যাহ ওয়া আ'লমুহা* (বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালায়িন, ১৯৮৪), পৃ. ৫১৬।
২. আহমাদ আল-ইসকান্দারী, *আ-মুফাসসাল ফী তারীখিল আদাবিল আরাবী* (বৈরুত : দারু ইহইয়াইল উলূম, ১৯৯৪), পৃ. ৬১৯।
৩. শাওকী আবু খলীল, *জুরজী যায়দান ফিল মীযান* (বৈরুত : দারুল ফিকার, ১৯৮১), পৃ. ১৫।
৪. J.A. Haywood, *Modern Arabic Literature* (London : Lund Hamphiries, 1971), P.133.
৫. শাওকী আবূ খলীল, *জুরজী যায়দান ফিল মীযান*, প্রগুক্ত, পৃ. ১৫
৬. জুরজী যায়দান, *তারীখূ আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ*, খ. ৪, পৃ. ৬৪৫; ইউসুফ কাওকান, খ. ১, পৃ. ২১৫; হান্না আল-ফাখুরী, পৃ. ১৯১।
৭. শাওকী আবূ খলীল, *জুরজী যায়দান ফিল মীযান*, প্রগুক্ত, পৃ. ১৫।
৮. *The Encyclopedia of Islam*, (London: Luzac and Co.1965), V.1, P.1195.
৯. নযীর আবূদ, *জুরজী যায়দান : হায়াতুহু ওয়া আমালুহু মা কীলা ফীহী* (বৈরুত : দারুল জীল, ১৪০৩ হি), পৃ. ৯৫।
১০. ১৮৮২ মিশরের কর্নেল ইরাবী পাশার নেতৃত্বে খাদীভ তাওফীক পাশা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর বিদ্রোহকে আস-সাওরাতুল আরবিয়্যাহ বলা হয়। খাদীব ইংরেজদের সহায়তায় কঠোর হস্তে এ বিদ্রোহকে দমন করেন।
১১. আল-ফাখুরী, হান্না, *আল-আদাবুল হাদীস* (বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৯৫), পৃ. ১৯১।
১২. ওমার আদ-দাসূকী, *ফিল আদবিল হাদীস* (বৈরুত : দারুল কিতাবিল 'আরবি, ১৯৬৬), খ. ১, পৃ. ৪৯২।
১৩. শওকী আবূ খলীল, *জুরজী যায়দান ফিল মী'যান* (প্রাগুক্ত), পৃ. ১৬।
১৪. ১৮৭৬ সালে ইয়াকুব সাররুফ ও ফারুক নামির কর্তৃক মিসর থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। ১৮৮৮ সাল থেকে পূর্ণাঙ্গরূপে জুরজী যায়দানের সম্পাদনায় নতুন আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়।
১৫. কাওকান, ইউসুফ, *আ'লামুন নাসর ওয়শ শি'র ফিল 'আসরিল আরাবিয়্যিল হাদীস* (মাদ্রাজ : দারু হাফিয়া, ১৯৮০), খ. ১ম, পৃ. ২১৭।
১৬. শওকী আবূ খলীল, *জুরজী যায়দান ফিল মী'যান*, (প্রাগুক্ত) পৃ. ১৬।
১৭. কাওকান, ইউসুফ, *আ'লামুন নাসর ওয়শ শি'র ফিল 'আসরিল আরাবিয়্যিল হাদীস* (প্রাগুক্ত), খ. ১, পৃ. ২১৭।
১৮. ওমার আদ-দাসূকী, *ফিল আদাবিল হাদীস* (বৈরুত : দারুল কিতাবিল 'আরবি, ১৯৬৬) খ. ১, পৃ. ৪৯৩।
১৯. মুহাম্মদ আল-আমীন পাশা বাঈ কিংবা মুহাম্মদ আল-আমীন বাঈ, কিংবা আল-আমীন বাঈ ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯৬২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন। তিউনিসিয়ান সর্বশেষ বাঈ। উল্লেখ্য বাঈ শব্দটি মূলত তুর্কি ভাষার অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ সায়্যিদ বা আমীর বা সম্রাট। তিউনিসীয় সম্রাটদের বাঈ বলা হতো।
২০. তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রীয় পদক। ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট মুস্তফা বাঈ কর্তৃক প্রবর্তিত সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার।
২১. জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ* (বৈরুত : মানশুরাতু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৮৩), পৃ. ৩৩-৩৪।
২২. শাওকী আবূ খলীল, *জুরজী যায়দান ফিল মী'যান* (প্রাগুক্ত), পৃ. ১৭।
২৩. জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ* (প্রাগুক্ত), পৃ. ৩৩-৩৪।
২৪. হান্না আল-ফাখুরী, *আল-আদাবুল হাদীস*, পৃ. ১৯২।
২৫. *Encyclopedia of Islam*, p.1195.
২৬. Ibid.

২৭. শওকী আবূ খলীল, *জুরজী যায়দান ফিল মী'যান* (প্রাগুক্ত), পৃ. ২১।
২৮. ওমার আদ-দাসূকী, *ফিল আদবিল হাদীস* (প্রাগুক্ত), খ. ১, পৃ. ৪৯৪।
২৯ . শওকী আবূ খলীল, *জুরজী যায়দান ফিল মী'যান* (প্রাগুক্ত), পৃ. ২৫।
৩০. জুরজী যায়দান, *ফাতহুল আন্দুলুস* (কায়রো : দারুল হিলাল, ১৯০৯), ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
৩১. J.A. Haywood, *Modern Arabic Literature,* (London : Lund Hamphiries, 1971), P.134.
৩২. আব্দুল মুহসিন ত্বা হা বদর, *তাতোওউরুর রিওয়াতিল 'আরবিয়্যাতিল হাদীসা ফী মিসর* (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ১৯৩৮), পৃ. ৯৪।
৩৩. জুরজী যায়দান, *আল-আসীর* (কায়রো : দারুল হিলাল, ১৯৮৫), ড. মুহাম্মদ মুস্তফা হাদারাহ লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
৩৪. মুহাম্মদ আব্দুল গনী হাসান, *জুরজী যায়দান* (কায়রো : আল-হাইইয়্যাতুল মিসরিয়্যাতু লিততালীফে ওয়ান নশর, ১৯৭০), পৃ. ৯৫।
৩৫. শাওকী আবূ খলীল, *জুরজী যায়দান ফিল মী'যান* (প্রাগুক্ত), পৃ. ২৮২।
৩৬. শাওকী আবূ খলীল, *জুরজী যায়দান ফিল মী'যান* (প্রাগুক্ত), পৃ. ৭।
৩৭. মুহাম্মদ সুরুর বিন নায়েফ যয়নুল 'আবেদীন, *দিরাসাতুন ফিস-সীরাতিন নুবুবিয়্যাহ* (দামেস্ক : দারুল আরকাম লিন নাশরে ওয়াত তাওযী' ১৯৮৬), পৃ. ১৯৩।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

হাফিজ ইব্রাহীমের কবিতায় জাতীয় জাগরণ
(National Awakening in The Poetry of Hafiz Ibrahim)

ড. মুহা. উবায়দুল্লাহ[*]

Abstract: Hafiz Ibrahim is one of the most famous pioneers of modern Arabic literature, which has been enriched by the extraordinary genius and talent of the said poet. He is mostly famous as the poet of the Nile in Arabic literature. He is also considered one of the pioneers in the national awakening of Egypt. Hafiz Ibrahim is one of the Egyptian poets who made an effective contribution to energizing oppressed countrymen with the spirit of freedom through their writings. He employed his poetic power in the service of the nation, social reform, and the welfare of distressed humanity. As a result, the people of Egypt accepted him as the national poet. He also played a leading role in introducing a new poetic style in the Arabic language. A strange similarity is observed between poet Hafiz, the son of a middle-class family in Egypt, and poet Kazi Nazrul Islam of Bengal. The article discusses the national awakening in the poetry of Hafiz Ibrahim.

Key words: Hafiz Ibrahim, Diwan, Literary Works, National Awakening, Analysis.

ভুমিকা

আধুনিক আরবী কাব্যসাহিত্য যে ক'জন কবি-সাহিত্যিকের একনিষ্ঠ সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃতফল স্বরুপ আরবী কাব্যসাহিত্য আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বের গৌরবময় মহাসনে সমাসীন কবি হাফিজ ইব্রাহীম তাঁদের অন্যতম। তিনি আরবী কাব্যসাহিত্যে নীলনদের কবি নামে সমধিক খ্যাত। তাকে মিসরের জাতীয় জাগরণের অন্যতম কবি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মিসরের যেসব কবি-সাহিত্যিক তাদের রচনার মাধ্যমে পরাধীন দেশবাসীকে স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত করতে কার্যকর অবদান রেখেছিলেন, হাফিজ ইব্রাহীম তাদের অন্যতম। তিনি তার কবিত্ব শক্তিকে নিয়োজিত করেন জাতির সেবায়, সমাজ সংস্কারে ও দুস্থ মানবতার কল্যাণে। ফলশ্রুতিতে মিসরের জনতা তাকে জাতীয় কবির মর্যাদায় বরণ করে নেন। আরবী ভাষায় নতুন কাব্যরীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রেও তার অগ্রণী ভূমিকা ছিল। মিশরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান কবি হাফিজের সঙ্গে বাংলার কবি কাজী নজরুল ইসলামের অদ্ভূত মিল পরিলক্ষিত হয়।

হাফিজ ইব্রাহীমের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিক্রমা

জন্ম ও বংশ পরিচয়

হাফিয ইব্র্যাহীম ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ৪ ফেব্রুয়ারী মিসরের 'আসইউথ' (أسيوط) প্রদেশের দায়রুত নামক শহরের সন্নিকটে নীলনদে নোঙ্গরকৃত একটি ভাসমান নৌকায় গরীব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে বিভিন্ন মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। আহমদ হাসান আয-যাইয়াত এর মতে তিনি ১৮৭০ খ্রী. জন্মগ্রহণ করেন।[২] বিখ্যাত ঐতিহাসিক হান্না আল ফাখুরী হাফিযের জন্ম সন ১৮৭১ খ্রী. বলে উল্লেখ করেন।[৩] তবে তিনি যে ১৮৬৯ হতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন একথা অনস্বীকার্য।[৪] তাঁর পিতার নাম ইব্রাহীম আফিন্দী ফাহমী। তিনি একজন মিশরীয়

[*] প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

প্রকৌশলী ছিলেন। মাতার নাম ছিল আস সিত্তু হানিম কারীমা। তাঁর পিতা ছিলেন মিশরীয় আর মাতা ছিলেন তুর্কী বংশোদ্ভূত।[৫] হাফিয ইবরাহীমের জন্ম তারিখ সঠিকভাবে জানা যায় নি। এমনকি তিনি নিজেও বলতে পারেননি। তবে ১৯১১ সনের ৪ ফেব্রুয়ারী কায়রোর পাবলিক লাইব্রেরী 'দারুল কুতুব আল-মিস্‌রিয়্যা-য় চাকরিতে নিয়োগকালে মেডিকেল কমিশন অনুমান করে তাঁর বয়স উনচল্লিশ বছর নথিভুক্ত করে। সে অনুযায়ী তাঁর জন্ম তারিখ ১৮৭২ খ্রী. ৪ ফেব্রুয়ারী বলে প্রচলিত আছে।[৬]

কবির নাম ও উপাধি

মিসরের জাতীয় কবি হাফিজ ইব্রাহীমের প্রকৃত নাম মুহাম্মদ।[৭] তবে তিনি সাহিত্যাঙ্গনে হাফিজ ইব্রাহীম নামেই সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। অসংখ্য আরবী কবিতা তার কণ্ঠস্থ থাকায় সর্বসাধারণের মাঝে তিনি হাফিজ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[৮] তার এ প্রসিদ্ধির কারণে নীলনদের অধিবাসীরা তাকে 'শা'ইরুন নীল' উপাধিতে ভূষিত করে। আর তাঁর আখিযুগলও ছিলো নীলনদের পানির ন্যায় বাদামী।[৯]

শৈশবকাল ও শিক্ষা

হাফিযের শৈশবকাল পিতা মাতার আদর যত্নে-সুখেই কাটছিল। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস তাঁর বয়স যখন মাত্র দু' বছর তখন তিনি পিতৃহারা হন। অতঃপর মমতাময়ী মাতা তাঁকে লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্য কায়রোতে মামার নিকট পাঠিয়ে দেন। মামা মুহাম্মদ আফিন্দী নিয়াযী হাফিযের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁকে কায়রোর আল-মাদরাসাতুল খায়রিয়্যা নামক এক মকতবে ভর্তি করে দেন। অতঃপর একের পর এক তিনি আল-মাদরাসাতুল-কিবরিয়্যা (একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়), মাদরাসাতুল মুবতাদিয়ান ও আল-মাদরাসাতুল খিদীবিয়্যাতে ভর্তি হন।[১০] তবে স্বাধীনচেতা বালক হাফিয কোথাও স্থিরভাবে নিয়মতান্ত্রিক লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতে পারলেন না। ১৮৮৭ খ্রী. হাফিযের মামা তানতায় বদলী হলে এ অসহায় বালককে সঙ্গে করে নিয়ে যান। এখানে লেখাপড়ার প্রতি তাঁর আগ্রহ কিছুটা কমে যায়। নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ ও হতাশাকে সম্বল করে তিনি আপন দুঃখ-দৈন্যের মাধুরী দিয়ে কবিতা লিখতেন।[১১] এমনিভাবে তিনি দারিদ্র্য ও পিতৃহীনতার মনোবেদনা ভুলে থাকার চেষ্টা করেন। কবির এ ভবঘুরে অবস্থা দর্শনে মামা কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েন। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে অনাথ বালক হাফিযের অন্তরে পিতৃহীনতার অনুভূতি প্রকট হতে থাকে এবং জীবন সম্পর্কে তাঁর মনে দারুণ হতাশা দানা বাঁধে। অনেক চেষ্টা করেও মামা হাফিযের মন হতে হতাশা ও নৈরাশ্য দূর করে তাঁর মনে আশার আলো জ্বালাতে পারেননি। তানতায় অবস্থানকালে লেখাপড়া ও কাজকর্মে উদাসীন হাফিযের মনে কাব্যচর্চার প্রতি কিছুটা ঝোঁক সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া সাহিত্য বিষয়ক বই পুস্তক অধ্যয়নের প্রতিও তিনি মনোনিবেশ করেন। আবার মাঝে মধ্যে তানতায় 'আল-জামিউল আহমাদী' (বা আল মা'হাদুল আহমাদী) নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকমণ্ডলীর মূল্যবান বক্তৃতা তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। তীক্ষ্ণ স্মৃতি শক্তির অধিকারী হাফিয পূর্ববর্তী কবিদের বিশেষত আব্বাসীয় যুগের কবিদের অনেক কবিতা মুখস্ত করেন এবং সভা-সমাবেশ ও বন্ধুবান্ধবদের আড্ডায় নানা প্রসঙ্গে এসব কবিতার উদ্ধৃতি পেশ করে তানতায় সুধী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেন।[১২] ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে হাফিয তানতায় ছেড়ে একটি সামরিক কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য কায়রো চলে যান। সে সময়ে সামরিক কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য কোন বিশেষ সার্টিফিকেট কিংবা নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন হত না। কেবল মেডিক্যাল ফিটনেস ও বার্ষিক পনের পাউন্ড ব্যয় নির্বাহ করার সামর্থ্য থাকলেই চলত। সুঠাম দেহ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হাফিয অনায়াসে এই কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ লাভ করেন এবং তিন বৎসরের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের পর উর্দি (সেনা পোশাক) পরিহিত সৈনিক হাফিয মাসিক বেতন-ভাতার নিশ্চয়তা নিয়ে সামরিক কলেজ হতে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন।[১৩]

কর্মজীবন

হাফিয স্বাধীন ওকালতি পেশার কথা ভেবে বিভিন্ন আইনজীবিদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আর বাধ্য হয়ে তানতায় কয়েকজন আইনজীবির অধীনে তাদের দফতরে কিছুদিন চাকুরি করেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মমতায় তিনি কোথাও খাপ খাওয়াতে পারেননি। বারবার কর্মস্থল পরিবর্তন করেও আইনজীবির পেশাকে হাফিয আপন করতে পারলেন না। অগত্যা বিশিষ্ট এডভোকেট শাইখ মুহাম্মদ আশ-শীমীর সাথে মতানৈক্য সৃষ্টি হলে তাকে পরিত্যাগ করে সেখান হতে বের হয়ে আসেন। অতঃপর তিনি এক সামরিক স্কুল হতে শিক্ষা সমাপন করে ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯১ খ্রী. সেকেন্ড লেফটেনেন্ট পদে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাকুরীতে যোগদান করেন। ১ অক্টোবর, ১৮৯৩ লেফটেনেন্ট হিসেবে তাঁর পদোন্নতি হয়। অতঃপর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন পুলিশ বাহিনীতে বদলি হয়ে প্রথমে 'বানী সুওওয়াফ' পুলিশ স্টেশনের পুলিশ সুপার হিসেবে ৭-০৫-১৮৯৪ থেকে ২৩-০৩-১৮৯৫ পর্যন্ত এবং পরে 'আল-ইবরাহীমিয়্যা' পুলিশ স্টেশনের প্রধান পুলিশ অফিসার হিসেবে ২৪-০৩-১৮৯৫ হতে ১৫-১০-১৮৯৫ পর্যন্ত কাজ করেন। তারপর আবার সেনাবাহিনীতে ফিরে আসেন।[১৪]

লেফটেনেন্টরূপে সুদানে গমন

মিসর যখন লর্ড কান্চানের (Lord Kitchener) নেতৃত্বে ১৮৯৬ খ্রী. সুদানের উপর হামলা চালায় তখন তাকে তথায় লেফটেনেন্টরূপে পাঠান হয়। এ উপলক্ষে দীর্ঘদিন তাঁকে পূর্ব সুদানে স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবস্থান করতে হয়। মিসরে ফিরে আসার জন্য তিনি উদগ্রীব হয়ে উঠেন ও অনেক চেষ্টা করে ফিরে আসতে ব্যর্থ হন। অবশেষে ১৮৯৯ খ্রী. একদল সেনাবাহিনী নিয়ে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। হাফিযসহ মোট ১৮ জন বিদ্রোহীর সামরিক আদালতে বিচার করা হয়। বিচারের রায় অনুসারে হাফিযকে ৩ মে, ১৯০০ খ্রী. সেনাবাহিনী হতে অবসর দেয়া হয় এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১ নভেম্বর, ১৯০৩ খ্রী. হতে তাঁর জন্য পেনশনের ব্যবস্থা করা হয়। এই পেনশনের পরিমাণ ছিল মাসে চার পাউন্ড মাত্র।[১৫]

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাহচর্যে কবি হাফিয

সেনাবাহিনী হতে অবসর গ্রহণের পর কবির এবারের জীবন ছিল ছন্নছাড়া জীবন। তিনি এক মজলিস থেকে অন্য মজলিস, এক হোটেল হতে অন্য হোটেলে বেড়াতে থাকেন। দিনে এক কফিখানা হতে অন্য কফিখানায় এবং রাতে এক আসর হতে অন্য আসরের আড্ডা জমানো ব্যতীত তাঁর তেমন কিছুই করণীয় ছিল না। প্রয়োজনের তুলনায় পেনশন অতি নগণ্য হওয়ায় তিনি একটি কাজ খুঁজতে থাকেন। এ পর্যায়ে কবি আহমদ শাওকী তাঁকে দৈনিক 'আল আহরাম' পত্রিকায় একটি কাজ দেয়ার জন্য সুপারিশ করেও কোন ফল হয়নি। এ সময় তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারক মুফতী মুহাম্মদ আবদুহুর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান। আবদুহুর নিকট তিনি রাজনীতি ও সমাজ সেবায় দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর সাথে হৃদ্যতার সুত্রপাত হয় একটি কাসিদার মাধ্যমে। ১৮৯৯ খ্রী. আবদুহু যখন মিসরের প্রধান মুফতী পদে অধিষ্ঠিত তখন তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে হাফিয একটি অভিবাদনমূলক কাসিদা রচনা করে তার সমীপে পেশ করেন। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে গড়ে উঠে সৌহার্দমূলক সম্পর্ক। আবদুহুর ইন্তিকালে (১৯০৫) হাফিয একটি দীর্ঘ মার্সিয়া রচনা করেছিলেন।[১৬] এ সময়ে মিসরের আরও কতিপয় শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে হাফিযের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এঁদের মধ্যে সা'দ যগ্লুল পাশা (১৮৫৮-১৯২৭), মুস্তফা কামিল (১৮৭৪-১৯০৮) ও কাসিম আমীন (১৮৬৩-১৯০৮) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৭] রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রভাবে হাফিযের মধ্যে গভীর দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়, যার ফলে তিনি জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত হন। আর্থিক অভাব অনটনগ্রস্ত হাফিয তৎকালীন মিসরের শিক্ষামন্ত্রী আহমদ হাশমত পাশার শরণাপন্ন হন। হাফিযের দুরবস্থা দেখে মহানুভব ও সাহিত্যানুরাগী

শিক্ষামন্ত্রীর মনে দয়ার উদ্রেক হয়। শিক্ষামন্ত্রীর সুপারিশে ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯১১ খ্রী. হাফিযকে কায়রোর দারুল কুতুব (তৎকালীন খিদীব গ্রন্থাগার)-এ মাসিক ত্রিশ পাউন্ড বেতনে একটি চাকুরী দেয়া হয়। ১৪ মার্চ, ১৯১১ খ্রী. তিনি উক্ত গ্রন্থাগারের সাহিত্য বিভাগের ডিরেক্টররূপে নিয়োগ লাভ করেন। ১ এপ্রিল, ১৯১২ খ্রী. এক সরকারী আদেশে তার এই চাকুরী স্থায়ী করা হয়। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি দারুল কুতুব এর এই চাকুরীতে বহাল ছিলেন। বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধির ফলে এই চাকুরিতে তাঁর সর্বশেষ বেতন দাঁড়িয়েছিল আশি পাউন্ড। অবশেষে ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২ খ্রী. তিনি চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করেন।[১৮] হাফিয মোট ৩৫ বছর ৪ মাস ২৯ দিন সরকারী চাকুরী করেন। এর মধ্যে প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে ১৪ বৎসর ৬ মাস ৮ দিন এবং দারুল কুতুব-এ ২০ বৎসর ১০ মাস ২১ দিন।[১৯]

বৈবাহিক অবস্থা

দাম্পত্য জীবনে তিনি সুখের মুখ দেখতে পাননি। যদিও তিনি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মায়ের ইচ্ছানুসারে ইসমাঈল সাবরী নামক এক ধনীর দুলালী হাওওয়ার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু এই বিবাহ স্থায়ী হয়নি। অল্প কয়েক মাস পরেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর তিনি জীবনে আর কখনও বিবাহের চিন্তা করেননি। হাফিযের জীবনে তাঁর এই কয়েক মাসের জীবনসঙ্গিনীর কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। হাফিযের মা ১৯০৯ সনে ইন্তিকাল করেন। কিছু দিন পর মামা নিয়াযীরও মৃত্যু হয়। ফলে একমাত্র বিধবা ও নিঃসন্তান মামী 'আইশা হানী ব্যতীত আপন বলতে হাফিযের আর কেউ রইল না। এই মামীর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তিনি আমরণ তাঁর পরিবারে থেকে যান। হাফিযের মৃত্যুর মাত্র তিন বৎসর পূর্বে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।[২০]

ইন্তিকাল

আধুনিক আরবী সাহিত্যের উজ্জল নক্ষত্র সহস্র ভক্ত রেখে ৬০ বৎসর বয়সে, ১৯৩২ সালের ২১ জুলাই বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটায় কায়রোর উপকণ্ঠে 'আয-যাইতূন' এলাকার একটি ক্ষুদ্র কুটিরে কবি হাফিয ইব্রাহীম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[২১]

হাফিয ইব্রাহীমের সাহিত্যকর্ম

হাফিয ইব্রাহীম আধুনিক যুগের অন্যতম প্রধান কবি ছিলেন। আধুনিক আরবী সাহিত্যে তাঁর অবদান অপরিসীম। জাহিলী যুগের আরবী কবিতা নিয়ে আলোচনা করলে যেমন ইমরুল কায়েসের নাম সর্বাগ্রে চলে আসে, তেমনি আধুনিক যুগের আরবী কবিতাসমূহ পর্যালোচনা করলে হাফিয ইব্রাহীমের নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। কারণ হাফিযের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তিনি মূলত কবি হওয়া সত্ত্বেও গদ্য সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। বিশেষ করে ফরাসী ভাষা হতে মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য অনেক গ্রন্থের সার্থক অনুবাদ করে আরবী গদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। হাফিযের সারা জীবনের রচিত কবিতার এক বিরাট অংশ কালের গ্রাসে বিলীন হয়ে গেছে। আর সংগৃহীত কবিতাগুলো তাঁর দিওয়ানে (কবিতা সংকলনে) সন্নিবেশিত হয়েছে।

রচনাবলী

দীওয়ান (কাব্য সংকলন), লায়ালী সাতীহ, আল-বুআসা, আল-কুতাইয়িব ফিত-তারবিয়াতিল আউওয়ালিয়্যা (প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক পুস্তিকা), আল মুজায ফী ইল্‌মিল ইকতিসাদ।[২২]

কবি হাফিয ইব্রাহীমের কবিতাসমূহকে নিম্নবর্ণিত অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা যায়। অধ্যায়গুলো হলোঃ প্রশংসামূলক, শোকগাঁথা, দেশাত্ববোধক, নারী সমাজের মুক্তি, সমালোচনামূলক, আরবী সাহিত্যের উন্নতির চেষ্টা, অভিযোগমূলক, কৌতুকমূলক, বর্ণনামূলক, ঐতিহাসিক বর্ণনামূলক ও একই সঙ্গে আশা ও নিরাশা

ব্যক্ত ইত্যাদি বিষয়ে কবিতা রচনা করে তিনি আধুনিক আরবী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। উপরোল্লিখিত রচনাবলী ও কবিতার অধ্যায়সমূহের মধ্যে তিনি যে সমস্ত রচনা ও কবিতাসমূহের মাধ্যমে বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে বিধৃত হলো-

দীওয়ান (কাব্য সংকলন)

কবি হাফিয ইব্রাহীম নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন না। তাই নিজের কবিতা সংরক্ষণের কথা ভাবেননি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যদি তাঁর কবিতা নিয়মিতভাবে প্রকাশ না করত, তাহলে খুব সামান্য পরিমাণই রক্ষা পেত। হাফিয তাঁর জীবদ্দশায় বন্ধু-বান্ধবের নিকট সংরক্ষিত কিঞ্চিত পরিমাণ কবিতা সংগ্রহ করে ছোট ছোট তিনটি খণ্ডে উহা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এর প্রথম খণ্ড ১৩১৯ হিজরিতে মুহাম্মদ ইব্রাহীম হিলাল বেক এর মূল্যবান টীকা-টিপ্পনীসহ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৩২৫ হি./১৯০৭ খ্রী. ও ১৩২৯ হি./১৯১১ খ্রী. প্রকাশিত হয়।[২৩] হাফিযের পরবর্তী সময়ে রচিত কবিতা তাঁর জীবদ্দশায় সংগৃহীত হয়নি। অতঃপর ১৩৫৩ হি. কায়রোস্থ আল-হিলাল লাইব্রেরী হাফিযের জীবদ্দশায় প্রকাশিত তিন খণ্ড ও সায়্যিদ আহমদ উবায়দ কর্তৃক 'যিকরাশ-শাইরায়ন' গ্রন্থে প্রকাশিত হাফিযের কবিতা একত্র করে এ কবির প্রথম দীওয়ান প্রকাশ করে।[২৪] তবে এই দীওয়ানে হাফিযের জীবনের বিশাল কাব্য সম্ভারের তুলনায় সামান্য পরিমাণ কবিতা স্থান পায়। এ কারণে পূর্ণাঙ্গ কাব্য-সংকলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দেশ ও জাতির স্বার্থে মিসরের জাতীয় চেতনাবোধ সমুন্নতকারী হাফিযের কবিতার বৃহত্তর সংকলন শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন মিসরের শিক্ষামন্ত্রী আলী যাকী আল উরাবী পাশা। তিনি প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক ড. আহমদ আমীনকে প্রধান সমন্বয়কারী করে এ কাজের দায়িত্ব দেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন তাঁর দুই সহকর্মী প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ আহমদ আয-যায়ন ও ইব্রাহীম আল-আবয়ারী। ইতিপূর্বে প্রকাশিত সংকলনের অতিরিক্ত আরো কবিতা সংগ্রহের জন্য ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হলো। হাফিযের কবিতা পত্র-পত্রিকায় যখন থেকে প্রকাশিত হওয়া শুরু হয় তখন থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীর বিভিন্ন সংখ্যা খুঁজে কবিতা সংগ্রহের কাজ চলল। পত্রিকার মাধ্যমে অনুরোধ করা হলো যে, কারো নিকট হাফিযের কোন কবিতা কিংবা তার সন্ধান থাকলে তা উদ্যোক্তাদের নিকট পাঠিয়ে দেন অথবা তাদেরকে অবহিত করেন।[২৫] এভাবে যখন কবিতার বিপুল সম্ভার সংগৃহীত হলো তখন ড. আহমদ আমীন ও তাঁর সহকর্মীদ্বয় প্রথমে তা বিষয়ভিত্তিকভাবে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত করলেন। অতঃপর প্রত্যেক অধ্যায়ের অধীন কবিতাসমূহ রচনা কিংবা প্রকাশের তারিখ অনুযায়ী সময়ানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়। দীওয়ানের শেষে কবিতাসমূহের অন্ত্যমিল বর্ণ (কাফিয়া) অনুসারে একটি বর্ণনাক্রমিক সূচী সন্নিবেশিত করা হয়। কবিতার প্রসঙ্গ, রচনা কিংবা প্রকাশের তারিখ, কঠিন শব্দের শাব্দিক ও প্রয়োগিক অর্থ, সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা ইত্যাদির উল্লেখসহ প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করা হয়। বৃহত্তর ও অধিকতর পূর্ণাঙ্গ দীওয়ান ড. আহমদ আমীনের দীর্ঘ ভূমিকাসহ ১৯৩৭ খ্রী. দুই খণ্ডে কায়রোতে প্রথম মুদ্রিত হয়।[২৬]

লায়ালী সাতীহ

ইহা ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কায়রো হতে প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি নৈতিক আবেদন সংবলিত মাকামা ধরনের বর্ণনামূলক গল্প। ইহা মুহাম্মদ আল-মুওয়ায়লিহী রচিত "হাদীছ 'ঈসা ইব্ন হিশাম"-এর অনুসরণে লিখা। এতে লেখক মিসরীয় সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতি কটাক্ষ করে তাঁর নিজস্ব সংস্কারমূলক চিন্তাধারা ব্যক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেন,[২৭]

ليالي سطيح هو كتاب على اسلوب المقامات من تأليف الشاعر المصري حافظ ابراهيم الملقب بشاعر
قد جاء الكتاب في صورة نثر فني، يتخذ شكلا أقرب إلى المقامة وإنما يقتصر . النيل، نشر سنة ١٩٠
الكاتب في تقديمها على تحويلها إلي نوافذ نطل من خلالها على أفكاره. وقد وجه حافظ من خلال هذا

العمل نقدا اجتماعيًا للأخلاق والعادات السائدة، وذلك في ثنايا وصفه لحال الاجتماع في مصر إبان تلك الفترة

আল-বু'আসা

ইহা আরবী গদ্যরীতিতে হাফিযের রচনার উৎকর্ষের একটি অনন্য প্রমাণ। আল-বু'আসা ১৯০৩ খ্রী. কায়রো হতে প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর অনেক বার পুনর্মুদ্রিত হয়। এটি ফরাসি মহাকবি Victor Hugo রচিত Les Miserables হতে চয়নকৃত কয়েকটি উপাখ্যানের আরবী অনুবাদ। বঞ্চিত মানবতা তথা মিসরের অবহেলিত জনগণের করুণ কাহিনী সম্বলিত এসব উপাখ্যান ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে হাফিয অনুবাদ করেন।[২৮]

رواية للكاتب فكتور هوغو نقله حافظ إلي اللغة (Les Misérables) البؤساء أو البائسون بالفرنسية: العربية سنة ١٩٠٣م. إنه يصف وينتقد في هذا الكتاب الظلم الاجتماعي علي اهل مصر

আল-কুতাইয়িব ফিত তারবিয়াতিল আউওয়ালিয়্যা (প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক পুস্তিকা)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় হাফিয এই গ্রন্থটি ফরাসী ভাষা হতে আরবীতে অনুবাদ করেছেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে রচিত তাঁর এ অনুবাদ গ্রন্থটি কয়েক খণ্ডে ১৯৯২ খ্রী. মাতবা'আতুল-মা'আরিফ কর্তৃক প্রথম মুদ্রিত হয়।[২৯]

আল-মুজায ফী 'ইলমি'ল-ইকতিসাদ

এ অনুবাদ গ্রন্থটি ১৯১৩ খ্রী. ৫ খণ্ডে কায়রোতে প্রকাশিত হয়। এটি Paul Leroy Beaulieu কর্তৃক ফরাসী ভাষায় রচিত একটি গ্রন্থের আরবী অনুবাদ। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী আহমদ হাশমাত পাশার নির্দেশে হাফিয ও খলীল মুতরান যৌথভাবে এ অনুবাদ সম্পন্ন করেন।[৩০]

হাফিজ ইব্রাহীমের কবিতায় দেশপ্রেম

কবি হাফিয ইব্রাহীম এর কবিতায় দেশপ্রেমের যে পরিচয় পাওয়া যায় সমমাময়িক অন্যান্য কবিদের মধ্যে এর দৃষ্টান্ত মেলা ভার। তার জন্ম হয় পরাধীন মিশরে। ইংরেজ কর্তৃক এসময় মিশর পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলো। এই ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী তখন এই দেশের জনগণের বিশেষ করে মুসলমানদের সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করে তাদের কে বিপর্যযের মুখে ঠেলে দিয়েছিলো। এসময় মিশরীয় জনতা তাদের শিক্ষার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়েছিলো। বঞ্চিত ও নিপীড়িত জনতার এ দুঃখ-কষ্ট দেখে কবির হৃদয় কেদে উঠে। তিনি তার কলমের সাহায্যে অগ্নিঝরা লেখনির মাধ্যমে মিশরীয় স্বাধীনতার প্রতি উজ্জীবিত করেন। ফলশ্রুতিতে তার মিলেছে রাজদ্রোহীর তকমা। প্রতিকুল অবস্থা, নানা অন্যায়-অবিচার সত্ত্বেও তিনি ছিলেন প্রতিবাদ মুখর।[৩১] তাই কবি ইংরেজদের অন্যায়-অবিচার থেকে তার জাতিকে মুক্ত করার জন্র দেশের যুবসমাজ কে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন। তিনি তাদেরকে ত্রুটিমুক্ত, কর্মঠ, একনিষ্ঠ, ত্যাগী ও জ্ঞানের পরিচর্যাকারী হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। কারণ স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী যুবকদের এসব গুণে গুণান্বিত হওয়া অতীব জরুরী। তিনি তার জাতির উদ্দেশ্যে বলেন[৩২]-

رِجالَ الغَدِ المَأمولِ إِنّا بِحاجَةٍ * إِلى قادَةٍ تَبني وَشَعبٍ يُعَمِّرُ
رِجالَ الغَدِ المَأمولِ إِنّا بِحاجَةٍ * إِلَيكُم فَسُدّوا النَقصَ فينا وَشَمِّروا
رِجالَ الغَدِ المَأمولِ لا تَترُكوا غَداً * يَمُرُّ مُرورَ الأَمسِ وَالعَيشُ أَغبَرُ
عَلَيكُم حُقوقٌ لِلبِلادِ أَجَلُّها * تَعَهُّدُ رَوضِ العِلمِ فَالرَوضُ مُقفِرُ
فَكونوا رِجالاً عامِلينَ أَعِزَّةً * وَصونوا حِمى أَوطانِكُم وَتَحَرَّروا
فَما ضاعَ حَقٌّ لَم يَنَم عَنهُ أَهلُهُ * وَلا نالَهُ في العالَمينَ مُقَصِّرُ

১) হে আগামী দিনের আকাঙ্খিত পুরুষরা! আমরা একটি প্রতিষ্ঠাকারী নেতৃত্ব এবং গঠনক্ষম জাতির মুখাপেক্ষী।

২) হে আগামী দিনের আকাঙ্খিত পুরুষরা! আমরা তোমাদের মুখাপেক্ষী। সুতরাং তোমরা আমাদের ক্রুটি-বিচ্যুতিকে রোধ কর এবং পুর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ কর।

৩) হে আগামী দিনের আকাঙ্খিত পুরুষরা! তোমরা গতকালের ন্যায় আগামীকালের জীবনটিকে ধুলায় ধুসরিত অবস্থায় অতিক্রান্ত হতে দিও না।

৪) তোমাদের প্রতি তোমাদের দেশের বহু অধিকার রয়েছে। তন্মোধ্যে সর্বপ্রধান অধিকার হল জ্ঞানোদ্যানের পরিচর্যা করা। কেননা জ্ঞানোদ্যানটি জনশূন্য হয়ে পড়েছে।

৫) তোমরা কর্মঠ ও সম্মানিত পুরুষে পরিণত হও এবং তোমাদের মাতৃভূমির সংরক্ষিত এলাকার সার্বভৌমত্বের হিফাযত কর এবং উহাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে মুক্ত কর।

৬) যে অধিকারের অধিবাসীরা নিদ্রা যায় না (অর্থাৎ নিজেদের অধিকারের ব্যাপারে সর্বদা সচেতন থাকে) তাদের অধিকার কখনও ধ্বংস হয় না। আর বিশ্বের ত্রুটি সম্পন্ন ব্যক্তিরা কখনও অধিকার লাভে সক্ষম হয় না।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে, মাতা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে সকলের জন্য ভালবাসা কর্তব্য। কবি কবি হাফিযের বেলায়ও আমরা সে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করি। মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। দেশের মঙ্গলের জন্য তিনি নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছেন। মিসরকে বিদেশিদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য স্বীয় মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রশংসা করে অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন। দেশের প্রতি তার ছিলো অকৃত্রিম ভালোবাসা। যেমন কবি বলেন[৩৩]-

وما أنا والغرام وشاب رأسي * وغال شبابِي الخطب الجسام
ورباني الذي ربي لبيداً * فعلمني الذي جهل الانام
لعمرك ما أرقت لغير مصر * وما لي دونها أمل يرام
ذكرت جلالها أيام كانت * تصول بها الفراعنة العظام

১) আমার জীবনে ভালোবাসা নেই। আমার মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে (মাথায় বার্ধক্যের ছাপ সুস্পষ্ট হয়েছে)। আর মহাদুর্বিপাক আমার যৌবনকালকে নিঃশেষ করে দিয়েছে।

২) লাবিদকে যে প্রতিপালন করেছে সে-ই আমাকেও প্রতিপালন করেছে। আর প্রাণীকুল যা জানতনা তা আমাকে শিক্ষা দিয়েছে।

৩) তোমার জীবনের শপথ! আমি মিসর ছাড়া অন্য কারো গোলামী করিনা। আমার নেই ইহা ছাড়া অন্য আশা-ভরসা।

৪) আমি তার (মিসরের) ঐ দিনগুলোকে উল্লেখ করে মহত্ত্ব বর্ণনা করেছি যেদিন শক্তিশালী ফিরাউন ইহা (মিসর) শাসন করছিলো।

দেশের মঙ্গলের জন্য তিনি নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছেন। মিশরকে তিনি বিদেশী শক্তির শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য অবিরাম কলম চালিয়েছেন। মিশরের প্রতি কবির ভালোবাসার প্রমাণ আমরা তার কবিতায় পাই। তিনি বলেন[৩৪]-

انى لأحمل فى هواك صبابة * يا مصر قد خرجت عن الأطواق

لهفى عليك متى أراك طليقة * يحمى كريم حماك شعب راقى

১) হে মিসর! নিশ্চয় আমি তোমার প্রেমে এমন আসক্তি বহন করি যা বহন করা আমার পক্ষে সাধ্যাতীত।

২) হে মিসর! তোমার প্রতি আমার আক্ষেপ! কখন আমি তোমাকে মুক্ত দেখব (বৈদেশিক শক্তির করালগ্রাস থেকে)। এমতাবস্থায় যে, একটি প্রগতিশীল জাতি তোমার সুরক্ষিত পবিত্র প্রাঙ্গণ রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

হাফিজ ইব্রাহীমের কবিতায় স্বাধীনতা

হাফিজ ইব্রাহীম ছিলেন স্বাধীনতার কবি। জীবনের নানা পরতে পরতে মুখোমুখি হওয়া ঘাত- প্রতিঘাত তাঁকে করেছিল কঠোর সাহসী, আত্মনির্ভরশীল এবং বিদ্রোহী। দারিদ্র্যের কঠোর কষাঘাতের কারণে তিনি বাধাধরা নিয়মে লেখাপড়ার মানসিকতা হারিয়ে ফেলেন এবং উদাসীনের মতো ঘুরতে থাকেন। তাঁর মামা তাঁর প্রতি নিরাশ হলে তিনি অহেতুক মামার ওপর বোঝা হতে চাইলেন না; বরং স্বাধীনতার বাণী শুনিয়ে দিয়ে মামার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি বলেছিলেন-[৩৫]

ثقلت عليك مؤنتي * انى اراها واهية

فافرح فاني ذاهب * متوجه في داهية

১) আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার ভরণ-পোষণ আপনার জন্য অনেক কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে।

২) আপনি আনন্দিত হবেন যে, আমি আপনাকে ছেড়ে নিরুদ্দেশে বেরিয়ে পড়ছি।

হাফিয ইব্রাহীম ছিলেন নারী সমাজের মুক্তির অগ্রদূত। তাঁর কবিতায় নারী জাতির আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছে। তিনি নির্যাতিতা নারী সমাজের করুণ আর্তনাদে ব্যথিত হয়ে তাঁদের দাসত্বের নাগপাশ হতে মুক্ত করার জন্য জোর সংগ্রাম চালিয়ে ছিলেন। পুরুষের পাশাপাশি নারী শিক্ষিত ও সচেতন হলে দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। কারণ একজন শিক্ষিত ও সচেতন নারী দেশের উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। তাই নারীদের অধিকার প্রদান সবার নৈতিক দায়িত্ব। তিনি একজন মাতাকে বিদ্যালয়, ফুলের বাগান ও উস্তাদের সাথে তুলনা করেছেন।[৩৬] আমরা তাঁর লিখা ‘মাদ্রাসাতুল বানাত’ مدرسة البنات কবিতায় এর পূর্ণ বিবরণ পেয়ে থাকি। যেমন কবি হাফিয বলেনঃ

الأم مدرسة إذا أعددتها * أعددت شعبا طيب الأعراق
الأم روض أن تعهده الحيا * بالرى أوراق أيما إيراق
الأم أستاذ الأساتذة الأولى * شغلت مآثرهم مدى الأفاق

১) বস্তুতঃ 'মা'ই হচ্ছেন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যখন তুমি তাকে উত্তম প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করবে, তখন তুমি উত্তম মূল বিশিষ্ট একটি জাতিকেই গড়ে তুলবে।

২) মা হচ্ছেন একটি উদ্যান স্বরূপ। যদি বৃষ্টি তার আদ্রতা নিয়ে ওর সাথে সাক্ষাৎ (সিঞ্চণ ও দেখাশুনা) করে, তা হ'লে তা কতই না সতেজ ও সুন্দরভাবে ফুলে ফুলে পত্র পলণ্ডবে সুশোভিত হয়ে উঠে।

৩) মা হচ্ছেন সমস্ত উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষকদের মধ্যে হতে একজন শিক্ষয়িত্রী, যাঁদের কীর্তিসমূহ দিগন্ত জুড়ে পরিব্যাপ্ত রয়েছে।

নারীদের সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, তাদেরকে আসবাবপত্রের ন্যায় গৃহে আটকে রাখা উচিত নয়। তিনি পর্দা সহকারে দেশের কাজে নারীর অংশগ্রহণের পক্ষপাতী। লাগামহীনভাবে নারীদের হাটে-বাজারে ছেড়ে দেবার পক্ষপাতী নন। বরং শিক্ষা ক্ষেত্রে বা উন্নতির জন্য যেমন তাদের স্বাধীনতা দিতে হবে; তেমনি শালীনতা ও ইজ্জত রক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে। যেমন তিনি বলেন-[৩৭]

أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا * بين الرجال يجلن فى الأسواق

আমি বলছি না যে, তোমাদের মহিলাদেরকে (কোন রক্ষণাবেক্ষণকারী ছাড়াই) পুরুষদের মধ্যে ভ্রমণ করতে যেতে দাও, এমতাবস্থায় যে, তারা বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়াবে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক আরবী কাব্যসাহিত্য জগতে হাফিয ইব্রাহীম একটি অনন্য প্রতিভা। যে পাঁচজন প্রসিদ্ধ কবির একনিষ্ঠ সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃতফল স্বরূপ আধুনিক আরবী কাব্য সাহিত্য আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বের গৌরবময় মহাসনে সমাসীন, কবি হাফিয ইব্রাহীম তাঁদের অন্যতম। অপর চারজন হলেন, মাহমূদ সামী আল বারূদী (১৮৪০-১৯০৪), ইসমাঈল সাবরী (১৮৫৪-১৯২৩), আহমাদ শাওক্বী (১৮৬৮-১৯৩২), খলীল মুতরান (১৮৭১-১৯৪৯)। তিনি সব ধরনের কবিতা রচনায় পারদর্শী ছিলেন। আরবী সাহিত্যের ক্লাসিক্যাল পদ্ধতি পরিবর্তন করে নতুন ধারায় কবিতা চর্চা হাফিযের হাতেই পূর্ণতা লাভ করে। তিনি তাঁর কাব্যশক্তি দ্বারা দেশ ও জাতির সেবায় এবং জাতীয় জাগরণে যে অবদান রেখেছেন তা চিরস্মরনীয়। আর এ কারণেই হাফিয ইব্রাহীমকে আধুনিক মিসরের জাতীয় কবি, নীলনদের কবি ও যুগের অবদান বলা হয়। কাব্যে অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি তাঁর স্বদেশ ও বহির্বিশ্বে সমানভাবে সমাদৃত।

তথ্যনির্দেশ

১. আব্দুল হামীদ সিন্দ আল-জুনদী, *হাফিয ইব্রাহীম শা'ইরুন নীল* (কায়রোঃ ১৯৬৮ খ্রী.), পৃ. ১৬; হান্না আল-ফাখুরী, *তারিখুল আদাবিল আরবী, আল-আদাবিল হাদীস* (বৈরূতঃ দারুল জিল, ১৯৯৫), পৃ. ১৩৭-১৫০; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৫ শ খণ্ড (ঢাকাঃ ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ই.ফা.বা, ১৯৯৬), পৃ. ১৯০; মুহাম্মদ ইউসুফ কোকেন, *আ'লামুন নছর ওয়াশ শি'র ফিল 'আছরিল আরাবিয়্যিল হাদীস*, ১ম খণ্ড (ভারতঃ মাদরাজ, হাফিজা হাউস, ১৯৮৪), পৃ. ২৯১-৩১১।

২. আহমদ হাসান আল-যাইয়্যাত, *তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী* (বৈরূতঃ দার আল-মা'আরিফাহ, ১৯৯৫), পৃ. ৩৭২।

৩. হান্না আল-ফাখুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৭-১৫০; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৫শ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯০।

৪. *হাফিয ইব্রাহীম শা'ইরুন নীল*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫-১৬; *দীওয়ান হাফিয ইব্রাহীম* (বৈরূতঃ দার সদর, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৯ খ্রী./১৪০৯ হি.), ভূমিকা, পৃ. ৫।
৫. আহমদ হাসান আল-যাইয়্যাত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭২; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৫শ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯০।
৬. *হাফিয ইব্রাহীম শা'ইরুন নীল*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬।
৭. ড. ইয়াহইয়া শামী, *হাফিয ইব্রাহীম : হায়াতুহু ওয়া শি'রুহু* (বৈরুত- লেবানন : দারুল ফিকরিল আরাবী, ১৯৯৫) পৃ. ১৩।
৮. ড. আহমদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহা*, (চট্টগ্রাম : আকিব প্রকাশনী, এপ্রিল, ২০০৪ খ্রী.), পৃ. ১৮।
৯. ড. মো. আব্দুস সালাম, মিসরের জাতীয় কবি হাফিজ ইব্রাহীম বেগ, *মাসিক কলম*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, এপ্রিল, ১৯৯১), পৃ. ৩।
১০. আহমদ হাসান আল-যাইয়্যাত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭২।
১১. *পূর্বোক্ত*; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৫শ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯১।
১২. *হাফিয ইব্রাহীম শা'ইরুন নীল*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭; ইউসুফ আল-বান সারকাইয, *মু'জামুল মতবু'আতিল আরাবিয়্যাহ ওয়াল মুয়াররাবাহ*, ১ম খণ্ড (কায়রোঃ মানশুরাতু মাকতাবাতি আয়াতিল্লাহিল উজমা, ১৯১৯ খ্রী./১৩২৯ হি.), পৃ. ৭৩৬-৭৩৭।
১৩. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৫শ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯১; হান্না আল-ফাখুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৭-১৫০।
১৪. আলী মুহাম্মদ হাসান, *আত্‌তা'রিখুল আদাবী* (মিসরঃ আল-ইদারাতুল মারকাযিয়্যাহ লিল মু'আহিদিল আয্‌হারিয়্যাহ, ১৯৯২ খ্রী./১৪১২ হি.), পৃ. ১৩৭-১৪৪; আহমদ আমীন, *হাফিয ইবরাহীমের দীওয়ানের ভূমিকা* (কায়রোঃ ১৯৪৮ খ্রী.), পৃ. ৪।
১৫. আহমদ হাসান আল-যাইয়্যাত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭২; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৫শ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯১; উমর রিজা কুহালা, *মু'জামুল মুয়াল্লিফীন*, ৩য় খণ্ড (বৈরূতঃ মুয়াস্‌সিসুর রিসালাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রী./১৪১৪ হি.), পৃ. ২০৪।
১৬. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৫শ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯১-১৯২।
১৭. "Hafiz Ibrahim", *Encyclopaedia of Islam*, New ed. Vol. iii, P. 59.
১৮. হান্না আল-ফাখুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৭-১৫০; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৫শ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯২; ড. মুহাম্মদ কামিল, *আল-আযহার*, তৃতীয় খণ্ড (মিসরঃ সিলসিলাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৬), পৃ. ৩০৬-৩০৭; আহমদ হাসান আল-যাইয়্যাত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭২-৩৭৩।
১৯. *হাফিয ইব্রাহীম*, *দীওয়ান* (কায়রোঃ ১৯৩৭), ভূমিকা, পৃ. ৪-৫।
২০. *হাফিয ইব্রাহীম শা'ইরুন নীল*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৯।
২১. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২; আহমদ হাসান আল-যাইয়্যাত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭৩।
২২. *হাফিয ইব্রাহীম*, *দীওয়ান*, ভূমিকা, পৃ. ৬।
২৩. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৫শ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৩।
২৪. *দীওয়ান*, ভূমিকা, পৃ. ৩৩।
২৫. *পূর্বোক্ত*।
২৬. *তদেব*; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৫শ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৩।
২৭.https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%AD
২৮.https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1#cite_note-2c~‡ev©³ |
২৯. *পূর্বোক্ত*।
৩০. *পূর্বোক্ত*।
৩১. মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ, "দুই দেশের দুই কবি : হাফিজ ও নজরুল" মাসিক কলম(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামীক সেন্টার, অক্টোবর, ১৯৯০ ইং), পৃ. ১৫।
৩২. *দীওয়ানু হাফজ ইব্রাহীম*, তাহিয়্যাতুল 'আমিল হিজরী, আহমাদ আমীন সংকলিত, ২য় খণ্ড(কায়রো : আল-মাতবাআতুল আমীরিয়্যাহ, ১৯৫), পৃ. ৩৭-৩৮
৩৩. *দীওয়ান হাফিজ ইব্রাহীম*, ১ম খণ্ড (বৈরুত : দারু সাদির, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৯ খ্রী.), পৃ. ৩১৫।
৩৪. জি.এম. মেহেরুল্লাহ, *আরবী কবি সাহিত্যিক ও সাহিত্য*(ঢাকা : নাহদা প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, নভেম্বর-২০১৪), পৃ. ১৬০।
৩৫. ড. আব্দুল হামীদ সিন্দ আল জুনদী, হাফিজ ইব্রাহীম, শাইরুন নীল (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯১৯ খ্রী.), পৃ. ১৮।
৩৬. *পূর্বোক্ত*, ১ম খণ্ড, 'মাদরাসাতুল বানাতি বি-বু'রি-সাঈদ', পৃ. ২৬৭-২৭১।
৩৭. *পূর্বোক্ত*।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

আরবী কবিতা'র শব্দালংকার : একটি পর্যালোচনা
(Ornamentation of Arabic Poetry : A Discussion)

ড. মো. মতিউর রহমান *

Abstract: Arabic is one of the most ancient languages in the world. Human express their feelings in wonderful ways through words. Literature plays a vital role to present a language in an alternative and ornamental manner. A particular language is as widely appreciated in the world as developed its literature. A great literature has many branches like- poetry, prose, drama, novel, short stories etc. No literature can be imagined without poetry. Arabic literature is an advance and highly recognised literature in the world. Since the dawn of knowledge, Arab poets have been composing poetry that is very rhythmic and decorative. Over the time Arabic poetry has developed a very elegant and decorative structure. Arabic rhetorical studies have a significant impact on Arabic poetry's beauty and embellishment. Arabic rhetorical studies must therefore be familiarised with in order to analyse the ornamentation of Arabic poetry. Phonetically and semantically are the two main ways that Arabic rhetoric typically appears. Phonetically it translates to "SHABD ALANKAR" (embellishment of words) which is the term for linguistic ornamentation as defined by the rules of rhetoric. Certain distinctive phonetic ornaments are used in Arabic rhetoric. The embellishment of Arabic poetry increases as a result of its utilisation. Important Arabic word ornamentation components are emphasised in this article and the ornamentation of Arabic poetry is investigated through a study of how they are used in various Arabic poetry quotations.

পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাসমূহের অন্যতম আরবী ভাষা। ভাষার মাধ্যমে মানুষ মনের ভাব সুন্দর ভাবে প্রকাশ করে থাকে। ভাষাকে সুন্দর ও নান্দনিক করে উপস্থাপনে সাহিত্যের অবদান যথেষ্ট। তাই যে ভাষার সাহিত্য যত উন্নত, সে ভাষা বিশ্বের বুকে তত ব্যাপৃত ও মর্যাদা সম্পন্ন। একটি উন্নত সাহিত্যের অনেক শাখা প্রশাখা থাকে, যেমন: গদ্য, পদ্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ইত্যাদি। পদ্য বা কবিতা ছাড়া সাহিত্য অকল্পনীয়। আরবী সাহিত্য একটি উন্নত ও মর্যাদাসম্পন্ন সাহিত্য। আরবী সাহিত্যের উন্নয়নে আরবী কবিতার অবদান যথেষ্ট। আবহমানকাল থেকেই আরবী কবিতা আরবী সাহিত্যের প্রধান ও মৌলিক শাখা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আরব কবিগণ প্রাচীন যুগ থেকেই ছন্দবদ্ধ ও অলংকারপূর্ণ কবিতা রচনা করে চলেছেন। কালের পরিক্রমায় আরবী কবিতার কাঠামো ও গঠন প্রণালী অনেক সুন্দর ও অলংকারময় হয়ে উঠেছে। যাতে আরবী অলংকার শাস্ত্রের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তাই আরবী কবিতার শব্দালংকার সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে হলে আরবী অলংকার শাস্ত্রের ভাষা অলংকার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আরবী ভাষা অলংকার সাধারণত দু'ভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে। শব্দগতভাবে এবং অর্থগতভাবে। শব্দের দিক থেকে ভাষা অলংকারপূর্ণ হওয়াকে অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় المحسنات اللفظية বা শব্দালংকার বলা হয়। আরবী অলংকার শাস্ত্রে المحسنات اللفظية-এর কিছু সুনির্দিষ্ট উপাদান রয়েছে। যেমন: السجع- الجناس- التصدير ইত্যাদি। এগুলোর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আরবী কবিতার শব্দালংকার ফুটে উঠে। আলোচ্য প্রবন্ধে

* প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আরবী শব্দালংকারের কিছু উল্লেখযোগ্য উপাদানের পরিচয় তুলে ধরে আরবী কবিতার বিভিন্ন উক্তির মাঝে সেগুলোর ব্যবহার পর্যালোচনার মাধ্যমে আরবী কবিতার শব্দালংকার বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পাব।

الجناس পরিচিতি ও আরবী কবিতায় এর ব্যবহার

الجناس আরবী অলংকার শাস্ত্রে শব্দালংকারের একটি অন্যতম সূত্র। الجناس-এর ব্যবহারের মাধ্যমে আরবী ভাষার সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা রয়েছে, তন্মধ্যে আরবী কবিতা একটি অন্যতম শাখা। আরবী কবিতায় الجناس-এর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অরবী কবিতার সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। এ পর্যায়ে الجناس-এর পরিচয় ও আরবী কবিতায় এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করছি।

الجناس-এর পরিচয়

الجناس শব্দটি باب مفاعلة এর مصدر। ج ن س এ তিনটি আরবী মূল অক্ষর থেকে শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে। অলংকার শাস্ত্রের দিক থেকে শব্দটির বাংলা অর্থ: বাক্যের দুই অংশের মধ্যে মিল, শ্লেষ, শ্লেষালংকার, শ্লেষবাক্য।[১] শব্দটির মৌলিকতা ও অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে:

جانس جناسا مجانسة: شاكله واتحد معه فى الجنس[২]

এ সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে:

الجناس في البديع: تشابه الكلمتين في اللفظ كله نحو "العين" أي الباصرة و "العين" أي ينبوع الماء أو بعضه نحو "ساه: و "ساهر".[৩]

"علم البديع তে جناس হলো বাক্যের মাঝে শব্দগত দিক থেকে দু'টি শব্দ পূর্ণরূপে মিল হওয়া। যেমন: العين অর্থ চক্ষু আবার العين অর্থ পানির ঝর্ণা। অথবা আংশিকভাবে মিল হওয়া যেমন: ساه এবং ساهر শব্দ।"

অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায়, একই পঙ্‌ক্তিতে ভিন্ন অর্থ বিশিষ্ট একই ধরণের দুই বা ততোধিক শব্দ ব্যবহার করাকে جناس বলা হয়।[৪]

الجناس-এর প্রকার

الجناس মূলত দু'প্রকার ১. تام বা পূর্ণাঙ্গ ২. غير تام বা অপূর্ণাঙ্গ।

الجناس تام সম্পর্কে বলা হয়েছে:

تام: وهو ما اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة هي: نوع الحروف وشكلها وعددها و ترتيبها-[৫]

"বাক্যের মাঝে দুটি শব্দে চারটি বিষয়ে মিল থাকলে তাকে الجناس تام বলা হয়। বিষয়গুলো হলো: ১. হরফের শ্রেণী, ২. হরফের আকৃতি, ৩. হরফের সংখ্যা, ৪. হরফের বিন্যাস।"

غير تام: وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور الأربعة المتقدمة-[৬]

"কোনো বাক্যে দুটি শব্দের মাঝে উল্লেখিত চারটি বিষয়ের কোনো একটিতে অমিল থাকলে তাকে

الجناس غير تام বলা হয়।" প্রকাশ থাকে যে, الجناس غير تام কে الجناس الناقص'ও বলা হয়।

আরবী কবিতায় الجناس-এর ব্যবহার

الجناس এর সংজ্ঞার আলোকে আরবী কবিতার মাঝে অনেক শ্লোক পাওয়া যায়, যেগুলোর মাঝে جناس -এর ব্যবহার ঘটেছে। এ পর্যায়ে আরবী কবিতার এমন কিছু উক্তি পর্যালোচনা করা হলো, যেথায় جناس-এর শব্দালংকার ফুটে উঠেছে। যেমন কবি মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন কানাসাহ আল আসদী তার ছেলে ইয়াহইয়া এর শোকগাঁথায় বলেন:

وسميته يحيى ليحيا فلم يكن إلى رد أمر الله فيه سبيل [৭]

"আমি তার নাম রাখলাম ইয়াহইয়া যাতে করে সে বেঁচে থাকে। কিন্তু আল্লাহর হুকুম বাতিল করারতো কোনো পথ নেই।"

আলোচ্য কবিতার লাইন পর্যালোচনায় দেখা যায়, এখানে ব্যবহৃত يحيى শব্দটি দু'বার ব্যবহার হয়েছে। তবে প্রথম এবং দ্বিতীয় يحيى শব্দের মাঝে হরফের প্রকৃতি, আকৃতি, সংখ্যা এবং ধারাবাহিকতার একই রকম হওয়া সত্বেও অর্থগত দিক থেকে উভয় শব্দের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। তাই এখানে আরবী কবিতার মাঝে অলংকার শাস্ত্রের جناس تام-এর শব্দালংকার ফুটে উঠেছে।

এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

ترى يحيى مكررا مع اختلاف المعنى. واختلاف كل كلمتين فى المعنى على هذا النحو مع اتفاقها فى نوع الحروف وشكلها وعددها وترتيبها يسمى جناسا تاما [৮]

"দেখ ইয়াহইয়া শব্দটি অর্থের ভিন্নতার সাথে দ্বিরুক্তি ঘটেছে। শব্দ দুটির মাঝে অর্থগত পার্থক্য থাকলেও হরফের শ্রেণী, আকৃতি, সংখ্যা এবং ধারাবাহিকতার দিক থেকে মিল থাকার কারণে جناس تام নামকরণ করা হয়েছে।"

মহিলা কবি খানসার কাসিদায় ভাইয়ের শোক প্রকাশ করে বলেছেন,

إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح[৯]

" আরোগ্য দেয় নিশ্চয়ই কান্না

তাহতে অন্তরে যত উত্তেজনা।"

বর্ণিত কবিতার উক্তির মাঝে الجوى এবং الجوانح শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দ দু'টির শেষাংশে কিছু অমিল থাকলেও প্রথমাংশে যথেষ্ট মিল রয়েছে। তবে শব্দ দু'টির মাঝে অর্থের দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। তাই এখানে جناس غير تام এর সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে।

মাহমুদ সামী আল-বারুদীর কবিতায় বলা হয়েছে,

تحملت خوف المن كل رزيئة وحمل رزايا الدهر أحلى من المن.[১০]

"অনুগ্রহের খোটা দেয়ার ভয়ে সকল বালা-মুছিবত আমি সহ্য করলাম, যুগযুগ ধরে সে বালা মুছিবত মধুর চেয়েও মিষ্টি মনে হয়েছে।"

আলোচ্য কবিতার অংশটুকু পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কবিতার একই বায়ত এর মাঝে المن শব্দটি দু'বার ব্যবহার করা হয়েছে। তবে কবিতার একই বায়ত এর মাঝে একই শব্দ দু'বার ব্যবহার হলেও শব্দটি দু'বার পৃথক দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন المن শব্দটি প্রথমবার নিয়ামতের আধিক্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর দ্বিতীয়বার শব্দটি দ্বারা মধু অর্থ বুঝানো হয়েছে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

فالمن الأول تعداد الصنائع والنعم نحو: أعطيتك كذا و أحسنت إليك بكذا, والمن الثاني العسل.[১১]

"প্রথম المن দ্বারা বৈচিত্রময় খোটাদান ও অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছে, যেমন কেউ বলে আমি এটা তোমাকে দিয়েছি এবং এর দ্বারা তোমাকে অনুগ্রহ করেছি। আর দ্বিতীয় المن দ্বারা মধু বুঝানো হয়েছে।"

তাই একই শব্দ কবিতার একই বায়ত এর মাঝে পৃথক দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে এখানে অলংকার শাস্ত্রের جناس تام এর শব্দালংকার ফুটে উঠেছে।

سجع পরিচিতি ও আরবী কবিতায় এর ব্যবহার

سجع আরবী অলংকার শাস্ত্রের المحسنات اللفظية বা শব্দালংকারের একটি অন্যতম প্রকার। سجع-এর মূল ব্যবহার ক্ষেত্র পদ্য সাহিত্য। তাই আরবী কবিতার মাঝে سجع-এর ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যার মাধ্যমে আরবী কবিতায় অলংকার শাস্ত্রের শব্দালংকার সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়।

سجع-এর পরিচিতি

سجع শব্দটি একবচন, বহুবচনে أسجاع ব্যবহৃত হয়। এর শাব্দিক অর্থ অন্তমিলযুক্ত গদ্যাংশ, অন্তমিলযুক্ত বাক্য।[১২] অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় سجع হলো-

السجع توافق الفاصلتين فى الحرف الأخير وأفضله ماتساوت فقره.[১৩]

"দু'টি বাক্যের শেষাক্ষরে মিল হওয়াকে سجع বলে। আর শ্রেষ্ঠ سجع যার সকল অনুচ্ছেদে মিল থাকে।"

سجع সুন্দর ও সার্থক হওয়ার জন্য চারটি শর্ত রয়েছে-

প্রথমত: বাক্যের প্রতিটি শব্দ সুগঠিত, সুন্দর এবং শ্রুতিমধুর হতে হবে।

দ্বিতীয়ত: বাক্যের সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে অর্থের অনুযায়ী এবং অনুগামী হতে হবে। কোনোরূপ কম বেশি হলে তা কৃত্রিম ও অপছন্দনীয় রূপে গণ্য হবে।

তৃতীয়ত: বাক্য গঠনের সময় অর্থ হবে মনোরম ও আকর্ষণীয়, কখনই অপছন্দনীয় হবে না।

চতুর্থত: প্রতিটি অন্তমিলযুক্ত বাক্য যেন এমন অর্থ প্রকাশ করে যা দ্বিতীয় বাক্যের অর্থের বিপরীত হয়, কখনই দ্বিরুক্ত না হয়। অন্যথায় অন্তমিলযুক্ত শব্দ ব্যবহার অনর্থক হয়ে পড়বে।[১৪]

سجع-এর প্রকার

অলংকার শাস্ত্রে سجع তিন প্রকার: مطرف، متواز، مرصع[১৫]

দু'টি বাক্যের সকল শব্দে অথবা অধিকাংশ শব্দে ওযন এবং অন্তমিল উভয় দিক থেকে মিল হওয়াকে السجع المرصع বলা হয়।

দু'টি বাক্যের শেষ দু'টি শব্দে ওযন এবং বর্ণে মিল হওয়াকে السجع المتوازى বলা হয়।

দু'টি বাক্যের শেষ দু'টি শব্দের শেষে ওযনে মিল না হয়ে শুধু বর্ণে মিল হওয়াকে السجع المطرف বলা হয়।[১৬]

আরবী কবিতায় سجع-এর ব্যবহার

سجع-এর সংজ্ঞার আলোকে আরবী কবিতার মাঝে এমন কিছু উক্তি পাওয়া যায়, যা আরবী কবিতায় তার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে।

যেমন ইমরুল কায়স এর কবিতায় বলা হয়েছে,

قفا نبك من ذكرى حبيب و منزل   بسقط اللوى بين الدخول فحومل [১৭]

"হে প্রিয় বন্ধুদ্বয়! দাঁড়াও, আমার প্রেয়সী এবং তার বাস্তুভিটার স্মরণে একটু কেঁদে নিই। যা বালুর টিলার শেষপ্রান্তে 'দাখুল' ও 'হাওমাল' নামক জায়গার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।"

আলোচ্য কবিতায় প্রথমাংশের শেষ শব্দ منزل এবং দ্বিতীয়াংশের শেষ শব্দ حومل এর মাঝে ওযন এবং বর্ণে মিল থাকার কারণে এখানে আরবী কবিতার মাঝে سجع-এর শব্দালংকার ফুটে উঠেছে।

হারীরীর কবিতায় বলা হয়েছে,

فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه   ويقرع الأسماع بزواجر وعظه [১৮]

"তিনি তাঁর বক্তব্যে শব্দের অলংকার দ্বারা ধারাবাহিক ছন্দের সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর ধমকিমূলক উপদেশ দ্বারা শ্রবনেন্দ্রিয়কে ঝংকৃত করেছেন।"

উল্লেখিত কবিতার প্রথম সতরের শেষ শব্দ لفظه এবং দ্বিতীয় সতরের শেষ শব্দ وعظه। শব্দ দু'টির মাঝে মাত্রা এবং বর্ণের দিক থেকে মিল থাকার কারণে এখানে কবিতার মধ্যে অন্তমিলের শব্দালংকার ফুটে উঠেছে।

التصدير পরিচিতি ও আরবী কবিতায় এর ব্যবহার

আরবী অলংকার শাস্ত্রে التصدير শব্দালংকারের একটি অন্যতম সূত্র। আরবী সাহিত্যে গদ্য ও পদ্য উভয় ক্ষেত্রে এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আরবী ভাষায় শব্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। আরবী অলংকার শাস্ত্রে একে ردالعجز على الصدر বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯] আরবী কবিতার মাঝে অনেক বাক্যে التصدير-এর ব্যবহার পাওয়া যায়। এ পর্যায়ে التصدير-এর পরিচয় ও আরবী কবিতায় এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

التصدير-এর পরিচয়

التصدير শব্দটি باب تفعيل-এর مصدر। আরবী ص د ر মূল অক্ষর থেকে শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে। এর শাব্দিক অর্থ আরম্ভ করা, শুরু করা, সামনে স্থান দেয়া।[২০]

পারিভাষিক অর্থে التصدير হলো:

هو في النثر أن يجعل أحد الركنين في أول الفقرة والأخر في آخرها، و في النظم أن يجعل أحد الفريقين من ذلك في آخر البيت في أول صدره.[২১]

"গদ্যে বাক্যের দু'টি মূল অংশের মধ্যে একই জাতীয় দু'টি শব্দের একটিকে বাক্যের প্রথমে এবং অন্যটিকে বাক্যের শেষে ব্যবহার করা। আর পদ্যে ছত্রের صدر-এর মধ্যে ব্যবহৃত শব্দকে عجز-এর মধ্যে পুনরায় নিয়ে আসা।"

আমরা এভাবে বলতে পারি পৌনঃপুনিকতা বা একজাতীয় দু'টি শব্দের একটিকে বাক্যের প্রথমে এবং অপরটিকে বাক্যের শেষে ব্যবহার করাকে التصدير বলা হয়।

আরবী কবিতায় التصدير-এর ব্যবহার

আরবী কবিতার মাঝে অনেক পঙ্ক্তিতে التصدير-এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

কবি সিম্মা ইবন আব্দিল্লাহ আল কুশায়রীর কবিতায় বলা হয়েছে,

تمتع من شميم عرار نجد   فما بعد العشية من عرار[২২]

"নাজদের আরার নামক গাছের সুগন্ধিময় বাতাসের ঘ্রান উপভোগ করো। কেননা সন্ধ্যার পর আরারের সুগন্ধ আর থাকবে না।"

আলোচ্য কবিতাংশটুকু পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখানে কবিতার দু'টি অংশের প্রথমাংশে عرار শব্দ ব্যবহার করে দ্বিতীয়াংশের শেষে পুনরায় শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এখানে কবিতার মাঝে التصدير-এর শব্দালংকার প্রকাশ পেয়েছে।

কবি হুসাইন ইবন মানসুর আল-হাল্লাজ-এর কবিতায় বলা হয়েছে,

تمنت سليمى أن أموت صبابة   وأهون شئ عندنا ما تمنت[২৩]

"সুলায়মার অভিলাষ আমার মরন হোক প্রেমে পাগল হয়ে,
আমার কাছে সহজ অতি, আর কি সহজ হতে পারে তার বাসনার চেয়ে।"

আলোচ্য কবিতাংশটুকু পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখানে কবিতার দু'টি অংশের প্রথমাংশের শুরুতে تمنت শব্দ ব্যবহার করে দ্বিতীয়াংশের শেষে পুনরায় শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এখানে কবিতার মাঝে التصدير-এর শব্দালংকার ফুটে উঠেছে।

কবি আবু তাম্মামের কবিতায় আছে,

و إذا البلابل أفصحت بلغاتها   فأنف البلا بل باحتساء بلابلا[২৪]

"যখন বুলবুলি পাখি সুন্দর ভাষায় গান গায়,
তখন মদের পাত্রে চুমুক দিলে মনের ব্যথা চলে যায়।"

আলোচ্য কবিতাংশটুকু পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখানে কবিতার দু'টি অংশের প্রথমাংশের মাঝে البلابل শব্দ ব্যবহার করে পুনরায় দ্বিতীয়াংশের মাঝেও শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এখানে কবিতার মাঝে التصدير-এর শব্দালংকার ফুটে উঠেছে।

لزوم ما لا يلزم পরিচিতি ও আরবী কবিতায় এর ব্যবহার

لزوم ما لا يلزم আরবী অলংকার শাস্ত্রে শব্দালংকারের একটি অন্যতম উপাদান। গদ্য ও পদ্য উভয় ক্ষেত্রে এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ পর্যায়ে لزوم ما لا يلزم-এর পরিচিতি ও আরবী কবিতায় এর ব্যবহার সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হলো।

لزوم ما لا يلزم পরিচিতি

لزوم ما لا يلزم একটি যৌগিক শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ অনাবশ্যক কে আবশ্যক করা। এর পারিভাষিক পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে,

لزوم ما لا يلزم هو أن يؤتى قبل حرف الروي بما ليس بلازم في التقفية[২৫]

حرف الروي (যে অক্ষরে অন্তমিল রক্ষা করা হয়)-এর পূর্বে অন্তমিলের জন্য অনাবশ্যক কিছু নিয়ে আসাকে অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় لزوم ما لا يلزم বলা হয়।

আরবী কবিতায় لزوم ما لا يلزم-এর ব্যবহার

আরবী কবিতার মাঝে এমন কিছু পঙ্ক্তি পাওয়া যায়, যে গুলোর মধ্যে لزوم ما لا يلزم-এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

যেমন কবি মুজিরুদ্দীন ইবন তামিম আদ দামেশকীর কবিতা,

يا محرقا بالنار وجه محبه   مهلا فإن مدامعي تطفيه

أحرق بها جسدي و كل جوارحي   وأحرص على قلبي فإنك فيه[২৬]

"হে আগুনে প্রেয়সীর চেহারাকে দগ্ধকারী!

থামো, নিশ্চয় আমার অশ্রু তা নির্বাপনকারী।

আগুনে আমার দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ দগ্ধ করো,

তুমি আমার অন্তরে তাই উহা রক্ষা করো।"

কবিতার আলোচ্য লাইন দুটির শেষে ছন্দমিল রক্ষার জন্য ه অক্ষর নেয়া যথেষ্ট ছিল, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে ه এর পূর্বে ي ও ف অক্ষরেও মিল আনা হয়েছে; যা ছন্দমিল রক্ষার জন্য আবশ্যক ছিল না। ফলে এখানে কবিতার মাঝে لزوم ما لا يلزم-এর শব্দালংকার প্রকাশ পেয়েছে।

التوزيع পরিচিতি ও আরবী কবিতায় এর ব্যবহার

التوزيع আরবী অলংকার শাস্ত্রে শব্দালংকারের একটি অন্যতম সূত্র। التوزيع-এর মাধ্যমে বাক্যের সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটে। এ পর্যায়ে التوزيع পরিচিতি ও আরবী কবিতায় এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

التوزيع পরিচিতি

التوزيع শব্দের শাব্দিক অর্থ বন্টন, বিতরণ, বিলি, পরিবেশন, ভাগকরণ।[২৮] অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় التوزيع বলতে কোনো বাক্যের প্রতিটি শব্দে নির্দিষ্ট কোনো বর্ণ নিয়ে আসা। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

هو أن يلتزم حرف في كل لفظ من العبارة[২৭]

"التوزيع হলো বাক্যের প্রতিটি শব্দে কোনো একটি বর্ণকে ব্যবহার করা।"

আরবী কবিতায় التوزيع-এর ব্যবহার

আরবী কবিতায় التوزيع-এর ব্যবহার লক্ষ্যনীয়। যেমন হারীরীর কবিতায় বলা হয়েছে,

و سيف السلاطين مستأثر   بأنس السماع و حسو الكؤس

سلاني وليس لباس السلو   يناسب حسن سمات النفيس

و سنن تناسي جلاسه   و أسوا السجايا تناسي الجليس

و سر حسودي بطمس الرسوم   وطمس الرسوم كرمس النفوس

وأسكرني حسرة واستعاض   لقسوته سكرة الخندريس

وساقي الحسام بكأس السلاف   وأسهمني بعبوس و بوس

سأكسوه لبسة مستعتب   وألبس سربال سال يئوس

و أسطر سيناته سيرة   تسير أساطيرها كالبسوس[২৮]

হারীরীর আলোচ্য কবিতার বাক্যগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়। এখানে প্রতিটি বাক্যের প্রত্যেক শব্দের মাঝে س বর্ণটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এখানে التوزيع-এর শব্দালংকার ফুটে উঠেছে।

التوزيع-এর ক্ষেত্রে কখনো কখনো একই অক্ষর বাক্যের প্রতি শব্দে না হয়ে অধিকাংশ শব্দের মাঝে হয়ে থাকে । যেমন বাসরার একজন লোক কোনো এক কাজিকে লক্ষ্য করে রচনা করেন।

أيا من فرض القاضي   له أرضى لكي يرضي

أهذا في القضا فرض   بأن ترضي ولا أرضي

قضى قاضيك في أرضي   قضاء ليت لم يقضي

فإبن العوض المفرو   ض لا كلا ولا بعضا[২৯]

আলোচ্য কবিতার শ্লোকগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এখানে প্রতিটি শব্দে ض অক্ষর ব্যবহার না হলেও অধিকাংশ শব্দের মাঝে ض অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এখানে আরবী কবিতার মাঝে التوزيع -এর শব্দালংকার ফুটে উঠেছে।

قلب পরিচিতি ও আরবী কবিতায় এর ব্যবহার

قلب আরবী অলংকার শাস্ত্রে শব্দালংকারের একটি অন্যতম উপাদান। আরবী ভাষায় قلب-এর ব্যবহারের মাধ্যমে ভাষার সৌন্দর্য ফুটে উঠে। এ পর্যায়ে قلب-এর পরিচয় ও আরবী কবিতায় এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

قلب পরিচিতি

قلب শব্দের শাব্দিক অর্থ: ওলট, ওলট-পালট, পরিবর্তন।[৩০] এ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

قلب- قلبا الشئ: حوله عن وجهه أو حالته (جعل أعلاه أسفله) جعل باطنه ظاهره.[৩১]

"কোনো জিনিষ পরিবর্তন করা, তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, কোনো জিনিষের উপর নিচে ওলটিয়ে দেয়া, কোনো জিনিষের ভেতরের অংশ বাইরে দেয়া।"

অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষাই قلب হলো:

هو أن يكون الكلام بحيث لو عكس وبدىء بحرفه الأخير إلى الأول لم يتغير الكلام عما كان عليه ويجري ذلك في النثر والنظم [৩২]

"কোনো বাক্য এমন যে, যদি তাকে উল্টিয়ে দেয়া হয় এবং বাক্যের শেষ অক্ষরকে প্রথমে নিয়ে এসে বাক্য শুরু করা হয়, তবুও বাক্যের কোনো পরিবর্তন হবে না। বরং বাক্যটি যেরূপ ছিল সেরূপই থাকবে। এটা পদ্য এবং গদ্য উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।"

আরবী কবিতায় قلب-এর ব্যবহার

আরবী কবিতার অনেক স্থানে قلب-এর ব্যবহার দেখা যায়। তবে আরবী সাহিত্যে এর ব্যবহার অতি সামান্য। এ পর্যায়ে আরবী কবিতার এমন কিছু শ্লোক পর্যালোচনা করা হলো যে গুলোর মাঝে قلب-এর ব্যবহার হয়েছে। যেমন কবি কাজি আল আরজানীর কবিতায়,

مودته تدوم لكل هول   وهل كل مودته تدوم[৩৩]

"তার ভালোবাসা সকল বিপদ-আপদে চলমান থাকে, তার সকল ভালোবাসা কি সব সময় স্থায়ী থাকে?"

আলোচ্য কবিতার পঙ্‌ক্তিটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কবিতার লাইনটি প্রথম থেকে পড়লে যেমন হবে, কবিতাটি ওলটিয়ে শেষের দিক থেকে পড়লেও ঠিক তেমনি হবে। তাই এখানে আরবী কবিতার মাঝে قلب-এর আলংকারিক সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে।

নাসীফ আল-ইয়াযিজীর মাকামায় বলা হয়েছে,

قيل افتح باب جار تلقه   قلت راج باب حتف أليق [৩৪]

"বলা হলো, প্রতিবেশীর দরজা খুলে তার সাথে সাক্ষাত করো! আমি বললাম, চলমান মৃত্যুর দরজা তার চেয়ে অধিক যোগ্য।"

এ কবিতার লাইনটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কবিতার শ্লোকটি প্রথম থেকে পড়লে যেমন হয়, ঠিক ওলটিয়ে শেষের দিক থেকে পড়লেও তেমনি হয়। তাই এখানে আরবী কবিতার মাঝে قلب এর শব্দালংকার ফুটে উঠেছে।

আরও একজন আরবী কবি বলেন,

قمر يفرط عمدا مشرق   رش ما دمع طرف يرمق[৩৫]

"চাঁদ স্বেচ্ছায় অধিকহারে উজ্জ্বলতা প্রকাশ করে,

তার দিকে দৃষ্টিপাতকারী অশ্রুজল বর্ষণ করে।"

এ কবিতার লাইনটিও পাঠ করলে দেখা যায়, এ কবিতাটি প্রথম থেকে পড়লে যেমন হয়, ওলটিয়ে শেষের দিক থেকে পড়লেও ঠিক তেমনি হয়। তাই এখানেও আরবী অলংকার শাস্ত্রের শব্দালংকার ফুটে উঠেছে।

আলোচ্য কবিতাগুলোর মাঝে পূর্ণ লাইনে قلب-এর ব্যবহার হয়েছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবিতার অর্ধ লাইনের মাঝেও قلب-এর ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন,

أرانا الإله هلالا أنارا[৩৬]

"আল্লাহ আমাদেরকে নবচন্দ্র দেখিয়ে আলোকিত করেছেন।"

কবিতার এ অর্ধ লাইনটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ মাছরার প্রথম থেকে পড়লে যেমন দেখায়, ঠিক শেষের দিক থেকে পড়লেও তেমনি দেখায়। তাই বলা যায়, এখানে কবিতাংশের মাঝে قلب- এর শব্দালংকার ফুটে উঠেছে। আল-কুরআনেও এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন আল্লাহর উক্তি ربك فكبر[৩৭]

পরিশেষে বলা যায়, এভাবে আরবী কবিতার প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে প্রত্যেকটি কবিতার শ্লোকে আরবী অলংকার শাস্ত্রের কোনো না কোনো সূত্রের ব্যবহার ঘটেছে। আরবী অলংকার শাস্ত্রে শব্দালংকার একটি অন্যতম বিষয়। আরবী কবিতার পরিধি অনেক বিস্তৃত হওয়ার কারণে একটি প্রবন্ধে আরবী কবিতার শব্দালংকার আলোচনা করা সম্ভব নয়। সে দিকে লক্ষ্য রেখে আলোচ্য প্রবন্ধে অলংকার শাস্ত্রের শব্দালংকারের উল্লেখযোগ্য কিছু বিশেষ বিশেষ সূত্রের পরিচয় তুলে ধরে উদাহরণ স্বরূপ আরবী কবিতার কিছু পঙ্ক্তির মাঝে সেগুলোর ব্যবহার পর্যালোচনা করার মাধ্যমে সংক্ষিপ্তাকারে আরবী কবিতার শব্দালংকারের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আশা করা যায়, পাঠক সমাজ ও গবেষকবৃন্দ এখান থেকে আরবী কবিতার শব্দালংকারের একটি ন্যূনতম ধারণা পেতে সক্ষম হবেন।

তথ্যনির্দেশ

১ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৩১২।

২ *আল-মুনজিদ* (বৈরুত, লেবানন: আল-মাকতাবাহ আশ-শারকিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১০৫।

৩ *তদেব*।

৪ অধ্যাপক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, *আরবী অলঙ্কার ও ছন্দ প্রকরণ* (কলিকাতা: বাণী মনযিল, ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ভূমিকাংশ।

৫ মুস্তফা আমীন ও আলী আল-জারিম, *আল-বালাগাহ আল-ওয়াযিহাহ* (দেওবন্দ: আল-মাকতাবাতু আত-থানুভী, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ.২৬১।

৬ *তদেব*।

৭ আহমাদ মুস্তফা আল-মারাগী, 'উলুম আল-বালাগাহ (বৈরূতঃ আল-মাকতাবাহ আল- আসরিয়্যাহ, ২০০৫ খ্রি.) পৃ. ২৯৭।

৮ মুস্তফা আমীন ও আলী আল-জারিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৬০।

৯ আস-সাইয়িদ আহমদ আল-হাশিমী, জাওয়াহিরু আল- বালাগাহ (কায়রো: মুআস্‌সাসাতু আল- মুখতার, ২০০৫ খ্রি.) পৃ. ৩১৭।

১০ আহমাদ মুস্তফা আল-মারাগী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৭।

১১ *তদেব*।

১২ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৮।

১৩ মুস্তফা আমীন ও আলী আল-জারিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৬৯।

১৪ আহমাদ মুস্তফা আল-মারাগী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০২।

১৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৩।

১৬ *তদেব*।

১৭ ড. মোহাম্মদ আল-ইসকান্দারী, *দিওয়ানু ইমরু আল-কায়স* (বৈরূত, লিবাননঃ দারু আল-কিতাব আল-'আরাবী, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ১৫।

১৮ আবু মুহাম্মদ আল-কাসিম আল-হারীরী, *শারহু মাকামাত আল-হারীরী* (বৈরূত, লিবাননঃ দারু আল-ফিকর লি আত-তবা'আ ওয়া আল-নশর ওয়া আত-তাওযী, তা. বি.), পৃ. ১১।

১৯ আস-সাইয়িদ আহমদ আল-হাশিমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৭।

২০ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৩।

২১ নাসীফ আল-ইয়াযিজী আল-লুবনানী, *মাজমূ'উল আদব ফী ফুনূনি আল-'আরব* (বৈরূতঃ আল-মাতবা'আতু আল- উম্মাহ, ১৯৩২ খ্রি.), পৃ. ১৬৬।

২২ আহমাদ মুস্তফা আল-মারাগী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০১।

২৩ *তদেব*।

২৪ *তদেব*।

২৫ নাসীফ আল-ইয়াযিজী আল-লুবনানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২।

২৬ আস-সাইয়িদ আহমদ আল-হাশিমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৬।

২৭ নাসীফ আল-ইয়াযিজী আল-লুবনানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২।

২৮ আবু মুহাম্মদ আল-কাসিম আল-হারীরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০৬।

২৯ নাসীফ আল-ইয়াযিজী আল-লুবনানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২।

৩০ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪৬।

৩১ *আল-মুনজিদ*, পৃ. ১০৫।

৩২ আহমাদ মুস্তফা আল-মারাগী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৫।

৩৩ *তদেব*।

৩৪ https:/ al- maktaba.org. তাং ৮/৮/২০০৯

৩৫ http:// www. alfaseeh.com ১/৫/২০১০

৩৬ আহমাদ মুস্তফা আল-মারাগী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৬।

৩৭ সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির, আয়াত নং- ৩।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

নাযিক আল-মালায়িকার কবিতার বিষয় ও বৈশিষ্ট্য
(Topics and Characteristics of Nazik's Poetry)

ড. মো. মনিরুজ্জামান*

Abstract: Nazik Al-Malaikah was one of the leading poets in the modern era. Nazik Al-Malaikah contributed greatly to the development of the modern Arabic poem in terms of its subject matter and structure through her poetic attempts. She was credited with spreading free poetry as a movement that started in Iraq and spread throughout the Arab world. It is characterized by its style in how it is performed and its expression of ideas. The poetry of Nazik Al-Malaikah is characterized by the brevity of the language, the eloquence of the pronunciation, and its original use of artistic images. The lines of the verses are of uneven length, and the music is weak. Her poems include the spirit of the time in which she lives and lives. In her poetry, she portrayed the image of human society in the most beautiful and finest way. In the article, we will look at the topics mentioned by the poetess in her poetry, and the features of her poems will follow them later.

Key words: Origin and Development of Modern Arabic poetry, Life of Nazik Malaikah, Her creativity, Free verse movement, Topics and featurs of her Poetry and characteristics.

ভুমিকা

আরবী সাহিত্যের প্রধান দুটি শাখা হলো গদ্য ও কবিতা। প্রাচীন আরবদের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের প্রকৃত চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে আরবী কবিতায়। প্রাচীন আরবদের সম্পর্কে জানতে চাইলে চোখ বুলাতে হয় তাদের কাব্যগ্রন্থসমূহে। জাহিলী যুগের কবিগণ কালজয়ী কবিতা রচনা করে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অমর আসন দখল করেন। তাদের কবিতা আবর্তিত হতো মরুজীবনকে ঘিরে। জাহেলী যুগেই আরবী সাহিত্যের এ গুরুত্বপূর্ণ শাখাটি সমৃদ্ধ হয়। পরবর্তীকালে আরবী কবিতা ও গদ্য বিশেষ মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়। ইসলামী শাসনামলে আরবী গদ্য ও কবিতা ব্যাপক পরিসরে চর্চা হওয়ায় আরবী সাহিত্যের পরিধি অভূতপূর্ব রূপে বিস্তৃত হয়। কালক্রমে নতুন নতুন ভাবনা ও বিষয়কে ধারণ করতে থাকে। এ অপ্রতিরুদ্ধ যাত্রায় ভাষা ও ভাবের প্রাচুর্যে ছাড়িয়ে যায় সকল ভাষাকে। উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় বিবেচনা করা হয়। এ দুটি যুগে আরবী সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কবিদের আবির্ভাব ঘটে। তাদের রচিত কবিতা দীওয়ান আকারে সংরক্ষিত আছে। এ ধারাবাহিকতায় আধুনিক যুগে আরবী সাহিত্য বিশ্বমানের সাহিত্যের মর্যাদায় উন্নীত হয়। যার ফলে বিংশ শতকে মিসরীয় সাহিত্যিক নাজীব মাহফূজ সাহিত্যের মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি পুরস্কার নোবেল জয় করেন। আরবী গদ্যের মতো পদ্যও সর্বত্র সমাদৃত হতে থাকে। এ শতাব্দীতে আরব কবিদের বিচরণ পরিদৃষ্ট হয় সর্বত্র। আহমদ শাওকী, হাফিজ ইবরাহীম, খলীল মুতরানসহ এক ঝাঁক কবি দাপুটে কলামিস্টদের মতো সাহিত্যাঙ্গনে একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখেন। এ সময় আরবী কবিতার জয়জয়াকার লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক আরবী সাহিত্যের দিগন্তজুড়ে যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁদের মাঝে অনন্য এক কাব্য-ব্যক্তিত্ব নাযিক আল মালায়িকা। ইরাকে জন্ম নেয়া এ মহিয়সী নারী আরবী কবিতায় মুক্তছন্দের অবতারণা করেন। তাঁর এ আধুনিকায়ন আরবী সাহিত্যের পালে নতুন বাতাস হিসাবে গণ্য হয়। এ কবির যশ-খ্যাতি ইরাকের সীমানা ছাড়িয়ে

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আরবের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। আরবী সাহিত্যের উর্বর ভূমি মিসর, লেবানন ও সিরিয়ায় তাঁর কবিতা সাদরে গৃহীত হয়। কবি নাযিক আল মালায়িকা প্রাচীন কাব্যরীতির বিপরীতে ছন্দমুক্ত কবিতা রচনার নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করে আরবী সাহিত্যে নক্ষত্রের স্থানে অধিষ্ঠিত হন।

আধুনিক আরবী কাব্যের সূচনা

১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ান মিসরে অভিযান পরিচালনা করেন। আরব ভূমিতে ফরাসীদের পা ফেলার ফলে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে এক নতুন দিক উম্মোচন হয়। এ যুগে এসে সকল অন্ধকার দুপায়ে ঠেলে নবালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে আরবী সাহিত্য। পাশ্চাত্যের সাথে সংমিশ্রণে আরবী সাহিত্যে আধুনিকতার চরম

শিখরে উন্নীত হতে থাকে। নেপোলিয়নের মিসর অভিযানকালকে আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে عصر النهضة (Renaissance) বা পুর্নজাগরণের যুগ বলা হয়।[১] ১৮০১ সালে ফরাসীগণ মিসর ত্যাগ করে এবং খেদীভ মুহাম্মদ আলী পাশা (১৮০৫-১৮৪৮) রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হন। তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়েন এবং পাশ্চাত্যের অনুকরণে মিসরকে জ্ঞানবিজ্ঞানের দিক থেকে আলোকিত করার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেন। ১৮৪৮ সালে মুহাম্মদ আলী পাশা মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চায় যে আন্দোলনের জোয়ার উঠেছিল তা স্তিমিত হয়ে যায়। কারণ তার মৃত্যুর পর আব্বাস পাশা (১৮৪৮-১৮৫৪) এবং সাইদ পাশা (১৮৫৪-১৮৬৩) ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তারা জ্ঞানবিজ্ঞান বা শিল্প সাহিত্য কোনোটির অনুরাগী ছিল না। যার ফলে এ সময়ে জ্ঞানবিজ্ঞার সাহিত্যচর্চা সব কিছুই নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এরপর ১৮৬৩ সালে মিসরের ক্ষমতায় ইসমাঈল পাশা অধিষ্ঠিত হন। তিনি মুহাম্মদ আলী পাশার অনুসরণ করে মিসরীয়দেরকে আবার জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য চর্চায় উজ্জীবিত করে তোলেন। ইসমাইল পাশা দেশ-বিদেশের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। নতুন সভ্যতা ও পরিবেশে অনেক নতুন নতুন কবি সাহিত্যিকের জন্ম হয়। তিনি তাদের যথার্থ পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। যার ফলে তাঁর আমলে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে এক অভূতপূর্ব উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জিত হয়। পাশাপাশি আরবী কাব্য প্রাচীনতাকে বাদ দিয়ে নতুনত্বের দিকে ধাবিত হয়।[২]

১৮৮২ সালে মিসরের সাথে পাশ্চাত্য তথা ইংরেজদের সাথে প্রচণ্ড গোলমাল ও দ্বন্ধের সৃষ্টি হয়। ইংরেজরা মিশরের রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিবর্তন আনতে চায়। পত্র পত্রিকা, শিল্প-কলা; সাহিত্য সংস্কৃতি প্রভৃত যাবতীয় ক্ষেত্রে তারা আরবী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষাকে প্রাধান্য দিতে চায়। অবশেষে সর্বক্ষেত্রে তারা আরবী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা প্রতিষ্ঠা করতে সফল হল।[৩] এর ফলে আরবী ভাষায় সাহিত্য চর্চার যে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল তা নিষ্প্রভ হয়ে গেল। কিন্তু এ দৈন্যদশা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। মিসরীয়গণ জাতীয় চেতনায় জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। তারা পরাধীন শৃংখল থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের অধিকার আদায় করে নিল; এবার তারা আর সামন্ত প্রভুদের পৃষ্ঠপোষকতা নয়; বরং নিজেরাই নিজেদের পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়ালো। তারই অনিবার্য পরিণতি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত বিদ্রোহ।[৪] মিসর আরবী সাহিত্যের প্রধান কেন্দ্র হলেও অন্যান্য দেশ- সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিনে গণজাগরণের এ ধারা বইতে ছিল। ফলে তারা ইংরেজদের হটিয়ে স্বীয় ভাষার অধিকার অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল এবং মাতৃভাষাতেই পুনরায় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প-সাহিত্য চর্চা করতে শুরু করে।

ইউরোপিয়দের সাথে মিসরীয়দের সংযোগ, পাশ্চাত্যের সাথে প্রাচ্যের মিলনে আরবী সাহিত্য পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ও ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, ক্রমে ক্রমে আরবী কবিতার গঠন-রীতি, বিষয়বস্তু, ভাবধারা পরিবর্তিত হতে থাকে। এ পরিবর্তনের প্রধান অগ্রনায়ক ছিলেন কবি মাহমূদ সামী আল বারূদী (১৮৩৮-১৯০৪), তিনি আরবী কবিতাকে ঢেলে সাজিয়েছেন। কবিতার বিষয়বস্তু, ভাষার আধিক্য, বাক্যালংকার

প্রভৃতি থেকে কবিতাকে মুক্ত করে প্রাঞ্জল, সাবলীল ভাষায় এবং আধুনিক বিষয়বস্তুর দ্বারা আরবী কবিতা সৃষ্টি করেন। তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী কবিগণ কবিতা রচনা করেন। এজন্য তাঁকে আধুনিক আরবী কবিতার পথিকৃৎ বলা হয়। কবি সম্রাট আহমদ শাওকী বেগ (১৮৭১-১৯৩২), মিসরের জাতীয় কবি হাফিজ ইব্রাহিম বেগ (১৮৭০-১৯৩২), ইসমাইল সাবারী (১৮৫৪-১৯২৩) এ সকল স্বনামধন্য প্রতিভাধর কবিদের কবিতা আরবী কাব্যকে উন্নতি ও আধুনিকতার শীর্ষে পৌঁছায়। তবে তাঁরা بحر ও قافيه বহাল রেখে ছন্দবিশিষ্ট কবিতা রচনা করেছেন। প্রাচীন কবিতার বিষয়বস্তু, রচনারীতিকে তাঁরা বাদ দিতে পারেননি। পুরানকে আঁকড়ে ধরে নতুন নতুন বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন। বলা যায়, তাঁরা মধ্যবর্তী এক স্থান দখল করে আছেন। এ সকল কবিদের মধ্যে ছিলেন ইরাকের মারূফ আর-রুসাফী (১৮৬৩-১৯৬৩), সিরিয়ার খলীল মরদম বেগ (১৮৯৫-১৯৫৯) ও অন্যান্য সিরীয় ও মিসরীয় কবি ও সাহিত্যিক।

এরপর আরবী কবিতার ক্ষেত্রে এক নতুন রূপরেখা প্রকাশ পায়। আব্দুর রহমান শুকরী (১৮৮৬-১০৫৮) আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ (১৮৯০-১৯৪৯) প্রমুখ কবিগণ কবিতার বিষয়বস্তুতে এক নতুন পরিবর্তন আনয়ন করেন। তাঁরা সামাজিক কবিতা রচনা করেন, সমাজের মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না যাবতীয় সবকিছু কবিতায় ফুটে তোলেন। বিদেশী-তথা ইংরেজী-ফরাসী কবিতা পাঠ করে তাঁরা একটা কথা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন যে, কবিতা নিজের জন্য নয়, কবিতার ভাষা সমাজের মানুষের জন্য উচ্চারিত হবে। যেমনটি বিদেশী কবিতায় পাওয়া যায়। এ সকল কবিগণ কবিতার রীতিতেও অনেক পরিবর্তন আনেন। তাঁদের হাত ধরে আরবী কবিতা আধুনিকতার ক্ষেত্রে আরো একধাপ এগিয়ে যায়। ১৩৪৩ হিজরিতে আমিন রায়হানী (১৮৭৬-১৯৪০), জিবরান খলিল জিবরান (১৮৮৩-১৯৩১) গদ্য কবিতা রচনা করেন। এরপর মুহাম্মদ হুসাইন আওয়াদ ১৩৪৫ হিজরির দিকে কবিতার নিয়ম লঙ্ঘন করে কবিতা রচনা করেন।[৫] তাঁরা পাশ্চাত্যের বিশেষ করে আমেরিকার চিন্তাধারা ও কাব্যরীতির অনুকরণে কবিতার Style ও Form কে পুরাতন চিন্তাধারা থেকে মুক্ত করে নতুন Style ও Form এ কবিতা রচনা করেন। ফলে রচিত হয় ছন্দমুক্ত (الشعر الحر) কবিতা। ইরাকের কবি নাযিক আল-মালায়িকা ও বদর শাকের আস সাইয়্যাব (১৯২৬-১৯৬৪) ছন্দমুক্ত কবিতার প্রবর্তন করেন। তাঁদের মাঝে কবি নাযিক আল মালায়িকা সর্বপ্রথম ছন্দমুক্ত কবিতা রচনা করেন।[৬] পাশাপাশি তিনি রোমান্টিক কবিতাও রচনা করেন। বিশেষ করে আরব অভিবাসী কবিদের মধ্যে যারা আমেরিকায় বসবাস করতেন, তাঁরা এ জাতীয় কবিতা রচনায় অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁদের মতে, কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দমিলের কোনো প্রয়োজন নেই। যেমনটি অভিবাসী কবি মিখাইল নু'আইমা (১৮৮৯-১৯৮৮) বলেছেন, "কবিতার জন্য ছন্দ কিংবা অন্ত্যমিলের কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, অন্ত্যমিল সম্পন্ন একশ চরণের কবিতার চেয়ে সুবিন্যস্ত ও সঙ্গীত লহরি বিশিষ্ট কিছু গদ্য কবিতা গুণাগুণ বিচারে অগ্রগামী।"[৭]

নাযিক-আল মালায়িকার পরিচয়

নাযিক আল-মালায়িকা। আধুনিক আরবী কাব্যজগতের খ্যাতিমান কবি ও সমালোচক। তাঁর প্রসিদ্ধি মূলত আরবী সাহিত্যে الشعر الحر -এর প্রবর্তক হিসেবে।[৮] কবি নাযিক আল মালায়িকা ১৯২৩ সালের ২৩ আগষ্ট বাগদাদের আকুলিয়া শহরে অবস্থিত দাদার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। সমৃদ্ধ, উচ্চবংশ ও সাহিত্যপ্রেমী হিসেবে এ পরিবারের খ্যাতি ছিল সর্বজন বিদিত। তাঁর পিতার নাম সাদিক আল-মালায়িকা। মাতার নাম সালিমা আব্দুর রাজ্জাক। তার মাতাও একজন কবি ছিলেন। কবি নিজ পরিবারের সঙ্গে দাদার বাড়িতেই বসবাস করতেন। পরবর্তী জীবনে এ বাড়ির অনেক স্মৃতি কবিকে তাড়া করে ফেরে। শৈশবের সে স্মৃতির প্রভাব মন থেকে মুছে ফেলতে পারেননি। তিনি তার দাদার বাড়ির স্মৃতিচারণ করে বলেন:[৯]

أذكر أننا كنا نعيش في منزل شاهق عتيق، يقوم في ناحية من بغداد في طفولتنا : فقد كان القدم يخلق حول البيت جوا من الرهبة الغامضة والعظمة الصامتة التي تركت في حياتنا حتي اليوم آثارا شديدة العمق-

এ বাড়িতেই কবি নাযিক আল-মালায়িকা সাত বছর বয়স পর্যন্ত অবস্থান করেন। অতঃপর ১৯৩৮ সালে তার পরিবার চলে আসে কারাদা শহরে এবং সেখানেই থাকেন। তাঁর পিতাও অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন। পিতার স্নেহ-যত্ন, ভালবাসা তাঁকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। তিনি নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করতে সক্ষম হন। নাযিক নামটি তাঁর পিতাই রেখেছিলেন। কিন্তু "মালায়িকা" তাঁদের বংশীয় উপাধি।[১০] নাযিক এর নানা মুহাম্মদ হুসাইন কাব্বাহ (১৮৫২-১৯১৭) তৎকালে একজন কবি, বড়ো মাপের আলেম ব্যক্তিত্ব ও পণ্ডিত ছিলেন। মাতা সালিমা মালায়িকাও একজন কবি ছিলেন। পিতা সাইয়েদ সাদিক মালায়িকা একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মামা জামিলও কবি ছিলেন। তিনি رباعيات الخيام - তরজমা করেন, এছাড়া অনেক গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেন। আরেক মামা সাইয়েদ আব্দুল সাহেব তাঁর একটি দীওয়ান রয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই নাযিক আল-মালায়িকার মাঝে কবিত্ব ভাব ফুটে উঠেছে।[১১] পাঁচ বছর বয়সে রিয়াদুল আতফাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। এরপর বাগদাদের কুর্দী গার্লস প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হন। সে সময়ে স্কুল সংখ্যা বিশেষ করে মহিলা স্কুল সংখ্যা কম ছিল। এ স্কুলেই তিনি মনোযোগ সহকারে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে পড়াশুনা শুরু করেছিলেন। ক্লাসের সহপাঠীদের সাথে সবসময় মিলে মিশে থাকতেন। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে অংক বুঝতে একটু কষ্ট হতো, তবে নাহু সরফ খুব ভাল বুঝতেন, মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন।[১২]

অতঃপর তিনি বাগদাদের টিচার্স টেনিং কলেজে ভর্তি হন। সেখানে আরবী ও ইংরেজি ভাষার উপর বিশেষ জোর দেন।[১৩] মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি জানতেন বিধায় তিনি বাইরুন, শেলী, জনকিডস্ এর লেখা পড়তে পারতেন। এতৎসত্ত্বেও তিনি ইংরেজি ভাষা রপ্ত করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং তিনি বৃটিশ সংস্কৃতি/রীতিতে ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য একটি কোর্সে ভর্তি হন। ১৯৫০ সালে পরীক্ষায় পাস করেন।[১৪] তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকার রোকপেলজে অবস্থিত বোস্টন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা শুরু করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল ছেলেদের সেখানে তিনি একাই মেয়ে। আর লেখাপড়ার ক্ষেত্রে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। আরবী সাহিত্যে সমালোচনা সম্পর্কে সেখানে শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রচারিত বিভিন্ন সাহিত্যিক বিষয়াবলি সম্পর্কে জানতে পারেন।[১৫]

১৯৫১ সালে আমেরিকা থেকে মাতৃভূমি ইরাকে চলে আসেন। একনিষ্ঠভাবে সাহিত্য সমালোচনার বইসমূহ পড়তে থাকেন। এরপর ১৯৫২ সালে বাগদাদের মহিলাদের উদ্দেশ্যে একটা বক্তৃতা পেশ করেন। যার বিষয়বস্তু ছিল- المرأة بين السلبية والأخلاق (অনৈতিকতা ও নৈতিকতার মাঝে নারীর অবস্থান)। এ বক্তৃতায় তিনি বাগদাদের মহিলাদের করুণ ও দুরবস্থার উপর সমালোচনা করেন, তাদের জরুরী ভিত্তিতে মুক্তি প্রদানের প্রতি জোর দেন এবং এ জড় ও অচল অবস্থা থেকে দ্রুত স্বাধীনতার লাভের জন্য নারীদের প্রতি আহ্বান জানান। তার লেখা কবিতা, প্রবন্ধ, সমালোচনামূলক লেখা সবকিছুই বৈরুতের আল-আদাব নামক পত্রিকায় প্রকাশ হতে থাকে।[১৬] নাযিক আল মালায়িকা ১৯৫৮ সালে দামেস্কে অনুষ্ঠিত আরব সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দেন। স্বদেশ ইরাকের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা তাঁর শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ কারণে তিনি আবার ইরাক ত্যাগ করেন এবং বৈরুতে একবছর (১৯৫৯-৬০সাল) অবস্থান করেন। বৈরুতের আল আদাব পত্রিকায় তাঁর রচিত অনেক জাতীয় কবিতা প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৬০ সালে বৈরুতে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত কবি ইলিয়া আবু মাদীর উপস্থিতিতে এক সম্মেলনে যোগ দেন। অতঃপর ১৯৬২ সালে বাগদাদে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি পুনরায় বাগদাদে ফিরে আসেন এবং এ কলেজে

যোগদান করেন। এছাড়া বিভিন্ন সাহিত্যিক সম্মেলন, সাংস্কৃতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এসকল সম্মেলনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন ছিল কায়রোতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান ও আফ্রিকান সাহিত্যিকদের সম্মেলন এবং বৈরুতে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলন।[১৭]

১৯৬১ সালের জুন মাসে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী ড. আব্দুল হাদী মাহবুব এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৬২ সালের ২৩ অক্টোবর সোমবার একমাত্র ছেলে বাররাক জন্মগ্রহণ করেন।[১৮] ১৯৬৪ সালে তিনি বাগদাদ ত্যাগ করে বসরায় চলে যান। সেখানে তাঁর স্বামী প্রধান হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ১৯৬৯ সালে তার পিতা মারা যান। পিতার মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোকাহত হন। ১৯৬৪ সালে নাযিক আল-মালায়িকা কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগের প্রধান হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। অতঃপর ১৯৬৪ সালে তিনি কায়রো চলে আসেন। সেখানে তিনি ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্য ভাষাসাহিত্য ও গবেষণার উপর একটি বক্তৃতা উপস্থাপন করেন।[১৯] ১৯৮২ সালে নাযিক আল-মালায়িকা কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কয়েক বছর পর নাযিক আল-মালায়িকা ইরাক ফিরে আসেন। ১৯৮৭ সালে ১৫ই ডিসেম্বর তিনি বাগদাদে পৌঁছেন। বাগদাদে অবস্থানকালে তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে স্নায়ুবিক দুর্বলতার শিকার হন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তিনি দিনের অধিকাংশ সময় ঘুমিয়ে কাটাতেন। এরপর ১৯৯২ সালে বসরা বিশ্ববিদ্যালয় নাযিক আল-মালায়িকাকে আরবী কাব্যে তাঁর অবস্থান ও অবদানের জন্য গৌরবজনক ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বিশ্ববিদ্যালয় আরো সিদ্ধান্ত নেয় যে, ১৯৯২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েটদের অনুষ্ঠানে তাকে এ সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করা হবে। কিন্তু নাযিক আল-মালায়িকা অসুস্থতার জন্য বসরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে সক্ষম হলেন না।[২০] ২০০৩ সালে আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করলে তিনি মিসর চলে আসেন। কবি নাযিক আল মালায়িকা দশ বছরের বেশী সময় পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত। ডাক্তারের মতে, তিনি এতই অসুস্থ যে, তার পক্ষে আর লেখালেখি করা সম্ভব নয়। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁকে সবসময় চলতে হবে। এ সময় তিনি গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় মিসরের হাসপাতালে অচেতন অবস্থায় ছিলেন। হাসপাতালের চিকিৎসক ড. সাবরী আব্দুল আজিজ বলেন, "পাঁচ সপ্তাহ পূর্বে কবি এ হাসপাতাল ভর্তি হয়ে আছেন। তিনি বার বার মুর্ছা যাচ্ছেন, যখনই জ্ঞান ফিরছে তখনই ইরাকের শেষ খবর জানতে চাচ্ছেন। তিনি ইরাকে যেতে চাচ্ছেন। কিন্তু তাঁর এখন পরিপূর্ণ যত্ন নেয়া প্রয়োজন।"[২১] এ প্রতিভাবান কবি ২০ শে জুন, ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের কায়রোতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। পশ্চিম কায়রোতে অবস্থিত পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[২২]

আরবী সাহিত্যে নাযিক আল মালায়িকার অবদান

ইরাকের প্রখ্যাত মহিলা কবি নাযিক আল-মালায়িকা কেবল একজন কবিই ছিলেন না। আক্ষরিক অর্থেই তিনি ছিলেন সব্যসাচী। একাধারে একজন সুদক্ষ সাহিত্যিক, সুনিপুণ সমালোচক ও রুচিশীল গল্পকার। তিনি অনেক কবিতা ও গল্প রচনা করেছেন। তাঁর সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা করলে নানা রঙের সাহিত্যের সমাহার পাওয়া যায়। তাঁর রচনাবলি নিম্নরূপ- [২৩]

দীর্ঘ কবিতা: তাঁর লেখা দুটি দীর্ঘ কবিতা রয়েছে। একটি হল مأساة الحياة যা ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হয়। অপরটি হলো- أغنية للإنسان যা ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়।

দীওয়ান: তাঁর রচিত কবিতাসমূহ চারটি দীওয়ান আমাদের নিকট বর্তমান। তা হলো-عاشقة الليل (১৯৪৭), شظايا ورماد- ১৯৪৯, قرارة الموجة - ১৯৫৭ এবং شجرة القمر -১৯৬৮

সমালোচনাগ্রন্থ: قضايا الشعر المعاصر যা ১৯৬২ সালে এটি প্রকাশিত হয়।

গল্প: নাযিক আল-মালায়িকা রচিত ছয়টি গল্প আমাদের নিকট বর্তমান। তা হলো-

الياسمين ، ظفائر السمراء عالية ، منحدر التل ، إلى حيث النخيل والموسيقى ، قناديل لمندلي المقتولة ، الشمس التي وراء القمة .

কবিতায় সৃজনশীলতা

কবি নাযিক মালায়িকা ছিলেন একজন বিষণ্নবাদী কবি। তিনি বিষণ্নতার ভিন্ন এক জগতে বসবাস করতেন। তিনি সর্বদা হতাশা, মানসিক যন্ত্রণা, একাকিত্ব এবং অতীত স্মৃতিতেই পড়ে থাকতেন। তিনি ছিলেন খুবই রোমান্টিক এবং ইমোশনাল একজন মানুষ। সর্বদা তিনি সুদূর জগত সম্পর্কে কথা বলতেন। তিনি পরিবারের সাথে থাকা সত্ত্বেও নিজেকে সব সময় একাকী অনুভব করতেন। ফলে তাঁর কবিতায় এ সকল বিষয়গুলো বরাবরই ফুটে উঠত, যা তার বিষণ্নতা এবং যন্ত্রণাকে আরো বৃদ্ধি করে দিত। ফলে তিনি সর্বদা এক শোকে মত্ত থাকতেন। অন্য দিকে এসবের তুলনায় তাঁর ভালোবাসাটা ছিলো খুবই তুচ্ছ এবং নগণ্য, যা তার বিয়োগান্তক বেদনাকে প্রশমিত করতে সক্ষম হতো না। কেননা তিনি সদা ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হতেন।[২৪]

কবি নাযিক আল-মালায়িকার অধিকাংশ কবিতা তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতাসূলভ। কেননা তিনি সর্বদা অভিযোগ, কান্না এবং কষ্ট-বেদনায় ডুবে থাকতেন । যার কারণে তিনি অন্যের যন্ত্রণা-বেদনা ভালোমতো অনুধাবন করতে পারতেন। তিনি তাদের কষ্ট, বেদনা এবং তাদের বিয়োগান্তক ঘটনাগুলোকে ভালোভাবে বুঝতে পারতেন, যা তার জীবনের ঘটনাগুলোর সাথে মিলে যেত। তিনি তার অনুধাবিত বিষয়গুলো ছোটোগল্প, নাট্য কবিতা ইত্যাদিতে প্রকাশ করতেন, যা তাঁকে আধুনিক কবিতার অন্যতম একজন কবি হিসেবে প্রসিদ্ধি এনে দেয়। কিন্তু তিনি তার দুঃখ-কষ্টের জন্য কখনই অশ্রুবিসর্জন করতেন না এবং অশ্রুসিক্তও হতেন না, যেমনটি শোকেমত্ত ব্যক্তি অশ্রু বিসর্জন করে।[২৫] নিঃসন্দেহে নাযিক মালায়িকা আধুনিক কবিদের অন্যতম একজন ছিলেন, যাঁরা কবিতা রচনায় নতুনত্বের প্রতি আহ্বান করেছেন। তাঁর সম্পর্কে অবু সা'দ আহমদ বলেছেন, নাযিক আল মালায়িকা সমসাময়িক কবিদেরকে প্রাচীন পদ্ধতিতে কবিতা রচনা থেকে বের হয়ে আসার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি চরম দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন।[২৬]

নাযিক আল-মালায়িকার কবিতায় অধিক আবেগ এবং সীমাহীন যন্ত্রণার বিষয়টি স্পষ্ট ছিল। তিনি ছিলেন প্রাচ্যের একজন নারী কবি, যিনি স্বাভাবিক সুন্দর জীবনযাপন করতে পছন্দ করতেন এবং জীবনের ঊষালগ্নে তিনি জীবনকে যেভাবে অনুভব করতেন সেভাবেই তিনি জীবনযাপন করতে পছন্দ করতেন। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে তিনি জীবনকে তাঁর কল্পনার বিপরীতভাবে দেখতে পেলেন। তিনি জীবনের মাঝে অনেক কঠোরতা, বাধা-বিপত্তি, রক্ষণশীলতা, দমন-নিপীড়ন এবং বন্দী জীবনের চিত্র প্রত্যক্ষ করেন। ফলে তিনি অধিক হতাশাগ্রস্থ ও বিষণ্ন হয়ে পড়েন, যা তাঁর মনে বিশাল এক রেখাপাত করে। তিনি বিষণ্নতা ও অতীত স্মৃতির মাঝে নিজেকে সমাধিস্থ করে ফেলেন। রাত্রির কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে রাতের অন্ধকারে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে থাকেন, ফলে রাত্রিজাগরণ তার কাছে অধিক প্রিয় হতে লাগল। এভাবে তার মনের ভেতর লুকায়িত অব্যক্ত ইচ্ছেগুলো প্রাধান্য পেতে থাকে। অতঃপর তিনি সেগুলোকে বিভিন্ন কাব্যিক রূপ দিয়ে কবিতায় প্রকাশ করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি তাঁর এই কবিতাগুলোর এক দীওয়ান প্রকাশ করেন, যা ছিল তাঁর প্রথম দীওয়ান এবং সম্পূর্ণ রোমান্টিক ও প্রাচীন অনুকরণীয় পদ্ধতিতে রচিত। অতঃপর তিনি তাঁর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দীওয়ান আধুনিক এবং বিদ্যমান প্রতীকী রূপে প্রকাশ করেন, যা ছিল মুক্তছন্দ কবিতার উপর রচিত। তাঁর গোপন বুদ্ধিমত্তা এবং নিজের চিন্তাশীলতার মাঝে যা কিছু বিচরণ করত তাতে তিনি তাই প্রকাশ করতেন, যা সর্বদা কবিতার আধুনিকায়নের কথা বলতো। আবু সা'দ তাঁর বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে

আরো বলেন, এই নাযিক আল-মালায়িকা ছিলেন রাত্রের প্রেমিক, দুঃখ কষ্টের হাবিয়া, যন্ত্রণার যাঁতাকলে পিষ্ট। অন্ধকারকেই তিনি বন্ধু মনে করতেন, দুঃখ-কষ্টে প্রভুকে খুঁজে পেতেন, মৃত্যুর মাঝেই সর্বশেষ আশ্রয় এবং মুক্তি খুঁজে পেতেন। তিনি যেন স্বীয় জানাজার পেছনে হেঁটে চলেছেন, যার প্রতিটি শব্দ ছিল তাঁর স্বপ্নের সমাধী। রোমান্টিকতার দিক থেকে তিনি ছিলেন বিলাপকারী জন কিটস এর মতো, আত্মকেন্দ্রিকতার দিক থেকে তিনি ছিলেন বিষাদগ্রস্ত অ্যালান বুউ এর মত আর নাস্তিক্যতার দিক থেকে তিনি ছিলেন আল্যুট এর মতো। তার কবিতার মাঝে আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ প্রবাস কাব্যধারা পরিলক্ষিত হত। এতৎসত্ত্বেও তিনি ছিলেন একক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং বিশেষ স্বভাবের অধিকারী, যা খোদাপ্রদত্ত ইলহামের ঝর্ণাধারার ফোয়ারা ফুটাত, যেগুলো তাঁর প্রকৃত কাব্যিক যোগ্যতার পরিচয় বহন করে।[২৭]

তবে তাঁর এই কাব্যিক প্রতিভায় কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে, তা হলো তাঁর সর্বদা হতাশাতন্তুর এই সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গীর মাঝে পড়ে থাকা, অশুভ পরিণামের দিকে ধাবমান, বাহ্যিক অস্তিত্বের অবহেলা এবং স্বীয় সত্তার মাঝে এমনভাবে লুকিয়ে থাকা, যা তাঁকে দিনে দিনে অসুস্থতার দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। শৈল্পিক দিক থেকে তাঁর নেতিবাচক দিক হলো, দুর্বুদ্ধ ও দুর্লভ শব্দ চয়ন, নাতিদীর্ঘ বর্ণনাভঙ্গি যা তাঁর অনুভূতি প্রকাশকে অনেক দুর্বল করে দেয় এবং তাঁর সাহিত্যমান কমিয়ে দেয়। কিন্তু এই সকল মন্দ দিক অবিবেচ্য হয়ে যায় যখন এই ব্যাপারটি আমরা জানতে পারি যে, কবি এবং তাঁর বংশধর ইরাকে শিল্পের ময়দানে এমন পথে হেঁটেছেন, যে পথে ইতোপূর্বে আর কেউ চলতে পারেনি। নিঃসন্দেহে নাযিক আল-মালায়িকা ইরাকের প্রসিদ্ধ কবিদের একজন ছিলেন। যদিও এই প্রসিদ্ধ কবিদের সংখ্যা ইরাকে খুবই নগণ্য। তথাপিও কাব্যজগতে তিনি খুবই প্রসিদ্ধ একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কেননা তিনি ছিলেন একজন নারী কবি। অন্যদিকে পুরুষ কবিদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি এবং তিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে নারী জাগরণের কথা বলেছেন। তবে কুমারী নাযিক আল-মালায়িকার দুঃখ কষ্টের যে কারণগুলো তাঁর কবিতার প্রতিটি শ্লোকের মাঝে উদ্ভাসিত হতো, তা হলো রাত্রিকে অধিক পরিমাণে ভালোবাসা তথা রাত্রিজাগরণ। তবে এটা তার বঞ্চনা, প্রেমে ব্যর্থতা বা মৃত্যুর চিন্তার জন্য ছিল না, বরং এটি ছিল একদিক থেকে মৃত্যু এবং জীবনকে নিয়ে তাঁর অধিক শঙ্কিত হওয়ার কারণে এবং অন্য দিক থেকে মনুষ্যত্বের অবস্থা নিয়ে অধিক বিভোর হওয়ার জন্য। অতঃপর তাঁর এই চিন্তা চেতনা এবং দৃষ্টিভঙ্গিগুলো অনুভূতিতে স্থানান্তরিত হয়ে অন্তরকে এমনভাবে ক্ষত-বিক্ষত করে যা কখনোই সেরে ওঠার ছিল না। এরপর সেগুলো তাঁর মনের মধ্যে স্থায়ী দুঃখ-কষ্ট-বেদনা সৃষ্টি করতে থাকে।[২৮]

মুক্তছন্দ আন্দোলন

আরবী ছন্দবিদ্যার জনক খলিল আহমাদ আল-ফারাহিদি (৭১৮-৭৯১ খ্রি.) উদ্ঘাটন করেছেন এর তাল-লয় ও ছন্দের প্রকৃত রহস্য। সম্পূর্ণ স্বতস্ফূর্তভাবে এঁকেছেন এর মানচিত্র। আরবী কবিতার এ ধারাই চলে আসছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। কবিগণ তাঁর সোনালী ফ্রেমেই বন্দি করতেন সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথামালা। খলিল আহমাদ আল ফারাহিদীর উদ্ভাবিত নিয়ম ও ওজনে উত্তীর্ণ না হলে তা কবিতা বলে গণ্য করা হতো না। কিন্তু পরিবর্তনশীল বিশ্বে সনাতনী ধারাসমূহ ভেঙ্গে যাত্রা শুরু হয় নতুন নতুন ধরন ও রীতি। ৪০-এর দশকে এ রূপায়ন আরো গতি লাভ করে। সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ৬০-এর দশকে আন্দোলনের প্রাবল্য ছেপে যায় সবকিছুতে। পরিবর্তনের এই সমীরণ আরবী কবিতাকেও ছুঁয়ে যেতে থাকে। আরবী কবিতায় পরিবর্তনের মৃদু ঢেউ শুরু হয় দিওয়ান-প্রণেতাগণ, আবুলুলু ধারার কবিতা ও প্রবাসী কবিদের থেকে। এরপর তরঙ্গায়িত হতে থাকে নাযিক আল-মালায়িকা, বদর শাকির আস-সাইয়াব, বুলানদ আল-হায়দারী, শাজিল তাকাহ, আলী আহমাদ সাইদ, ইউসুফ আল-খাল, মাহমুদ দারবিশ, সামিহ আল-কাসিম, সালাহ আব্দুস সবুর, আহমাদ আব্দুল মু'তি হিজাজি, মুহাম্মাদ ফায়তুরী ও আব্দুল ওয়াহহাব বায়াতি প্রমুখের হাত ধরে। নাজিক আল-মালায়িকা ও বদর শাকির আস-সাইয়াবকে এ ধারার কবিতার প্রধান পথিকৃৎ মনে করা হয়। ইরাকে সর্বপ্রথম الشعر الحر (Free verse)-এর সূচনা হয় ১৯৪৭ সালে কবি নাযিক আল-মালায়িকার

"الكوليرا" কবিতার মাধ্যমে। ১৯৪৭ সালে কবিতাটি বৈরুত থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। S. moreh বলেন:[২৯]

At the end of the same year (1947) two young Iraqi poets, both graduates of the teachers' training collage, Badar Shakir al-Sayyab (1926-64) and Mrs. Nazik al-Malaika (b-1923) succuded in creating accomplished lyric poems, based on what Seemed a new and revolutionary.

নাযিক আল-মালায়িকাকে رائدة الشعر الحر তথা মুক্তছন্দের অগ্রদূত বলা হয়। তাঁকে حركة الشعر الحر - এর মাতাও বলা হয়। নাযিক আল মালায়িকার প্রথম মুক্তছন্দ কবিতা "الكوليرا" (কলেরা) কবিতার কতিপয় চরণ হলো[৩০]

سكن الليل

أصغ إلى وقع صدى الأنات

في عمق الظلمة - تحت الصمت - على الأموات

صرخات تعلو ، تضطرب

حزن يتدفق، يلتهب

يتعثر فيه صدى الأهات

في كل فؤاد غليان

في الكوخ الساكن أحزان

"রাত্রি শান্ত হল

কর্ণকুহরে প্রবেশ করল কান্নার প্রতিধ্বনি

গভীর অন্ধকারে নিরবতার মাঝে মৃত্যুর উপর

চিৎকার বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিচলিত হচ্ছে।

চিন্তা স্ববেগে বের হয়ে আসছে, জ্বলে রক্তিম বর্ণ ধারণ করছে,

দুঃখ বেদনার আঘাত উহাতে হোঁচট খাচ্ছে।

সকল হৃদয়ে ব্যথা জাগ্রত হচ্ছে,

বসবাসের কুঁড়ে ঘরেও রয়েছে চিন্তা-বেদনা।"

কবিতার বিষয়বৈচিত্র

কবিতার বিষয়: কবি নাযিক আল-মালায়িকা নিজেকে হতাশা, দুঃশ্চিন্তা, নীরবতার মাঝে আবদ্ধ করে রেখেছেন। ইংরেজ কবিদের কবিতা পাঠ, বৃটিশদের হস্তক্ষেপ, মহিলাদের সামাজিক অবস্থা, সবকিছুই তাঁর

হৃদয়ে আঘাত করেছিল। আর তা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতা জুড়ে রয়েছে মৃত্যুর ভয়, হতাশা, অশুভ কামনা, মানুষের দুঃখ সমাজের দুরবস্থা। এজন্য তাকে বলা হয়, شاعرة متشائمة -অশুভ মনোভাবের কবি। তাঁর কবিতা পাঠ করলে যেসব বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হলো–

১. হতাশা-বিষণ্নতা: হতাশাব্যঞ্জক কবি নাযিক আল মালায়িকার কবিতা পর্যালোচনা করলে প্রথমেই যে বিষয়টি প্রকাশ পায় তাহলো তাঁর হতাশা ও বিষণ্নতার সুর। এ বিষণ্নতার সুর তাঁর কবিতাকে কলুষিত করেছিল। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অভিজ্ঞতা, সাংস্কৃতিক চিন্তা, ইংরেজ রোমান্টিক কবি জনকিন্স, শেলী, বাইরুন এর কবিতা কবির অন্তরে হতাশা-বিষণ্নতা প্রবেশ করিয়েছিল। তাঁর কাব্যিক চেতনা গভীর কালো অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছিল। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কালো আভা কালো ছায়া বিরাজ করছে। যেমন তাঁর দীর্ঘ কবিতা مأساة الحياة -এ কবির শুধু হতাশা মনের বিষাদ চিত্রই সর্বত্র ফুটে উঠেছে। সুখের সন্ধানী কবি সর্বত্র সুখ খুঁজেছেন। কিন্তু কোথাও সুখ পাননি। তিনি بين قصور الأغنياء কবিতায় বলেন:[৩১]

لم أجد في القصور إلا قلوبا - حائرات وعالما محزونا

ليس إلا قوم يضيقون بالأ يا - م ضيق الجياع والبائسينا

"আমি প্রাসাদগুলোতে অস্থির কিছু হৃদয় ও বেদনাভরা জগত দেখতে পেয়েছি,

তারা এমন শ্রেণি যারা ক্ষুধার্ত ও হতভাগাদের মতো সময়ের সাথে কার্পণ্য করে।"

২. রাত-প্রেমিকা: عاشقة الليل -রাত-প্রেমিকা কবির অনবদ্য দীওয়ান। কবি নাযিক আল-মালায়িকা রাতকে ভালোবাসেন। কেননা, রাত অন্ধকারসহ সবকিছুকে ঢেকে রাখে। রাতে দুঃশ্চিন্তা, বিষণ্নতা, হতাশা, যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। তিনি দিনের চেয়ে রাতকে বেশি প্রাধান্য দেন। তিনি অন্ধকারকে ভালোবাসেন। রাতে অন্ধকার নেমে আসে, ফলে কিছুই দেখা যায় না। কবি একাকীত্ব, নীরবতাকে ভালোবাসেন। রাতেই সবকিছু নীরব থাকে, সব কিছুই একাকীত্বের মধ্যে আসে। কবির ভাষায়:[৩২]

كنت وحدي لم يكن يتبع خطوي غير ظلي

أنا وحدي و الليل الشتائي وظلي

"আমি একা, নেই কোনো অনুগামী ছায়া ছাড়া

আমি একা, শীতের রাত আর ছায়া আমার সঙ্গী।"

৩. শোকগাথা ও ক্রন্দন: কবি নাযিক আল-মালায়িকার কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি বিষয়বস্তু হলো مرثية তথা শোকগাথা। তিনি তাঁর নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনদের উদ্দেশ্য করে শোকগাঁথা রচনা করেছেন। তাঁর ফুফুর স্মরণে রচনা করেন هل ترجعين কবিতাটি। এ কবিতার পাঁচটি স্তবকের প্রত্যেকটি স্তবকের শেষে তিনি একটি হতাশার বাণী উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন-[৩৩]

الشوق للموتى سهاد ليس يشفيه الضياء

الشوق للموتى جراح ليس يقربها شفاء

أبكي ؟ أذوب ؟ سدي؟ فبعض النار يأبى الانطفاء

بعض التعطش مستحيل أن يطوف به ارتواء

يبقى يمزقني و أنت بعيدة لا تدركين

وأنا انتفاض صارخ في حسرة : هل ترجعين

"অনিদ্রিত মৃত ব্যক্তির জন্য আগ্রহ, যার কোনো প্রশমিত আলো নেই,

আগ্রহ আঘাত প্রাপ্ত মৃতব্যক্তির জন্য, আরোগ্য যার নিকটবর্তী হতে পারে না।

আমি কাঁদি? আমি বিগলিত হই? অনিদ্রায় থাকি? কিছু কিছু আগুন নিভতেও অস্বীকার করে।

কিছু কিছু পিপাসা মিটানো অসম্ভব, উহা পরিতৃপ্তির জন্য ঘুরতে থাকে,

অবশিষ্ট ভালোবাসা আমাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, জীবনতো অনেক দূরে, যাকে ছোঁয়া যায় না।

আমি আন্দোলিত হই দুঃখকষ্টে চিৎকার করতে থাকি : তুমি কি ফিরে আসবে?"

৪. মৃত্যুর চিন্তা: কবি নাযিক আল মালায়িকার কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্যতম হলো মৃত্যুর চিন্তা। মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজনদের মৃত্যু তাঁর অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে। আর কবি কবিতার ভাষায় সে মৃত্যুর ভয়, মৃত্যুর চিন্তা ব্যক্ত করেছেন। সারাক্ষণ মৃত্যুর চিন্তা তাঁকে আগলে রাখতো। তাঁর অনেক কবিতায় আমরা মৃত্যুর কথা পাই। তিনি عاشقة الليل -দীওয়ানে الموت শব্দটি ৬১টি বার উল্লেখ করেছেন। ২টি কবিতায় الموت শব্দ ব্যবহার ছাড়া মৃত্যুর কথা বলেছেন। سياط وأصداء কবিতায় তিনি বলেন:[৩৪]

وغدا ستطويك الليالي في دياجير الهلاك

وغدا سيأسرك التراب فلا شعور ولا حراك

"আগামীকাল অচিরেই আপনাকে গুছিয়ে আনবে রাত্রিসমূহ তার ধ্বংসের অন্ধকারের মাঝে,

আগামীকাল অচিরেই মাটি তোমাকে আবদ্ধ করবে, তখন থাকবে না কোনো অনুভূতি, স্পন্দন।"

৫. মানবতাবোধ: মানবদরদী কবি নাযিক আল-মালায়িকার কবিতায় তাঁর অন্তরের গভীর থেকে জাগ্রত মানবতাবোধ, মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, সহনশীলতা ফুটে উঠেছে। কবি বলেন:[৩৫]

يا رياح الليل رفقا بالرفات

وأهدأى ، لا تقلقي جسم الغريق

حسبه ما مزقت أيدي الحياة

فليكن منك له قلب صديق

"হে রাতের বাতাস, জীর্ণ-শীর্ণ হাড্ডির প্রতি কোমল হও,

তুমি শান্ত হও, ডুবন্ত ব্যক্তির আত্মাকে তুমি উৎকণ্ঠিত করো না,

উহার কারণ হলো জীবনের হাতকে তুমি চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছ,

এজন্য তোমার পক্ষ থেকে তার জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ হৃদয় হওয়া উচিত।"

কবিতার বৈশিষ্ট্য

বিশ্বসাহিত্য ও আরবী সাহিত্যের দিকপাল কবি নাযিক আল মালায়িকা। যার কবিতার মাঝে প্রকাশ পেয়েছে হতাশা-দুঃশ্চিন্তা, তৃষ্ণাকাতর পিপাসার্তের আর্তনাদ। তিনি কল্পনার জগতে ভেসে বেড়িয়েছেন। তার কবিতায় যে সব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তা হলো:

তিনি বর্তমানকে অতিক্রম করেছেন। শৃঙ্খলিত জগতে তিনি রোমান্টিক ও বিপ্লবীচেতনাপূর্ণ কবিতা উপস্থাপন করেন। তিনি الرحيل কবিতায় বলেন-[৩৬]

وفي الغد من بعدنا أن أطل حبيبي القمر

ولا مس ضوء النجوم التشاؤمي خرير النهر

ورن مع الليل صوت يعيد الصدى و اندثر

فقولي له اننا لن نعود

الأرض القيود

فقد أشرق الفجر مند عصور

"আমাদের পরে আগামীকাল আমার বন্ধু চাঁদ উঁকি দিবে

অশুভ নক্ষত্রের আলো স্পর্শ করবে না নদীর স্রোতকে,

"রাতে গভীর কান্নাররোল ভেসে আসবে এবং হারিয়ে যাবে,

তাকে বলো, নিশ্চয়ই আমরা কখনো ফিরব না,

এ জগৎ শৃঙ্খলিত

যুগে যুগে উষার আলো ছড়িয়েছে।"

কবি নাযিক আল-মালায়িকা জীবনের এ বিচিত্ররূপ, হাজারও দুঃখ-যন্ত্রণার কথা ভেবে হতাশ হয়ে ফিরেছেন। তিনি মনে করেন, এ বিশ্ব হতাশা, ভয় আর অস্তমিত কিরণ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। সৃষ্টিকুলে যা প্রচলিত আছে তা সবই বিবেক বর্জিত। অতঃপর এ অতীত হতাশাপূর্ণ পৃথিবী বোঝা বহন করছে, যা মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে অভিশাপের দিকে। হতাশার অনুভূতি যার শেষ পরিণাম। যেমন তিনি قوقعة سيزيف কবিতায় বলেন:[৩৭]

أين أمشي؟ مللت الدروب

وسئمت المروج

و العدو الخفي اللجوج

لم يزل يقتفي خطواتي فأين الهروب

"কোথায় চলছি? বিরক্ত হচ্ছে গলিগুলো
মাঠঘাট বিরক্ত হয়ে পড়েছে,
গোপন শক্ররা পেছনে ক্রমান্বয়ে আমার পদাঙ্কনুসরণ করছে
কোথায় পালাবো এখন।"

কবি নাযিক আল মালায়িকার কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি ইংরেজ কবি শেলী, জন কিডস্, বাইরুন শেক্সপিয়ার প্রমুখ কবিদের চিন্তাধারার সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁদের মতো আশার বাণী ব্যক্ত করেন, অন্ধকারকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে বিশাল সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন। তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। তিনি কালের শক্তিকে ফিরিয়ে আনেন। তাই তিনি বলেন:[৩৮]

اغضب ، أحبك غاضبا متمردا
في ثورة مشبوبة و تمزق
أبغضت نوم النار فيك فكن لظى
كن عرق شوق صارخ متحرق

"তুমি রাগান্বিত হও, আমি তোমাকে ভালোবাসি
রাগান্বিত ও বিদ্রোহী অবস্থায়।
তারুণ্যময় বিপ্লবে, খণ্ডবিখণ্ড হতে
আমি অপছন্দ করি, তোমার মাঝে ঘুমন্ত অগ্নিকে,
অতঃএব তুমি হও জ্বলন্ত অগ্নিশিখা।
তোমার আগ্রহ ঘর্মাক্ত হোক (তুমি হও) প্রফুল্লিত চিৎকারকারী।"

কবি নাযিক আল-মালায়িকা সামাজিক ও মানবতাবোধ সম্পন্ন কবি ছিলেন। এ মনোভাব তাঁর কবিতায় প্রকাশ করেছে। তিনি শুধু নিজের ব্যথাই অনুভব করেননি; বরং সমাজের ব্যথাও অনুভব করেছিলেন এবং কবিতার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। কবি নাযিক আল-মালায়িকার কবিতার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল মুক্ত ছন্দ কবিতার প্রবর্তন। ১৯৪৭ সালে "কলেরা" কবিতার মাধ্যমে তিনি এ ধারার প্রবর্তন করেন। নাযিক আল-মালায়িকা বলেন:[৩৯]

علينا أن نتذكر ان الشعر الحر ليس خروجا على قوانين الوزن العربي والعروض العربي.

"আমাদের জন্য স্মর্তব্য যে, মুক্ত কবিতা আরবীয় মাত্রা এবং আরবী ছন্দ-রীতিতে উৎকলিত হয়নি।" কিন্তু তিনি মুক্তছন্দ কবিতা রচনার পূর্বে ছন্দযুক্ত কবিতা রচনা করেছেন। যেমন বহরে খফীফ (بحر خفيف) এর ওজনে তিনি "মা'সাত আল হায়াত" রচনা করেছেন। এভাবে নাযিক আল-মালায়িকার কবিতাসমূহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

উপসংহার: কবি নাযিক আল-মালায়িকা একজন স্বপ্নচারী কবি। তিনিক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে মানব হৃদয়ের অনুভূতি, সুখ-দুঃখ এবং মানব জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলিকে শব্দ ও বাক্যের মাধ্যমে তুলে ধরতে সক্ষম

হন। তাঁর প্রত্যেকটি কবিতায় দুঃখজনক অনুভূতির ছাপ রয়েছে। এজন্য তাঁকে বলা হয়, خنساء العصر الحديث। বা আধুনিক যুগের খান্‌সা।[৪০]

তথ্যনির্দেশ

১ শাওকী দ্বায়ফ, *আল আদাবুল-আরাবী আল-মু'আছির ফী মিসর* (মিসরঃ দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), সংস্করণ ১০, পৃ. ৩৩।
২ আহমদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস, খ.১* (চট্টগ্রাম: আকিব প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ. ২১।
৩ জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ, খ. ৪* (বৈরুত: দারল হেলাল, ১৯৫৭), পৃ. ৫৬৯।
৪ হান্না আল ফাখূরী, *তারীখুল আদব আল আরাবী* (বৈরূত: দারুল জীল, তা. বি.), পৃ. ৮১১।
৫ ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩।
৬ ড. মুহাম্মদ বিন সা'আদ বিন হায়সাম, *আল আদাব আল আরাবী ও তারীখু মিসর আল-হাদীস* (মিসরঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৫), পৃ. ২৫।
৭ *তদেব।*
৮ Salma Khadra Jayyusi, *Modern Arabic poetry An Ahthrology* (U.S.A: Columbia University Press, 1987), P. 329.
৯ ফারহানা সিদ্দীকী, *নাযিক আল মালায়িকা* (নয়া দিল্লিঃ গুড ওয়ার্ড বুক, ২০০২), পৃ. ১৬।
১০ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১।
১১ *তদেব।*
১২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭।
১৩ MM. Badawi, *A Critical Introduction to Modern Arabic Poetry* (London: Cambridge University Press, 1987), P. 329.
১৪ ফারহানা সিদ্দীকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮।
১৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫।
১৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮।
১৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭।
১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।
১৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২।
২০ *তদেব।*
২১ http:// w.w.w. arabrenewal.com/index.php?rd
২২ মুহাম্মদ ফারুকী ও মুহাম্মদ ইসমাঈল মুজাদ্দেদী, *আল আরাবিয়্যাহ ওয়া আদাবুহা* (কালিকোটঃ এরশাদ বুক স্টল, তা.বি.), পৃ. ৬৩।
২৩ নাযিক আল-মালায়িকা, *দীওয়ান, খণ্ড ১* (বৈরুত: দার আল-আওদা, ১৯১৭ খৃ), পৃ. ৫১৮।
২৪ খলীল জাহা মিশাল, *আশই''রুল আরাবি আল-হাদীস; মিন আহমাদ শাওকী ইলা মাহমূদ দারবীশ* (বৈরুতঃ দারুল আও'দা, ১ম সংস্করণ), পৃ. ৩৯৫।
২৫ আব্বাস ইহসান, *আব্দুল ওহহাব আল বয়াতী ওয়াশ শি'রুল 'ইরাকী আল-হাদীস* (বৈরুতঃ লানা. তা.বি.), পৃ. ৮।
২৬ আবু সা'দ আহমদ, *আশ শি'রু ওয়াশ শু'আরা ফিল ইরাক: দিরাসাতুন মুখতারাতুন* (বৈরুতঃ দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), পৃ. ১৯০।
২৭ *তদেব।*
২৮ জালীল আতিয়্যাহ, *আ'লামুল আরব ফিল ইরাক আল হাদীস, খ. ২* (লেবাননঃ দারুল হিকমাহ, তা.বি.), পৃ. ৫২৩-৫২৪।
২৯ S. Moreh, *Modern Arabic poetry 1800-1970* (leiden, 1976), P. 198.
৩০ *দীওয়ান*, পৃ. ১৩৮।
৩১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫।
৩২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩।
৩৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৭।
৩৪ নাযিক আল-মালায়িকা, *দীওয়ান 'আশিকাতুল- লায়ল* (বৈরুত: দারুল-আওদা, ১৯১৭), পৃ. ৫১৯।
৩৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০৯।

৩৬ মুস্তফা যাব্বাখ, *আল রায়েদ ফী দিরাসাত আল-আদাব আল ‘আরাবী আল-হাদীছ* (রাবাতঃ মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, ১৯৮২), ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৪৯।

৩৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০০।

৩৮ *দীওয়ান*, খণ্ড ৩, পৃ. ৪০১।

৩৯ ইহসানুন নস ও অন্যান্যরা, *আল-রাইদ ফি দিরাসাত আল-আদাব আল ‘আরবী আল হাদীছ* (দামেস্কঃ আল-মাতবা‘আ আল-জাশিমিয়্যাহ, ১৯৪৮), ১ম সংস্করণ, পৃ. ২০২।

৪০ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

আহমাদ মুহাররামের কবিতায় 'ইফ্ক' প্রসঙ্গ : একটি পর্যালোচনা
('Efq' Context in Ahmad Muharram's Poetry : A Review)

ড. জিয়াউর রহমান খান*

Abstract: 'Ifq' or false slander is an important event in Islamic history. The hypocrites tried to tarnish the character of Hazrat Aisha, the wife of Prophet Muhammad (sm.), based on this incident which took place in 6th Hijri. Some of the Muslim community also got involved in it. As a result, the Muslims fell into a dire situation. Even the existing Aws and Khazraj clans were in conflict. Finally, Almighty Allah revealed the verses of the Quran and declared Hazrat Ayesha to be pure. The slanderers were punished and the Muslim society was spared the worst disaster. The matter has become an integral part of history. And has found its place in various parts of Quran, Hadith and Arabic poetry. The need for application and practice of the subject is undeniable. But till date no significant research has been observed on this subject in Bengali language. The famous poet Ahmad Muharram has detailed this subject in a poetic form in his famous book Majdul Islam. Through which Arabic and Bengali language readers, researchers, people who are thirsty for knowledge will be benefited and will be able to observe a wonderful form of the poetic form of this famous incident and rant.

ভূমিকা

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা:)[১] এর জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা 'ইফ্ক'[২]। যে ইফ্কের মাধ্যমে মুনাফিকরা তাঁকে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস চালিয়েছিল। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ ওহী নাযিল করে তাঁকে সম্মানিত ও মহিমান্বিত করেছেন। ইফ্ক সংঘঠিত হওয়ার পর মুনাফিকদের কুৎসিত কথাবার্তা, মুসলমানদের কতিপয়ের তাতে জড়িয়ে যাওয়া, ফলশ্রুতিতে হযরত আয়েশা (রা:) এর নিদারুন কষ্ট, অমানুষিক যন্ত্রণা নাবী মুহাম্মদ (সা:) ও হযরত আবূ বাকর (রা:) কেও ভাবিয়ে তুলেছিল। অবশেষে পবিত্র কুরআনের ওহীর দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা এ অপবাদের অবসান ঘটিয়ে হযরত আয়েশাকে পবিত্র ঘোষণা করেন। ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে ব্যাপক তাৎপর্যবহ। কবি আহমদ মুহাররাম[৩] তাঁর গীতিনাট্য ধারায় রচিত[৪] 'মাজদুল ইসলাম' কাব্য গ্রন্থে ঘটনাটিকে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। ঘটনার সূত্রপাত, ঘটনার প্রভাব এবং ঘটনার সুন্দর পরিসমাপ্তি চমৎকার ভাবে তাঁর কবিতায় বিবৃত হয়েছে। অত্র প্রবন্ধটি ইফ্কের সে বিষয়টিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করবে।

ইফ্কের সংক্ষিপ্ত ঘটনা

রাসুল (সা:) ৬ষ্ঠ হিজরীতে বনু মুস্তালিক যুদ্ধে গমন কালে হযরত আয়েশা (রা:) কে তাঁর সফরসঙ্গী করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে তিনি যখন মদীনায় ফিরছিলেন তখন পথিমধ্যে একখানে কাফেলা অবতরণ করলে হযরত আয়েশা (রা:) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বের হয়েছিলেন কিন্তু যখন তিনি প্রয়োজন শেষে ফিরে আসেন তখন তাঁর গলার হারটি গলাতে দেখতে না পেয়ে তা অনুসন্ধান করতে বের হয়ে পরেন। ইতোমধ্যে কাফেলার লোকজন তিনি হাওদায় আছেন ভেবে তাঁর হাওদাটি উটের উপর উঠিয়ে যাত্রা শুরু করে। ফিরে এসে তিনি কাউকে দেখতে না পেয়ে সেখানেই চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পরেন। কাফেলার শেষে হযরত সাওবান (রা:) এর দ্বায়িত্ব ছিল কাফেলার ফেলে আসা জিনিসপত্র তদারক করা, দ্বায়িত্ব পালন করতে এসে

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

তিনি হযরত আয়েশা (রা:) কে একা দেখতে পেয়ে তাঁর উটে আরোহন করিয়ে নিজে হেটে রাসূল (সা:) এর কাফেলার সাথে মিলিত হন। এ ঘটনায় মুনাফিকরা হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে ইফ্ক বা মিথ্যা রটনা আরম্ভ করে। ব্যাপারটি বহুদূর পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। কতিপয় মুসলিম ব্যক্তিও এতে জড়িয়ে পরে। বিষয়টি আল্লাহর রাসূল (সা:) ও মুসলিমদের ভিষণভাবে কষ্ট দেয়। পরিশেষে মহান আল্লাহ কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করে হযরত আয়েশা (রা:) এর পবিত্রতা ঘোষণা করেন এবং অপরাধিরা শাস্তি পায়।[৫]

কবি আহমদ মুহাররাম তাঁর কবিতার শুরুতেই বনু মুস্তালিক যুদ্ধের প্রসঙ্গ আলোকপাত করেছেন। যে যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল (সা:) মুসলিম বীরদের নিয়ে জয়লাভ করেন।[৬] আর সে যুদ্ধে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা:) তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন।[৭] কবির ভাষায়-[৮]

سيد الرسل وأم المؤمنين + بشر الأبطال بالنصر المبين

خرجت في الجيش ترجو ربها + عصمة الراجي وعون المستعين

একদা রাসূলদের সর্দার ও উম্মুল মু'মিনীন (আয়েশা সিদ্দিকা) জানবাজ সাহাবাদের সুসংবাদ শুনালেন, তোমরা ফাতহে মুবিন লাভে ধন্য হবে। নাবীর সফরসঙ্গী যোদ্ধাদের সাথে সাথে রওনা হলেন উম্মুল মু'মিনীন, চোখে মুখে আশা ছিল অবশ্যই সাহায্য করবেন রব্বে করিম, তিনিই শ্রেষ্ট সাহায্যকারী।

যুদ্ধ শেষে রাসূল (সা:) সাহাবাদের কাফেলা নিয়ে মদিনায় ফিরে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কাফেলা মাঝে মাঝে যাত্রা বিরতি করছিল। এমনই এক যাত্রা বিরতিতে উম্মুল মু'মিনীন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে উটের উপর তাঁর হাওদা থেকে বাহিরে বের হয়েছিলেন এবং প্রয়োজন শেষে যখন ফিরে আসেন তখন তাঁর গলার ঝিনুকের মালাটি গলাতে দেখতে না পেয়ে মালাটির খোঁজে পুনরায় সেখানে গমন করেন।[৯] কিন্তু বিপত্তিটি ঘটেছিল সেখানেই। তাই কবি যেন তাঁর এই পুনর্গমনের মাঝে প্রকৃতির বিষাদ, বিলাপ আর উদ্বীগ্নতা লক্ষ্য করেছিলেন। আহমদ মুহাররামের ভাষায়-[১০]

أرأيت الأرض لما رجفت + إذ هوى عقدك؟ بل لاتشعرين

اقشعرت وتمنت لو هوى + كل عال من رواسيها مكين

أنت في شأنك إذ تبغينه + وهي في هم وغم وأنين

سوف يبدي الخطب عن روعته + بعد حين فاصبري حتى يحين

আপনি কি লক্ষ্য করেছেন (হে আয়েশা), যখন আপনার কণ্ঠহার হারিয়েছিল? এই পৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল, থমকে গিয়েছিল সবকিছু আপনি হয়তো খেয়াল করেন নি।

জমিন স্বজোড়ে কেঁপে উঠেছিল, আকুতি করছিল যদি এমন না হয়ে সদৃঢ়, সউচ্চ, অনড় পাহাড় ধ্বসে পরে যেত! শেষ হয়ে যেত সবকিছু।

আপনি ব্যস্ত ছিলেন হারিয়ে যাওয়া কণ্ঠহারের সন্ধানে, হন্যে হয়ে খোঁজ করছিলেন কোথায় পরে গেল।

আর এ দিকে পৃথিবীর সবই ছিল যেন চিন্তামগ্ন, ব্যাথাতুর ক্লিষ্ট। চিন্তা করবেন না। অচিরেই সব শঙ্কা কেটে যাবে, বিপদ দূরিভূত হবে, আপনি ধৈর্য্য ধরুন সে সময় আসবে, খুব অল্প সময়েই তা আসবে।

এ দিকে হযরত আয়েশা (রা:) যখন তাঁর কণ্ঠহার অন্বেষনে গমন করেন তখন দ্বায়িত্বশীল ব্যক্তিরা তাঁর হওদাটি উটের উপর তুলে নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। কেননা তারা ভেবেছিলেন তিনি হয়তো হাওদার মধ্যেই আছেন।[১১] এদিকে ইঙ্গিত করে কবি বলেন-[১২]

رفعوا الهودج والظن بها + أنها فيه وساروا مدلجين

দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা আম্মাজানের বসার আসন উটের উপর তুলে দিলেন, তাঁরা ভেবেছিলেন তিনি আসনে আছেন, তাই রাতের সফর শুরু হলো।

হযরত আয়েশা ফিরে এসে যখন দেখেন কাফেলার সবাই যাত্রা করে চলে গেছে তখন তিনি এদিক ওদিক ছুটাছুটি না করে সেখানেই চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে পরেন। কেননা এছাড়া তাঁর আর কোন উপায় ছিলনা। বিশাল মরুভূমীতে তিনি যেন অসহায় হয়ে পরেছিলেন। কবির ভাষায়-[১৩]

رجعت والليل في بردته + دائم الإطراق كالشيخ الرزين

ذهب الجيش وأمست وحدها + غير أصداء من الوادي الحزين

خطرت في الجو من أنفاسها + خطرات للأسى ما ينقضين

نام عنها الهم لما رقدت + فهو في الأحشاء مكتوم دفين

সেনা ছাউনিতে ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় শেষ, রাত ঝিমিয়ে পরেছে, অতিশয় বৃদ্ধ যেমন লাঠিতে ভর করে হাটে।

ফিরে এসে দেখেন। সৈন্য দল চলে গেছে। তখন তো তিনি একা। এই শুনশান উপতাকায় নেই আওয়াজ, কিছুই ঠাওর করা যাচ্ছেনা।

এই জন মানবহীন মরুতে তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতিধ্বনিতে তৈরী হচ্ছে নানান ভীতি শঙ্কা। ব্যথা কষ্টের সাথে একাকার হয়ে পুঞ্জিভূত হলো নানান আতংক, ক্রমশ তা বেড়েই চলেছে। কোন উপায় না পেয়ে পর্দাবৃত হয়ে তিনি ঘুমিয়ে গেলেন। এতেই যেন সব উদ্বেগ কেটে গেল। সব শঙ্কা দূর হলো, ঘুমন্ত হৃদয়ে চাপা পড়ে গেল সব কিছু।

হযরত আয়েশা ধারনা করেছিলেন কেউ না কেউ তাঁর খোঁজে আসবে।[১৪] কাফেলার নিয়মানুযায়ী কেউ কিছু ফেলে গেছে কিনা তা অনুসন্ধানে কোন ব্যক্তি নিযুক্ত থাকতেন। আর এ যাত্রায় হযরত সাফওয়ানের উপর সে দায়িত্ব অর্পিত ছিল। তিনি আসবার সময় কাউকে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখে কাছে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা:) কে দেখতে পেয়ে ইন্নালিল্লাহ বলে ওঠেন।[১৫] আহমদ মুহাররামের ভাষায়-[১৬]

وأتى صفوان ما يبدو له + غير شيء ماثل للناظرين

يرسل الطرف ويمشي نحوها + مشية المرتاب في رفق ولين

عرف الخطب فما أصدقه + حين يدعو دعوة المسترجعين

دعوة رنت فلو قيل اسمعوا + لسمعنا اليوم ترداد الرنين

পিছনে আসার দ্বায়িত্বরত সাফওয়ান (রা:) সেখানে লক্ষ্য করলেন যে, পর্দাবৃত হয়ে কেউ হয়তো শুয়ে আছেন। আস্তে আস্তে সতর্কতার সাথে সমূহ সম্ভাবনার শঙ্কা মাথায় নিয়ে গভীর ভাবে দেখতে দেখতে এক পা দু'পা করে সেদিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তিনি ইন্নালিল্লাহ বলে আওয়াজ দেয়া মাত্রই হযরত আয়েশা বুঝতে পেলেন বিপদের মাত্রা বহুগুণ বেড়ে গেছে। তিনি অনুচ্চ আওয়াজে বিলাপের সুরে কথা বলছিলেন। কেউ লক্ষ্য করলে আজও সেই সুর শুনতে পাবে, তার কানে বাজবে গুনগুনিয়ে।

হযরত সাফওয়ান হযরত আয়েশা (রা:) কে চিনতে পেরে সসম্মানে তাঁর উটকে হযরত আয়েশার নিকট এনে তাঁকে তাতে আরোহন করতে বলে নিজে দূরে সরে দাড়ালেন। অত:পর তাঁকে নিয়ে পথ চলতে চলতে

নাবী (সা:) এর কাফেলার সাথে মিলিত হলেন।[১৭] প্রকৃত পক্ষে হযরত সাফওয়ান হযরত আয়েশা (রা:) এর সাথে তেমন আচরনই করলেন যেমন একজন সন্তান তার মার সাথে করে। কেননা তিনিতো উম্মুল মু'মিনীন। কবির ভাষায়-[১৮]

أيقظت عائشة من نومها + مثلما يوقظها صوت الأذين

جفلت منه فغطت وجهها + وهي في سترين من عقل ودين

يصرف اللحظ كليلا دونها + خاشع القلب كدأب المتقين

قرب الناقة منها ودعا + إركبي أماه مليت البنين

أخذ المقود يمنًا ومضى + يتبع الماضين من أهل اليمين

ينتحي يثرب بالنور الذي + يملأ الدنيا ويعيي المطفئين

হযরত আয়েশা (রা:) ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন যেভাবে মুআয্যিনের সুমধুর সুরে তিনি নিত্যদিন ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। হঠাৎ পরপুরুষের আওয়াজ পেয়ে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন; নিজেকে পর্দাবৃত করে নিলেন। আসলে তখনও তো তিনি ধার্মিকতা ও বুদ্ধিমত্তায় সজ্জিত ছিলেন।

সাফওয়ান খুব দ্রুতই তাঁর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন, তিনি তো পূর্ণ আল্লাহ ভীরু বান্দা। নিজের উট হযরত আয়েশার (রা:) নিকট এনে বললেন, আম্মাজান উঠুন আরোহন করুন, এখনই রওনা দিতে হবে। উটের লাগাম ডান হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে চললেন।

পূর্ববর্তী মহামনিষীগনের আদর্শ তো এমনই ছিলো। তিনি ইয়াসরিবে (মদিনায়) ফিরে আসলেন এমন নূর নিয়ে যে নূরে উদ্ভাসিত হলো দুনিয়া, পরাভূত হলো ষড়যন্ত্রে লিপ্তরা।

এদিকে হযরত সাফওয়ান (রা:) হযরত আয়েশা (রা:) কে নিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা:) এর কাফেলার সাথে মিলিত হওয়ার পরই মুনাফিকরা এক অসত্য, বানোয়াট, মিথ্যা অপবাদ রটাতে থাকে।[১৯] কুৎসিত মনের অধিকারী ব্যক্তিরা নিচুমানই হয়ে থাকে। ভালোর মধ্যেও তারা খারাপ কিছু দেখতে পায়। তাদের সন্দেহ প্রবণ মন তাদের অস্থির করে তোলে। কবির ভাষায়-[২০]

وانجلى الليل عن الخطب الذي + غادر الإصباح مسود الجبين

أين غابت أي أرض نزلت + كيف غم الأمر ؟ هل من مستبين ؟

রাত্রী শেষ হওয়া মাত্র নেমে এলো মহাবিপদ, মহাপ্রলয়। সেদিন প্রভাত এক বিভৎস, কুশ্রি চেহারায় প্রকাশ পেল। তিনি (হযরত আয়েশা) কোথায় ছিলেন, কীভাবে কাটালেন সুদীর্ঘ রজনী? সবই অজানা, তমাশাচ্ছন্ন, কেউ কি আছে সব কিছুর বর্ণনা দেয়ার?

যা ছিল অশ্রাব্য, জঘন্য, বিবেক বর্জিত, গর্হিত কথা। যা শ্রবণ করাও পাপ। তাইতো কবি আহমদ মুহাররাম হযরত আয়েশা (রা:) এর উদ্দেশ্যে বলেন-[২১]

ينصر الحق ويقضي أمره + إن رماه كل أفاك مهين

إصبري إن جل أمر إنها + يا ابنة الصديق دنيا الصالحين

রবই করবেন সত্যকে সাহায্য, করবেন সত্যকে সমুন্নত সুউচ্চ, যদিও হীণ, ইতর, মিথ্যুকেরা ছড়াক না মিথ্যা রটনা, নিন্দুকেরা করুক না নিন্দা। হে সিদ্দিকের কন্যা সিদ্দিকা ধৈর্য্য ধরুন যদি ভারি মনে হয় সব কিছু, কষ্ট পান সব কিছুতে।

বাস্তবতা হলো এই দুনিয়া পূন্যবানদের ওসিলায় টিকে আছে। টিকে থাকবে।

আর এমন জঘন্য রটনার মূল হোতা ছিল মুনাফেক সরদার আব্দুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালুল।[২২] তার প্ররোচনায় কিছু মুসলিম ব্যক্তিও এতে জড়িয়ে যায়। এ মিথ্যা অপবাদ মূহুর্তেই ছড়িয়ে পরে। চারিদিকে কানাঘুষা শুরু হয়। ইবন উবাই এর প্রচেষ্টায় তা সফল হয়। খারাপ লোকদের বিষাক্ত কথার বিষবাষ্প যেন মদিনার পরিবেশকেও বিষিয়ে তোলে। কবির ভাষায়-[২৩]

نشروا الإفك فسادًا وأذى + وعلى الله جزاء المفسدين

لا ينال الحق في سلطانه + كذب الحمقى وإفك الرجفين

يا لها من عصبة فاسقة + هاجها للشر شيخ الفاسقين

وجدت فيه زعيمًا حاذقًا + وإمامًا بارعا للمفترين

هكذا يا ابن أبي هكذا + لايكن شأنك شأن المسلمين

(মুসলিমদের) কষ্টদিতে আর বিশৃংঙ্খলা ছড়াতে তারা মিথ্যা অপবাদ আরোপ করল। মহান আল্লাহই বিশৃংখলদের বরবাদ করে দিবেন। নির্বোধ মিথ্যুকদের মিথ্যা অপবাদ আর বিভিন্ন ষড়যন্ত্র আল্লাহ কখনই সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করবেন না। এ সত্য চীর সত্য, সর্বজন বিদিত।

হায়! তোরাতো পাপিষ্ট, মিথ্যুক, গর্হিত কাজ করেছিস।

পাপিদের গুরু ইবন সালুল এই জঘন্য গুজব রটিয়েছে। ইন্ধন জুগিয়েছে এক দক্ষ নেতা ইবন সালুল, সে হলো মিথ্যুকদের অগ্রজ ও মিথ্যাবাদীদের অতুলনীয় মান্যবর নেতা।

হে ইবন উবাই মুনাফিকদের সরদার! তোর কাজকর্ম তো এমনই, প্রকৃত পক্ষে তোর অবস্থা তো মুসলিমদের মত হবেনা, এটাই সাভাবিক।

এদিকে বনু মুস্তালিকের সফর শেষে মদীনায় ফিরে হযরত আয়েশা (রা:) অসুস্থ হয়ে পরেন। তাঁর মা তাঁর সেবা করতেন। আর আল্লাহর রাসূল (সা:) মাঝে মাঝে তাঁর থেকে খবর নিতেন।[২৪] প্রকৃত পক্ষে বাহিরের কানাঘুষা আর রটনা রাসুল (সা:) ও আবূ বাকরকে বিচলিত করে তোলে।[২৫] রাসূল একদিন সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে তাঁকে তাঁর পরিবার নিয়ে কষ্টদায়ক কথা বলাবলী করার জন্য একটা ভাষণও দেন। সে ভাষণে নাবী (সা:) বলেন-[২৬]

أيها الناس ما بال رجال يؤذونني فى أهلى ويقولون عليهم غير الحق والله ما علمت عليهم إلا خيرًا ، ويقولون ذالك لرجل والله ما علمت منه الا خيرًا ، ولا يدخل بيننا من بيوتى الا وهو معى

লোকে সকল! মানুষের কী হয়েছে? তারা আমার পরিবার সম্পর্কে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। তারা অসত্য কথা বলছে তাঁদের বিরুদ্ধে। আল্লাহর কসম! তাঁদের বিরুদ্ধে মঙ্গল ও কল্যাণ বৈ কিছুই আমি জানিনা। আর এটা এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে যার সম্পর্কে ভাল ছাড়া কিছুই আমার জানা নেই। সে যখন আমার ঘরে প্রবেশ করে তখন সে আমার সঙ্গেই থাকে।

পিতা আবূ বাকর ও নাবী (সা:) এর এই কষ্টের কথা প্রকাশ পায় কবি আহমদ মুহাররামের কবিতায়। কবি বলেন-[২৭]

يا رسول الله صبرًا إنها + في ذمام الله رب العالمين

يا أبا بكرٍ رويدًا إننا + لنراها في حمى الروح الأمين

এ আল্লাহর রাসূল! ধৈর্য্য ধারন করুন, বিচলিত হবেন না। তিনি তো কিছুই ভোলেন না।

ওহে পিতা আবু বকর! অসহায় পিতা! অপেক্ষা করুন, সাহস হারাবেন না, তাঁর দ্বায়িত্বে রয়েছেন রুহুল কুদ্দুস জিব্রাইল আমিন।

পরিপার্শিক অবস্থার কারনে রাসূল (সা:) এর মনও খারাপ থাকত। আর তিনি হযরত আয়েশার সাথে কথা বার্তা কমিয়ে দিলেন, শুধু শারিরীক অবস্থার খোঁজ খবর নিতেন। নাবীর এমন আচরণ হযরত আয়েশা (রা:) এর জন্য আরো পীড়াদায়ক ছিল। আহমদ মুহাররামের ভাষায়-[২৮]

يا ابنة الصديق صبرًا ليته + ألم المرضى وهم الموجعين

يا لها من علة لو تعلمين + إنها أبرح مما تشتكين

أعقب البشر عبوس وبدا + من رسول الله ما لا ترتضين

ওহে সিদ্দিকের কন্যা; একটু ধৈর্য্য ধরুন, হয়তো আপনার ব্যথ্যা হচ্ছে, কষ্ট অনুভব হচ্ছে, অসুস্থতা বোধ হচ্ছে।

এ ব্যথা যে কত মহান, কত কল্যাণকর যতি তা অনুধাবন করতে পারতেন। কত যে সম্মান বয়ে আনবে, মর্যাদা বয়ে আনবে, যার কাছে এই সামান্য কষ্ট ম্লান হয়ে যাবে। সর্বদা হাস্যজ্জ্বলতা আর উদারতাই দেখেছেন রাসূল (সা:) থেকে, কিন্তু এখন রাসূল (সা:) এর মুখ মলিন, চোখে মুখে অসন্তুষ্টির ছাপ হায়!

এমন পরিস্থিতিতে একদিন রাত্রে হযরত আয়েশা (রা:) উম্মু মিসতার সাথে প্রাকৃতিক কাজ সাড়ার জন্য বাড়ীর বাহিরে গেলে উম্মু মিসতাহ হোঁচট খেয়ে পরে যায় এবং সে বলে ওঠে মিসতাহ ধ্বংশ হোক! তখন হযরত আয়েশা তার প্রতিবাদ করেন কেননা সে ছিল বদরী সাহাবী। কিন্তু উম্মু মিসতাহ ইবন উবাই এর সাথে মিসতার এ অপবাদ প্রচারের কথা বললে হযরত আয়েশা অবাক হয়ে যান।[২৯] যা কখনো কল্পনাও করেন নি তা শুনে তিনি যার পর নাই আহত হন। এমন মিথ্যা, বানোয়াট কথাও কেউ বলতে পারে? কবির ভাষায়-[৩০]

مسطح لا قر عينا مسطح + شبها نارا تهول المصطلين

(মিসতাহ (রা:) এর মা বললেন) মিসতাহ! কখনো তার চক্ষু শীতল হবেনা। সেতো আগুন নিয়ে খেলা শুরু করেছে। উনুন কে তাতিয়ে তুলেছে।

তখন তিনি দুঃখ ভরাক্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরে আসেন। এবং নাবী (সা:) এর এমন আচরনের কারন বুঝতে পেয়ে পিত্রালয়ে যাবার জন্য রাসূল (সা:) এর অনুমতি গ্রহণ করেন।[৩১] যে প্রাণাধিক প্রিয় স্বামী তাঁকে এতো ভালবাসেন, আদর করে হুমাইরা বলে ডাকেন তাঁর এ পরিবর্তনের কারন তাঁর আর বুঝতে বাকী থাকল না। এদিকেই ইঙ্গিত দিয়ে কবি বলেন-[৩২]

رجعت في غمرة من همها + لم تبت منها بليل الراقدين

لوعة مشبوبة في سقم + في شئابيب من الدمع السخين

يا رسول الله هل تأذن لي ؟ + إن بيتي بمصابي لقمين

مر ودع همي لأمي وأبي + إنما استأذنت خير الآمرين

তিনি ফিরে আসলেন একরাশ দুঃখ ও বেদনা নিয়ে। এতো দুঃখ কষ্ট নিয়ে যে সরারাতে এক মুহুর্তের জন্যও ঘুমাতে পারলেন না। শারিরীক অসুস্থতার সাথে যুক্ত হল তীব্র মনোকষ্ট ও দহন।

প্রতিক্ষণ ঝরছে আঝোর ধারায় চোখের তপ্তঅশ্রু। আম্মাজান বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমায় কি পিত্রালয়ে যাওয়ার অনুমতি দিবেন? আমার পিতামাতা ও গৃহবাসী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পরেছে।

হযরত আয়েশা পিত্রালয়ে গিয়ে তাঁর মার নিকট এসব কিছু জানতে চাইলেন যা তিনি পূর্বে জানতে পারেন নি।[৩৩] তাঁর অগোচরে এত ঘটনা ঘটে গেছে আর তিনি কিছুই জানেন না। বিস্ময়ের পর বিস্ময় তাঁকে অস্থির করে তুলল। কবির ভাষায়-[৩৪]

ذهبت يحزنها أن لم تكن + طوح الدهر بها في الذاهبين

ثم قالت وهي تبكي عجبا + لك يا أماه ماذا تكتمين ؟

أفلا نبأتني ما زعموا؟ + ويحهم ما حيلتي في الزاعمين ؟

ظلموني ما رعوا لي حرمة + رب كن لي ما أقل المنصفين

তিনি গেলেন পিত্রালয়ে কিন্তু খুবই ভারাক্রান্ত মনে। মনে হতো হায় আমি যদি হতাম আজ অখ্যাত কেউ। যদি আমায় কেউ না চিনতো! আমার ব্যপারে না জানতো!

এরপর ক্রন্দনরত মাকে লক্ষ্য করে বললেন, মা কী আশ্চর্য! আমার থেকে কী লুকাচ্ছেন? সবই খুলে বলুন।

ডাহা মিথ্যা অপবাদ ও অমূলক ধারনার ব্যপারে আমায় কেন আগে বলেননি?

মিথ্যুক পাপিষ্টদের ব্যাপারে আর আমার কিইবা করার আছে?

তারা আমার প্রতি অবর্ণনীয় যুলুম করেছে। আমার সম্মানের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করেনি। ওহে রব! আমার প্রতি একটু ইনসাফের দৃষ্টি প্রসারিত করুন।

পিত্রালয়ে যাবার পর তাঁর পিতা আবূ বাকর (রা:)ও দুঃখ কষ্টে অস্থির হয়ে যান। তার অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে কবির কবিতায়। কবি বলেন-[৩৫]

جزع الصديق مما نابه + إنه خطب يهول الأكرمين

قال أف لك من داهية + ما رمينا بك في ماضي السنين

أفلما زاننا دين الهدى + ساءنا منك حديث لا يزين ؟

সিদ্দিকে আকবর আকস্মিক এই বিপদে অস্থির হয়ে পরেন। এমন মহা বিপদ তো সম্মানীদেরকেও শংকিত করে ছাড়ে। আবূ বাকর (রা:) বললেন, হায় আয়েশা! একি বিপদ, আহ!!

অতিতের কোনো সময়ে তোমার ব্যপারে আমাদের কে অপবাদ দেয়া হয়নি। প্রকৃত হিদায়েতের ধর্ম ইসলামই যখন আমাদেরকে সুসজ্জিত করেছে। ভেবে দেখো, তখন তোমার ব্যপারে এমন বাজে অশোভনীয় কথা আমাদেরকে কত কষ্ট দিচ্ছে না?

চারিদিকে অমানিশার অন্ধকার। সবচেয়ে আপনজনও যেন আজ পর। এমন পরিস্থিতিতে একদিন রাসূল (সা:) হযরত আবূ বাকর (রা:) এর বাড়ীতে আগমন করেন এবং যথারীতি শুধু হযরত আয়েশার শারীরিক খোঁজ খবর নেন। প্রতিটা কষ্টের একটা সীমা থাকে কিন্তু এ কষ্টের যেন কোন সীমা ছিলনা। যেন তিনিও এ অপবাদ বিশ্বাস করছেন। তাইতো কবি হযরত আয়েশা কে শান্তনা দিয়ে বলেন-[৩৬]

كيف تيكم ؟ يا لها صاعقة + أرسلت من فم خير المرسلين

كيف تيكم ؟ كيف تيكم كلما + جاء إن الله مولى الصابرين

إصبري يا ربة العقد الذي + زين من عينيك بالدر الثمين

কেমন আছো? হায় কী বিপদ! কত বড় আঘাত! তাও আবার প্রিয় নবীর জবানিতে!!

কেমন আছো? কেমন আছো? বাক্যটি আয়েশা (রা:) যতবার শুনেন অধৈর্য্য হয়ে যান, আসলে তো আল্লাহই হলেন ধৈর্য্যশীলদের প্রকৃত মালিক। আল্লাহই ধৈর্য্য ধারনের তওফীক দিবেন।

ধৈর্য্য ধারন করুন, হে কণ্ঠহারের মালিকান, আপনার চক্ষুদয় দামী মোতি দিয়ে সজ্জিত হয়ে উঠুক। এই কামনাই রইল আপনার জন্য।

রাসূল (সা:) হযরত আয়েশা (রা:) কে তাঁর সম্পর্কে যে রটনা রটেছে তাতে যদি তিনি জড়িত হন তবে আল্লাহর কাছে তওবা করতে বলেন।[৩৭] ধৈর্য্যের পাহাড় হযরত আয়েশা চোখের অশ্রু মুছে ফেলে তওবা করতে অস্বীকার করে শুধু কুরআনের একটা আয়াত পাঠ করে বলেন-[৩৮]

فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون

অতএব সুন্দর সবরই (উত্তম) আর তোমরা যা বলছ, সে ব্যাপারে আল্লাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করছি।

প্রকৃত পক্ষে রাসূলের মুখে তাওবার কথা শ্রবন করে আয়েশা (রা:) সহ্য করতে পারেন নি, এমন মিথ্যা অপবাদ মেনে নিয়ে কেও তওবা করতে পারে? এমন সময় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত আয়েশা (রা:) এর পবিত্রতার ঘোষণা নিয়ে জিব্রাইলের আগমন ঘটে।[৩৯] এবং সূরা নূরের দশটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। যার প্রথম আয়াত ছিল নিম্নরূপ-[৪০]

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

যারা এই অবপাদ রচনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল; এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এটা তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং তাদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

আল্লাহর এই বার্তাকে স্বরণ করে কবি বলেন-[৪১]

مرحبًا بالوحي يجلو ما طوت + ظلمات الشك من نور اليقين

مرحبًا بالروح يلقي من عل + رحمة الله تغيث المؤمنين

يا ابنة الصديق طيبي وانعمي + ذاك حكم الله خير الحاكمين

আহলান সাহলান ওঠে ওহী! বিশ্বাসের তেজস্বী আলোর ফোয়ারাকে সন্দেহের তমাশা আচ্ছন্ন করে রেখেছে তোমার আলোতে তা অবমুক্ত হতেই হবে।

আহলান সাহলান হে রুহুল কুদ্দুস! যিনি নিয়ে আসেন উর্ধ্বলোক থেকে মুমীন বান্দার সাহায্য ও হাত ছানির বাণী।

হে সিদ্দিকের কন্যা! আনন্দিত হোন, উৎফুল্ল হোন, এসে গেছে আহকামুল হাকিমিনের পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীন ফয়সালা।

আল্লাহ তায়ালার এ ঘোষণার পর রাসূল (সা:) ঘর থেকে বের হলেন এবং অপরাধীদের তলব করে মিসতাহ ইবন উসাসা, হাসসান ইবন সাবিত এবং হামানা বিনতে জাহাশকে অপবাদ রটনার জন্য শাস্তি দিলেন। কবির ভাষায়-[৪২]

ضرب القوم بماض مخذم + من مواضيه فولوا مدبرين

سقطوا صرعى عليهم غبرة + من قتام البغي تخزي الظالمين

মিথ্যুকদের আঘাত করেছেন ধারালো তরবারী দিয়ে, ক্ষত বিক্ষত করেছে তাদের অঙ্গগুলো। তাই তারা পালিয়ে জীবন বাঁচানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

তাদের মাথা নিচু হয়ে গেছে, চেহারা ভ্রষ্টতায় কালিমাচ্ছন্ন।

তারা দিশেহারা, লজ্জিত, লাঞ্চনার বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে।

প্রকৃত পক্ষে পূন্যবতী, পূন্যাত্মা হযরত আয়েশা (রা:) কে নিয়ে মুনাফিকদের এমন হীণ প্রচেষ্টা মুসলিমদের অস্থির করে তোলে। তদুপরি কতিপয় মুসলীমদের তাতে জড়িয়ে যাওয়া আরো হতাশা জনক অবস্থা সৃষ্টি করে। যার কারনে মহান আল্লাহ ওহী নাযিল করে মুসলিমদের ধমক দেন এবং সতর্ক করে দেন। কেননা মুসলিমদের উচিৎ ছিল নিজেদের সম্পর্কে সু-ধারণা পোষণ করা এবং অপবাদ কে মোটেই প্রশ্রয় না দেয়া। যার শিক্ষা তাঁরা আল্লাহর বানী থেকে মর্মে মর্মে উপলদ্ধি করতে পেরেছে।

উপসংহার

ইফ্ক বা মিথ্যা অপবাদ মুসলিম জাতিকে বিরাট শিক্ষা দিয়ে গেছে। যে অপবাদের কারনে কিছুদিনের জন্য হযরত আয়েশা (রা:) মর্মাহত, পিড়িত ও অসহায় হয়ে পরলেও মহান আল্লাহর অনুকম্পায় তিনি পুত: পবিত্র ও মহান ব্যক্তিত্ব রূপে বিশ্ববাসীর নিকট প্রতিভাত হয়ে উঠেছেন। ইফ্ক সম্পর্কে কুরআন, হাদীস ও আরবী কবিতায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষত, আহমদ মুহাররাম তাঁর 'মাজদুল ইসলাম গ্রন্থে যে সুদীর্ঘ কবিতার অবতারণা করেছেন এর মাধ্যমে একদিকে তিনি যেমন আরবী কাব্য প্রেমীদের আত্মার খোরাক জুগিয়েছেন অপরদিকে এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সম্মুখে হযরত আয়েশা (রা:) এর ধৈর্য্যে, মহত্ব, সম্মান ও মর্যাদাকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর এ কাব্য প্রচেষ্টা তাঁকে চিরকাল স্মরণীয় করে রাখবে।

তথ্যনির্দেশ

১ হযরত আয়েশা (রা:): তিনি হযরত আবূ বাকর (রা:) এর কন্যা। রাসূল (সা:) তাঁকে হিজরতের পূর্বে মক্কায় বিবাহ করেন। তিনি রাসূল (সা:) এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী। তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা:) এর খেলাফত কালে ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।
ইবন খাল্লিকান, ওফিয়াতুল আ'য়ান ওয়া আনবাউ আবনাউয যামান, (বৈরুত: দারুল ফিকর আল-আলামিয়্যাহ, তা.বি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯-১০

২ ইফক্: افك এর শাব্দিক অর্থ الكذب, الإثم বা পাপ, মিথ্যা। বহুবচনে الأفائك

ইবন মানযুর, লিসানুল আরাব (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০১৩ খ্রী.) ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৪
ইফ্‌ক সম্পর্কে তাফসীরে মাজহারীতে বলা হয়েছে-

الإفك أبلغ ما يكون من الكذب وهو في الأصل الصرف والقلب وذلك أن عائشة كانت تستحق الثناء والدعاء لمّا كانت عليه من الحصانة والشرف ولما كانت بنتا للصديق زوجا للرسول صلى الله عليه وسلم والام للمؤمنين واجبة الإكرام والاحترام فمن رماها بسوء قلب الأمر عن وجهه غاية القلب

الإفك অর্থ চরম মিথ্যা। افك এর মূল অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া, উল্টিয়ে দেওয়া। আয়শা (রা:) এর প্রতি যে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল, তাকে افك বলা হয়েছে এ কারণে যে, বস্তুত আয়শা (রা:) ছিলেন পূত, পবিত্র ও সম্মানিত। এবং তিনি ছিলেন আবূ বাকর (রা:) এর কন্যা, রাসূল (সা:) এর সম্মানিতা স্ত্রী এবং মু'মিনগনের মাতা। এ কারণে অতি সম্মানের যোগ্য। তাঁকেই যারা অপবাদের মাধ্যমে লাঞ্ছিতা করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে, তারা বাস্তবকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে।
কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ, তাফসীরুল মাযহারী, (দেওবন্দ: সাহরানপুর, তা.বি.), পৃ. ৩৫৯।

৩ আহমাদ মুহাররাম: আহমদ মুহাররাম। পিতার নাম- হাসান আব্দুল্লাহ। তিনি মিসরের দলনজাত এর অধিভুক্ত আবিয়া আল-হামরা গ্রামে ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। মুহাররম মাসে জন্ম নেন বলে তাঁর নামের সাথে মুহাররাম শব্দটি যুক্ত হয়ে যায়। তিনি তুর্কী বা সারাকসি বংশোদ্ভূত। পারিবারিক পরিবেশই তাঁর শিক্ষার হাতে খড়ি। অল্প বয়সেই তিনি ব্যকরণ, সাহিত্যে বুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি রাজনৈতিক কলম ও সংস্কৃতিক রচনায় মনোযোগী ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থকে 'ইসলামী ইলিয়াড' বলে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন। দমন হুরে তাঁকে সমাহিত করা হয়।
খাইর উদ্দিন আল-জিরিকলি, আল-আ'লাম; কামুসু তারাজিম (বৈরুত: দারুল ইলম লিন মালায়িন, ২০০২ খ্রী.) ১ম খণ্ড, পৃ. ২০২।

৪ ড. শাওকি দাইফ, দিরাসাতু ফি আল-শির আল-আরাবী আল-মুয়াসির (মিসর: দারু আল-মাআরিফ, ১৯৫৯ খ্রী), পৃ. ৫৬-৫৭।

৫ আবুল ফিদা, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (কায়রো: মাকতাবাতুস সফা, ২০০৩ খ্রী.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৬।

৬ ইবন সা'দ আত-তাবকাতুল কুবরা (কায়রো: দার ইবন জাওযী, ২০১৭ খ্রী.) ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৮।

৭ সফিউর রহমান আল-মুবারকপুরি, আর-রাহীকুল মাখতুম, (কায়রো: দার ইবন জাওযি, ২০১৩ খ্রী.), পৃ. ৩২০।

৮ আহমাদ মুহাররম, দীওয়ানু মাজদুল ইসলাম, (মিসর: মুআচ্ছাছাতু হানদাবী, ২০১২ খ্রী.), পৃ. ১৫১।

৯ আত তাবকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯।

১০ দীওয়ানু মাজদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

১১ ইবন হিশাম, আস-সিরাতুল নববিয়্যাহ (কায়রো: দারুল হাদীস, ১৯৯৫ খ্রী.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১।

১২ দীওয়ানু মাজদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

১৩ দীওয়ানু মাজদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

১৪ আলাবী ইবন আব্দুল কাদির আস-সাক্কাফ, আয়েশা উম্মুল মু'মিনীন, (মু আচ্ছিছাতু আদ দুরারুছ ছান্নিয়্যাহ, আল-মামলাকাতুল আরাবিয়্যাহ আস সাউদিয়্যাহ, ১৩৩৭ হিজরী), পৃ. ৫৭৮।

১৫ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।

১৬ দীওয়ানু মাজদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

১৭ আয়েশা উম্মুল মু'মিনীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৮।

১৮ দীওয়ানু মাজদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২-১৫৩।

১৯ ইবনুল আছীর, কামিল ফীত তারীখ, (বৈরুত: দারু সাদির, ২০০৯ খ্রী.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৬।

২০ দীওয়ানু মাজদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

২১ দীওয়ানু মাজদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

২২ আয়েশা উম্মুল মু'মিনীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৮।

২৩ দীওয়ানু মাজদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

২৪ কামিল ফীত তারীখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

২৫ আবূ বাকর আল-জাস্‌সাছ, আহকামুল কুরআন, (বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ৩৯৬।

২৬ আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।

২৭ দীওয়ানু মাজদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

২৮ দীওয়ানু মাজদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

২৯ আয়েশা উম্মুল মু'মিনীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৯।

৩০ দীওয়ানু মাজদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

৩১ আর-রাহীকুল আখতুম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১।

৩২ দীওয়ানু মাজদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

৩৩ আয়েশা উম্মুল মু'মিনীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৯-৫৮০।

৩৪ দীওয়ানু মাজদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

৩৫ দীওয়ানু মাজদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

৩৬ দীওয়ানু মাজদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

৩৭ আস-সিরাতুল নববিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩।

৩৮ আস-সিরাতুল নববিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪।

৩৯ আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

৪০ আল-কুরআন, সূরা: নূর, আয়াত: ১১।

৪১ দীওয়ানু মাজদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

৪২ দীওয়ানু মাজদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

আবূ নুওয়াসের কবিতা : একটি পর্যালোচনা
(Abu Nawas' Poetry : An overview)

রুমানা ফেরদৌসী*

Abstract: Abu Nuwas was one of the great Arabic poets of the Abbasid era, he sang poetry as a representative of his time. He did not walk in poetry on the path of pre islamic era only, but also mixed the old and the new of style. His era was full of new creations and social and cultural changes took place, and he depicted them in his poetry in a beautiful styel. He disagreed with the old topics of poetry and came up with new topics. The most prominent characteristic is that it came up with the description of wines and obscenity in Arabic poetry. If we look closely at his poetry, we will reveal his own features. He won bad charactaristics and expressed it in his poetry. He used to violate the taboos, and violated religion, custom and nature in the early life, but in the latter half of his life he sang poetry as an ascetic and a sincere believer, which shows its impact on his poetry.

Keywords: The Life of Abu Nawas, Abu Nawas's Contributions to Arabic Literature, Abu Nawas' Topics in Poetry, Renewal in Abu Nawas's Poetry, Abu Nawas's Style of Poetry.

ভূমিকা

জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ভাষা ও সাহিত্যের সোনালী যুগ হিসেবে আব্বাসীয় যুগ খ্যাত। এ যুগে খ্যাতিমান ও প্রতিভাবান বহু কবি সাহিত্যিকের আগমন ঘটে। এসকল কবি সাহিত্যিকদের মাঝে আবূ নুওয়াস অন্যতম। তিনি আব্বাসীয়যুগে (৭৫০-১২৫৮ খ্রী.) আরবী সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল। প্রাচীন কাব্যধারার সাথে নতুন নতুন কাব্যধারা যুক্ত করার ক্ষেত্রে তিনি এক অনবদ্য অবদান রাখেন। একজন স্বার্থক কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে তিনি চিন্তাধারা, ভাব, বিষয়, শব্দ, উপস্থাপনা ও কাব্য বিন্যাস ও প্রয়োগের কলাকৌশলে প্রাচীনত্বের বেড়াজাল ছিন্ন করে নতুন ধারা তৈরী করে নিজের প্রতিভা, মেধা ও মননের স্বাক্ষর রাখেন। যুগেযুগে কবি সাহিত্যিকগণ তাদের লেখামালায় বারংবার আবূ নুওয়াসের কবিতার উদ্বৃতি দিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্য কৌশল, শব্দ যোজনা ও ভাষালঙ্কারের প্রয়োগ বিতর্কাতীত। সাহিত্য সমালোচকগণ তাঁর কাব্যসাহিত্যের ভূয়শী প্রশংসা করেন।

আবূ নুওয়াসের পরিচয়

৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম সাম্রাজ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করলেও পরবর্তীতে সর্বত্র শান্তি-শৃংখলা ফিরে আসে। ক্রমে সমাজে বৈষয়িক প্রাচুর্যের প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে পরকাল বিবর্জিত বৈষয়িক ভোগ-বিলাস এবং সমাজ সংসার বহির্ভূত নির্জন জীবন যাত্রার (যুহদ) ধারা পরিলক্ষিত হয়। নৈরাশ্যবা অনুসারীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য না হলেও সমাজে এদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নিতান্তই কম ছিল না। সামাজিক স্থিতিশীলতার সুবাদে সাম্রাজ্যের সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের পারস্পরিক মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতার কারণে

* পিএইচ.ডি গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মুসলিম সাম্রাজ্যে সভ্যতা-সংস্কৃতি উন্নতরূপ পরিগ্রহ করে। খলিফা ও শাসকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা এবং কবি সাহিত্যিকদের ঐকান্তিক সাধনা সভ্যতা-সংস্কৃতির এই বিকাশ ধারাকে আরো ত্বরান্বিত করে। এভাবে আব্বাসী যুগে (৭৫০ খ্রীঃ-১২৫৮ খ্রীঃ) বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন ধারার সূচনা হয়। কবি আবূ নুওয়াস হাসান ইবনু হানী এ বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, যিনি স্বীয় কাব্য প্রতিভার মাধ্যমে যুগ চিত্রের সঠিক রূপকার হিসেবে আবির্ভূত হন।

অশ্লীল কবিতার জন্য আরব কিংবা অনারব সবার কাছেই তিনি সমানভাবে পরিচিত। কবি আবূ নুওয়াসের প্রকৃত নাম আবু আলী হাসান ইবনে হানী আল হাকামী। পিতার নামঃ হানি বিন আব্দুল আউয়াল মাতার নাম জালবান আল হাকামী কবির ঘনিষ্ট ব্যক্তি খালফ আল আহমার কবিকে ইয়েমেনের রাজবংশ যূ নুওয়াসের নামানুসারে আবূ নুওয়াস নামকরণ করেন।

[১] আব্বাসীয় যুগে ইরাকের আহওয়ায নামক পল্লীতে হিজরী ১৪৫ সনে (৭৫৬খ্রিঃ-৮১৪খ্রিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন আরব, মা পারস্যের। তাঁর পিতা দামেস্কর অধিবাসী ছিলেন। খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ানের সেনাবাহিনীতে চাকুরীকালে তিনি আহওয়াযে বদলী হন। এখানে তিনি জিনান নামী এক নরীর প্রেমে পড়েন ও তাঁর সাথে পরিণয়ে আবদ্ধ হন। এ নারীর গর্ভেই কবি ও তাঁর ভাই জন্মগ্রহণ করেন। কবি আহওয়াযে জন্ম গ্রহণ করলেও বসরায় লালিত পালিত হন। আত্মীয়–স্বজন কারো মধ্যেই কাব্যচর্চার বাতিক ছিল না। কাব্য ছিল তার সহজাত প্রতিভার একটি বৈশিষ্ট্য। জন্মের সময়ে বাবা মারা যান। মা আরেকটি বিয়ে করে তাকে রেখে আসেন বসরায়। সেখানে তিনি কুরআন অধ্যয়ন করেন। পুরো কুরআনের হাফিজ হন। তার পরবর্তী জীবনে কুরআনের শিক্ষার খুব বেশি প্রতিফলন দেখা না গেলেও বলা যায়, জীবনের শেষটা হয়তো এ কুরআনের আলোকে অতিবাহিত হয়। জীবনের শেষ দিকের কবিতাগুলোতে কুরআনের প্রভূত প্রভাব ছিলো। আতর ব্যবসার মাধ্যমে তিনি তাঁর কর্ম জীবন শুরু করেন। কিন্তু আতর তৈরীর চাইতে কাব্য বাণী তৈরীর দিকেই তাঁর লক্ষ্য ছিলো বেশী। তাই সময় পেলেই কবিদের সাহচর্য পেতে জলসায় উপস্থিত হতেন।

আবূ নুওয়াসের জ্ঞানসাধনা

শৈশবে পিতৃহীন হয়ে আবূ নুওয়াস প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জীবন যুদ্ধে বিজয়ী হন। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত এই বালকটি একদা মাতুলালয়ে আশ্রয় নেয় এবং পরবর্তীতে জীবন ধারণ কল্পে আতর বিক্রেতার চাকুরী গ্রহণ করে। এ সময় তিনি উপলব্ধি করেন, এ চাকুরী তাঁর উপযুক্ত ক্ষেত্র নয় এবং প্রতিভা বিকাশের পথে সহায়কও নয়। সুতরাং তিনি অবসর সময়ে তৎকালে প্রচলিত নিয়মমাফিক মসজিদে অনুষ্ঠিত শিক্ষার মজলিসে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সাহিত্য আসরেও তাঁর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।[২] এ সব মজলিসে কবিতার রাভী, সীরাত ও ইতিহাস বিশারদ এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়ে স্ব স্ব বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করতেন। আবূ নুওয়াস এ সব বিষয় গভীরভাবে আত্মস্থ করেন। ক্রমে তাঁর জ্ঞানের পরিমণ্ডল বিস্তৃত হতে থাকে এবং বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনেক সময় তিনি পুরো রাত এদের সাথে আড্ডা দিয়ে কাটাতেন। এক সময় এসব আড্ডাবাজ বন্ধুদের প্রভাবে তিনি মাদকাসক্ত ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়েন। এ গড্ডালিকা প্রবাহ তাকে বেশী দূর এগুতে দেয়নি।

কবি জীবনে প্রেম

তিনি সমকামিতার পাঠ আবু উসামার কাছ থেকে শিখে ছিলেন এবং প্রেমের পাঠ শিখেছিলেন জিনান নামের বসরাবাসী এক নারীর কাছ থেকে। প্রেমঘটিত যেসব কবিতা লিখেছেন তা সম্ভবত জিনানকে কেন্দ্র করেই।

যদিও তাদের সম্পর্ক বেশিদিন স্থায়ীত্ব পায়নি। আবু নুয়াসের বিকৃত রুচি জিনান বেশিদিন সহ্য করতে পারেনি। সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবার পর জিনান বসরার পথে পথে আবু নুয়াসকে অভিশাপ দিয়ে বেড়াতে থাকে।[৩]

খলীফা হারুনুর রশিদের দরবারে আবূ নূওয়াস

প্রাথমিক অবস্থায় তিনি হারছামা ইবনু আম্বয়ুন এর মাধ্যমে খলীফা হারুন অর-রশীদের (৭৮৬ খ্রীঃ-৮০৯ খ্রীঃ) দরবারে স্থান লাভ করেন এবং তাঁর স্তুতি কাব্য রচনা করে পুরস্কৃত হন। তখন আবূ নুওয়াসের বয়স ছিলো ত্রিশ বছর। বাগদাদে কবি জ্ঞানী-গুণীদের সাহচর্যে এসে অল্প দিনেই নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। তাঁর সুখ্যাতি শুনে স্বয়ং খলীফা তাকে তাঁর প্রশস্তি রচনা করতে বললেন। এর মাধ্যমেই কবির ঠাঁই হয়ে গেল হারুনুর রশীদের দরবারে। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি খলীফার একান্ত সঙ্গী হয়ে দাঁড়ালেন। কবি আবূ নুওয়াস আবদুল ওহাব আল-ছাক্বাফী পরিবারের জিনান নাম্নী খলীফার এক ষোড়শী বাঁদীর প্রেমে পড়েন। খলীফাও তাঁর এ প্রেমকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন।[৪]

মৃত্যু: কবি আবূ নুওয়াস ১৯৯ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন।[৫]

সাহিত্য কর্ম: আবূ নুওয়াস তার রচিত কবিতা নিজে সংকলন করেননি, বরং তার মৃত্যুর ত্রিশ বা চল্লিশ বছর পর বিভিন্ন লেখক তা একত্রিত করে দীওয়ানু আবি নূওয়াস নামে প্রকাশ করেন। যেমন আল সূলী কর্তৃক সংকলিত দীওয়ান। তার দীওয়ানটি বারো অধ্যায়ে বিন্যস্ত, যাতে বারো হাজার চরণ রয়েছে। অতঃপর বিভিন্ন প্রকাশক তা প্রকাশ করেন। তার দীওয়ানের বিভিন্ন ব্যাখ্যা গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কতিপয় হলো-ইলিয়া আল হাবী'র ব্যাখ্যা, আহমদ আব্দুল মজীদ আল গাজাবীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ। মূল ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ বৈরুত ও মিসর হতে একাধিকবার মুদ্রিত হয়েছে। কবির নামে অসংখ্য কবিতা চালিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা মানসম্মত নয়। এসকল জাল ও নকল কবিতাকে "মানহুল" বলা হয়।[৬]

আবূ নুওয়াসের কবিতায় বিষয় বৈচিত্র

কবি আবূ নুওয়াস নানা বিষয়ে কবিতা রচনা করেন। তার কবিতাসমগ্রের নাম দীওয়ান। এ গ্রন্থে বারোটি অধ্যায় রয়েছে, যার মধ্যে বারো হাজার কবিতা স্থান পেয়েছে। এসকল কবিতা দশটি বিষয়ে রচিত হয়েছে। আবূ নুওয়াস যে সকল বিষয়ে কবিতা রচনা করেন তা নিম্নরূপ-

১.খামরিয়্যাত-মদ সম্পর্কিত কবিতা, ২. মুজূন-অশ্লীলতা (কিশোর সম্পর্কিত ও কুরুচি বিষয়ক কবিতা), ৩. গয্ল ও নাসীব- প্রণয় কবিতা (নারী সম্পর্কিত কবিতা), ৪. নাকাইদ-প্রতিউত্তরমূলক কবিতা, ৫. মার্সিয়া-শোকগাঁথা কবিতা, ৬.যুহ্দ-বিরাগমূলক কবিতা, ৭. মাদ্হ-প্রশংসামূলক কবিতা, ৯. হিজা-ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা ৮. ইতাব-তিরস্কারমূলক কবিতা ১০. তর্দ-শিকারবিষয়ক কবিতা।[৭]

১. মদ সম্পর্কিত কবিতা (الخمريات)

কবি আবূ নুওয়াস সভাকবি ছিলেন। রাজদরবারে কবিতার পসরা সাজাতেন। তিনি যথার্থ অর্থেই দরবারী কবি ছিলেন। দরবারের সকল বিলাস-বৈভবই তাঁর কাব্যে বিদ্যমান। তিনি ত্যাগের চাইতে ভোগকেই উপরে স্থান দিয়েছেন। তাই বিলাসের অন্যতম সামগ্রী মদের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ। এ বিষয়ে তাঁর কবিতাগুলো অতুলনীয়। বাগদাদে লম্বা একটা সময় আবু নুয়াস মদের আসরে ডুবে থাকতেন। মদকেই বানিয়ে ফেলেন জীবনের আসল উদ্দেশ্য। কবি বলেন-[৮]لا عيش إلا المـُدّام أشربها "জীবন তো জীবনই নয় মদপান বাদে।"তিনি মদের বৈচিত্রপূর্ণ বর্ণনার অবতারণা করেন। তার এমনই একটি কবিতা হলো: [৯]

فَما العَيشُ إِلّا سَكرَةً بَعدَ سَكرَةٍ فَإِن طالَ هَذا عِندَهُ قَصُرَالدَهرُ

وَما الغَبنُ إِلّا أَن تَرانِيَ صاحِيًا　　وَما الغُنمُ إِلّا أَن يُتَعتِعُني السُكرُ

'নেশার পর নেশাই জীবন। যদি নেশা দীর্ঘ হয় তবে যুগ ছোট হয়ে আসবে।

তুমি আমাকে চিৎকার করতে দেখলে মনে করো যে আমি প্রবঞ্চিত হয়েছি। আমি সুখে থাকি যখন মদের নেশায় বিড়বিড় করি।'

মদের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে কবি বলেন-[১০]

لمّا تبيّن أنّي غيرُ ذي بُخَل　　وليسَ لي شغلٌ عنها وإبطاءُ

كدمعةٍ منحتها الخدَّ مرهاءُ　　أتى بها قهوةً كالمسكِ صافيةً

'যখন স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, আমি কৃপণ নই, তখন হতে মদের প্রতি আমার অনিহা ও অলসতা নেই।

মদ আমার নিকট ভেড়ীর গন্ডদেশে চোখ হতে বিসর্জিত অশ্রুর মত, সে আমার জন্য মিশকের মত স্বচ্ছ এক পেয়ালা মদ নিয়ে এলো।'

কবি উল্লিখিত পংক্তিদ্বয়ে মদকে ভেড়ীর চোখের অশ্রু এবং মিশকের সাথে তুলনা করেন। তাঁর এ তুলনার মধ্য দিয়ে মদের দু'টি গুণ ফুটে উঠেছে। প্রথমতঃ মদের রঙ ভেড়ীর চোখের অশ্রুর মত আকর্ষণীয়। দ্বিতীয়তঃ মদ মিশকের মত স্বচ্ছ ও পরিছন্ন।

গজল- নারীপ্রেমের অপূর্ব বর্ণনা (الغزل)

উমাইয়া যুগের শেষের দিকে ক্ষমতাসীন ও অভিজাত শ্রেণীর নৈতিক পতনের ফলে সমাজে অশ্লীলতা বিশেষত মদ ও নারীর প্রতি আসক্তির যে সয়লাব দেখা যায় তা আব্বাসীয় যুগে এসেও আছড়ে পড়েছে। এ সময় মদ ও নারী প্রধান উপভোগ্য বিষয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কবি আবূ নুওয়াসের নিকটওমদ ও নারী অসম্ভবপ্রিয় হয়ে ওঠে। কবি এ দুটির অনবদ্য বর্ণনা প্রদান করেন। কবির এরূপ একটি কবিতা হলো: [১১]

أعتل بالماء فأدعو به　　لعلها تنزل بالماء

إلا لما ألقى بإنسانة　　مختالة في نعل حناء

'আমি পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লে পানি আনতে ডাকি। হয়তো সে পানি নিয়ে আসলে পানিতে তার ছবি দেখতে পাবো।আমি পানি চাই যেন মেহেদী পায়ে অহংকারী নারীটির সাক্ষাৎ পাই।'

কবি এ কবিতায় প্রেয়সীর প্রতি তার গভীর অনুভূতি প্রকাশ করেন। তিনি নান্দনিকভাবে তার ভালবাসা ও ভাললাগার বিবরণ প্রদান করেন। কবি প্রেমিকা জিনানকে উদ্দেশ্য করে বলেন-[১২]

وجه حبيبي دنيائي　　ترتع فيه ظباء أهوائي

تصطادها أكلب الصدود　إذا　يدعو إليها الهوى بإيماء

'আমার প্রিয়তমার মুখ আমার পৃথিবী, এখানে আমার কামনার হরিণীরা বিচরণ করে।আমার কামনা তাকে ইঙ্গিতে আহবান করলে অন্তরের হিংস্র প্রাণীরা তাকে শিকার করতে ছুটে আসে।'

কবি পংক্তিগুলোতে প্রেয়সীর প্রতি তার ভালবাসার গভীরতা প্রকাশ করেন। কবির সবুজ মনের প্রান্তরে প্রেয়সীর ভালবাসার অবাধ বিচরণ। কবি তার হাতে সুরা পানে সবচেয়ে বেশী স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

১. আল মুজূন-অশ্লীলতা (المجون)

আবূ নুওয়াস বাগদাদে হারুনুর রশীদের সভা কবি ছিলেন। এ সময় কবি অশ্লীল কবিতা রচনার অপরাধে খলীফার নির্দেশে অসংখ্যবার কারাবরণ করেন। খলীফার নির্দেশ না মেনে বারংবার অশ্লীল কবিতা রচনার দায়ে খলীফা তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। কবি বললেন, আপনি কি মনের বাসনা পূরণে আমাকে হত্যা করবেন? খলীফা বললেন না, বরং তুমি হত্যার উপযুক্ত। কবি বললেন, আমি হত্যার উপযুক্ত হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন তোমার এ কবিতাংশের জন্য-[১৩]

ألا فاسقني خمرا وقل لي هى الخمر ولاتسقني سرا إذا أمكن الجهر

'ওহে তুমি আমাকে মদ পান করাও এবং বল যে আমার প্রেমিকাই মদ।

আর প্রকাশ্যে আমাকে মদ পান করাতে সমস্যা নাহলে গোপনে পান করাবেনা।'

কবি বললেন আমীরুল মু'মিনীন, আপনি কি জানেন আমাকে সে মদ পান করিয়েছে ও আমি পান করেছি? তিনি বললেন আমার ধারনা ছিল। কবি বললেন, আপনি কি আমাকে ধারনার ভিত্তিতে হত্যার আদেশ করছেন। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন-[১৪] إن بعض الظن إثم রশীদ বললেন, আমি যে কারণে হত্যা করা যথার্থ সে কথাই বলেছি। এক পর্যায়ে কবি বললেন আপনি না জেনেই আমাকে হত্যা করতে চাইছেন! তখন খলীফা বললেন তাকে ছেড়ে দাও।

পুরুষকে নিয়ে আবূ নুওয়াস এরূপ বহুসংখ্যক অশ্লীল কবিতা বলেছেন। এগুলোকে আরবীতে الغزل بالمذكر বলা হয়।

২. আল ওয়াসফ-বর্ণনামূলক কবিতা (الوصف)

আরব কবিগণ প্রকৃতির বর্ণনা অসাধারণভাবে উপস্থাপনে অভ্যস্ত । সুবিশাল আকাশ, মুষলধারে বৃষ্টি, মেঘপুঞ্জ, বিদ্যুৎ চমক, পানির ঝর্ণাধারা, পোয়ারা, শিকারের দৃশ্য, দিবারাত্রি, বাস্তুভিটা, জাহাজ, সবুজ উদ্যান ও প্রকৃতির নান্দনিক সৌন্দর্য ইত্যাদি কবিদের আল্পনায় স্থান পায়। কবি আবূ নুওয়াসও প্রকৃতির সান্নিধ্যে জীবনযাপন করেছেন। তিনিও প্রকৃতির অপরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। কবি রাত ও প্রভাতের বর্ণনায় বলেন-[১৫]

لما تبدى الصبحُ من حجابه كطلعة الأشمط من جلبابه

وانعدل الليلُ إلى مآبه كالحبشي افترعن أنيابه

'প্রভাত যখন পর্দা হতে বেরিয়ে এলো মনে হলো, ধূসরবর্ণের চুলের গুচ্ছ গাউনের আবরন হতে বের হল। রাত তার গন্তব্যে ফিরে গেল। যেন নিগ্রু লোক দাঁতকিলিয়ে হাসলো।'

৫. আর রাছা- শোকগাথা কবিতা (الرثاء)

আবূ নুওয়াস চমৎকার করে শোকগাথা রচনা করেন। আবেগ-দুঃখ মিশ্রিত এসকল রচনায় কোনরূপ বাড়াবাড়ি ছিলনা। জ্ঞানী-গুণী, শাসক, নেতার জন্য তিনি শোকগাথা রচনা করেন।

হারুনুর রশীদের মৃত্যুর পর কবি তার স্মরণে শোঁকগাথা রচনা করেন। কবিতা-[১৬]

النّاسُ ما بينَ مَسرُورٍ ومَحزُونِ وذي سَقامٍ بكفّ المَوْتِ مرْهونِ

مَنْ ذا يُسَرّ بدُنْياهُ وبَهجَتِها بعدَ الْخَليفَة ذي التّوفيقِ هارُونِ

'মানুষ হাসি-কান্নার মাঝে দিনাতিপাত করছে, আর কিছু রোগাক্রান্ত মৃত্যুর হাতে দায়বদ্ধ রয়েছে।

সৌভাগ্যবান খলীফা হারুনুর রশীদের পর কে আছে এমন যে, তার পৃথিবী ও পৃথিবীর হাসি-খুসিতে আনন্দিত থাকে!'

৬.আয যুহ্‌দ-বিরাগমূলক কবিতা (الزهد)

দুনিয়ায় মজে থাকা এ কবির কিছু কবিতা পাওয়া যায় যে একেবারেই দুনিয়াবিমুখতা ও আল্লাহভীতি নির্দেশ করে। সম্ভবত জীবন সায়াহ্নে এ কবিতাগুলো তিনি রচনা করেছিলেন। আবার কেউ বলেন, শৈশবের সেই ধর্মীয় জ্ঞান তার মনে আন্দোলন সৃষ্টি করতো এ নোংরা জীবন ছেড়ে পবিত্রতার সাথে বাঁচতে। তখন তিনি এসব কবিতা লিখতেন। তার এরূপ একটি কবিতা হলো:[১৭]

يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة - فلقد علمت بأن عفوك أعظم

أدعوك ربي كما أمرت تضرعاً - فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم

"আমার রব! আমার গুনাহ যে অনেক বড়ো, কিন্তু আমি জানি তোমার দয়া তার চেয়েও অনেক বড়ো।

তাই ডাকছি তোমায়, যেভাবে বলেছ তুমি ডাকতে বিনয়ের সাথে, যদি তুমি ফিরিয়ে দাও, তবে আমি দয়া পাব কার কাছে?

৭. আততর্‌দ-শিকারবিষয়ক কবিতা (الطرديات)

তারদ অর্থ শিকারি পাখির গুণাবলি সম্পর্কিত কবিতা। জাহিলী যুগে এরূপ কবিতার অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যা আব্বাসী যুগে সমৃদ্ধি লাভ করে। হিজরী প্রথম শতাব্দির শেষে এবং দ্বিতীয় শতাব্দির শুরুতে অভিজাত শ্রেণির পদধ্বনিতে এ জাতীয় কবিতা আবার ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচীন কবিরা ঘোড়ায় আরোহণ করে শিকার করতেন, কুকুরের শিকার তাদের অপসন্দ ছিল। কবির কুকুর প্রশস্ত গন্ডদেশ বিশিষ্ট, সুদীর্ঘ চোয়াল রয়েছে তার, এতটা দ্রুত গতির যেন মাটিতে পা পড়েনা। কবি বলেন:[১৮]

أنعت كلبا ليس بالمسبوق مطهما يجري على العروق

جاءت به الأملاك من سلوق كأنه المقود المشوق

'আমি এমন এক কুকুরের প্রশংসা করছি যার পূর্বে এমন হিংস্র কুকুর দেখা যায়নি। যে কুকুর রক্তের শিরার মত এগিয়ে যায়। এ কুকুরের পরিশ্রমের মাধ্যমে অনেক সম্পদ অর্জিত হয়েছে। এ যেন হাল্কা লাগাম।'

৮. আল মাদ্‌হ-প্রশংসামূলক কবিতা (المدح)

আবূ নুওয়াস খলীফা আমীনের প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন। কবি বলেন-[১৯]

تتيه الشمس والقمر المنير إذا قلنا كأنهما الأمير

فإن يكُ أشبها منه قليلا فقد أخطاهما شبه كثير

'যখন আমরা বললাম চন্দ্র-সূর্য যেন রাজপুত্র আমীনের মত, তখন তারা ঘুরতে শুরু করে দেয়। যদি এ দুয়ের মাঝে সামান্য মিলও থাকে তাহলে অধিক তুলনা ভুল হিসেবে গণ্য হবে।'

৯. আল হিজা-ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা (الهجاء)

আবূ নুওয়াস ব্যাঙ্গকাব্যে পারদর্শী ছিলেন।

তিনি মাওয়ালীদ তথা পারস্য ভুখণ্ডের আরব কবি ছিলেন। আরবদের বিভিন্ন রীতি-নীতির সমালোচক ছিলেন। বিশেষত প্রাচীন আরবকবিদেরকে বাস্তুভিটার বর্ণনা সম্বলিত কবিতার রচনার জন্য ভৎর্সনা করেন। তার এরূপ একটি কবিতা হলো-[২০]

عاجَ الشَقِيُّ عَلى دارٍ يُسائِلُها وَعُدتُ أَسأَلُ عَن خَمّارَةِ البَلَدِ

قالوا ذَكَرتَ دِيارَ الحَيِّ مِن أَسَدٍ لا دَرَّ دَرُّكَ قُل لي مَن بَنو أَسَدِ

হতভাগ্য লোকটি একটি বাড়িতে জিজ্ঞাসা করতে গেল এবং আমি শহরের মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে ফিরে এলাম।

তারা বলল, আপনি আসাদ গোত্রে গ্রামের বাড়িঘরের কথা বলেছেন। ঘুরে কোনো কাজ হবেনা। আমাকে বলুন, বনূ আসাদের পরিচয় কি?

১০. আল ইতাব-তিরস্কারমূলক কবিতা (العتاب)

জনৈকা নারী কবির প্রেমিকা জিনানকে সংবাদ দেয় যে, আবূ নুওয়াস তোমাকে ভালোবাসে। জিনান কবিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন। কবি অবগত হওয়ার পর জিনানকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠেন-[২১]

وابأبي من إذا ذكرت له. وطول وجدي به..تنقّصَني

لوسألوه عن وجه حجته في سبه لي لقال :يعشقني

نعم إلى الحشر والتناد نعم أعشقه أو أُلفّ في كفني

يا معشر الناس فاسمعوه وعوا إن جنانًا صديقة الحسن

‘আমাকে এমন একজন অবজ্ঞা করে যার নিকট আমার কথা আলোচনা করা হয়েছে এবং তার জন্য আমার দীর্ঘ আবেগ রয়েছে। সে আমাকে খাটো করে কথা বলে। যদি তারা তাকে জিজ্ঞেস করতো আমাকে গালি দেয়ার কারণ কি? সে বলতো যে, তার অপরাধ সে আমাকে ভালোবাসে। হাশর-কিয়ামত পর্যন্ত হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি তাকে ভালোবাসি কাফনে মিলিত হওয়া অবধি। আমি স্পষ্টভাবে বলছি যে, আমি তাকে ভালোবাসি, তাকে ভালোবাসার কথা গোপন করবোনা। এ বিষয়ে কেউ কেউ আমার সাথে পীড়াপীড়ি করেছে। হে মানবগোষ্ঠী! শোনো ও মনে রেখো। নিশ্চয় জিনান আমার ভালো বান্ধবী।’

আবূ নুওয়াসের কবিতায় সৃজনশীলতা

আবূ নুওয়াসের কাব্যরীতি: কবি আবূ নুওয়াস আরবী কাব্যরীতির প্রাচীন পদ্ধতি পরিবর্তন করে এতে নতুনত্ব আনয়নের আহ্বান জানালেও তিনি পরিপূর্ণভাবে প্রাচীন রীতির প্রভাবমুক্ত হতে সক্ষম হননি বলেই প্রতীয়মান হয়। তার ‘মাদহ’ (স্তুতিকাব্য), ‘রাজায’ (বীরত্বগাঁথা), ‘মারাছী’ (শোকগাঁথা) প্রভৃতি কবিতায় প্রাচীন রীতির প্রভাব লক্ষ্যণীয়। যদিও তার ‘হিজা’ (নিন্দাকাব্য), ‘গযল’ (পণয়গাঁথা) ও ‘খমরিয়্যাত’ (মদ বিষয়ক কাব্য) কাব্যে নতুন ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে,[২২] জাহিলী কবি ইমরুউল কায়স (মৃ. ৫৪০ খ্রীঃ) তার আল-মুআল্লাকায় প্রেয়সীর পরিত্যক্ত বাস্তবভিটার পাশে দাঁড়িয়ে অতীত স্মৃতি রোমন্থন পূর্বক অশ্রু বিসর্জন সম্বলিত যে কাব্যরীতি প্রচলন করেন কবি আবূ নুওয়াস এই পদ্ধতিকে নিত্যন্ত সেকেলে বলে অভিহিত করেন এবং এই পদ্ধতি পরিহার পূর্বক কাব্যক্ষেত্রে নতুনধারা প্রবর্তনের আহ্বান জানান। আবূ নুওয়াস বলেন-[২৩]

دع الأطلال تسفيها الجنوب وتبلي عهد جدتها الخطوب

وخل لراكب الوجناء أرضا تحب بها النجيبة والنجيب

'প্রিয়ার পরিত্যক্ত বাস্তুভিটাকে তুমি ছাড়, যাকে দক্ষিনা হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে গেছে এবং যার ভিটেমাটির যুগ নানা ঘনঘটায় জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে।উষ্ট্রারোহীর জন্য তুমি ভূমিকে ছেড়ে দাও, যেথায় উন্নত জাতের উট ও উষ্ট্রী দুলকি চালে চলতে পারে।'

কবিতার মূল্যায়ন

কবি ইমরুউল কায়স কর্তৃক প্রবর্তিত কৃছীদা রীতির সূচনা পর্বে (মাতলা) পেয়সীর বিরহ বেদনায় পেমিক হৃদয়ের অন্তর্জ্বালা এবং দয়িতার পরিত্যক্ত নিবাসের ধ্বংস্তুপে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জনের যে ধারা প্রাক ইসলামী আরব কবিগণ কর্তৃক অনুসৃত হয়ে আসছিল, এর পরিবর্তে কবি আবূ নুওয়াসের কাব্য চেতনায় জীবন বোধ এবং সৃষ্টি ও সুন্দরের পতিফলন পরিলক্ষিত হয়।[২৪]

আবূ নুওয়াসের অনুসৃত কাব্যরীতি তার কবিতার সকল স্তরে একই ধারায় প্রবাহিত হয়নি। তার 'ত্বরদ' (শিকারের পশ্চাৎধাবন) শীর্ষক কবিতায় বেদুইন জীবনের ছাপ পরিস্ফুট। অনেক বেদুইন শব্দেরও এতে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। 'মাদহ' (স্তুতিকাব্য), 'হিজা' (নিন্দাকাব্য) এবং 'রিছা' (শোকগাঁথা) কাব্যে আমরা আবূ নুওয়াসকে ভিন্ন মাত্রার কবি হিসেবে দেখতে পাই। তার অধিকাংশ 'মাদহ' কাব্য আব্বাসী খলিফা হারুন আল-রশীদ (৭৮৬খ্রীঃ-৮০৯খ্রীঃ) ও তদীয় পুত্র আল-আমীনকে (৮০৯খ্রীঃ-৮১৩খ্রীঃ) কেন্দ্র করে রচিত। 'মাদহ' রচনায় তার কাব্যিক মান কিছুটা নিম্নগামী। শিল্প সৌন্দর্যের সাথে এ সব কাব্যে কিছুটা লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা স্থান পেয়েছে। 'মারছী' রচনায় তার অনুভূতি সুতীব্র। ব্যথাতুর হৃদয়ের বাস্তব অভিব্যক্তি এ সব কাব্যে পরিস্ফুট। তার 'গযল' কাব্য সঠিক কাব্য ধারায় পরিচালিত হলেও অশ্লীলতার ছোঁয়া এর গ্রহণযোগ্যতাকে কিছুটা ম্লান করে দিয়েছে। 'হিজা' রচনায় তার বক্তব্য ধারালো এবং প্রতিপক্ষের হৃদয় সংহারক। তবে অশ্লীল প্রেমের পভাবের কারণে এ সব কবিতা অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট।[২৫] আবূ নুওয়াসের কাব্যে কোন কোন ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী ধারা পরিলক্ষিত হয়। এক দিকে তিনি 'আল-খমরিয়্যাত' রচনার মাধ্যমে নিজেকে মদ্যপ হিসেবে উপস্থাপন করেন অপরদিকে 'যুহদ' রচনার মাধ্যমে স্রষ্টার সান্নিধ্যে গিয়ে পাপ-তাপ মোচনের জন্য ক্ষমা পার্থনা করেন। এই বিপরীতমুখী কাব্য রচনার কারণে তাকে আমরা সংশয়বাদী কবি হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি না। বরং আমরা বলব, জাগতিক উপভোগ এবং ঐশ্বরিক আকর্ষণ মানবজীবনের স্বাভাবিকপ্রবৃত্তি যা হতে আবূ নুওয়াসের মত কবিও মুক্ত নন। 'যুহদ' রচনায় আবূ নুওয়াস কেবল শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈপুণ্য প্রদর্শন করে ক্ষান্ত হননি বরং কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব রূপায়ন এবং হৃদয়ের গভীর অনুভূতি চিত্রায়নেও তিনি স্বীয় দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। জীবনের ভারে ন্যুজ হয়ে যখন পার্থিব জীবন সম্পর্কে কবির মোহমুক্তি ঘটে তখন পরকালে যাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে তিনি 'যুহদ' কবিতা রচনা করেন।[২৬] তার চিন্তাধারা ও দর্শনে গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব বিদ্যমান ছিল বলে তার কাব্যেও এর কিছুটা পভাব লক্ষ্য করা যায়।[২৭]

কবি আবূ নুওয়াস একজন মৌলিক শিল্পী। এই বিশ্ব চরাচর মহান স্রষ্টার শিল্পকর্মেরই বাস্তবরূপ। বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টিতে স্রষ্টার শিল্প নৈপুণ্যের নিদর্শন বিদ্যমান। আবূ নুওয়াস একজন দক্ষ শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে এই শৈল্পিক নিদর্শন পত্যক্ষ করেন। তাই তার কাব্যে সৃষ্টিলোকের গভীর রহস্য স্থান পায়। গ্রহ, নক্ষত্রের অবস্থান, সূর্যের পরিভ্রমণ, পাখ-পাখালির কলতান, সর্বোপরি জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত তার দৃষ্টিভঙ্গী শিল্পীর তুলিতে প্রতিভাত।[২৮] তার কবিতা সমূহ জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। কবিগণ সাধারণতঃ কল্পনার আশ্রয়ে তৈরী করে তা কবিতায় রূপ দিয়ে থাকেন। এতে করে কবিতায় শৈল্পিক উপাদান বিদ্যমান থাকলেও এতে জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি অনেক সময় উপেক্ষিত হয়। কিন্তু আবূ নুওয়াস সাহিত্য ও জীবনকে এক ও অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতেন। তাই তার কাব্যে জীবনের বাস্তব পতিচ্ছবি অঙ্কিত হয়।

পরিসমাপ্তি

আব্বাসী যুগে বেদুইন জীবনের প্রভাবমুক্ত হয়ে আরবী কাব্য চর্চার যে ধারা সৃষ্টি হয় কবি আবূ নুওয়াস তার সাথে পরিপূর্ণ রূপে একাত্ম হতে পারেন নি। যদ্দরুন তার কাব্যে বেদুইন জীবনের ছাপ এবং উমাইয়া কাব্য রীতি অনুসরণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, যদিও তিনি সমসাময়িক কবিদেরকে প্রাচীন কাব্যরীতি পরিহারের উদাত্ত আহ্বান জানান। কাব্যচর্চায় এই বিপরীতমুখী ধারা অনুসরণ কবি আবূ নুওয়াসের কাব্য ভাবনার ফলশ্রুতিতে নয় বরং একে তার অনভিজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা বলে চিহ্নিত করা যায়। তাই তার কাব্যে যেমনিভাবে প্রাচীন রীতি বিদ্যমান, অনুরূপভাবে আধুনিক রীতিও দৃশ্যমান। বস্তুত আরবী কাব্যে আধুনিক ধারার সূচনা হয় কবি আবূ নুওয়াসের মাধ্যমে। কাব্যচর্চায় আধুনিক ধ্যান-ধারণা মিশ্রিত ভাবাবেগকে তিনি নতুন শব্দালংকারে সাজিয়ে তা প্রাচীন রীতিতে উপস্থাপন করেন।[২৯] সুতরাং তাকে আরবী কাব্যে প্রাচীন ও আধুনিক ধারার মাঝে সেতুবন্ধন রচনাকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১ আহমদ হাসান আল যায়্যাত, *তারীখুল আদাব আরাবী* (বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ, সংস্করণ ৬, ২০০০), পৃ. ১৯৮।
২ যায়দান, জুরজী, *তারীখু আদাবিল লুগাত আল-আরাবিয়্যাহ, ১ম খণ্ড* (বৈরুত : মাকতাবা আল-হায়াত, ১৯৫৮), পৃ. ২৭২।
৩ *Abu Nuwas: A Genius of Poetry*- Philip F. Kennedy, Page:8
৪ আহমদ হাসান যায়্যাত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৮।
৫ আবূ নুওয়াসের মৃত্যু সাল নিয়ে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে, তার মৃত্যু সাল ১৯৫ হিঃ *(কাশফ-আল-যুনূন আন-আসামী আল-কুতুব ওয়া আল-ফুনূন'*, ১ম খণ্ড, (বৈরুতঃ মাকতাবাতুল মুছান্না, ১৯৪১), পৃ. ৭৭৪; ইবনু নদীম তার মৃত্যু সাল ২০০ হিঃ উল্লেখ করলেও তিনি ইবনু কুতাইবার সাথে ঐক্যমত পোষণ পূর্বক ১৯৯ হিঃ কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইবনু নদীম, দ্রষ্টব্যঃ *আল-ফিহরিস্ত* (বৈরুতঃ মাকতাবাতু খায়্যাত, ১৮৭২)।
৬ মুকাররামা, আবূ নুওয়াস ও খাসাইসু শি'রিহী আনিল হুব্বি, দিরাসাহ, জামিআ আলাউদ্দীন আল ইসলামিয়া আল হুকুমিয়্যাহ, মুকাসির, ২০১৯, পৃ. ১১০।
৭ হান্না আল ফাখূরী,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৩।
৮ *দিওয়ানু আবি নুওয়াস*, (বৈরূতঃ দারু সাদির, তা. বি.), পৃ. ১৪৯
৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪২।
১০ আল গাযালী, আহমদ আবদুল মাজীদ, *দীওয়ানু আবী নুওয়াস* (বৈরুতঃ দারুল কিতাব আল আরাবী, তা.বি.), সংস্করণ বিহীন, পৃ. ৭০০।
১১ *প্রাগুক্ত*, খ.৪, পৃ. ৮-৯।
১২ *প্রাগুক্ত*, খ.৪, পৃ. ১০।
১৩ *দীওয়ান*, পৃ. ২৪২।
১৪ *হুজুরাত:* ১২।
১৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭।
১৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬৩।
১৭ আবুল ফারাজ আল ইসফাহানী, *কিতাব আল আগানী*, খণ্ড ৩(কায়রোঃ মাকতাবাতুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যাহ, ২০১১), পৃ. ২০৬
১৮ *দীওয়ান*, পৃ. ৪৬৬।
১৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৫।
২০ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮১।
২১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৭।
২২ শাওকী দ্বাইফ, *তারীখ আল-আদব আল-আরবী-আল-আছর আল-আব্বাসী আল-আউয়্যাল*(মিসর, দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭২), পৃ. ২২৬-২২৭।
২৩ দীওয়ান, পৃ. ১১।
২৪ নিকলসন, আর.এ., *এ্যা লিটারারী হিস্ট্রী অব দ্যা এ্যারাবস*, কেমব্রিজ, ইউনিভারসিটি প্রেস, ১৯৬৬), পৃ. ২৮৬।

---

২৫ কার্ল ব্রকেলম্যান, *তারীখ আল-আদব আল-আরবী*, ২য় খণ্ড, (আবদুল হালীম আল-নাজ্জার কর্তৃক আরবী ভাষায় অনুদিত), (কায়রোঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৮৩), পৃ. ২৬।

২৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭।

২৭ দ্বাইফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩।

২৮ ইবনু কুতাইবা, আবদুল্লাহ ইবনু মুসলিম, *আশশির ওয়াশ শুয়ারা* (মিসরঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৭), পৃ. ৭৯৮-৭৯৯।

২৯ গোল্ড জিহারগোল্ড জিহার, ইগনেস-১৯৬৬ ঃ *এ্যা সর্ট হিষ্ট্রী আর ক্লাসিক্যাল এ্যারাবিক লিটারেচার* (জার্মানীঃ হিল্ডেসীন, ১৯৬৬, পৃ. ৭৩।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

তাফসির আস-সা'দির রচনা পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য : একটি পর্যালোচনা (Methods and Features of Tafseer As-Sadi : An Overview)

গোলাম কিবরিয়া*

Abstract: Shaikh Abdur Rahman ibn Nasir As-Sa'di was a famous mufassir of the modern era. He was a great scholar, not only tafseer, hadith, fiqh, usulul fiqh, balagat and mantiq but also in Arabic language and literature. To make Al-Qur'anul Karim easily understandable for people, he wrote an outstanding book of Tafsir named "Taiseerul kareemir Rahman Fi Tafsiri Kalamil Mannan". He is forever remembered in the pages of history for this precious volume of book. This article describes the brief biography of Shaikh Abdur Rahman Ibn Nasir as-Sadi, the introduction as well as the Methods and Features of his Tafseer including the manhaj followed by him.

ভূমিকা

শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সা'দি (১৩০৭-১৩৭৬ হি.) ছিলেন আধুনিক যুগের একজন বিজ্ঞ আলিম। মানবিক বিদ্যার এমন কোন শাখা নেই যেখানে তাঁর পদচারণা ছিল না। কুরআনুল কারিম, উলুমুল কুরআন, তাফসির, উসুলে তাফসির, হাদিস, উসুলে হাদিস, তাওহিদ, ফিকহ, উসুলে ফিকহ, বালাগত, মানতিক, ইলমে নাহু ও আরবি সাহিত্যের উপর ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। তিনি এ সকল বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেই ক্ষান্ত হননি, পাশা-পাশি এ সকল বিষয়ের উপর তাঁর রয়েছে ক্ষুরধার লিখনি। বিশেষ করে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারিমের পূর্ণাঙ্গ তাফসির রচনা করে ছাত্র-শিক্ষক, লেখক-গবেষক ও পাঠকদের মনের মণিকোঠায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর তাফসির গ্রন্থের মৌলিক রচনা পদ্ধতি হলো- কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসির, হাদিস দ্বারা কুরআনের তাফসির, সাহাবি তাবি'ই ও তাবিতাবি'ই গণের কথা দ্বারা কুরআনের তাফসির। এছড়াও তিনি অন্যান্য মুফাসসিরদের মত পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণ থেকে নকল করেছেন। কুরআনের অর্থকে সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন একই জাতীয় আয়াতের অর্থ বারবার উল্লেখকরণ, শব্দ চয়ন ও বাক্য প্রয়োগের চেয়ে অর্থের প্রতি গুরুত্বারোপ, বাতিল ফিরকা সমূহের ভ্রান্তমতবাদ খণ্ডন, আহকাম বর্ণনা, ইসরাইলিয়াত পরিহার, অতিরিক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকিদার বর্ণনা ইত্যাদি তাঁর তাফসির গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য প্রবন্ধে শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সা'দি (১৩০৭-১৩৭৬ হি.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁর তাফসির রচনা পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মুফাসসির-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ও বংশ পরিচয়

তাঁর নাম আব্দুর রহমান, কুনিয়াত আবু আব্দিল্লাহ, পিতার নাম নাসির, দাদার নাম আব্দুল্লাহ। তাঁর পূর্ণাঙ্গ বংশতালিকা নিম্নরূপ-

আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান বিন নাসির বিন আব্দুল্লাহ বিন নাসির বিন হাম্দ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্দ আস-সা'দি।[১] তিনি 'আল্লামাতুল কাসিম' নামেও প্রসিদ্ধ। আরবের প্রসিদ্ধ তামিম গোত্রের বনি 'আম্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ 'হায়িল'-এর নিকটবর্তী 'মুসতাজাদাহ'।[২] অথবা 'কাফার' নামক স্থানে

---

* পিএইচ.ডি গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বসবাস করত। সেখান থেকে তারা ১১২০ হিজরিতে আল-কাসিম প্রদেশের 'উনায়যাহ' নামক স্থানে স্থানান্তরিত হন।[৩] তাঁর মাতার নাম ফাতিমা বিনতে আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান বিন উসমান। তিনিও আরবের প্রসিদ্ধ তামিম গোত্রের উসাইমিন শাখায় জন্মগ্রহণ করেন।[৪]

জন্ম

শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সা'দি ১২ই মুহাররম ১৩০৭ হিজরি, ২৪ জানুয়ারি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে সৌদি আরবের আল কাসিম প্রদেশের উনায়যাহ নামক স্থানে এক উচ্চ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৫]

শৈশবকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ

শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সা'দি ১৩১০ হিজরিতে মাত্র ৪ বছর বয়সে মা এবং ১৩১৩ হিজরিতে ৭ বছর বয়সে পিতাকে হারিয়ে উভয় দিক থেকে ইয়াতিম হিসেবে লালিত-পালিত হন।[৬] পিতা-মাতা মৃত্যুর পর সর্ব প্রথম লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর সৎ মা। যখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করলেন তখন তাঁর পিতার পূর্ব অসিয়ত অনুযায়ী দেখা শুনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন আপন বড় ভাই হামদ বিন নাসির, যিনি সে সময়ের একজন বিখ্যাত আলিম ছিলেন। শায়খ সা'দি শৈশবকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ও প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি অতি অল্প বয়সে লেখা-পড়া শুরু করেন এবং পিতার নিকট থেকেই অক্ষরজ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর পিতা 'উনায়যাহ'-এর 'মাসুকুফ' মসজিদের সম্মানিত ইমাম ছিলেন। কুরআনুল কারিম হিফযের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। তিনি মাত্র ১১ বছর বয়সে কুরআনুল কারিমের হিফয সম্পূর্ণ করেন।[৭] শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান বিন সালিহ আল-বাস্‌সাম তাঁর রচিত গ্রন্থে বলেন, فحفظ القران الكريم عن ظهر قلب قبل أن يتجاوز الثانية عشرة من عمره 'তাঁর বয়স ১২ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই তিনি কুরআনুল কারিমের হিফয সম্পন্ন করেন'[৮]। বাল্যকাল থেকেই তিনি ইলম অর্জন ও ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান পালনে গভীর মনোযোগী ছিলেন। ইলম অর্জনের প্রচুর আগ্রহের মাধ্যমেই তিনি তাফসির, হাদিস, ফিকহ ও আরবি ভাষা-সাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করেন।[৯]

শিক্ষাজীবন

শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সা'দি (১৩০৭-১৩৭৬ হি.) (রহ.)-এর জ্ঞানার্জনের প্রতি গভীর অনুরাগ ও অদম্য স্পৃহা বাল্যকালেই তাঁর চরিত্রে ফুটে ওঠে। বিদ্যার্জনের প্রতি গভীর অনুরাগ ও অদম্য স্পৃহা দেখে তাঁর বড় ভাই উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে তৎকালীন সময়ের স্থানীয় আলিমগণের দারসে প্রেরণ করেন। তিনি তৎকালীন বিখ্যাত মুফাসসির ও মুহাদ্দিস শায়খ ইবরাহিম বিন হামদ বিন মুহাম্মাদ বিন জাসির (১২৪১-১৩৩৮হি.)-এর নিকট তাফসির, উসুলে তাফসির, হাদিস ও উসুলে হাদিস;[১০] শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল কারিম বিন ইবরাহিম বিন সালিহ আশ-শুবুল (১২৫৭-১৩৪৩ হি.)-এর নিকট ফিকহ, উসুলে ফিকহ ও নাহু-সরফ; শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আয়েজ আল-হারবী (১২৪৯-১৩২২ হি.)-এর নিকট ফিকহ ও আরবি ভাষা ও সাহিত্য এবং শায়খ সালিহ বিন উসমান বিন হামদ বিন ইবরাহিম আল-কাযী (১২৮২-১৩৫১ হি.) নিকট তাওহিদ, তাফসির, ফিকহ, উসুলে ফিকহ ও আরবি ভাষা ও সাহিত্য; শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হামদ বিন মুহাম্মাদ বিন সালিম (১২৪০-১৩২৩ হি.)-এর নিকট তাওহিদ; শায়খ আলী বিন নসির বিন মুহাম্মাদ আবু ওয়াদী (১২৭৩-১৩৬১ হি.)-এর নিকট হাদিস, উসুলে হাদিস, তাফসির ও উসুলে তাফসির শিক্ষার্জন করেন।[১১]

খ্যাতনামা শিক্ষকবৃন্দ

বিশ্ববরেণ্য এ আলিমে দ্বীন তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ আলিমদের নিকট থেকে কুরআন, হাদিস তাফসির, উসুলে তাফসির, ফিকহ, উসুলে ফিকহ, আরবি ভাষা-সাহিত্য, আকিদাহ ও তাওহিদসহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জন করেন, তাঁর শিক্ষকগণের সংখ্য সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা কঠিন। তবে তাঁর শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : ১. শায়খ আলী বিন মুহাম্মাদ আস-সানানী (১২৬৩-১৩৩৯ হি.) ২. শায়খ আলী বিন নাসির বিন আবু ওয়াদী (১২৭৩-১৩৬১ হি.) ৩. শায়খ ইবরাহিম বিন হামদ বিন জাসির (১২৪১-১৩৩৮ হি.) ৪. শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুল কারিম বিন ইবরাহিম বিন সালিহ আশ-শুবুল (১২৫৭-১৩৪৩ হি.) ৫. শায়খ মুয়ারিরখ ইবরাহিম বিন সালিহ বিন ঈসা (১২৭০-১৩৪৩ হি.) প্রমুখ।[১২]

প্রসিদ্ধ ছাত্রবৃন্দ

শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সা'দি আধুনিক যুগের প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। তাঁর সুন্দর পাঠদান পদ্ধতি, ছাত্রদের সাথে উত্তম ব্যবহার ও ক্ষুরধার লিখনির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অসংখ্য জ্ঞানপিপাসু বহু দূর দূরান্ত হতে এসে জ্ঞানের অমীয় সুধা পান করে বিদ্যাতৃষ্ঞা নিবারণ করত। যারা ইলম অর্জনের পর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইলমি খিদমত করেছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ১. শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন (রহ.) (১৩৪৭-১৪২১হি./১৯২৯-২০০১ খৃ.)। ২. শায়খ আব্দুল আযিয বিন মুহাম্মাদ আস-সালমান (রহ.)। ৩. শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল-বাসসাম ৪. শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযিয বিন আকিল ৫. শায়খ মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আল-বাসসাম প্রমুখ।[১৩]

রচনাবলী

ক. আকিদাহ-তাওহিদ বিষয়ক **গ্রন্থ :** القول السديد في مقاصد التوحيد (আল কাওলুস সাদিদু ফি মাকাসিদিত তাওহিদ), التوضيح و البيان لشجرة الايمان (আত-তাওযিহ ওয়াল বায়ান লিশাজারাতিল ইমান), الحق الواضح المبين في شرح توحيد الانبياء و المرسلين من الكافية الشافية (আল-হাক্কুল ওয়াযিহুল মুবীন ফি শারহি তাওহিদিল আমবিয়ায়ি ওয়াল মুরসালীন মিনাল কাফিয়াতিশ শাফিয়্যাহ), توضيح الكافية الشافية (তাওযিহুল কাফিয়াতিশ শাফিয়াহ) এবং الدرر البهية شرح قصيدة التائية في حل المشكلة القدرية (আদ-দুরারুল বাহিয়্যাহতু শারহু কাসিদাতিত তা-ইয়্যাহ ফি হাল্লিল মুশকিলাতিল কাদারিয়্যাহ) ইত্যাদি।

খ. কুরআন ও উলুমুল কুরআন বিষয়ক **গ্রন্থ :** تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (তাইসিরুল কারিমির রহমান ফি তাফসিরি কালামিল মান্নান), تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن (তাইসিরুল লাতিফিল মান্নান ফি খোলাসাতি তাফসিরিল কুরআন), القواعد الحسان لتفسير القرآن (আল-কাওয়ায়িদুল হাসসান লি-তাফসিরিল কুরআন) এবং فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والاخلاق والاحكام المستنبط من القران (ফাতহুর রাহিমিল মালিকিল 'আল্লাম ফি ইলমিল আকাইদি ওয়াত-তাওহিদি ওয়াল-আখলাকি ওয়াল আহকামিল মুসতামবাতিম মিনাল কুরআন) ইত্যাদি।

গ. হাদিস বিষয়ক **গ্রন্থ :** ১. بهجة قلوب الابرار و قرة عيون الاخيار في شرح جوامع الاخبار (বাহজাতু কুলুবিল আবরার ওয়া কুররাতু উইয়ূনিল আখয়ার ফি শারহি জাওয়ামি'ইল আখবার)।

ঘ. ফিকহ ও উসুলে ফিকহ বিষয়ক **গ্রন্থ :** المختارات الجلية في المسائل الفقهية (আল মুখতারাতুল জাল্লিয়াহ ফিল মাসায়িলিল ফিকহিয়্যাহ), المناظرات الفقهية (আল-মুনাযারাতুল ফিকহিয়্যাহ), منهج السالكين و توضيح الفقه في الدين (মানহাজুস সালিকিন ওয়া তাওযিহুল ফিকহি ফিদ-দ্বিন) ইত্যাদি।

ঙ. দাওয়াত ও উপদেশ বিষয়ক গ্রন্থ : الرياض الناضرة و الحدائق النيرة الزاهرة في العقائد و الفنون المتنوعة الفاخرة (আর-রিয়াযুন নাযিরাহ ওয়াল হাদায়িকুন নিরাতুয যাহিরাহ ফিল আকাইদ ওয়াল ফুনুনিল মুতানাওয়াতিল ফাখিরাহ), الدين الصحيح يحل جميع المشاكل (আদ-দ্বিনুস সহিহু ইয়া হিল্লু জামি'উল মাশাকিল), الدرة المختصرة في محاسن الدين الاسلامي আদ-দুর্‌রাতুল মুখতাসিরাহ ফি মুহাসিনিদ দ্বিনিল ইসলামি ইত্যাদি। এছাড়া আরবি ভাষা-সাহিত্য কেন্দ্রিক আত-তা'লিক ওয়া কাশফুন নিকাব 'আলা নাযমি কাওয়াইদিল ই'রাব গ্রন্থ রচনা করেন।[১৪]

আকিদাহ ও মাযহাব

শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সা'দি আকিদার ক্ষেত্রে সালাফে সালিহিন' তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী ছিলেন।[১৫] শায়খ তাঁর লিখিত 'কাওলুস সাদিদ শারহু কিতাবিত তাওহিদ' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের' সংক্ষিপ্ত আকিদাহ এবং এর মৌলিক ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো ভূমিকায় পেশ করার বিষয়টি আমার কাছে সমীচীন বলে মনে হচ্ছে'।[১৬] ফিকহি মাসআলার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে তিনি হাম্বলি মাযহাবের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে মাযহাবের মতামতকে উপেক্ষা করে দলিলের অনুসরণ করেছেন।[১৭]

কর্মজীবন

শায়খের কর্মময় জীবন ছিল বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে পরিপূর্ণ। যা দ্বারা সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি ও পরিবার উপকৃত হয়েছে। সর্বাবস্থায় তিনি দেশ ও জনগণের আশা-ভরসার আশ্রয়স্থল হিসাবে বিবেচিত হন। তিনি ছিলেন জ্ঞান অন্বেষণকারীদের শিক্ষক, সাধারণ জনগণের উপদেশদাতা, জুম'আ মসজিদের ইমাম ও খতিব, গুরুত্বপূর্ণ দলিল, দানপত্র ও অসিয়তনামার লেখক। বিবাহের কাজি ও দেশের নির্ভরযোগ্য মুফতি। তাঁর এ সকল কাজের পিছনে একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি।[১৮] আল্লাহ ও জনগণের হক আদায়ে তিনি তাঁর জীবনের দুনিয়াবীসকল সুখ-শান্তি ত্যাগ করে চিরস্মরণিয় হয়ে আছেন। তিনি ১৩৫৯/১৩৬০ হিজরিতে মন্ত্রী বিন হামদান এর সহযোগিতায় সৌদিআরবের প্রসিদ্ধ অঞ্চল আল-কাসিমের 'উনায়যাহ' নামক স্থানে 'আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ' নামে একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন।[১৯] ১৩৬০ হিজরিতে তিনি উনায়যার কাজি নির্বাচিত হন[২০], ১৩৬১ হিজরির রামাযান মাসে উনায়যার শাসনকর্তা তাঁকে কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম ও খতিব নিযুক্ত করেন, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।[২১] ১৩৬২-১৩৬৩ হিজরিতে উনায়যার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য 'জাম'ইয়্যাহ খায়রিয়্যাহ' নামক একটি সংস্থা গঠন করেন,[২২] ১৩৭৩ হিজরিতে উনায়যার 'আল-মা'আহাদুল ইলমি' এর পরিচালক নিযুক্ত হন।[২৩]

মৃত্যু

১৩৭৬ হিজরি মোতাবেক ২৩ জামাদিউল আখির রোজ বৃহস্পতিবার ফজরের কিছুক্ষণ পূর্বে সৌদি আরবের আল-কাসীম প্রদেশের 'উনায়যাহ' নামক স্থানে নিজ বাড়িতে বিশ্ববরেণ্য এ মুফাসসির ইন্তিকাল করেন। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। 'উনায়যাহ'-এর উত্তরে 'শাহওয়ানিয়্যাহ' নামক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[২৪]

তাফসির আস-সা'দির রচনা পদ্ধতি

তাফসির আস-সা'দির রচনার লক্ষ্য উদ্দেশ্য

তাফসিরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো- الفوز بسعادة الدارين 'দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানের সফলতা লাভ করা'।[২৫] তিনি বলেন, 'যেহেতু আমার ও আমার ভাইদের উপর আল্লাহর মহিমান্বিত কিতাব নিয়ে কাজ

করার দায়িত্ব এসেছে, সেহেতু আমাদের যোগ্যতা ও অবস্থার আলোকে আল্লাহ্‌র কিতাবের ততটুকু তাফসির পেশ করতে পছন্দ করেছি, যতটুকু সহজ হয় এবং আল্লাহ আমাদেরকে অনুগ্রহ করেন। যাতে করে এটি জ্ঞানীদের জন্য উপদেশস্বরূপ, চিন্তাশীলদের ইলমি খোরাক, এ পথের পথিকদের জন্য সহায়ক ও পথনির্দেশক হয়। এখানে কেবল আমি অর্থই উদ্দেশ্য করেছি। সেজন্য শব্দ বিশ্লেষণ নিয়ে কোন কাজ করিনি'।[২৬]

তাফসির আস-সা'দির রচনার প্রেক্ষাপট

আল-কুরআনের এ মর্মবাণী অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনেক মুফাসসির স্বীয় তাফসির গ্রন্থকে অনেক বড় করে ফেলেছেন। আবার কেউ সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে শুধু শব্দের আভিধানিক অর্থ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। ফলে আল-কুরআনের মূল কথা অস্পষ্টই রয়েছে। আবার কেউ কেউ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে খারিজি, শি'আ, মু'তাযিলা, জাবরিয়া, জাহমিয়া, মুরজিয়া, ক্বাদারিয়ার মত বিভিন্ন ভ্রান্ত ফিরকার জন্ম দিয়েছেন। এ সকল প্রেক্ষাপট ও দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে গিয়ে শায়খ সা'দি তাঁর তাফসির রচনা করেন। তিনি বলেন, 'অনেক ইমাম আল্লাহর কিতাবের তাফসির করেছেন। কিছু তাফসিরে রয়েছে উদ্দেশ্যহীন দীর্ঘ আলোচনা। আবার কিছু আলোচনা রয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত, যা কেবল শাব্দিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ। ফলে মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে যা করা উচিত ছিল তা হলো, অর্থকেই উদ্দেশ্য করা আর শব্দকে সে অর্থে পৌঁছানোর মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা'।[২৭]

তাফসির আস-সা'দির রচনাকাল

শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সা'দি ১৩৪২ হিজরিতে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারিমের তাফসির লিখা শুরু করেন এবং ১৩৪৪ হিজরিতে মাত্র দু'বছরে শেষ করেন, যখন তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৭ বছর।[২৮]

তাফসির আস-সা'দির নামকরণ

শায়খের তাফসির গ্রন্থের নাম হল **'তাইসিরুল কারিমির রহমান ফি তাফসিরি কালামিল মান্নান'**। তিনি উক্ত গ্রন্থের নামকরণের ক্ষেত্রে অন্যান্য মুফাসসিরের ন্যায় নিজস্ব চিন্তা ও গবেষণা থেকে নামকরণ করেছেন। তিনি মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারীমের এ দু'টি আয়াত এর উপর ভিত্তি করে তাঁর তাফসিরের নামকরণ করেন।[২৯] মহান আল্লাহ বলেন, (১) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ 'আর অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?[৩০] (২) وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا 'আর তারা আপনার কাছে যে বিষয়ই উপস্থিত করে না কেন, আমরা সেটার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আপনার কাছে নিয়ে আসি'।[৩১]

তাফসির আস-সা'দির রচনার অনুসৃত মূলনীতি

এ প্রসঙ্গে শায়খ বলেন, 'জেনে রাখো! তাফসির প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমার নির্বাচিত পদ্ধতি হলো: প্রতিটি আয়াতের যে অর্থ আমি জানি তা উল্লেখ করি। পরবর্তী বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কোনো আলোচনা আসলে আমি সেই বিষয়ে পূর্বে উল্লেখিত বক্তব্যকে যথেষ্ট মনে না করে পুনরায় আলোচনা করি। কেননা আল্লাহ তা'আলা এ কিতাবকে 'মাসানি' বলে পরিচয় দিয়েছেন'।[৩২] এছাড়া তিনি পূর্ণাঙ্গ তাফসিরের সাথে সাথে অতিরিক্ত কিছু বিষয় সংযোজন করেছেন। যেমন: ১. মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারিমকে সহজভাবে অনুধাবন করার জন্য তিনি ইলমুন নাহু, ইলমুল ফিকহ, ইলমুল বালাগাত ও ইলমুত তাফসির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি লিপিবদ্ধ করেন।[৩৩] ২. তিনি সম্পূর্ণ তাফসিরের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিস দ্বারা 'আসমাউল্লাহীল-হুসনা'-এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন।[৩৪] ৩. তিনি 'উসুল ওয়া কুল্লিয়াত মিন উসুলিত তাফসির ওয়া কুল্লিয়াতিহি লা

ইয়াসতাগনা আন-হাল মুফাসসির লিল-কুরআন' এই শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেন, যেখানে ইলমুত তাফসির, ইলমুন নাহু ও ইলমুল বালাগাত বিষয়ে আলোকপাত করেন।[৩৫] ৪. এছাড়া আল-কুরআনের আয়াত থেকে ফিকহি মূলনীতি রচনা, যা তাঁর তাফসিরের নতুন সংযোজন।[৩৬]

তাফসির আস-সা'দির রচনা পদ্ধতি

তাফসিরুল কুরআন রচনা করতে গিয়ে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। শায়খ সা'দির তাফসির রচনার অনুসৃত পদ্ধতি গুলো নিম্নরূপ:

১. তাফসিরুল কুরআন বিল কুরআন (تفسير القران بالقران) : অর্থাৎ আল-কুরআনের এক আয়াতের তাফসির অন্য আয়াত দ্বারা করা।[৩৭] ড. মুসা'ইদ বিন সুলাইমান আত-ত্বায়্যার বলেন- هو بيان معاني اية بدلالة اية أخري 'এক আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য আয়াত দ্বারা করা'।[৩৮] যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ 'আর যারা ইমান আনে তাতে, যা আপনার উপর নাযিল করা হয়েছে...'[৩৯]। শায়খ সা'দি বলেন, أُنْزِلَ 'কুরআন ও সুন্নাহ,[৪০] তিনি আল কুরআনের অন্য আয়াত দিয়ে এর তাফসির করেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ 'আল্লাহ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন..'।[৪১] শায়খ সা'দি বলেন- الْكِتٰبَ আল-কুরআন ও الْحِكْمَةَ সুন্নাহ।[৪২]

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন- فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ "তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি। অথঃপর আল্লাহ্ তাদের ব্যাধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী"।[৪৩] শায়খ সা'দি অত্র আয়াতের তাফসির অন্য আয়াত দ্বারা করেছেন। তিনি বলেন- والمراد بالمرض هنا: مرض الشك والشبهات والنفاق 'مَرَضٌ দ্বারা উদ্দেশ্য 'সন্দেহ-সংশয়. যিনা-ব্যভিচার এবং নিফাকি।[৪৪] দলিল হিসেবে তিনি সুরা আহযাবের ৩২ নং আয়াত পেশ করেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন- يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا "হে নবী-পত্নিগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর সুতরাং পর-পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, কারণ এতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংকত কথা বলবে"।[৪৫] শায়খ সা'দি বলেন- أي: مرض شهوة الزنا 'مَرَض দ্বারা উদ্দেশ্য যিনা-ব্যভিচারের কামনা।[৪৬]

২. তাফসিরুল কুরআন বিস সুন্নাহ (تفسير القران بالسنة): ড. মুসা'ইদ বিন সুলাইমান আত-ত্বায়্যার বলেন- هو بيان معاني القران الكريم بالسنة النبوي 'সুন্নাহ দ্বারা আল-কুরআনের আয়াতের তাফসির করা'।[৪৭]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ 'তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তোমরা দাঁড়াবে বিনীতভাবে'।[৪৮] শায়খ সা'দি বলেন, وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى দ্বারা উদ্দেশ্য আসরের সালাত।[৪৯] যা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।[৫০]

৩. তাফসিরুল কুরআন বি আকওয়ালিস সাহাবাহ (تفسير القران بأقوال الصحابة) : অর্থাৎ 'সাহাবায়ে কিরামের কথা দ্বারা আল-কুরআনের আয়াতের তাফসির করা'।[৫১] আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 'আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম'।[৫২] শায়খ সা'দি অত্র আয়াতের তাফসিরে সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর কাওল উল্লেখ করেছেন।[৫৩]

৪. তাফসিরুল কুরআন বি আকওয়ালিত তাবি'ইন (تفسير القران بأقوال التابعين) : 'তাবি'ইন এবং তাদের অনুসারীদের কথা দ্বারা আল-কুরআনের আয়াতের তাফসির করাকে তাফসিরুল কুরআন বি আকওয়ালিত তাবি'ইন বলে'।[৫৪] শায়খ সা'দি তাঁর তাফসির গন্থে أقوال السلف অথবা بعض السلف বলে তাবি'ইনদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী, وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا 'আল্লাহ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং আপনি যা জানতেন না তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আপনার প্রতি আল্লাহ্র মহা অনুগ্রহ রয়েছে'।[৫৫] শায়খ সা'দি বলেন- 'কিতাব' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল-কুরআন আর 'হিকমত' এর ব্যাখ্যায় তিনি তাবিইনদের বক্তব্য নকল করেছেন।[৫৬].

এছাড়াও তিনি তাহলিলি[৫৭] ইজমালি,[৫৮] মুকারানা[৫৯] ও মাওজু'ই,[৬০] পদ্ধতিতে তাফসির রচনা করেছেন। তিনি যে নীতির উপর ভিত্তি করে তাঁর তাফসির রচনা করেন, তাতে আধুনিক তাফসির সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। তাঁর তাফসির গ্রন্থটি সর্বমহলে প্রশংসনীয়।

তাফসির আস-সা'দির রচনার উৎস

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারিম-এর মুফাসসিরদের রচিত তাফসির পর্যালোচনা করলে নিঃসন্দেহে এ-কথা বলা যায় যে, সকল যুগের মুফাসসিরদের মূল উৎস হলো- কুরআন, হাদিস, সাহাবি ও তাবি'ইদের কথা এবং পরবর্তী যুগের মুফাসসিরগণ পূর্ববর্তী মুফাসসিরদের হতে সহায়তা নিয়েছেন। যেমন- ১. ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ, ২. ইমাম ইবনুল কাইয়্যুম, ৩. ইমাম তাবারি, ৪. ইমাম ইবনু কাসির সহ আরো অনেকে। শায়খ আব্দুর রহমান আস-সা'দি যেহেতু সালাফি-মানহাজ[৬১] ও আকিদাহকে লালন করেন তাই তিনি সালাফী মানহাজের মুফাসসিরদের হতে সহায়তা নিয়েছেন। যেমন- ১. সুরা আল-বাকারাহ-এর ৭৫ নং আয়াতের তাফসির শায়খ সা'দি (১৩০৭-১৩৭৬ হি.), শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) থেকে নকল করেছেন, তিনি বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তিরষ্কার করেছেন আহলে কিতাবের, যারা জেনে-বুঝে আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করেছে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হতে অন্য উদ্দেশ্যে'।[৬২] অথচ কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা নিষিদ্ধ। কারণ এটা দ্বীন ও ঈমানের অংশ ।[৬৩] ২. সুরা বাকারাহ-এর ২৪ নং আয়াতের তাফসিরে শায়খ সা'দি (১৩০৭-১৩৭৬ হি.) বলেন, 'বর্তমানে জাহান্নাম মওজুদ', এ আয়াতটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম একটি দলিল।[৬৪] যা তিনি তাফসিরে ইবন কাসীর থেকে নকল করেছেন। ৩. ইমাম ইবনুল কাইয়্যুম[৬৫], ৪. ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযি[৬৬] সহ আরো অনেকের নিকট থেকে নকল করেছেন।

তাফসির আস-সা'দির বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা

১. সুস্পষ্টতা ও সহজ সরল ভাষা

শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সা'দি রচিত তাফসির গ্রন্থটি ছাত্র-শিক্ষক, লেখক-গবেষক, পাঠক-পাঠিকা সকলের নিকট অত্যধিক জনপ্রিয়। কারণ এর ভাষা অত্যন্ত সহজ-সরল, প্রাঞ্জল খুব সহজেই মূল উদ্দেশ্য বুঝা যায়। তিনি সংক্ষেপ ও বিস্তারিত উভয়কেই পরিহার করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন।[৬৭]

২. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের[৬৮] আকিদাহ বর্ণনা

শায়খ সা'দি তাঁর তাফসির গ্রন্থে প্রচলিত সকল ভ্রান্ত মতবাদকে সঠিক দলিলের ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'তের আকিদাহকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যা আধুনিক যুগে বড় চ্যালেঞ্জ।[৬৯]

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ "বিচার দিবসের মালিক"[৭০] অত্র আয়াতে তাফসিরে শায়খ সা'দি কাদারিয়া এবং জাবারিয়াদের ভ্রান্ত আকিদাহকে খণ্ড করেছেন।[৭১]

৩. আধুনিক যুগের সঙ্গে সমাঞ্জস্য

আধুনিক যুগের সঙ্গে সমাঞ্জস্য রেখে তাফসির রচনায় তিনি ছিলেন অনন্য। কেননা তিনি কুরআন, হাদিস ও সালফে-সালেহিনের মতামতের আলোকেই ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধান, সামাজিক, রাজনৈতি, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থাকে আধুনিক যুগের সঙ্গে সমাঞ্জস্য রেখে দলিলের আলোকে তার সঠিক সমাধান জাতির নিকট পেশ করেছেন।[৭২] মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ "আর প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করবে না"।[৭৩] অত্র আয়াতের তাফসিরে শায়খ সা'দি বলেন- وإكرامًا لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد "যারা দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করে তাদেরকে সম্মান করা"।[৭৪] এখানে তিনি নিজ নিজ দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। যা অন্য কোনো তাফসির গ্রন্থে দেশের কথা বলা হয়নি।

৪. অতিরিক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার

অপ্রয়োজনীয় আলোচনা বর্জন করা একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাফসির রচনার মূল উদ্দেশ্য আকিদাহ, আহকাম, আল্লাহ্র গুণাবলি ও কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাবলি আলোচনার পর তিনি জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে শুধু ইঙ্গিত করেছেন মাত্র; বিস্তারিত আলোচনা করেননি। কারণ তাফসীর রচনার মূল উদ্দেশ্য হলো আকিদাহ, আহকাম, আল্লাহ্র গুণাবলী, ও কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাবলীর মৌলিক আলোচনা ।[৭৫]

৫. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শানে-নুযুল আলোচনা

শায়খ সা'দি তাঁর তাফসির গ্রন্থে সকল সুরা বা আয়াতের শানে-নুযুল তথা নাযিলের প্রেক্ষাপট আলোচনা করেননি। বরং তিনি গুরুত্বপূর্ণ সুরা ও আয়াতের শানে নুযুল তথা নাযিলের প্রেক্ষাপট তাঁর তাফসির গ্রন্থে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। কারণ পবিত্র কুরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যার নাযিলের প্রেক্ষাপট বর্ণনা না করলে আয়াতের সঠিক অর্থ ও মর্মবাণী বুঝা সম্ভব নয়। শায়খ সা'দি সুরা ও আয়াতের যে শানে-নুযুল তথা নাযিলের প্রেক্ষাপট উল্লেখ করেছেন তার একমাত্র উৎস হলো রাসুল (সা.)-এর হাদিস ও সাহাবিদের কথা।[৭৬]

৬. ইলমে নাহুর আলোচনায় কম গুরুত্বারোপ

আল-কুরআনের তাফসিরের পাশাপাশি তিনি খুব সামান্য স্থানে সংক্ষেপে ইলমে নাহুর কায়েদা-কানুন, শব্দ ও অক্ষরের অর্থ, যমির ইত্যাদি আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর ভূমিকায় এ-কথা স্পষ্ট করে ঘোষণা দিয়েছেন যে, 'এখানে কেবল আমি অর্থই উদ্দেশ্য করেছি। সেজন্য শব্দ বিশ্লেষণ নিয়ে কোনো কাজ করিনি'।[৭৭]

৭. বিভিন্ন আয়াত থেকে শিক্ষা গ্রহণ

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও উপদেশ গ্রহণের ক্ষেত্রে শায়খ সা'দি আল-কুরআনের আয়াতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। বিশেষ কোনো ঘটনা বা আল-কুরআনে বর্ণিত ঘটনা যেমন, আসহাবে কাহাফ, ইউসুফ (আ.) ও জিহাদের ঘটনা ইত্যাদি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলেও কুরআনের 'নস' তথা আয়াতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, যা তাঁর তাফসিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[৭৮]

৮. ইসরাইলিয়াত পরিহার

অনেক মুফাসসির তাঁদের রচিত তাফসির গ্রন্থে বাণি ইসরাইলের কাহিনি বর্ণনার মাধ্যমে আলোচনা দীর্ঘায়িত করেছেন কিন্তু শায়খ সা'দি তা শুধু বর্জনই করেননি বরং সঙ্গে সঙ্গে রদ করেছেন। এ প্রসঙ্গে শায়খ সা'দি বলেন, অপরিচিত রেওয়াত যার অধিকাংশই মিথ্যা, বানোয়াট ও দুর্বল যা বর্ণনা করা কোনো ভাবেই জায়েয নেই। তাঁর রচিত তাফসির গ্রন্থটি এ সকল দোষ ত্রুটি মুক্ত।[৭৯]

৯. আল কুরআনে বর্ণিত ঘটনা থেকে উপদেশ বর্ণনা

মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে উপদেশ ও শিক্ষা প্রদানের জন্য অসংখ্য কিসসা বা ঘটনা উল্লেখ করেছেন। শায়খ সা'দি ঐ সমস্ত ঘটনা থেকে সালফে সালিহিনের বুঝ ও মানহাজ অনুযায়ী সঠিক তাফসির করার পরে অত্যন্ত সংক্ষেপে বিভিন্ন উপদেশ উল্লেখ করেছেন।[৮০]

১০. আহকাম বর্ণনা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে প্রায় পাঁচশত আহকামের আয়াত বর্ণিত হয়েছে যদিও এ সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ আছে। তিনি সংক্ষেপে ইসলামি শরি'আতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আহকামগুলো সুন্দর ও সাবলিল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। যা তাঁর তাফসিরকে অন্যান্য তাফসির থেকে পৃথক করেছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন- فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ 'সুতরাং যখন তোমরা 'আরাফাত হতে ফিরে আসবে তখন মাশ'আরুল হারামের কাছে পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ করবে...' ।[৮১] অত্র আয়াতে শায়খ সা'দি হজ্জের ৭টি আহকাম উল্লেখ করেছেন। ১. আরাফার মাঠে অবস্থান করা হজ্জের রুকন। ২. মুযদালিফায় আল্লাহকে স্মরণ করা। ৩. আরাফার পরে মুযদালিফায় অবস্থান করা। ৪-৫. আরাফাহ ও মুযদালিফা দুইটিই হজ্জের অন্যতম অনুষ্ঠানাদির অন্তর্ভুক্ত। ৬. মুযদালিফা হলো হারামের অন্তর্ভুক্ত। ৭. আরাফাহ হুদুদে হারামের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৮২] এভাবে তিনি বিভিন্ন আয়াতের আহকাম গুলো অত্যন্ত চমৎকারভাবে উল্লেখ করেছেন। যা তার তাফসির গ্রন্থকে অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। অত্র আয়াতের তাফসিরে জালালাইন গ্রন্থকার শুধুমাত্র অতি সংক্ষেপে আরাফা ও মুজদালিফার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।[৮৩]

শায়খ আস-সা'দি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের একজন বিখ্যাত আলিম ছিলেন, তিনি তাঁর তাফসিরে খারেজি, মু'তাযিলা, শি'আ, কাদারিয়াহ, মুরজিয়া, চরমপন্থী সুফী প্রভৃতি বাতিল ফিরকাসমূহের মত খন্ডণ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন- فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ "অতএব যদি তোমরা তা করতে না পার আর কখনই তা করতে পারবে না, তাহলে তোমরা সে আগুন থেকে বাঁচার ব্যবস্থা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কাফেরদের জন্য"।[৮৪] অত্র আয়াতে শায়খ সা'দি ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু পথভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত আকিদায় বিশ্বাসী মু'তাযিলা ও খারেজি দু'টি দলকে রদ করেছেন। তিনি বলেন, أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ونحوها من الآيات، دليل لمذهب أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة، وفيها أيضا، أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار،.... خلافا للخوارج والمعتزلة. 'আয়াতের এ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ 'যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কাফেরদের জন্য') অংশটুকু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের জন্য দলিল যে, জান্নাত-জাহান্না আল্লাহর দু'টি সৃষ্ট বস্তু এবং কাবিরা গুনাহগার ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামি নয় কিন্তু মু'তাযিলা ও খারেজি উভয়ই সম্প্রদায় বিপরীত মত প্রকাশ করেছে।[৮৫]

১২. তাওহিদের আলোচনা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারিমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে শুধু তাওহিদের আলোচনাই ফুটে ওঠে। তিনি তাঁর এ গ্রন্থে এটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তার সারনির্যাস নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

তাওহিদ মূলত তিন প্রকার, তাওহিদুর রুবুবিয়্যাত, তাওাহিদুল উলুহিয়্যাহ বা তাওহিদুল ইবাদাহ, তাওহিদুল আসমা ওয়াস-সিফাত তথা আল্লাহর নাম ও গুণাবলির তাওহিদ।

(১) তাওহিদুর রুবুবিয়্যাত অর্থাৎ রব হিসাবে আল্লাহকে এককভাবে স্বীকার করা। বান্দার এ আকিদাহ পোষণের নামই হচ্ছে তাওহিদুর রুবুবিয়্যাত।[৮৬] তাওহিদুর রুবুবিয়্যাত সম্পর্কে শায়খ সা'দি যে আয়াত গুলো নিয়ে এসেছেন। মহান আল্লাহ বলেন- ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি সৃষ্টিকুলের ‘রব’।[৮৭] শায়খ সা'দি বলেন- توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: رَبِّ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ رَبِّ الْعَالَمِينَ দ্বারা তাওহিদুর রুবূবিয়্যাত প্রমাণিত।[৮৮]

(২) তাওাহিদুল উলুহিয়্যাহ বা তাওহিদুল ইবাদাহ অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই তাঁর সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর উলুহিয়্যাত এবং উবুদিয়্যাতের অধিকারী হিসেবে জানা ও স্বীকার করা। যাবতীয় ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান ও তাঁরই জন্য সকল প্রকার ইবাদতকে নিরঙ্কুশ করা।[৮৯] মহান আল্লাহ বলেন- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক। শায়খ সা'দি বলেন, اللهِ দ্বারা তাওহিদে উলূহিয়্যাত প্রমাণিত’।[৯০] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ “আর আপনার পূর্বে যে রাসুলই প্রেরণ করেছিলাম তার কাছে এ প্রত্যাদেশ করেছিলাম যে, আমি ছাড়া প্রকৃত আর কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর”।[৯১] এ আয়াতের তাফসিরে শায়খ সা'দি বলেন- ‘আল্লাহ তা'আলা সকল নবি রাসুলকে এ আদেশ দিয়েছেন যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে হবে তাঁর সাথে কাউকে শরিক করা যাবে না তিনি হলেন সত্য মা'বুদ। তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদত করলে তা হবে বাতিল’।[৯২]

(৩) তাওহিদুল আসমা ওয়াস-সিফাত (আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলির তাওহিদ) : আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠত্ব মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের যাবতীয় গুণাবলিতে এক, একক এবং নিরঙ্কুশভাবে পূর্ণতার অধিকারী। এ-ক্ষেত্রে কোনোক্রমেই কেউ তাঁর অংশীদার হতে পারে না। উপরিউক্ত আকিদাহ পোষণ করার নামই হচ্ছে তাওহিদুল আসমা ওয়া সিফাতের তাওহিদ।[৯৩] মহান আল্লাহ বলেন- لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ “কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা”।[৯৪] শায়খ সা'দি বলেন- এ আয়াতটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের দলিল, আল্লাহর ‘সিফাত’ সাব্যস্তকরণ ও সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য না করা এবং মুশাব্বিহাদের ‘রদ’ করার ক্ষেত্রে।[৯৫] শায়খ সা'দি বলেন- আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে যেগুলো ইঙ্গিত করে প্রশংসার এবং পূর্ণাঙ্গ গুণাবলির। এ সকল নাম দ্বারা তাঁকে আহবান করার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলা কেননা এগুলো তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার একটি মাধ্যম।[৯৬] আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলির ক্ষেত্রে কোনোরূপ বিকৃতরূপ, পরিবর্তন, সাদৃশ্য, দূরতম ব্যাখ্যা করা যাবে না। এ ব্যাপারে সালাফদের[৯৭] আকিদাই তিনি যুক্তি ও দলিলের মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন।

১৩. আমসালের আলোচনা

মাসাল বা উপমা হলো এমন কোনো বিষয়ের উপস্থাপনা করা যেটি তুল্য বিষয়ের সাথে হুবহু মিলে যায়। দুটোর মধ্যে এমন সামঞ্জস্য রয়েছে যে, একটি অপরটির বর্ণনা দেয় এবং একটি অপরটির প্রতিচ্ছবি হিসেবে

গণ্য হয়। মাসাল শব্দটি মহাগ্রন্থআল-কুরআনে ১৭৯ স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[৯৮] শায়খ সা'দি বলেন- আল্লাহ তা'আলা 'মাসাল' শব্দ ব্যবহার করে হিকমত অবলম্বন এবং হক স্পষ্ট করেছেন। কেননা আল্লাহ হক প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে মাকড়সা ও মাছির উদাহরণ পেশ করার পর মুশরিকরা প্রশ্ন উত্থাপন করল মাকড়সা ও মাছি কি উল্লেখযোগ্য কিছু? এটা তাদের প্রশ্নের জাবাব মাত্র। এখানে আল্লাহর উদ্দেশ্য তাঁর বান্দাদেরকে শিক্ষা প্রদান করা।[৯৯]

১৪. হুরুফে মুকাত্তা'আতের আলোচনা

আল-কুরআনের কতিপয় সুরার প্রথমে কিছু অক্ষর আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন যার অর্থ, উদ্দেশ্য ও কারণ আজ পর্যন্ত কেউ উৎঘাটন করতে পারেনি। এ সকল অক্ষরগুলোকে 'হুরুফে মুকাত্তা'আত' বলা হয়। ২৯ টি সুরা হুরুফে মুকাত্তা'আত দ্বারা শুরু হয়েছে। যেমন, الٓمّٓ, الٓرٰ, حٰمٓ, طٰسٓمّٓ ইত্যাদি। শায়খ সা'দি বলেন- এ সমস্ত অক্ষরগুলোর অর্থ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং মর্মার্থ শুধু মাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন অন্য কেউ এ গুলোর অর্থ জানে না।[১০০]

১৫. ইলমুল কিরাআতর আলোচনা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারিমের সাত পদ্ধতিতে তিলাওয়াত স্বীকৃত। আরবির শুদ্ধ উচ্চারণে ইলমুল কিরাআতের বিকল্প নেই। কিরাতের ভিন্নতার কারণে অর্থের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ফলশ্রুতিতে একটি শব্দ বা আয়াত থেকে একাধিক অর্থ ও আহকাম উপলব্ধি করা সম্ভব। শায়খ সা'দি তাঁর তাফসির গ্রন্থে কিরাত নিয়ে সরাসরি আলোচনা করেননি তবে বিভিন্ন স্থানে একটি শব্দ বা আয়াত থেকে কিরাতের পার্থক্যের কারণে ভিন্ন ভিন্ন আহকামের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ "হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াতে চাও তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও এবং তোমাদের মাথায় মাসেহ কর এবং পায়ের টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে নাও..".[১০১] শায়খ সা'দি বলেন- 'অত্র আয়াতে وَأَرْجُلَكُمْ কে দুইভাবে পড়া যায় 'লাম' এর উপর যবর অথবা যের। যবর দিয়ে পড়লে অর্থ হবে দুই পা-কে ধৌত করা যখন পা-দ্বয় খোলা থাকবে আর যের দিয়ে পড়লে অর্থ হবে মাসেহ করা যখন দুই পা মোজা দ্বারা আবৃত থাকবে।[১০২]

উপসংহার

আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সা'দি (১৩০৭-১৩৭৬ হি.) ছিলেন প্রথিতযশা ও সুবিখ্যাত মুফাসসির ও সমাজসেবক। ইসলামী শরি'আতের সকল ক্ষেত্রে তাঁর পদচারণা লক্ষ করা যায়। বিশেষতঃ তাফসির শাস্ত্রে। তাঁর রচিত আল-কুরআনের তাফসির গ্রন্থটি আধুনিক যুগের সর্বমহলে প্রশংসিত তাফসির গ্রন্থ। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা তাওহিদ ও আকিদাহ তাঁর তাফসিরকে অন্যান্য তাফসির গ্রন্থ থেকে পৃথক করেছে। এছাড়ও ফিকহি মাসলা-মাসায়েল, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকিদাহ, শানে-নুযুল, ইলমুল কিরাত, ইসরাইলিয়াত বর্জন, ভ্রান্ত ফিরকাহ সমূহের যুক্তি খণ্ডন তাঁর তাফসীর গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সর্বসাধারণের মাঝে আল-কুরআনের শিক্ষাকে বিস্তারের ক্ষেত্রে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ তাফসির অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এই তাফসির গ্রন্থটি আরব-অনারব, আলিম-উলামা, শিক্ষক-ছাত্র, লেখক-গবেষক নির্বিশেষে সকলের নিকট গ্রহণ যোগ্যতা অর্জন করেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. মুহাম্মদ বিন উসমান বিন সালিহ বিন উসমান আল-কাযি, **রাওযাতুন নাযিরিন,'আন মায়াসিরি উলামাই নাজদ ওয়া হাওয়াদিসিস সিনিন.** ১ম খণ্ড (রিয়াদ : মাতবা'আতুল হালাবি, ১ম সংস্করণ, ১৪০০ হি./ ১৯৮০ খৃ.) পৃ. ২১৯।

২. মুসতাজাদাহ : একটি গ্রামের নাম, যা হায়িল এর দক্ষিণে অবস্থিত যার দূরত্ব হায়িল থেকে ১২০ কিলোমিটার; শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান বিন সালিহ আল-বাসসাম, **উলামাউ নাজদ খিলালা সামানিয়াতা কুরূন**, ৩য় খণ্ড (রিয়াদ : দারুল 'আসিমাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪১৯ হি.) পৃ. ২১৮-২১৯।

৩. আব্দুর রাযযাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-'আব্বাদ, **শায়খ আব্দুর রহমান বিন সা'দি ওয়া জুহূদুহু ফি তাওযিহিল আকিদাহ** (রিযাদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ২য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি./ ১৯৯৩ খৃ.) পৃ. ১৭।

৪. আব্দুর রহমান খালিদ আস-সা'দি, **ইখতিয়ারাতুশ শায়খ আব্দির রহমান আস-সা'দি ফি মাসায়িলিল ফিকহিয়্যাহ আল-মুসতাজাদ্দাহ** (রিয়াদ : দারুল মায়মান, ১ম সংস্করণ ১৪৩৬ হি./ ২০১৫ খৃ.) পৃ. ২২।

৫. মাহা বিনত আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আস-সায়ারী, **ইখতিয়ারাতুশ শায়খ আব্দির রহমান আস-সা'দি ফি কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মু'য়াসিরাহ** (রিয়াদ : দারু কনুয ইশবালিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৪৩৯ হি./ ২০১৮ খৃ.) পৃ. ২২।

৬. **জুহূদুহু ফি তাওযিহিল আকিদাহ**, পৃ. ১৮।

৭. **কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মু'য়াসিরাহ**, পৃ. ২৭।

৮. **উলামাউ নাজদ**, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২০।

৯. **জুহূদুহু ফি তাওযিহিল আকিদাহ**, পৃ. ১৯; **মাসায়িলিল ফিকহিয়্যাহ আল-মুসতাজাদ্দাহ**, পৃ. ২২।

১০. **রাওযাতুন নাযিরিন**, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১; **উলামাউ নাজদ**, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৭।

১১. **জুহূদুহু ফি তাওযিহিল আকিদাহ**, পৃ. ৩২-৩৫; **মাসায়িলিল ফিকহিয়্যাহ আল-মুসতাজাদ্দাহ**, পৃ. ২৬।

১২. **রাওযাতুন নাযিরিন**, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২০; **উলামাউ নাজদ**, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২২-২২৩।

১৩. **উলামাউ নাজদ**, পৃ. ২৩৬-২৪৪; **জুহূদুহু ফি তাওযিহিল আকিদাহ**, পৃ. ৪১-৪৩।

১৪. **মাসায়েলিল ফিকহিয়্যাহ আল-মুসতাজাদ্দাহ**, পৃ. ২৮-২৯।

১৫. **জুহূদুহু ফি তাওযিহিল আকিদাহ**, পৃ. ৪৩।

১৬. শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সা'দি, **কাওলুস সাদিদ শারহু কিতাবিত তাওহিদ** (রিয়াদ : দারুস সুবাত, ১ম সংস্করণ ১৪২৫ হি./২০০৪ খৃ.) ভূমিকা দ্র. পৃ. ৩১।

১৭. **রাওযাতুন নাযিরিন**, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২২; **জুহূদুহু ফি তাওযিহিল আকিদাহ**, পৃ. ৪৮।

১৮. **কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মু'য়াসিরাহ**, পৃ. ২৪।

১৯. **রাওযাতুন নাযিরীন**, ১ম খণ্ড,; পৃ.২২৩; **জুহূদুহু ফি তাওযিহিল আকিদাহ**, পৃ. ২২।

২০. **তদেব**।

২১. **তদেব**।

২২. **তদেব**।

২৩. **তদেব**।

২৪. **জুহূদুহু ফী তাওযীহিল আকিদাহ**, পৃ. ২৩-২৪; **কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মু'য়াসিরাহ**, পৃ. ২৫।

২৫. শামসুল হক দৌলতপুরী, **তাফসির শাস্ত্র পরিচিতি** (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, (তৃতীয় সংস্করণ মার্চ ২০০৪, চৈত্র ১৪১০, মুহররম ১৪২৫), পৃ. ১০-১১।

২৬. শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সা'দি, **তাইসিরুল কারিমির রহমান ফি তাফসিরি কালামিল মান্নান** (বৈরুত : মুয়াস্‌সাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ ২০০২ খৃ./ ১৪৩২ হি.), পৃ. ৩০।

২৭. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ২৯-৩০।

২৮. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ১৩-১৪।

২৯. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ১৪।

৩০. সুরা আল-কামার, আয়াত : ২২।

৩১. সুরা আল ফুরকান, আয়াত : ৩৩।

৩২. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ২৭।

৩৩. **তদেব**, পৃ. ৩১।

৩৪. **তদেব**, পৃ. ৯৪৫-৯৪৯।

৩৫. **তদেব**, পৃ. ৯৪১-৯৪৫।
৩৬. **তদেব**, পৃ. ৪৮২-৪৮৪।
৩৭. মান্না' আল-কাত্তান, **মাবাহিস ফি 'উলুমিল কুরআন**, (কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহিবাহ, তা. বি.), পৃ. ৩৩৭।
৩৮. ড. মুসা'ইদ বিন সুলাইমান বিন নাসির আত-ত্বায়্যার, **আত-তাহরির ফি উসুলিত তাফসির** (জিদ্দা : মারকাযুদ-দিরাসাত ওয়াল মা'লুমাতিল কুরআনিয়্যাহ বি-মা'হাদিল ইমামিশ শাত্বিবী, ৪র্থ সংস্করণ ২০১৮ খৃ./ ১৪৩৯ হি.), পৃ. ৪২।
৩৯. সুরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত : ৪।
৪০. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ৪১।
৪১. সুরা আন-নিসা, আয়াত : ১১৩।
৪২. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ৪১।
৪৩. সুরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত : ১০।
৪৪. لأن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة، ومرض الشهوات المردية، فالكفر والنفاق والشكوك والبدع، كلها من مرض الشبهات، والزنا، ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها، من مرض الشهوات، كما قال تعالى: {فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} وهي شهوة الزنا، والمعافى من عوفي من هذين المرضين، فحصل له اليقين والإيمان، والصبر عن كل معصية، فرفل في أثواب العافية দ্র. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ৪২।
৪৫. সুরা আল-আহযাব, আয়াত : ৩২।
৪৬. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ৬৬৩-৬৬৪।
৪৭. ড. মুসা'ইদ বিন সুলাইমান বিন নাসির আত-ত্বায়্যার, **আল-মুয়াসসার ফি উসুলিত তাফসির**, (জিদ্দা : মারকাযুদ-দিরাসাত ওয়াল মা'লুমাতিল কুরআনিয়্যাহ বি-মা'হাদিল ইমামিশ শাতিবী, ১ম সংস্করণ ২০১৯ খৃ./ ১৪৪০ হি.), পৃ. ২৭।
৪৮. সুরা আল-বাকারাহ, আয়াত : ২৩৮।
৪৯. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ১০৬।
৫০. মুহাম্মাদ বিন ঈসা আবূ ঈসা আত-তিরমিযি আস-সালামি, **আল-জামিউস সহিহ সুনানিত তিরমিযি**, ৫ম খণ্ড (বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবি, তা.বি), পৃ. ২১৭, হা/ ২৯৮৩ ।
৫১. **তদেব**, পৃ. ৮৪।
৫২. সুরা আল-মায়িদাহ্‌, আয়াত : ৪৫।
৫৩. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ২৩৩।
৫৪. **তদেব**, পৃ: ৮৪।
৫৫. সুরা আন-নিসা, আয়াত : ১১৩।
৫৬. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ২০১।
৫৭. يعمد المفسر هو بهذا الاسلوب الي التحليل في الاية فيبين سبب نزولها وبيان غريبها واعلراب مشكلها وبيان مجملها ড. মুসা'ইদ বিন সুলাইমান আত-তাইয়ার, **ফসুলুন ফি উসুলিত তাফসির** (রিয়াদ : দারুন নাশরিদ দাওলী, প্রথম প্রকাশ ১৪১৩ হি./ ১৯৯৩ খৃ.), পৃ. ১৯।
৫৮. يعمد المفسر هو بهذا الاسلوب الي بيان المعني العام للاية دون التعرض للتفاصيل كالاعراب واللغة والبلاغة والفوائد وغيرها দ্র. **তদেব**।
৫৯. يعمد المفسر هو بهذا الاسلوب الي نصين او قولين ويقارن بينهما وقد يقارن بين الاية واية أو اية و حديث وقد يقارن بين قول في اية و قول اخر و يرجح بينهما দ্র. **তদেব**, পৃ. ২০।
৬০. يعتمد هذا الاسلوب علي دراسة لفظة أو جملة أو موضوع في القران وهو اقسام ان يكون عرض الموضوع من خلال سورة ان يكون عرض الموضوع من خلال القران كله و দ্র. **তদেব**।
৬১. সালাফি মানহাজ বলতে পূর্বসূরীদের তরিকাকে বুঝায়। অর্থাৎ সাহাবী, তাবি'ই ও তাবি'ইগণ যে পথ, পন্থা, পদ্ধতি ও রীতি-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাকেই সালাফি মানহাজ বলা হয়। দ্র. **মাসিক আল-ইখলাছ**, সালাফি মানহাজ: পরিচিতি ও অনুসরণের আবশ্যকতা (রাজশাহী, জুলাই ২০২০), পৃ. ২।
৬২. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ২০১।
৬৩. শায়খুল ইসলাম ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ, **আত-তাফসির আল-কাবীর** (বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৮ খৃ./ ১৪০৮ হি.), ৩ খণ্ড; পৃ. ৩৬।
৬৪. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ৪৬।
৬৫. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ৩১-৩৮।

---

৬৬. والأحسن في هذا أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة দ্র. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ৮৫।

৬৭. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ১৩।

৬৮. ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহ.) বলেন, وَأَهْلُ السُّنَّةِ الَّذِيْنَ نَذْكُرُهُمْ أَهْلَ الْحَقِّ وَمَنْ عَدَاهُمْ فَأَهْلُ الْبَاطِلِ فَإِنَّهُمُ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَكُلُّ مَنْ سَلَكَ نَهْجَهُمْ مِنْ خِيَارِ التَّابِعِيْنَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَهْلُ الْحَدِيْثِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ جِيْلًا فَجِيْلًا إِلى يَوْمِنَا هَذَا وَمَنِ اقْتَدَى بِهِمْ مِنَ الْعَوَامِّ فِىْ شَرْقِ الْأَرْضِ وَغَرْبِهَا رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ- 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত- যাদেরকে আমরা হকপন্থী ও তাদের বিরোধীদের বাতিলপন্থী বলি, তাঁরা হ'লেন, (ক) ছাহাবায়ে কেরাম (খ) তাঁদের অনুসারী শ্রেষ্ঠ তাবেঈগণ (গ) আহলেহাদীছগণ (ঘ) ফকিহদের মধ্যে যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত (ঙ) এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐ সকল 'আম জনসাধারণ, যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন'। দ্র. আলি বিন হাযম আন্দালুসি, কিতাবুল ফিসাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল (বৈরুত : মাকতাবা খাইয়াত, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩২১ হি./১৯০৩ খৃ.), পৃ. ১১৩।

৬৯. নাসির আল আবদ সালিম আল মারনাখ, **মানহাজুশ শায়খ সা'দি ফি তাফসিরিহি 'তাইসিরুল কারিমির রহমান ফি তাফসিরি কালামিল মান্নান'** (অপ্রকাশিত এমফিল অভিসন্দর্ভ, ১৪২৩ হি./ ২০০২ খৃ. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গাজা, ফিলিস্তিন), পৃ. ২৪।

৭০. সুরা আন-নিসা, আয়াত : ৪।

৭১. তিনি বলেন- وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} وأن الجزاء يكون بالعدل، لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. وتضمنت إثبات القدر، وأن العبد فاعل حقيقة، خلافا للقدرية والجبرية দ্র. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ৩৯।

৭২. **তদেব**, পৃ. ২৫।

৭৩. সুরা আদ-দুহা, আয়াত : ১০।

৭৪. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ৯২৮।

৭৫. **মানহাজুশ শায়খ সা'দি ফি তাফসিরিহি**, পৃ. ২৫।

৭৬. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ২৪৩।

৭৭. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ৩০।

৭৮. **তদেব**।

৭৯. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ৫৫-৫৬।

৮০. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ৩৮৮।

৮১. সুরা বাক্বারাহ, আয়াত : ১৯৮।

৮২. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ৯২।

৮৩. তিনি বলেন, {فَإِذَا أَفَضْتُمْ} دَفَعْتُمْ {مِنْ عَرَفَات} بَعْد الْوُقُوف بِهَا {فَاذْكُرُوا اللَّه} بَعْد الْمَبِيت بِمُزْدَلِفَةَ بِالتَّلْبِيَةِ وَالتَّهْلِيل وَالدُّعَاء {عِنْد الْمَشْعَر الْحَرَام} هُوَ جَبَل فِي آخِر الْمُزْدَلِفَة يُقَال لَهُ قُزَح وَفِي الْحَدِيث أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بِهِ يَذْكُر اللَّه وَيَدْعُو حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا رَوَاهُ مُسْلِم দ্র. জালালুদ্দীন মুহাল্লি জালালুদ্দীন সুয়িতি, **তাফসিরুল জালালাইন** (কায়রো: দারুল হাদিস, প্রথম খণ্ড, তাবি.), পৃ. ৪২।

৮৪. সুরা আল-বাকারাহ, আয়াত : ২৪।

৮৫. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ৪০।

৮৬. **তদেব**, পৃ. ৪২।

৮৭. সুরা আল-ফাতিহা, আয়াত : ২ ।

৮৮. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ৪০।

৮৯. **আল-কাওলুস সাদিদ শারহু কিতাবিত তাওহিদ**, পৃ. ৪২-৪২।

৯০. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ৪০।

৯১. সুরা আল-আম্বিয়া, আয়াত : ২৫।

৯২. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ৫২১।

৯৩. **আল-কাওলুস সাদিদ শারহু কিতাবিত তাওহিদ**, প ৪০।

৯৪. সুরা আশ-শুরা, আয়াত : ১১।

৯৫. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ৭৫৪।

৯৬. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ৫০২।

৯৭. সালাফিদের পরিচয়: তারা হলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত অর্থাৎ সাহাবি ও তাবি'ইগণ এবং যারা আকিদাহ, কথা ও কাজে তাদের অনুসরণ করেন। দ্র. শায়খ ড. মুহাম্মাদ বিন উমর বিন সালিম বাযমূল, **এটা সালফগণের মানহাজ নয়,** অনুবাদ-সম্মাদনা শায়খ ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া (ঢাকা: আত-তাওফীক প্রকাশনী, চতুর্থ সংস্করণ ২০২৩ খৃ.), পৃ. ২০।

৯৮. ড. মোঃ রহিম উল্যাহ, **উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণে আল-কুরআনে বর্ণিত উপমাসমূহ একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ** (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, ৪৭ বর্ষ ১ম সংখ্যা ২০০৭ খৃষ্টাব্দ) পৃ. ৪৮।

৯৯. শায়খ ড. আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া, **কুরআনুল কারিম** (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির), প্রথম খণ্ড, (মদীনা মুনাওয়ারা : বাদশাহ্ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স, প্রথম প্রকাশ ১৪৩৬ হি.), পৃ. ৪৭।

১০০. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ৪০।

১০১. সুরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৬।

১০২. **তাফসির আস-সা'দি**, পৃ. ২২২-২২৩।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

আল-কুরআনে ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞান : একটি পর্যালোচনা
(Geography in the Qur'an: A Review)

মো. জয়নুল আবেদীন*

Abstract: The most read scripture in human history is the Holy Quran. Islam is a scientific religion and its great book Al-Quran is also scientific. Islam is not just a set of rituals, but it is a complete code of life. Allah Almighty has sent down many verses in order to study and gain knowledge on the things created in the university, through which the superiority of Allah's words emerges. Advances in various branches of science, new researches and discoveries have opened the tangle of many complex issues in the scientific theory of the Quran. As a results, today people are rushing towards the teachings of the Quran. We know there are many branches of science. There are three basic or main branches. Geological science is one of them. Where Earth's formation, Earth's past history and its changes are discussed. Discussion of the subject has been given priority in the dissuasion article. One should concentrate on the worship of Allah by strengthening faith with his teachings.

ভূমিকা

মানব ইতিহাসে সর্বাধিক পঠিত ধর্মগ্রন্থ হলো মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। যা বিশ্বমানবতার জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। বিশ্বমানবতার মুক্তি ও কল্যাণের জন্য ইসলামই আল্লাহ তা'আলার মনোনিত চূড়ান্ত ধর্ম। যার পূর্ণাঙ্গতার জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাদের প্রতি পথনির্দেশিকাও নাযীল করেছেন। ইসলাম বিজ্ঞানসম্মত একটি ধর্ম, যার ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনও বিজ্ঞানময়। আল-কুরআনই যে মানবিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনন্ত উৎস তার অভ্রান্ত মহাসত্য প্রস্ফুটিত হয়েছে বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনার মধ্য দিয়ে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রতিটি নুকতা, বর্ণ, শব্দ ও আয়াত চ্যালেঞ্জের দাবিদার। এতে মহাবিশ্বে সৃষ্ট বস্তুসমূহের উপর চিন্তা-গবেষণা ও এতদবিষয়ে জ্ঞানার্জনের তাকিদ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা প্রায় ৭৫৬টি আয়াত নাযিল করেছেন। এছাড়াও আল-কুরআনে এক হাজারেরও অধিক আয়াত রয়েছে যেখানে সরাসরি কিংবা ইঙ্গিতে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোচনা রয়েছে। ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞান বিষয়ক আয়াত রয়েছে প্রায় চারশতাধিক। আল-কুরআনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি কোন বিষয়ে তাত্ত্বিক ইঙ্গিত করবে; বিস্তারিত বর্ণনা দেবে না। তাই এ বিষয়ে সাধারণ পাঠকদের অনুধাবন অত্যন্ত কঠিন। কাজেই আরবী শব্দাবলির অর্থের পাশাপাশি বিজ্ঞান বিষয়ক পর্যাপ্ত জ্ঞানার্জনও জরুরী।

আল-কুরআন ও বিজ্ঞান-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আল-কুরআন পরিচিতি

القران শব্দটি বাবে فتح ও نصر এর مصدر।[১] قرأ অর্থ- اسم مفعول অনুযায়ী تلا (তিলাওয়াত করা) অথবা اسم فاعل অনুযায়ী جمع (একত্রিত করা)। এক্ষেত্রে উভয়টিই বিশুদ্ধ।[২] পারিভাষিক অর্থে-[৩] كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس.'আল্লাহ তা'আলার বাণী আল-কুরআন সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (ছা.)- এর উপর অবতীর্ণ হয়,

* পিএইচ.ডি গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

যার সূচনা সূরা ফাতিহা ও শেষ সূরা নাস দিয়ে'। মহাগ্রন্থ আল–কুরআন বিশ্বের সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। ইহা বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানকোষ এবং বিভিন্ন বিষয়ের উত্তম বর্ণনার প্রতিচ্ছবি। এতে রয়েছে সর্বকালের মানুষের যুগ-জিজ্ঞাসার সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম সমাধান। অতুলনীয় ভাবের গভীরতা, ভাষার অলংকার, ছন্দ মূর্ছনা, নিপুণ রচনাশৈলী, ভাষার লালিত্য, শব্দ চয়ন, বাক্যের অনুপম বিন্যাস, মর্মস্পর্শী সুর ঝংকার, সাবলীল প্রকাশভঙ্গি, বর্ণনার গতিময়তা ইত্যাদির দিক থেকে প্রতিটি আয়াতই চ্যালেঞ্জের দাবিদার। যার অনুপম ভাষাশৈলীর কাছে আরবের তৎকালীন প্রসিদ্ধ কবি-সাহিত্যিক ও বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিরা মাথা নত করে বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, ليس هذا من كلام البشر 'এটি মানুষের কথা নয়'।

বিজ্ঞান পরিচিতি

বিজ্ঞান শব্দটি বিশেষ্য। ইংরেজি প্রতিশব্দ Science।[৪] বিজ্ঞান শব্দটির বিশ্লেষিতরূপ হচ্ছে- বি+জ্ঞান। বি অর্থ বিশেষ আর জ্ঞান অর্থ সম্যক ধারণা। যা ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে কোন বিষয়ে প্রাপ্ত ব্যাপক ও বিশেষ জ্ঞান।[৫] বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় The Oxford Companion of the History of Modern Science গ্রন্থে বলা হয়েছে- "বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকৃতি ও সমাজের নানা মৌলিক বিধি ও সাধারণ সত্য আবিষ্কারের চেষ্টাকে বিজ্ঞান বলে"।[৬] বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় 'অজৈব রসায়ন' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে- 'বিজ্ঞান বলতে সাধারণতঃ বৈচিত্রময় বিশ্বের অন্তহীন রহস্য ও নানাবিধ পরিবর্তন সম্বন্ধে মানুষের অর্জিত তথ্য, তত্ত্ব, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সুশৃঙ্খল, সুসংবদ্ধ ও সুষ্ঠু সমাবেশকে বুঝায়।[৭]

দীর্ঘ ইতিহাস পরিক্রমায় বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অগ্রযাত্রা, নিত্যনতুন গবেষণা ও আবিষ্কার কুরআনের বিজ্ঞানময় তাত্ত্বিক অনেক জটিল বিষয়ের জট খুলে দিয়েছে। বিজ্ঞানের অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তন্মধ্যে মৌলিক বা প্রধান শাখা তিনটি।[৮] যথা: ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, ও রসায়ন বিজ্ঞান।

ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞান পরিচিতি

ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা। ভূ অর্থ- পৃথিবী; আর তত্ত্ব অর্থ- বিদ্যা বা অনুসন্ধান। সুতরাং ভূ-তত্ত্ব অর্থ- পৃথিবীর উৎপত্তি পরিণতি বিষয়ক বিজ্ঞান বা ভূপৃষ্ঠে ও তার অভ্যন্তরস্থ স্তরগুলি সংক্রান্ত বিজ্ঞান।[৯]

ভূ-তত্ত্ব হলো- পৃথিবী বিষয়ক গবেষণা, যেখানে পৃথিবীর সূচনা ও আমাদের বসবাস উপযোগী পরিবেশের যাবতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে সুক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়।[১০] দুইশ বছর পূর্বে ভূ-তত্ত্ব মূলতঃ পৃথিবীর প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এবং তার উৎপাদন বিষয়ের আলোচনা করত। সময়ের ব্যবধানে আজ তার বিষয়বস্তুর রূপ পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানীগণ এর মৌলিক বিষয়ের বিভিন্ন চিত্রাঙ্কন করেছেন। বিজ্ঞানের এ শাখায় পৃথিবী, পৃথিবীর গঠন, পৃথিবীর অতীত ইতিহাস এবং এর পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া এর খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব, অতীত আবহাওয়া, ভবিষ্যতের জলবায়ু সম্পর্কে ধারণা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[১১]

ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা

ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞানের অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তন্মধ্যে মৌলিক শাখা গুলোর আলোচনা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো-

মহাবিশ্ব সৃষ্টি তত্ত্ব

নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল তথা মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা খুবই জটিল। এ বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করতে হলে সৃষ্টির মূলে যে বিস্ময়কর কলাকৌশল রয়েছে সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। সুদূর অতীত কাল থেকে মানুষ এ মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করার জন্য প্রবল

অনুসন্ধান চালিয়ে আসছে। তাদের অনুসন্ধান বিভিন্ন সময়ে বহু পৌরাণিক কল্পকথা ও নাস্তিকতার জন্ম দিয়েছে। যেমন- প্রাচীন মিশরীয়দের মতে, আদি সমুদ্র 'নু' থেকে পৃথিবীর উৎপত্তি ঘটে। প্রাচীন ব্যাবিলনবাসীরা দেবতার রাজা বেলমারদুককে এই আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টার আসনে বসিয়েছিলো। তিরামাত নামের এক দুষ্ট ড্রাগন-অসুরকে বেলমারদুক পরাজিত করে তার দেহকে কেটে দুই টুকরো করে এক অংশে সৃষ্টি করলেন আকাশ আরেক অংশে পৃথিবী। হিন্দু ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ বলে স্বীকৃত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ থেকে জানা যায়, প্রজাপতি ব্রহ্মা আদিম সাগরে ডুব দিয়ে এক মুঠো মাটি তুলে আনলেন, আর সেই মাটি পানির ওপরে ভাসমান জল পাতার ওপর ছড়িয়ে দিলেন, সৃষ্টি হলো পৃথিবী।[১২] এসব কাল্পনিক চিন্তাভাবনার পরও সৃষ্টির মূল উৎস অনুসন্ধানে বিজ্ঞানীদের নিবিড় অনুসন্ধান প্রয়াস চলমান রেখেছেন। অবশেষে তা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এসে কিছুটা মিশ্র ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন।

মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কিত তত্ত্বসমূহের মধ্যে বর্তমান বিশ্বের সমস্ত বিজ্ঞানীদের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং সবচেয়ে বেশী স্বীকৃত তত্ত্ব হলো Big Bang Theory বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব। যা সম্প্রতি ১৯২৭ সনে বেলজিয়াম জ্যোতির্বিজ্ঞানী G. Lemaitre উক্ত তত্ত্ব প্রস্তাব করেন। এরপর তত্ত্বটি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন জর্জ গ্যামও, এইচ.আলফার ও আর হেরমান।[১৩]

বিজ্ঞানীদের ধারণা মতে, আদিতে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু তথা সকল বস্তুই একত্রে যুক্ত ছিল এবং একটিমাত্র একক বিন্দুতে একটি অতিক্ষুদ্র, অতিঘন এবং অতি উত্তপ্ত বুদবুদের মধ্যে অস্তিত্বমান ছিল। সময়ের ঘড়ির কাঁটা তখনও যাত্রা শুরু করেনি। এমনি শুন্য সময়ে সৃষ্টির সূচনা হয় 'বিগ-ব্যাং (Big-Bang) তথা মাহবিস্ফোরণের মাধ্যমে এই বুদবুদের বিচ্ছিন্ন।[১৪]

বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক এই ধারণার বহুকাল পূর্বেই মহান আল্লাহ মানব জাতিকে অবগত করেছেন পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা বলেন- أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا 'অবিশ্বাসীরা কি লক্ষ্য করে দেখেনা যে, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল একত্রিত ছিল। অতঃপর আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম।[১৫] অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান ও ক্বাতাদাহ (র.) বলেন-. كانت السماوات والأرض ملترقتين ففصل الله بينهما بالهواء 'অতীতে নভোমণ্ডলও ভূ-মণ্ডল একত্রিত ছিল, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বাতাসের দ্বারা উভয়ের মাঝে ব্যাবধান সৃষ্টি করেছেন'।[১৬] ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন-. كانت السماوات رتقاً لا تمطر، وكانت الأرض رتقاً لا تُنبت ففتق هذه بالمطر، وهذه بالنبات 'আসমানসমূহ একত্রিত ছিল ফলে বৃষ্টি বর্ষণ করত না, আর যমীন একত্রিত ছিল ফলে কোন কিছু উৎপন্ন করত না। অতঃপর আসমানসমূহকে বৃষ্টি দ্বারা এবং যমীনকে শস্য দ্বারা বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে'।[১৭]

কুরআনের সাথে বিজ্ঞানীদের উক্ত ধারণার মিল থাকলেও মৌলিক একটি বিষয়ে বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই মহাবিস্ফোরণ অতি উত্তপ্ত বুদবুদের মাধ্যমেই আপনা-আপনি সংঘঠিত হয়ে আজকের এই মহাশূন্য ও সকল বস্তু সৃষ্টি হয়েছে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা মতে, দূর অতীতে প্রায় ২০ হাজার কোটি বছর পূর্বে মহাশূন্যে হঠাৎ এক্সিডেন্টের ফলে এক মহাবিস্ফোরণ ঘটেছিল। যার ফলে বিচ্ছিন্ন টুকরা সমূহের একটি হল 'পৃথিবী' নামক আমাদের এই ছোট গ্রহ। যাদের ধারণা মতে মহাবিশ্বের কোন শুরু ছিল না। বরং অনাদিকাল থেকেই এভাবে অবস্থান করছে। সময়ের ব্যাপ্তিতে এখানে আপনা থেকে পদার্থ তৈরী হত এবং তা আপনা থেকেই মহাবিশ্বের শূন্যস্থানকে ভরে দিত।[১৮]

অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন- بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 'আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যখন তিনি কোন কিছু করতে সিদ্ধান্ত করেন শুধু বলেন, 'হও' আর তা হয়ে যায়।'[১৯] তাহলে বুঝা যায় মহাবিশ্বের যা কিছু ঘটে সবই মহান আল্লাহর নির্দেশেই ঘটে থাকে।

আসমান ও যমীন সৃষ্টির সঠিক হিসাব

এই মহাবিশ্বের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করার পর মহান আল্লাহ মহাশূন্যকে বসবাস উপযোগী করার লক্ষ্যে সূচনা করেন নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সৃষ্টি কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ 'তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন।'[২০] 'তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে'।[২১]

আল্লাহ তা'আলার দিন গণনার হিসাবটি মূলত আমাদের হিসাবের অনুরূপ নয়। বরং দিন গণনার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন- وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ 'আর তোমার রবের নিকট নিশ্চয় একদিন তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান।'[২২]

অন্যত্র বলেন- تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ 'ফেরেশতাগণ ও রূহ এমন দিনে আল্লাহর পানে ঊর্ধ্বগামী হয়, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।'[২৩]

এর মাধ্যমে বুঝা যায় যে, মহাবিশ্বের সৃষ্টি দীর্ঘ সময় ধরে আল্লাহর সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়েছে, হঠাৎ বা আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়নি।

আল্লাহ তা'আলার গণনাকৃত ছয় দিনের সৃষ্টিকে বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন কার্যাবলিতে বিভক্ত করেছেন। প্রথম দুইদিনে সৃষ্টি করেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী।[২৪] যা দুটি পর্যায়ে উভয়ের উপাদান সমূহ সৃষ্টি করেন। প্রথম পর্যায়ে সৃষ্টি করেন ছায়াপথ সমূহ। আর এর মধ্য দিয়েই সমাপ্ত হয় আকাশমণ্ডলী সৃষ্টির প্রথম পর্যায় বা দিন। এতে সময় লাগে প্রায় ১৫ কোটি বছর। দ্বিতীয় পর্যায়ে সৃষ্টি করেন তারকামণ্ডলী, গ্রহ, নক্ষত্র আর উপগ্রহ সমূহ। এই দ্বিতীয় পর্যায়ে সময় লাগে প্রায় একশ কোটি বছর।[২৫] আমরা আজ যে পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছি। এটির সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় মূলত চার দিনে। আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ 'তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূ-পৃষ্ঠে এবং এতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চারদিনের মধ্যে এতে ব্যবস্থা করেছেন পরিমিত খাদ্যের, যাঞ্চাকারীদের জন্য'।[২৬] বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীর সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় চারটি ভূ-তাত্ত্বিক যুগে।[২৭] যথা: প্রি-ক্যামব্রিয়ান (Pre-Cambrian) যুগ প্যালিওসোয়িক (Palaeozoic) যুগ তথা জীবাশ্ম বা প্রত্ন যুগ, মেসোযোয়িক যুগ (mesozoci) তথা মধ্যজীবীয় বা দ্বিতীয় ভূতাত্ত্বিক যুগ এবং সেনোযোয়িক (cenozoic) যুগ। প্রি-ক্যামব্রিয়ান (pre-cambrian) যুগে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে সৃষ্টি করা হয় পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি, আগ্নেয়গিরি আর লাভা ক্ষেত্রের এক অনুর্বর প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্য। এ প্রক্রিয়ায় সময় লাগে প্রায় একশ কোটি বছর। শেষের ১০ কোটি বছরে সৃষ্টি হয় এককোষী জীব, অমেরুদণ্ডী প্রাণী এবং আদীম যুগীয় জলজ উদ্ভিদসমূহ। এটাই হচ্ছে পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম পর্যায় বা প্রথম দিন। দ্বিতীয় পর্যায় তথা প্যালিওযোয়িক যুগে নানা প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে উদ্ভব ঘটে মাছ, উভচর প্রাণী এবং সরীসৃপের মত মেরুদণ্ডী প্রাণীকুলের এভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে পৃথিবী সৃষ্টির দ্বিতীয় দিবস বা পর্যায়ের।[২৮]

এরপর মেসোযোয়ীক (mesozoic) বা ভূ-তাত্ত্বিক মধ্যজীবীয় যুগই হচ্ছে পৃথিবী সৃষ্টির তৃতীয় দিন বা পর্যায়ে স্থলভাগের অধিকাংশ স্থান জুড়েই ছিল মরুভূমি আর জঙ্গলাকীর্ণ পবর্তমালা। এ সময়ে ডাইনোসারের

অস্তিত্ব ছিল এবং এরাই সে সময়ে পৃথিবীতে আধিপত্য করত। এ যুগ বা সৃষ্টির পর্যায় ১৫ কোটি বছর স্থায়ী হয়। সেনোযোয়িক যুগ তথা পৃথিবী সৃষ্টির চতুর্থ পর্যায়ই হচ্ছে আজকের যুগ। প্লেট টেকটোনিক্স (plate tectonics) তথা ভূ-পৃষ্ঠের বহিরাবরণের শক্তিশালী বা প্রচণ্ড আন্দোলনের ফলে আলপস ও হিমালয় পর্বতমালার গঠন সম্পন্ন হয়। এর ফলে বিভিন্ন মহাদেশ ও মহাসাগর বর্তমান আকার ধারণ করে। এ যুগে ডাইনোসররা বিলুপ্ত হয়ে স্তন্যপায়ী জীবকুলের সৃষ্টি সম্পন্ন হয়। সবশেষে মানুষ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এ যুগের পূর্ণতা ঘটে। এভাবেই আল্লাহর গণনাকৃত ছয়টি পর্যায়ে বা ছয় দিনে সমাপ্ত হয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি।[২৯]

মহাকাশ সৃষ্টির রহস্য

আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে'।[৩০]

অন্যত্র বলেন- إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে, যা মানুষের হিত সাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ আকাশ হতে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীব-জন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে।'[৩১]

অত্র আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির নৈপুণ্যতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আমরা মাথার উপর দিগন্ত জুড়ে যে নীল আকাশ দেখতে পাই তা মহান আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার অধিকাংশ নিদর্শন ১৮টি সূরা ও ৪২টি আয়াতে দেখতে পাওয়া যায়। এ সকল আয়াতের সবই বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।[৩২] অবশ্য বিজ্ঞানীদের অনেকেই আকাশ নামক স্বতন্ত্র কোন কিছু স্বীকার করতে চান না। তারা মনে করেন, মহাশূন্যে ভাসমান ধূলি কণা ও বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণে একটি আবরণের মত নীল বর্ণের যে জিনিসটি দৃষ্টির শেষ সীমায় দৃষ্টিগোচর হয় তাকেই আমরা আকাশ বলি। কিন্তু আল-কুরআন বলে, আকাশ নামক স্বতন্ত্র এক সৃষ্টি রয়েছে। যাকে খুঁটি বিহীনভাবে অত্যন্ত নিখুঁত রূপে মহাশূন্যে স্থাপন করা হয়েছে।[৩৩] আল-কুরআনে বলা হয়েছে- خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا 'তিনি মহাকাশ সৃষ্টি করেছেন কোন রকম খুঁটি ছাড়াই যা তোমরা দেখতে পাও।'[৩৪] আকাশ নামক স্বতন্ত্র সৃষ্টি আছে তো বটেই আল-কুরআনের ভাষ্যমতে শুধু একটি নয় বরং আকাশ রয়েছে ৭টি।[৩৫] আসমান নামে পরিচিত যে বায়ুমণ্ডল তা মানুষের ঊর্ধ্বদেশে এক প্রতিরক্ষামূলক এবং উপকারী আচ্ছাদন হিসাবে কাজ করে। কতগুলো গ্যাসের মিশ্রণ সম্বলিত এই বায়ুমণ্ডলের রয়েছে কয়েকটি স্তর এবং স্থুলাণুকৃত (ionised) স্তর যা পৃথিবীকে ঘিরে আছে।

প্রথম স্তরটিকে বলা হয় ট্রপোস্ফেয়ার এবং এটা পৃথিবীপৃষ্ঠের উপরের দিকে ৮-১৬ কি.মি. (৫-১০ মাইল) পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরে প্রায় ৪:১ অনুপাতের ঘনফলে রয়েছে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের অণু ; আছে জলীয়বাষ্প কার্বন-ডাই অক্সাইড (CO_2) এবং অন্যান্য কিছু গ্যাস ও ধূলিকণা। গ্রীনহাউজের কাঁচের ছাদের মত রাত্রিবেলা ভূ-পৃষ্ঠের তাপ রক্ষায় কম্বলের কাজ করে থাকে। এটাই গ্রীন হাউস ইফেক্ট নামে পরিচিত। বায়ুমণ্ডলের পরের স্তরটি ট্রপোস্ফেয়ারের উপরে ৭০ কি.মি. (৪৪ মাইল) বিস্তৃত। এই স্তরের নাম স্ট্রাটোস্ফেয়ার। এ স্তরে রয়েছে ওজন অণুর (O_3) একটি স্তর। এই ওজন স্তর পৃথিবীর প্রায় ৩০ কি.মি.

উপরে অবস্থান করে সূর্য থেকে আগত ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি এবং রঞ্জন-রশ্মি থেকে সকল জীবকে রক্ষা করে থাকে। স্ট্রাটোস্ফেয়ারের প্রায় ৩২০ কি.মি. (২০০ মাইল) উপর পর্যন্ত আইনোস্ফেয়ার (ionosphere) নামে পরিচিত এক বিশেষ স্থলাণু স্তর। আইনোস্ফেয়ার হ্রস্ব বেতার তরঙ্গ প্রতিক্ষেপনের মাধ্যমে দীর্ঘ দূরত্বের বেতার যোগাযোগ আমাদের সাহায্য করে থাকে।[৩৬]

মহাকাশে বিদ্যমান বস্তুসমূহ সৃষ্টির রহস্য

আল্লাহ তা'আলা শুধু আসমান সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি বরং উহাকে নিখুঁতভাবে সুসজ্জিত ও সুশোভিত করেছেন।[৩৭] লক্ষ কোটি নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতি দ্বারা আকাশমণ্ডলীকে সুসজ্জিত করেছেন। যার কোনটি দিনের এবং কোনটি রাতের নিদর্শন ও সময় নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ছায়াপথ গ্যালাক্সির একটি নক্ষত্র, যাকে এক দৃষ্টিতে তাকানো যায় না। চোখ ঝলসে যায়। তার নাম সূর্য। আকাশমণ্ডলীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসজ্জা হচ্ছে সূর্য। যা দিনের বেলায় সূর্যের প্রতাপ অপরিসীম এবং আকাশমণ্ডলীর অন্য সব গ্রহ-উপগ্রহকে আলো বিতরণ করে তাদেরকে উদ্ভাসিত করে। **৯**টি গ্রহ, **৩১**টি উপগ্রহ, সর্বনিম্ন ৩০,০০০ ধুমকেতু এবং লক্ষ লক্ষ গ্রহাণু, উল্কা, নীহারিকা প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করছে।[৩৮] অন্যান্য গ্রহের চেয়ে আমাদের এই পৃথিবীই সূর্যের বেশি কাছাকাছি অবস্থিত।[৩৯] সকলগ্রহ তার চারপাশে আবর্তিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সৌরজগতে মোট **৯**টি গ্রহ আবিষ্কার করেছেন। বর্তমানে আরো দুটি সন্ধান পেয়ে **১১**টির তথ্য পেশ করেন। যা সম্প্রতি বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফল। অথচ মহান আল্লাহ বহু পূর্বেই মানবজাতিকে অবগত করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَاأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 'স্মরণ করুন, যখন ইউসুফ (আ.) তাঁর পিতাকে বললেন, পিতাজী, আমি এক স্বপ্নে **১১**টি গ্রহ, সূর্য এবং চাঁদকে দেখেছি।'[৪০]

মহাকাশে সূর্যের চেয়ে লক্ষ গুণ উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। পৃথিবী থেকে সুবিশাল দূরত্বে থাকার দরুন তাদের খালি চোখে দর্শন করা অসাধ্য। সূর্য যে তারামণ্ডলে অবস্থিত তার নাম ছায়াপথ তারা মণ্ডল। পৃথিবী থেকে **১**৪,৮৮,**১**৪,০০০ কি.মি. দূরত্বে থাকার দরুন সূর্যের আলো বসুন্ধরায় পৌছতে সময় লাগে ৮ মি. **১৯** সে.।[৪১]

মহাকাশে বিদ্যমান পৃথিবীর নিকটতম মহাজাগতিক প্রতিবেশী এবং একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ চাঁদ আমাদের কাছ থেকে গড়ে মাত্র ২,৩৮,৮৫৭ মাইল দূরে অবস্থিত।[৪২] চাঁদ সূর্যের আলো পেয়ে আলোকিত হলেই আমরা দেখতে পাই। কারণ চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন- هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا 'তিনি আল্লাহ যিনি সূর্যকে বানিয়েছেন উজ্জ্বল আলো বিকিরণকারী আর চাঁদকে করেছেন জ্যোৎস্নাময়'।[৪৩] এছাড়া চাঁদ শুধু আলোকিতই করেনা বরং সময় নির্ধারণেও কাজ করে।[৪৪]

সমুদ্রে সংঘঠিত জোয়ার ভাটার অন্যতম কারণ হচ্ছে চাঁদ ও সূর্যের প্রভাব। যেমনটি মহান আল্লাহর বাণীতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন- وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً 'আমরা রাত ও দিনকে দুটি নিদর্শন করেছি। অতঃপর রাতের নিদর্শন নিষ্প্রভ করে দিয়েছি এবং দিনের নিদর্শনকে দেখার উপযোগী করেছি।'[৪৫]

মহাকাশে বিদ্যমান কোটি কোটি নক্ষত্ররাজি দ্বারা শুধু আকাশকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করাই উদ্দেশ্য নয় বরং এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা শয়তানের প্রতি নিক্ষেপক হিসাবেও কাজ করে।[৪৬]

আল্লাহ তা'আলার মহাকাশ সৃষ্টির অন্যতম বড় নিদর্শন হলো- মহাশূন্যে বিচরণের পথ সৃষ্টি। যার মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন যানবাহন তৈরী করে মহাশূন্যে বিচরণ করে তাঁর সৃষ্টি নৈপুন্যতা প্রদর্শন করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন- وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ 'আর আমি সুলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত।[৪৭]

এসব ছাড়াও মহাকাশে বিদ্যমান অনেক নিদর্শন রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে মহান আল্লাহর বড়ত্ব ও মাহাত্ব প্রকাশ পায়।

ভূ-মণ্ডল তথা পৃথিবী সৃষ্টির রহস্য

একটি কথা প্রচলিত রয়েছে যে, সূর্য সৃষ্টির সাথে সাথে পৃথিবী সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়। যা মূলত মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত আয়াত সমূহের সাথে সাংঘর্ষিক বলে প্রতিয়মান হয়।[৪৮] বহু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পৃথিবী আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। সৌরজগতের **১১**টি গ্রহের মধ্যে তৃতীয় গ্রহ আমাদের এই পৃথিবী। আর সেই গ্রহগুলোর মধ্যে কেবল পৃথিবীতেই প্রাণের সৃষ্টি ও বৃদ্ধির সহায়ক ব্যবস্থা আছে। বড় বড় গ্রহগুলোর মধ্যে পৃথিবীর একমাত্র ঐ তাপমাত্রা তা যা খুব বেশী গরমও নয়, খুব বেশী ঠাণ্ডাও নয়। যার ফলে এখানে জীবন বেড়ে চলেছে অবিচ্ছিন্নভাবে। একমাত্র পৃথিবীতে-ই পানি ও বায়ুমণ্ডল রয়েছে। বায়ুমণ্ডলে আছে সুষম গ্যাসসমূহ। যথাঃ অক্সিজেন (O_2), নাইট্রোটেজন (N_2), কার্বনডাই অক্সাইড (CO_2), আরগন (Ar) ইত্যাদি।[৪৯] গ্যাসসমূহের উল্লেখিত শতকরা হার বিদ্যমান না থাকলে মানুষ, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগত অস্বস্থিকর পরিস্থিতির শিকার হয়ে বিলীন হয়ে যেত। তাদের জন্ম, বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি সম্ভব হতো না। সুতরাং পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন গ্রহে প্রাণের সহায়ক অবস্থা বিদ্যমান নেই। বরং সে সব গ্রহে আছে জীবন বিনাশী গ্যাসসমূহ। যথাঃ এ্যামোনিয়া (NH_3), মিথেন (CH_4), হাইড্রোজেন (H_2), হিলিয়াম (He) ইত্যাদি।[৫০]

আমাদের এই বসুন্ধরার বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে উৎপন্ন হয় নানাবিধ ফসল। মাটি ভেদ করে বেড়ে উঠে সবুজ বৃক্ষ। কিন্তু আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি উদ্ভিদ ও ফসলের বীজ বহন করলে কেন অংকুরোদগম ঘটে? এর কারণ হচ্ছে মহান আল্লাহ মাটিতে উর্বরা শক্তি সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ 'তাদের জন্য একটি নিদর্শন হলো নিষ্প্রাণ জমি, আমরা উহাতে সজীব করি এবং যাতে শস্য উৎপন্ন করি। যেন তারা ঐগুলো ভক্ষণ করতে পারে।'[৫১]

এছাড়া উদ্ভিদ ও ফসলের পুষ্টি সাধনের জন্য অন্তত **১০**টি রাসায়নিক এবং **৪**টি গ্যাসীয় পদার্থ অপরিহার্য।[৫২]

ভূ-মণ্ডল সৃষ্টির অন্যতম বড় নিদর্শন পাহাড়-পর্বত। যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا 'এবং পর্বতকে তিনি প্রোথিত করেছেন দৃঢ়ভাবে।[৫৩] অন্যত্র বলেন- وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا 'ও পর্বত সমূহকে পেরেক স্বরূপ'।[৫৪]

পর্বতসমূহ শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে, কারণ তারা খুবই শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর শক্ত বহিরাবরণ অথবা কঠিন ভূত্বকের গভীরতা সমুদ্র থেকে প্রায় ৫ কি.মি. এবং মহাদেশীয় সমতল ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৩৫ কি.মি. নিচে বিস্তৃত রয়েছে। আর হিমালয়ের মত বিশাল পর্বতমালার ক্ষেত্রে এই গভীরতার পরিমাণ প্রায় ৮০ কি.মি.। এভাবে পর্বতশ্রেণী অতি শক্ত ভিত্তির উপর স্থাপিত।[৫৫]

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

বিজ্ঞানীগণ আবহাওয়া নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেছেন। আবহাওয়া পরিবর্তন ও মাঝে মাঝে ভয়ংকর রূপ গ্রহণের কথা পৃথিবীর সকল মানুষই কম বেশী জানে। প্রকৃতির মালিক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে নিমিষের মধ্যে মানুষ ও পশু-পাখির জীবনে নেমে আসে এক অবর্ণনীয় বিপদ ও বিভীষিকা। সেই বিপদ থেকে বাঁচার জন্য রেডিও-টেলিভিশনসহ সকল প্রচার মাধ্যমে আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রচার করা হয়। তার পরও রক্ষা হয়না। কারণ মানুষ যতটা পূর্বাভাস সংগ্রহ করে থাকে তা নিশ্চিত কোন আগমন সংবাদ নয় বরং সম্ভাবনার কথাই শুধু প্রচার করতে পারে। দেখা যায় বৃষ্টিপাতের ১০০% সম্ভাবনার কথা বলা হলেও অনেক সময় বৃষ্টি এক ফোটাও পতিত হয়না। আবার মোটেও সম্ভাবনা নেই অথচ মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে যায়। এর কারণ হল আবহাওয়ার নিয়ন্ত্রণ তো মানুষের হাতে নেই, এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বিশ্বচরাচরের একমাত্র মালিক মহান আল্লাহর হাতে। আবহাওয়ার মূল প্রতিপাদ্য হল মেঘ, বৃষ্টি ও ঝড়। এ তিনের উৎপত্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ:

সূর্যের তাপে জলাধারের পানি উত্তপ্ত হয়ে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। ধোয়ার মত ঐ বাষ্পগুলো বাতাসে ভর করে ভেসে বেড়ায়। ঠাণ্ডার সংস্পর্শে এলে ঐ বাষ্পগুলো ছোট ছোট পানির ফোটায় পরিণত হয় এবং ঘনিভূত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে। পানির ঐ ফোটাগুলো আরো একটু বড় হলে তা আর বাতাসে ভেসে থাকতে পারে না ফলে বৃষ্টির আকারে মাটিতে পতিত হয়। কোন স্থানের বাসাত উত্তপ্ত হয়ে উপরের দিকে উঠে গেলে চার দিকে থেকে দ্রুত গতিতে ঐ খালি স্থান পূর্ণ করতে পার্শ্বস্থ বাতাস ছুটে আসে। ফলে সৃষ্টি হয় ঝড়ের। এ তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ১৫০০ বছর পূর্বেই আল-কুরআনে এভাবে বলে দেয়া হয়েছে- وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 'তিনি বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠিয়ে থাকেন, এমনকি যখন বায়ুরাশি পানি পূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত শহরের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাই। অতপর এ মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকি। আর ঐ বৃষ্টির পানি দ্বারাই সর্বপ্রকার ফল উৎপন্ন করি। এভাবেই মৃতকে জীবিত করে থাকি যাতে তোমরা শিক্ষা লাভ কর।'[৫৬]

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ

মহাবিশ্ব সৃষ্টির পর থেকে ধীরে ধীরে সম্প্রসারণ হতে হতে আজকের মহাকৃতি ধারণ করেছে। যা ক্রমাগতভাবে বিস্তৃত হয়ে চলেছে। পৃথিবীর এই পরিবর্তনের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ– وَالأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ 'আমরা নিজ ক্ষমতায় আকাশ নির্মাণ করেছি। আর আমরা অবশ্যই এর সম্প্রসারণকারী। আর যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছি, সুতরাং কতইনা সুন্দর বিছানা প্রস্তুতকারী।'[৫৭] উক্ত বিষয়ে ১৯২৯ সালে মার্কিন জ্যোতির্বিদ এডুইন হাবল (Hubble) (১৮৮৯-১৯৫৩ খ্রি.) দেখিয়েছেন যে, মহাবিশ্বের সবগুলো গ্যালাক্সি একে অন্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।[৫৮] পৃথিবী সম্প্রসারণের বিষয়টি পবিত্র কুরআন প্রায় পনেরশ বছর পূর্বেই অবগত করেছে।

উপসংহার

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এমন এক আসমানী কিতাব যা মর্যাদার গগণচুম্বি পাহাড়। যার প্রতি শব্দ ও বর্ণে রয়েছে লাখো মশালের ইন্ধন, প্রতিবাক্যে বা আয়াতে রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা সংস্কৃতির ঝলক ও চমক। আরো রয়েছে হারানো মানিকের সন্ধান। এ মহাগ্রন্থের শত সহস্র ব্যাখ্যা হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে, তবুও মণিমুক্তার খনি অফুরন্তই থেকে যাবে। কারণ সৃষ্টি রহস্যের বিশাল কারখানার মূল প্রকৌশলীর বাণী এ

মহাগ্রন্থ, যে গ্রন্থের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সৃষ্টির রহস্যের শতকোটি উপাদান সম্বলিত তথ্য ভাণ্ডার লুকিয়ে আছে, যা থেকে জ্ঞানের জগতের শতসহস্র খণ্ডের মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হতে পারে। এসব কিছুর পরও আজ বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতিতে চমকে উঠা মানুষ কুরআনী জীবন ব্যবস্থাকে এ যুগের জন্য অনুপযুক্ত বলে মনে করছে। যেখানে বিগত দেড় হাজার বছরে কারও সাধ্য হয়নি মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের কোন দুর্বল দিক চিহ্নিত করা। বরং যে বা যারাই এর সংস্পর্শে 'মুরাদ' সেজে এসেছে, তারাই পরিণতিতে মুরিদ বনে বসেছে। তাই আল-কুরআনের অভ্রান্ত সত্যকে মহিরুহে রূপদানের জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনার প্রয়োজন।

তথ্যনির্দেশ

১ আবূল ফযল মাওলানা আব্দুল হাফিয বালয়াবী সংকলিত, *মিসবাহুল লুগাত* (লাহোর : মাকতাবাতু কুদ্দুসিয়্যাহ, ১৯৫০ খ্রি.), পৃ. ৬৩৮।

২ মুহাম্মাদ বিন ছালিহ আল-উছায়মিন, *উছুলু ফীত তাফসীর* (দাম্মাম: দারা ইবনিল জাওযীহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪৩০ হি.), পৃ. ৮।

৩ তদেব।

৪ Zillur Rahman Siddiqui, *English-Bangla Dictionary* (Dhaka : Bangla Academy, Second Edition, December 2010), P. 680.

৫ সম্পাদনা বোর্ড, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৮৭০।

৬ J. L. Heilbron, *The Oxford Companion to the History of Modern Science* (England: Oxford University Press, 2003), P. 34.

৭ ড. মো. আব্দুস সবুর চৌধুরী সম্পাদিত, *অজৈব রসায়ন* (ঢাকা: হাসান বুক হাউজ, চতুর্দশ সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৩।

৮ https://www.bissoy.com/q/4660364, date: 12.07.23

৯ *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* , পৃ. ৯৩৪।

১০ Willim L. Ramsey & Raymond A. Burckley, *Modern Earth Science* (Printed in the united states of America, 1965), p. 21.

১১ Carla W. Montgomery, *Environmental Geology* (USA: Brown Publishers, 1986), p. 12.

১২ নাসরিন মুস্তাফা, *জামশিদ গিয়াসুদ্দিন আল কাশি জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর আবদান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৬২-৬৩।

১৩ মুহাম্মদ আবু তালেব, *বিজ্ঞানময় কুরআন* (ঢাকা: ঢাকা বুক কর্নার, একাদশ প্রকাশ, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৫০।

১৪ গবেষণা বোর্ড কর্তৃক রচিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ৩৬২।

১৫ সূরা আল-আম্বিয়াহ, ২১: ৩০।

১৬ মুহাম্মাদ আলী আছ-ছাবূনী, *ছাফওয়াতুত তাফাসীর*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুরআনিল কারীম, ২য় সংস্করণ, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ২৬১।

১৭ তদেব।

১৮ কাযী জাহান মিয়া, *আল-কুরআন দ্য চ্যালেঞ্জ* (মহাকাশ পর্ব-১) (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ২৭৭-২৭৮।

১৯ সূরা আল-বাকারাহ, ২: ১১৭।

২০ সূরা আল-আরাফ ৭: ৫৪

২১ সূরা আল-হুদ ১১ : ৭

২২ সূরা আল-বাকারাহ ২: ১১৭ ; সূরা আল-ইয়াসীন ৩৬: ৮২।

২৩ সূরা আল-মা'আরিজ ৭০ : ৪।

২৪ আল্লাহ তা'আলা সূরা হা-মীম সাজদাহর ৯ আয়াতে এ বিষয়ে বলেন- قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ 'বল, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে'। অত্র সুরার ১২ আয়াতে বলেন- فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَاتٍ فِى يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِى كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا 'অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলকে দু'দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে এর বিধান ব্যক্ত করলেন'।

২৫ আল-কুরআনে বিজ্ঞান, পৃ. ১৮৯।

২৬ সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১: ১০।
২৭ Editorial Board, *Scientific Indications in the Holy Quran* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 4th ed., 2014), p. 187.
২৮ *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, পৃ. ১৮৯।
২৯ তদেব, পৃ. ১৮৯-১৯০।
৩০ সূরা আল-ইউসুফ, ১২: ১০৫।
৩১ সূরা আল-বাকারাহ, ২: ১৬৪।
৩২ M. Akbar Ali, *Sciencs in the Quran* (Dhaka: The Molik Library, 1976), p. 57.
৩৩ আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ 'তারা কি তাদের মাথার উপরে অবস্থিত সুবিশাল আকাশ পানে তাকায় না? কী নিখুঁতভাবে আমি তা নির্মাণ করেছি। এতে কোনো লেশমাত্র ক্রুটি নেই। দ্র. সূরা ক্বফ, ৫০: ৬।
৩৪ সূরা আল-লুকমান, ৩১: ১০।
৩৫ সূরা আল-বাকারাহ, ২: ২৯; সূরা আল-মুলক, ৬৭: ৩।
৩৬ *Scientific Indications in the Holy Quran*, p. 33.
৩৭ সূরা ক্বফ, ৫০: ৬; সূরা আস-সফফাত, ৩৭: ৬।
৩৮ *Modern Earth Science*, p. 33.
৩৯ *Ibid*, p. 21.
৪০ সূরা আল-ইউসুফ, ১২: ৪।
৪১ *বিজ্ঞানময় কুরআন*, পৃ. ৮২।
৪২ *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, পৃ. ১৯৪।
৪৩ সূরা আল-ইউনুস, ১০: ৫।
৪৪ সূরা আল-বাকারাহ, ২: ১৮৯।
৪৫ সূরা আল-বানী ইসরাঈল, ১৭: ১২।
৪৬ সূরা আল-মুলক, ৬৭: ৫।
৪৭ সূরা আস-সাবা, ৩৪: ১২।
৪৮ সূরা আল-আম্বিয়াহ, ২১: ৩০।
৪৯ E.J. Tarbuck F.K. Lulgens, *Earth Science* (London: Merrill publishing co. A Bell & Howell information co. Toronto, 5th edn, 1966), P.156
৫০ *Ibid.*
৫১ সূরা আল-ইয়াসিন, ৩৬: ৩৩।
৫২ রাসায়নিক উপাদানগুলো হচ্ছে সোডিয়াম (Na), ক্যালসিয়াম (Ca), পটাসিয়াম (K), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), সালফর (S), ফসফরাস (P), বোরন (B), ক্লোরিন (Cl2), আয়রণ (Fe), এবং পানি (H2O) যা মাটির মধ্যে ধরা থাকে। এসব উপাদান উদ্ভিদ ও ফসল মূলের সাহায্যে মাটি থেকে চুষে নেয়। আর নাইট্রোজেন (N2), অক্সিজেন (O2), হাইড্রোজেন (H2), কার্বন ডাই অক্সাইড (CO2) প্রভৃতি গ্যাসীয় পদার্থ বায়ুমণ্ডল থেকে গ্রহণ করে পুষ্টি পরিপর্ণ করে। দ্র. Henry D. Foth, *Fundamantals of Soil Science* (Canada: Simultaneously, 8th ed., 1990), p. 2.
৫৩ সূরা আন-নাযিয়াহ, ৭৯: ৩২।
৫৪ সূরা আন-নাবা, ৭৮: ৭।
৫৫ *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, পৃ. ২৬১।
৫৬ সূরা আল-আরাফ, ৭: ৫৭।
৫৭ সূরা আয-যারিয়াত, ৫১: ৪৭-৪৮।
৫৮ httpps://en.m.wikipedia.org, date: 04.11.23

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

ভারতীয় উপমহাদেশে রাসূল (সা.)-এর প্রশস্তিমূলক আরবী কবিতার ক্রমবিকাশ [Development of Arabic Praise Poetry to The Prophet (PBUH) in Indian Subcontinent]

মোহাম্মাদ মহসিন*

Abstract: Praise in an important aspect of Arabic poetry. It has been composed widely by the Arab poets, since Arabic poetry was known for its well-known images, in which the poets competed and were distinguished. But those in the Indian subcontinent who praised the prophet (PBUH) in Arabic poetry did so out of religious love and emotions.It is also example of rich literature. In this articlc, will be preseted the history of the development of Prophet Muhammad (PBUH) in Arabic poetry in the Indian Subcontinent, dividing into three times.

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে তাঁর প্রিয় রাসূল (সা.)-এর সর্বোচ্চ প্রশংসা করেছেন। কবিতার মাধ্যমে প্রশংসা করার বিষয়টি একবারে পুরাতন। ইসলামের ঊষাকাল থেকে ধারাবাহিকভাবে এটি চলে আসছে। এ ধরনের কবিতা রচনার ক্ষেত্রে রাসূলের কবি হাসসান ইব্ন সাবিত, সাহাবী কবি কা'ব ইব্ন যুহায়র, উমাইয়া কবি ফারাজদাক ও আল-আ'শা প্রথম যুগের অভিজাত মডেল। ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার লাভের সাথে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ঘটে ও আরবী ভাষা চর্চা বৃদ্ধি পায়। ইসলামী শিক্ষা ও আরবী ভাষার সাথে জড়িত ব্যক্তিগণ রাসূলের প্রতি ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রশস্তিমূলক কবিতা রচনা করেন। বিগত দুই শতাব্দীতে বহু আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠায় রাসূলের প্রশস্তিমূলক কবিতা রচনাকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে অসংখ্য কবিদের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন কবির রচনা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

প্রশংসা

আরবী মাদহ (مدح) শব্দটি হিজা (هجاء) বা ব্যঙ্গ ও যাম্ম (ذم) বা নিন্দা এর বিপরীত। অর্থ শ্রেষ্ঠ প্রশংসা, সুন্দর প্রশংসা, গুণের প্রশংসা করা।

আরবী-সাহিত্যে প্রশংসা

'প্রশংসা' কাব্যের অন্যতম উদ্দেশ্য। কুদামা ইব্ন জাফর তাঁর "নাকদুন নাসর" গ্রন্থে বলেন, কবিদের কবিতার অনেক শিল্প আছে, যা মূলে চার প্রকার। যেমন ১. আল-মাদহ ২.আল-হিজা ৩.আল-হিকমা ৪. আল-লাহ্ব। অতঃপর প্রত্যেকটির কয়েক প্রকার আছে। মারাসী, ইফতিখার, শুকর, লুতফ এগুলো আল-মাদহের প্রকরণ; আয-যাম্ম, আল-ইত্ব, আল-ইসতিবতা, আত-তানীব এগুলো আল-হিজা এর প্রকরণ; আমসাল, তাযহীদ, মাওয়াইয এগুলো আল-হিকমা এর প্রকরণ; আল-গযল, আত-তরদ, সিফাতুল খামর, আল-মাজুন এগুলো আল-লাহ্ব এর প্রকরণ।[১]

---

* পিএইচ.ডি গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

রাসূল (স.) এর প্রশংসা

নববী প্রশংসা (المدح النبوى) হলো সেই কবিতা যা নবীর (সা.) সৃষ্টিগত ও চরিত্রগত গুণাবলী বর্ণনা করে এবং তাঁকে দেখা, তাঁর কবর ও তাঁর জীবনের সাথে জড়িত পবিত্র স্থানসমূহ যিয়ারত করা, তাঁর বৈষয়িক ও নৈতিক অলৌকিকতার কথা উল্লেখ করা, কবিতায় তাঁর জীবনী লেখা, তাঁর বিজয় ও তাঁর আদর্শ গুণাবলীর প্রশংসা করা। ড. যাকী মুবারক বলেন- ''নববী প্রশংসা সুফিবাদ দ্বারা প্রচারিত কবিতার একটি শিল্প। তাই এটি ধর্মীয় বিষয়ে সহানুভূতি প্রকাশের একটি রীতি এবং উচ্চ সাহিত্যের একটি অধ্যায়। কারণ এটি শুধুমাত্র সততা এবং আন্তরিকতায় পূর্ণ হৃদয় থেকে উত্থিত হয়''।[২]

ভারতীয় উপমহাদেশে আরবী সাহিত্য চর্চা

ভারতের আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস অধ্যায়ন করে আমরা প্রাচীনকাল থেকে ভারত আরব সম্পর্ক সম্পর্কে জানতে পারি। প্রথম দিকে উভয় ভূ-খণ্ডের মাঝে ছিল বাণিজ্যিক সম্পর্ক, পরে এটি একটি মজবুত সাংস্কৃতিক সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়। প্রাক ইসলামী কবি ত্বরফা ইব্‌ন আবদের ভাষায়-

وظلم ذوى القربى اشد مضاضة * على المرأ من وقع الحسام المهند[৩]

'স্বজনের অত্যাচার মানব হৃদয়ে ভারতীয় অসির চেয়েও তীব্র আঘাত হানে।

এখানে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সুদূর প্রাচীন কাল থেকেই ভারত-আরবের মাঝে সাংস্কৃতিক মিলবন্ধন ছিল। আরবী ভাষার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কবিতা দিয়েই এই মিলবন্ধনের সূত্রপাত হয়েছিল। হারুন-ইব্‌নমূসা মুলতানী (ডাক নাম মুলতানী কবি) ছিলেন প্রথম ভারতীয় কবি, যিনি আরবী ভাষায় কবিতা রচনা করেছিলেন।[৪] দ্বিতীয় হিজরী শতকে আবূ আতা আস-সিন্ধী প্রথম বনূ উমাইয়া ও বনূ হাশিমের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। মাসউদ ইব্‌ন সালমান লাহোরী জন্ম গ্রহণ করেন লাহোরে এবং সেখানেই প্রতিপালিত হন। সুলতান মাসউদ ইব্‌ন মাহমূদ গযনভী তাকে ৪১৬ হিজরীতে নিজ পুত্র প্রিন্স মুজাদ্দিদ ইব্‌ন মাসউদের সাথে ভারতের এক শহরে পাঠান। তিনি আরবী কবিতায় এতটা দক্ষ ছিলেন যে, লোকেরা তাঁকে আরবী কবি হিসাবেই চিনত।[৫] এভাবেই হিজরী সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষে আরবী কাব্যচর্চার মাধ্যমে আরবী সাহিত্য চর্চা শুরু হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশে নববী প্রশংসা

মূলত হিজরী ৮ম শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতীয় উপমহাদেশে রাসূল (সা.) এর প্রশস্তি মূলক আরবী কবিতার সূত্রপাত ঘটে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এর ক্রম বিকাশের ইতিহাসকে তিনটি যুগে বিভক্ত করব।

মধ্যযুগ (অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত)

রাসূল (সা.)-এর প্রশংসায় কবিতা রচনার বিকাশে এ যুগের কবিগণ গুরুত্বপূর্ণ ধারা সৃষ্টি করেন। এদের মধ্যে প্রথম ভূমিকা রাখেন কাজী আব্দুল মুকতাদির ইব্‌ন মাহমূদ ইব্‌ন সুলায়মান আশ-শারীহী আল-কিন্দী, যিনি ৭০৩ হিজরীতে ভারতের থানেশ্বর শহরে এক বিচারক ও বিদ্যান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আব্দুল মুকতাদির আল-কিন্দী নামেই ইতিহাসে পরিচিত। তিনি দিল্লীতে প্রতিপালিত হয়ে বেড়ে উঠেন। আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ করে রাসূলের প্রশংসায় অনেকগুলো কাসীদা ও গযল রচনা করেন।[৬] শায়খ নাসির উদ্দীন দেহলভীর হাতে তিনি তরীকার বায়'আত গ্রহণ করেন। তিনি সর্বদা দার্স ও তাদরীসের কাজে লিপ্ত থাকতেন। ৭৯১ হিজরীতে ৮৮ বছর বয়সে দিল্লীতে মারা যান। রাসূলের প্রশংসায় লিখিত ভুবন

বিখ্যাত কবিতা ''*কাসীদাহ লামিয়াহ*'' *বা* ''*লামিয়াতুল হিন্দ*'' তার অমর কীর্তি। এতে ৯১টি শ্লোক আছে। কাসীদাটি প্রাক ইসলামী যুগের নিয়মে ধ্বংসাবশেষের উল্লেখ করে বাস্তুভিটার বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছে। এমন কি তিনি ইমরুল কায়েসের মত তার প্রেমিকা সালমার নাম উল্লেখ করেছেন।[৭]

শায়খ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ থানেশ্বরী ৭৩২ হিজরীতে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন ও সেখানেই বড় হন। ফিকহ, উসূল ও আরবী ভাষায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন তিনি। মহানবী (সা.) এর গুণাগুণ বর্ণনায় তাঁর রচিত কাসীদাটি হলো'*কাসীদাহ দালিয়্যাহ*'।[৮] তিনি ৮২০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

আবুল ফায়ায কুতুবুদ্দীন আহমাদ ইব্ন আব্দুর রহীম ১১১৪ হিজরীতে দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহ নামে পরিচিত। পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা রহীমিয়্যাতে পড়াশুনা করেন। সাত বছর বয়সে কুরআনুল কারীম হিফয করেন। তিনি একাধারে মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ, সূফী ও কবি ছিলেন। তাঁর নামের শেষে 'মুহাদ্দিস দেহলভী' ব্যবহৃত হয়। আর 'লকব' হিসেবে গায়ালিউল হিন্দ, মুসনাদুল হিন্দ, আল-ইমামুল মুজাহিদ ইত্যাদি ব্যবহার হয়। 'হুজ্জাতুল্লাহুল বালিগাহ' তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি।ফাযলুল মুবীন, আত-তাফহীমাতুল ইলাহিয়্যাহ, ইক্দুল জীদ ফীআহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত-তাকলীদ, ইযালাতুল খফা আন খিলাফাতিল খুলাফা, ফাতহুর রহমান ফী তারজামাতিল কুরআন, ফাওযুল মুবীন ফী উসূলিত তাফসীর, হুসনুল আকীদাহ ইত্যাদি গ্রন্থগুলো আরবী সাহিত্যের ভাণ্ডার সমতুল্য।[৯] আর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রশংসায় রেখে গেছেন *'দীওয়ানু ফী মাদহি সায়্যিদিল আরাব ওয়াল আজাম'*। এটি কাব্য জগতে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। এছাড়া আছে '*কাসীদাতুল হামযিয়্যাহ*' *ও* '*কাসীদাতুল বাইয়্যাহ*'। তাঁর লেখনীর মধ্যে অনেক খণ্ড খণ্ড কবিতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে; যা মহানবী (সা.)-এর প্রশংসায় লিখিত। তিনি ১১৭৬ হিজরীতে মারা যান।[১০]

ফকীর গোলাম আলী ইব্ন সায়্যিদ নূহ আল-হুসায়নী আল-ওয়াসতী আল-বিলগ্রামী আল-হানাফী আল-চিশতী ১১১৬ হিজরীর ২৫ সফর রবিবার মোতাবেক ৩০ জুন ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের হারদোই জেলার অন্তর্গত বিলগ্রামের সন্নিকটে মাহরুসা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[১১] ইতিহাসে তিনি মাওলানা গোলাম আলী আজাদ বিলগ্রামী নামে খ্যাত। ভারতবর্ষের আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি আরবী, ফারসী, হিন্দী ও উর্দু ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। সাহিত্য চর্চা করেছেন আরবী ও ফারসীতে। তবে আরবী ভাষার প্রতি তার ভালোবাসা অন্যান্য ভাষার প্রতি ভালোবাসাকে ছাপিয়ে গেছে। আরবী সাহিত্য, ভাষা, কবিতা, আল-বাদী, আল-আরূদ, আল-কাওয়াকী ও আল-বালাগাত ইত্যাদি বিষয়ে যে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল তাঁর বই ও লেখনীগুলো তার সাক্ষ্য বহন করে। বিশেষ করে তাঁর আরবী কবিতাগুলো ভারতের আরবী কবিদের মাঝে অমূল্য সম্পদ হিসেবে রয়ে গেছে। তাঁর আরবী কবিতার শ্লোকের সংখ্যা ১১০০০ (এগার হাজার)।[১২]

তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন। যেমনঃ ওয়াস্‌ফ, রিসা, গযল, মাদীহ, হুব্ব, কিত্বআ, কাসীদাহ ইত্যাদি।[১৩] এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় 'মাদীহ' অর্থাৎ প্রশংসামূলক কবিতা, যা তিনি রাসূল (সা.) এবং তাঁর শিক্ষক, নিকটাত্মীয়, দ্বীনী আলেম ইত্যাদি ব্যক্তিদের প্রশংসায় লিখেছেন।[১৪]কিন্তু রাসূল (সা.)-এর প্রশংসায় লিখিত তাঁর আরবী কবিতার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এ মর্মে তাঁর বেশ কয়েকটি দীওয়ান ও কাসীদাহ রয়েছে। যেমন- *আদ-দীওয়ানান*: এতে তিন হাজার পংক্তি। রাসূল (সা.)-এর কবরের পাশে পাঠ করার জন্য তিনি উক্ত দীওয়ান মদীনা মুনাওয়ারায় প্রেরণ করেছিলেন।[১৫] *আরজুস সাবা ফী মাদহিল মুস্তফা* নামক দীওয়ানটি রাসূল (সা.)-এর প্রশংসায় রচিত কবিতার সংকলন। *আস-সাবআহ আস-সাইয়ারা* নামক সপ্ত দীওয়ানের প্রথম তিনখানা দীওয়ান রাসূল (সা.)-এর প্রশংসায় ভরপুর।

লামিয়াতুলহিন্দ, লামিয়াতুল মাশরিক ও মাদহুর রাসূল নামে প্রসিদ্ধ কাসীদা ৩টি রাসূল (সা.) এর প্রশংসায় রচিত। শিরোনাম বিহীন চারখানা কাসীদাহ তাঁর জগৎ বিখ্যাত গ্রন্থ *সুবহাতুল মারজান ফী আসারি হিন্দুস্তান* এর ভূমিকায় সংযোজন করা আছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে ছোট ছোট কবিতায় রাসূল (সা.)-এর প্রশংসা করেছেন। রাসূল (সা.)-এর প্রশংসায় রচিত কবিতার জগতে তাঁকে হাসসানুল হিন্দ লকব দেওয়া হয়। কতিপয় গবেষক মনে করেন রাসূলের (সা.) শানে প্রশংসামূলক কবিতা রচনায় তিনি শীর্ষে অবস্থান করেন। বরং কখনো কখনো তাঁর প্রশংসাকারীদের সকলের উর্ধ্বে আরোহন করেন।[১৬]

প্রশংসার পদ্ধতি: প্রেয়সীর প্রশংসা দিয়ে কাসীদাহ শুরু করেন। তারপর রাসূল (সা.)-এর প্রশংসায় লিপ্ত হন। শেষে রাসূল (সা.)-কে ওয়াসীলা করে নিজের পরিত্রাণ চেয়ে কাসীদা শেষ করেন।[১৭] তিনি ১২০০ হিজরী মোতাবেক ১৭৮৬ খ্রি. ঔরাঙ্গবাদে মৃত্যুবরণ করেন।[১৮]

শায়খ বাকির ইব্‌ন মুরতুযা আল-মাদরাসী ১১৫৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আর ১২২০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। রাসূল (সা.)-এর মহানুভব প্রকৃতি, চিরন্তন মু'জিয়া ও বিরল চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে রেখে গেছেন "আল আশরাতুল কামিলা" নামক একখানা দীওয়ান।[১৯]

প্রাক আধুনিক যুগ (উনবিংশ শতাব্দী)

এ যুগে যারা অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন-ভারতগুরু 'শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর পুত্র শাহ রফীউদ্দীন মুহাদ্দিস দেহলভী। তিনি ১১৬৩ হিজরী মোতাবেক ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নিকট থেকে ইলমে হাদীস অর্জন করেন। পিতার মৃত্যুর পর বাকীটা বড় ভাই আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলভীর নিকট সমাপ্ত করে ২০ বছর বয়সে দারস ও তাদরীসের পেশায় নিয়োজিত হন। তিনি মুহাক্কিক, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও ফকীহ ছিলেন। উর্দু তরজমায়ে কুরআন মাজীদ, মুকাদ্দামাতুল ইলম, কিয়ামতনামা, তাকমীলুল আযহার, আসরারে মুহাব্বাত তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থমালা।আর রাসূল (সা.)-এর প্রশংসায় লিখিত তাঁর প্রসিদ্ধ কাসীদা '*আল-ইসরা ওয়াল মিরাজ*'।[২০] তিনি ১২৩৩ হিজরীতে ইহজগত ত্যাগ করেন।

মালিবারের হাসসান নামে খ্যাত শায়খ ওমর ইব্‌ন আলী, যিনি আল-কাজী, আল-বালানকোটী নিসবাতে প্রসিদ্ধ, তিনি ১১৭৭ হিজরী মোতাবেক ১৭৬৩ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। আরবী ভাষা, সাহিত্য ও কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তিনি বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী।*আল-কাসীদাতুল উমারিয়্যাহ (القصيدة العمرية), আলিফুল আসী (الف العاصى) লাম্মা যাহারা (لما ظهرا), লাহাল হিলাল (لاح الهلال)* প্রভৃতি কাসীদাগুলো তিনি রচনা করেছেন। তিনি রাসূল (সা.) এর প্রশংসায় লিখেছেন লাহাল হিলাল' কাসীদাটি (حروف مهملة) নুক্তা বিহীন হরফ দিয়ে।

لاح الهلال هلال لامع العلم * لله داع رسول الله للأمم

الحاكم العادل الصدر المعد له * كل المكارم سمح واسع الكرم[২১]

> ''নবচন্দ্র উদ্ভাসিত হয়েছে, উজ্জ্বল নিশানার নবচন্দ্র আল্লাহর রাসূল (সা.) জাতিদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী।
>
> ন্যায়পরায়ণ শাসকের বক্ষ তাঁর জন্য প্রস্তুত রয়েছে, তিনি সমস্ত ভাল কাজের অনুমতি দেন এবং তিনি উদারতায় সেরা''।

‘তিনি অপর একটি কাসীদা রাসূলের (সা.)-এর প্রশংসায় রচনা করেছেন (حروف معجمة) নুকতা ওয়ালা হরফ দিয়ে

جفتني فذبتني فغظت بغيظة * فذبت بشجن بين جنبي يخفق

يشققني شغفي فخفت تجنني * بنشق شذى في نبي ينشق[২২]

‘‘এটা আমাকে শুকিয়ে দিয়েছে, আমাকে বিতাড়িত করেছে, দারুনভাবে আমাকে রাগান্বিত করেছে। তাই দুঃখে আমার দু’পার্শ্বসহ স্পন্দিত হলাম।

(নবীর প্রতি) আমার আবেগ-অনুভূতি আমাকে বিদীর্ণ করে ফেলেছে। ফলে আমি ভয় করছি যে, আমি নবীর সুরভিত ঘ্রাণে পাগল হয়ে যাব, যিনি ঘ্রাণ নিতে দিচ্ছেন’’।

‘লাম্মা যাহারা’ কাসীদাটি- রাসূল (সা.)-এর অবয়ব ও গুণের বর্ণনা দিয়ে রচিত।

হাসসানু মালিবার কাজী ওমর ইব্‌ন আলী ১২৭৩ হিজরী মোতাবেক ১৮৫৭ খ্রি. এ নশ্বর দুনিয়া ত্যাগ করেন।

উসতায ফায়যুল হাসান সাহারানপুরী (১২২৮ হি-১৩০৪ হি./১৮১৬-১৮৮৭ খ্রি.) ছিলেন বিদগ্ধ জ্ঞানী, দক্ষ শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও অত্যন্ত মেধবী ব্যক্তি। তাঁর সময়ে ইলমে নাহু, ভাষা, কবিতা ইত্যাদি বিষয়ে তার মত আর কেউ ছিল না।[২৩] আরূযুল মিফতাহ, ফায়যিয়্যাহ, রাওযুহু ফায়য, আল-ফায়যী, ফায়যুল কামূস, শারহু দীওয়ানিল হামাসাহ, হাশিয়াতু আলা দীওয়ানিন নাবিগাহ, হাশিয়াতু আলা দীওয়ানি হাসসানইব্‌ন ছাবিত ও দীওয়ানুল ফায়য প্রভৃতিসহ মোট ২৩খানা গ্রন্থ তাকে আরবী সাহিত্যের জগতে অমর করে রেখেছে।[২৪] শেষোক্ত গ্রন্থ অর্থাৎ *‘দীওয়ানু ফায়য’* রচনা করে নিজের ব্যক্তি জীবনের ভুল ত্রুটির জন্য রাসূল প্রশস্তিতে কাসীদাহ লিখে মহান রবের নিকটে ক্ষমা চেয়েছেন। সাহারানপুরীর *দীওয়ানুল ফায়য* ভারতের আজমগড় থেকে ও ১৪১৬ হিজরীতে পাকিস্তানের লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।[২৫]

ভারতীয় আরবী কবিদের মধ্যে যারা রাসূল (সা.)-এর প্রশংসায় ইমাম বুসীরীর কাসদিাতুল বুরদা ও মুখাযরাম কবি কা’ব ইব্‌ন যুহায়র (রা.)-এর পদাংক অনুসরণ করেছেন তাঁদের মধ্যে শায়খ আহমাদ আব্দুল কাদির আল-কাওকানী (১২৭২হি.-১৩২০হি.) অন্যতম। রাসূল (সা.)-এর প্রশংসায় তিনি *কাসীদা মীমিয়া* রচনা করেছেন।যেমন,

هبني ذنوبي قد جمت أليس لها * من الرسول شفيع رحمة الامم

محمد بهجة الدارين نور هما * سر الوجود وعين الجود و الكرم[২৬]

‘‘আমার পাপ পুঞ্জিভূত হয়ে গেছে। এর জন্য সুপারিশকারী কোন রাসূল কি নেই, যিনি জাতিদের প্রতি দয়ালু?

মুহাম্মাদ (সা.) দুই জগতের সৌন্দর্য্য ও আলোকবর্তিকা, অস্তিত্বের রহস্য এবং উদারতা-বদান্যতার উৎস’’।

সিদ্দীক হাসান ইব্‌ন আওলাদ হাসানইব্‌ন আওলাদ আলী হুসায়নী আল-বুখারী আল কনৌজি ১২৪৮ হি. ১৯ জুমাদাল উলা রবিবার মোতাবেক ১৮৩২ খ্রি. ভারতের বাঁশ ব্রেলীতে জন্মগ্রহণ করেন। সাত বছর বয়সে তিনি ইয়াতীম হন। পরে মা ও ভাইয়ের সহযোগিতায় বেড়ে উঠেন ও অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভুপালী হিসেবে পরিচিত। একাধারে তিনি মুহাক্কিক, মুহাদ্দিস, মুফাসসির,

ফকীহ, কবি ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা। ফাতহুল বায়ান ফী মাকাসিদিল কুরআন, নায়লুল আওতার, আবজাদুল উমূম, আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ, রিহলাতুস সিদ্দীক ইলা বায়তিল আতীক, আল-বালাগাত ফী উসূলিল লুগাত, আল-জান্নাতু ফী উসওয়াতিল হাসানাহ, বিয়াযুল জান্নাত ফী তারাজুমি আহলিস সুন্নাহ, আদ-দ্বীনুল খালিস, মিসকুল খিতাম, শারহু বুলুগিল মারাম প্রভৃতি সহ তিনি ২২২ খানা গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তার রেখে যাওয়া গ্রন্থগুলো আরবী সাহিত্যের অমূল্য ভাণ্ডার। তার অন্তিম সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে নুযহাতুল খাওয়াতির গ্রন্থকার বলেন,

ثم يدرس في كتاب من كتب القرآن والسنة، ويحضره بعضابنائة وخاصة طلبة العلم، ويحضر بعض الشعراء و الادباء فيتذاكر معهم في الشعر والادب، ويتساجل في الطائف الشعرية و النكت للادبية، ثم يصلى العشاء و ينصرف الى النوم والراحة-[২৭]

‘‘তারপর তিনি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে একটি বই অধ্যয়ন করে জ্ঞান অন্বেষণের ব্যাপারে এর কিছু অংশ গঠনমূলকভাবে উপস্থাপন করেন। এরপর কয়েকজন কবি সাহিত্যিক উপস্থিত হন এবং তাদের সাথে কবিতা ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন। তারপর এশার সালাত আদায় করে ঘুম ও বিশ্রামের জন্য প্রস্থান করেন’’।

আধুনিক যুগ(বিংশ শতাব্দী)

এ যুগে উল্লেখযোগ্য কবিগণের মধ্যে রয়েছেন আল্লামা হাবীবুর রহমান ইব্ন ফযলুর রহমান ওসমানী দেওবন্দী, তিনি ১২৭৫ হিজরীতে দেওবন্দ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত দারুল উলূম দেওবন্দে পড়াশুনা করে ১৩০০ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে পড়া-লেখা শেষ করেন। অতঃপর ১৯০৭ খ্রি. উক্ত দারুল উলূমে সহকারী প্রধান পদে নিযুক্ত হন। ১৯২৫ খ্রি. হায়দ্রাবাদে মুফতি পদে কর্মরত হন কিন্তু বছর খানেক যেতে না যেতেই দারুল উমূল দেওবন্দের শায়খ হাফিয মুহাম্মাদ আহমাদের ওফাতের পর তার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে তিনি মুদীর হন। তাঁর দক্ষ প্রশাসনিক ক্ষমতা দারুল উলূম দেওবন্দকে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেয়। তিনি বিদ্যান, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও মুদীর ছিলেন। তাঁর পূর্ণ জীবন অতিবাহিত হয় শিক্ষা দান ও মানবকল্যাণে। ৪ রজব ১৩৪৮ হি মোতাবেক ১৯২৯ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।[২৮] তিনি মজবুত শৈলীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন। চমৎকার এবং সহজ পদ্ধতিতে আরবী ভাষায় কবিতা রচনা করার জন্য তাকে দারুল উলূমের সবচেয়ে দক্ষ পণ্ডিতদের একজন বলে মনে করা হতো। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা রচনা করেন। তার মধ্যে মাদহ্, সানা, ওয়াসফ ইত্যাদি বিষয়ে অনেকগুলো কাসীদাহ রয়েছে। মহানবী (সা.)-এর প্রশংসায় তাঁর তিনটি প্রশিদ্ধ কাসীদাহ রয়েছে।[২৯]

১. *দুআউল মুযত্বরর* (*دعاء المضطر*)- এটি তিনি কাসীদাতুল বুরদার স্টাইলে রচনা করেন। অলংকারপূর্ণ শব্দের প্রয়োগ, ভাষাগত বিশুদ্ধতা ও মৌলিকতার (যা প্রাক ইসলামী যুগের কবিদের পদ্ধতির বেশিষ্ট্য ছিল) এই রচনাশৈলী কবিতাটিকে অন্যান্য কবিতার উপরে স্থান করে দিয়েছে। নববী প্রশংসায় এই কবিতাটি ১২১টি শ্লোকে রচিত।

২. *বাইয়াতুল মুজিযাত* (*بائية المعجزات*)- এতে তিনি মহানবীর (সা.)-এর ১০০টি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এতে ১৮০/১৯০ টি শ্লোক আছে।

৩. *লামিয়াতুল মুজিযাত* (*لامية المعجزات*)-এটি কবি ওসমানীর সবচেয়ে বিখ্যাত ও বিস্ময়কর কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম। এটি একটি দীর্ঘ কবিতা এতে ৩৮৫টি শ্লোক রয়েছে। ১৯০টি শ্লোকে রাসূলের (সা.) মুজিযাগুলোকে ১৭টি ভাগে ভাগ করে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। ১২টি শ্লোকে তিনি উপসংহার

টেনেছেন। "মুঈনুল লাবীব ফী মাদহি কাসাইদিল হাবীব" তার প্রকাশিত দীওয়ান।[৩০]তিনি ১৩৪৮ হি. মোতাবেক ১৯২৯ খ্রি. মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন।

আল্লামা আব্দুল হাই আল হাসানী (১৮৬৯-১৯২৩ খ্রি.) ভারতীয় আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে সিংহ পুরুষ সাদৃশ্য। "নুযহাতুল খাওয়াতির ওয়া বাহজাতুল মাসামিউ ওয়ান নাওয়াযির', ও 'আস-সাকাফাতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল হিন্দ' গ্রন্থের ফজিলতে তার কণ্ঠস্বর মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ভাষা, সাহিত্য ও ইসলামী জ্ঞান লাক্ষ্মৌর প্রসিদ্ধ বিদ্যানদের নিকট থেকে গ্রহণ করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর পড়াশুনা করেন ও চিকিৎসা কর্মে রত হন। ১৩১০ হি. মোতাবেক ১৮৯২ খ্রি.নাদওয়াতুল উলামার আন্দোলন শুরু হলে তিনি তাতে অনেক বড় অবদান রাখেন। এমনকি সারা জীবন তার সাধ্যমত নাদওয়ার খিদমতে নিয়োজিত থাকেন। তিনি কিছু বিশ্বস্ত সাথী সংগ্রহ করেন। আল্লামা হাসানীর যোগ্যতা ও মর্যাদার বিবেচনায় ১৩৩৩ হিজরীতে তাঁকে নাদওয়াতুল ওলামার পরিচালক নির্বাচন করা হয়। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে এ কর্মে টিকে ছিলেন।[৩১] তাঁর সম্পর্কে তাঁর বড় ছেলে যথার্থই বলেছেন-

كان متضلعا من العلوم، راسخ القدم في ادب اللغة العربية و الفارسية والاردية، وكان شاعرا مجيدا الا أنه لم يكثر فيه، بارعا في الفقه والحديث والتفسير السير والتاريخ، لم يكن له نظير في العلم باحوال الهند ورجالها في عهد الدولة الاسلامية-[৩২]

''তিনি জ্ঞানে সুপণ্ডিত ছিলেন। বিশেষ করে আরবী, ফার্সী ও উর্দূ সাহিত্যে। তিনি একজন গৌরবময় কবি ছিলেন। কিন্তু তিনি বেশি কবিতা রচনা করেননি। আইনশাস্ত্র, হাদীস, তাফসীর, জীবনী এবং ইতিহাসে দক্ষ ছিলেন। ইসলামী যুগে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর সমান জ্ঞান আর কারোও ছিলনা''।

রাসূল (সা.)-এর প্রশংসায় আল্লামা হাসানীর লিখিত *কাসীদা* হতে-

خير البرية رأسهم ورئيسهم * ابن الكرام أخو الندى والسؤدد

رحب الذراع حليف مجد سابغ * خدن الصلاح شفيق عز سرمد[৩৩]

''তিনি সৃষ্টিজগতের সেরা, তাদের প্রধান ও নেতৃস্থানীয় সম্মানীয় ব্যক্তির বংশধর, দানশীলতা ও মর্যাদাবান ব্যক্তিদের ভ্রাতা।

প্রশারিত বাহু, মৈত্রী চুক্তিবদ্ধ, পরিপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী, সৎকর্মশীলদের অন্তরঙ্গ বন্ধু, শাশ্বত মর্যাদাশীলদের সুহৃদ''।

আল্লামা আনওয়ার শাহ ইব্ন মুআযযিম শাহ আল-হুসায়নী আল-হানাফী আল-কাশ্মীরী ১৮৭৫ খ্রি. কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৩ খ্রি. দেওবন্দে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লামা কাশ্মীরী তাঁর যুগের বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের ছাত্র ছিলেন। পরে শিক্ষক হন। ইলমে হাদীসের পাণ্ডিত্বের কারণে তাঁকে ভারতের ইমাম বুখারী বলা হয়। ধর্মীয় জ্ঞান যেমন কুরআন, হাদীস, ফিকহ, তাফসীর, কাওয়ায়েদ, আরবী সাহিত্যে তিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।[৩৪] ফায়যুল বারী (বুখারী), আল-উরফুশ শাযী (তিরমিযী), মুশকিলাতুল কুরআন, ফাসলুল খিতাব, নায়লুল ফিরকাদায়নি ফী রফইল ইয়াদায়ন, আক্বীদাতুল ইসলাম বিহায়াতি ঈসা (আ.), খাতামুন নাবিয়্যিন, আল-ইতহাফু লিমাযহাবিল আহনাফ ইত্যাদি গ্রন্থগুলো তার অমর সৃষ্টি, যা আরবী সাহিত্যের মূল্যবান উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি অনেক

বড় মাপের কবি ছিলেন। আরবী ও ফারসী দু'ভাষাতে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। আরবীতে কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। রাসূল (সা.)-এর প্রশংসায় লিখিত তার *কাসীদা* হতে-

شفيع مطاع نبي كريم * نسيح حسيم نسيم وسيم

شفيع الانام مطاع المقام * كريم الكرام نبي الانيم[৩৫]

''এমন সুপারিশকারী যার আনুগত্য করা হয়, মহানুভব নবী (সকলের) আকাঙ্ক্ষার স্থল, (শিরক-কুফর) কর্তনকারী, নম্র ব্যবহারকারী অতি সুদর্শন।

মানবতার সুপারিশকারী, যার সুউচ্চ মর্যাদার আনুগত্য করা হয়, সম্মানিতদের মধ্যে অতি সম্মানী শ্রেষ্ঠ নবী''।

শায়খ আবু মুহাম্মাদ আব্দুল কাদির আল-বাকিভী ইব্ন শায়খ আল্লামা ইউসুফ ফাযফারী (১৩১৩-১৩৬৪ হি.) হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে পশ্চিম ভারতের একজন মহান কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। মহানবী (সা.) এর প্রশংসায় *লামিয়াতুল কাযফারী*, *তাখমীসুল ফাযফারী* কাসীদাগুলো রচনা করে আরবী সাহিত্যর জগতে অমর হয়ে আছেন।[৩৬] '*লামিয়াতুল ফাযফারী*' কাসীদাটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, আরবী কবিতার প্রতি লাইনের ২টি অংশ থাকে। প্রত্যেক অংশকে মাসরা বলে। উভয় মাসরা প্রথম বর্ণ একই এবং তা আরবী হরফের ক্রমানুসারে ২৮টি বায়ত দিয়ে কবিতাটি রচিত। যেমন,

الهاء: هِبات صلوة رب العالمينا * هديات السلام كالغوالى

الياء: يفيض عليك صبّهما دواما * ينابيعا واصحاب وآل[৩৭]

''আমাদের জন্য প্রভূর প্রর্থানার উপহার ও শান্তির উপঢৌকনগুলো মূল্যবান জিনিসের মত।

যা আপনার, আপনার পরিবার ও সাহাবীদের উপর সর্বদা ঝর্ণাধারায় প্রবাহিত হয়''।

এটি তিনি ১৩৫৩ হি. ২০ রজব মঙ্গলবার রাতে রচনা করেন।

আর 'তাখমীসুল ফাযফারী' কাসীদাটি পাঁচটি পাঁচটি মাসরায় (আড়াই লাইন) বিভক্ত এবং প্রত্যেক মাসরা শুরু হয়েছে মুহাম্মাদ (محمد) শব্দ দিয়ে।

محمد افضل المخلوق ذو العصم * محمد صاحب القرآن والحكم

محمد قاسم الاموال والنعم * محمد اشرف الاعراب و العجم

محمد صادق الافعال و الكلم[৩৮]

''মুহাম্মাদ (সা.) সর্বোত্তম সৃষ্টি নিষ্পাপ মুহাম্মাদ (সা.) কুরআন ও সুন্নাহর বাহক।

মুহাম্মাদ (সা.) সম্পদ ও নে'আমত বন্টনকারী, মুহাম্মাদ (সা.) আরব-অনারবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

মুহাম্মাদ (সা.) কর্মে ও কথায় সত্যবাদী''।

এটি তিনি ১৩৪৭ হিজরীতে রচনা করেন।

শায়খ মুহাম্মাদ ইদরীস কান্ধলভী ১৩১৮ হিজরীতে ভারতের কান্ধলা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি হিজরত করে পাকিস্তানে চলে যান ও ১৯৭৪ খ্রি. লাহোরে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি অনেক বড় মাপের আলেম ও কবি ছিলেন। মহানবী (সা.) সম্পর্কে তাঁর কবিতার বেশির ভাগ অংশ জুড়ে আছে। *'সালকুদ দুরার' (سلك الدرر)* তাঁর কাব্যগ্রন্থ। মি'রায এর ঘটনা নিয়ে যারা আরবী কবিতা লিখেছেন তার মধ্যে শায়খ মুহাম্মাদ ইদরীস কান্ধলভী একজন।[৩৯] দৃষ্টান্ত-

الا ليت شعرى هل يقولن مقولى * قصيدا بإسراء النبي المبجل

فسبحان من أسرى بليل بعبده * الى المسجد الأقصى إلى عرشه العلى[৪০]

> ''আমি আশা করি আমার কবিতাগুলো বলবে যা আমি নবীর রাত্রিকালীন সফর সম্পর্কীয় কবিতা হিসেবে বলেছিলাম।
>
> মহা পবিত্র তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রিবেলা মসজিদুল আকসা থেকে তাঁর আরশে আলা পর্যন্ত ভ্রমণ করালেন''।

আরীকালীর উস্তাদ আবু মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ আহমাদ ১৩৫৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৮ খ্রি. ১৩ জুলাই ভারতের কেরালা প্রদেশের কালিকোট জেলার 'মায়বুত' গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা একজন বিজ্ঞ আলিম ওকবি ছিলেন। প্রথমে পিতার নিকট থেকে আরবী জ্ঞান অর্জন করেন। উচ্চ শিক্ষা সমাপ্তির পর দারস-তাদরীস ও লেখালেখির প্রতি মনোনিবেশ করেন। এক সময়ে তিনি আরব দেশগুলি ভ্রমণে বের হন। এভাবে তিনি আরবী-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ করে কবিতা রচনায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন।[৪১] রাসূল (সা.) এর প্রতি ভালোবাসা তাকে মাদীহ রচনায় প্রেরণা যোগায়। ফলে বৃহদায়তনের দু'টি দীওয়ান রচনা করেন।

১. *'আল-জাওয়াহিরুল মুনাযযামু ফী সীরাতিন নাবিয়্যিল মুকাররাম'(الجواهر المنظم فى سيرة النبى المكرم)* এটি তাঁর ক্লাসিক কবিতার সংকলন। দীওয়ানটি দুবার কাতার থেকে মুদ্রীত হয়েছে।[৪২] ওয়াহীর শুরু থেকে হিজরত পর্যন্ত ২৫টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। শ্লোকের সংখ্যা ৬০২টি। শেষ অধ্যায় কেবল হিজরতের বর্ণনা। এতে আছে ১২১টি শ্লোক।[৪৩]
২. *'আদ-দুরুল মুনাযযাদু ফী কামালাতিন নাবিয়্যি (সা.)' (الدر المنضد فى كمالة النبى ص)*। এটি কেরালা থেকে মুদ্রীত। এই মহান কবি আব্দুর রহমান আরীকালী সেপ্টেম্বর ২০০৫ খ্রি. ইহধাম ত্যাগ করেন।[৪৪]

শায়খুলহাদীস আল্লামা আজিজুল হক রাসূল (সা.)-কে লক্ষ্য করে ৫টি কবিতা রচনা করেছেন। তার মধ্যে "*আত-তাওয়াসুলু বিমাদহি খায়রি রুসুল*" তাঁর অনূদিত "বুখারী শরিফ এর ৬ষ্ঠ খণ্ডে সংযোজন করা আছে।[৪৫]

ড. মুহাম্মাদ সদরুল হাসান নাদভী (জন্মগ্রহণ ১৯৫৭ খ্রি.) দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা থেকে পাস করে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বর্তমানে তিনি মহারাষ্ট্রের আওরাঙ্গাবাদ শহরে শিক্ষকতা করেন। তিনি একজন ভারতীয় আরবী-সাহিত্যিক ও কবি। তাঁর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ আছে। তার মধ্যে 'আল-ইসলাম ওয়াল-মুশতারিকুন, আল-মাদীহুল আরাবী ফিল হিন্দ'- এটি পিএইচ.ডি থিসিস, 'আল-মাদাইহুন নাবাবিয়্যা ফিল হিন্দ' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৪৬] আরবী ভাষায় তার বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা আছে। *রাসূল (সা.) এর প্রশংসায়* লিখিত তার *কবিতা* থেকে-

فاق النبيين في الأخلاق قاطبة * من جاءه منكرًا قد زانه شرقا

نال الكرامة فالخلق يكرمه * بحر الفضائل لا نقصًا ولا رتقا[৪৭]

"তিনি নৈতিকতার দিক দিয়ে সকল নবীকে ছাড়িয়ে গেছেন। যিনি এসেছিলেন অপরিচিত অবস্থায় কিন্তু সুশোভিত করেছিলেন দিগন্ডকে।

তিনি লাভ করেছিলেন ইয্যত-সম্মান ফলে সমস্ড় সৃষ্টি তাঁকে সম্মান করেছিল। যিনি ছিলেন মর্যাদার সাগর যাতে ছিল না কোন দোষ-ত্রুটি"।

শায়খ আবু সুহায়ল আনওয়ার আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুর রহমান আল-ফাযফারী (জ. ১৩৭৯ হি.) কেরালায় জন্মগ্রহণ করেন। কালিকোট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি শ্রেষ্ঠ বিদ্যানের সনদ লাভ করেন। বর্তমানে রিয়াদে কর্মরত। তিনি রাওয়াইহুজ জহুর ওয়া ফাওয়াইহুল আতুর, শারহুল মানযূমাতিল ফাযফারিয়্যা ফী কাওয়াইদিল ফিকহিয়্যা, ওয়াল কালাইদুল জালিয়্যা ফিল কাওয়াইদিল উলূহিয়্যা, আন-নাযমুল ওয়াফী ফিল ফিকহিশ শাফি, আন-নাযমুল জালী ফিল ফিকহিল হাম্বলী, ইত্যাদি গ্রন্থগুলোর প্রণেতা।[৪৮] *আল-মাদহ*, আত-তাহনিয়া, আর রসা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর আরবী কবিতা আছে। *রাসূল (সা.)-এর প্রশংসায়* লিখিত তার *কাসীদা* হতে-

فاقبل الى ذكرى الحبيب محمد * نبي الهدى، اسمى الورى، خير مرسل

رسول، رؤوف، رحمة الخلق، سيد * سراج منير، شافع خير مأمل[৪৯]

''অতএব প্রিয় মুহাম্মাদ (সা.) হেদায়াতের নবী, সৃষ্টিজগতের মহত্তর শ্রেষ্ঠ রাসূলের স্মরণে অগ্রসর হও।

যিনি প্রেরিত দূত, করুণাময়, সৃষ্টিজগতের অনুগ্রহ, নেতা, আলোকিত প্রদীপ, সুপারিশকারী ও শ্রেষ্ঠ ভরসার স্থল''।

শায়খ মুহাম্মদ যিয়াউদ্দীন আল ফায়যী ইব্ন মুহাম্মাদ হাসান আল-কাদেরী আল-মিলিমরী একবিংশ শতাব্দীর একজন তরুণ গবেষক। ১৯৯৪ খ্রি. আরবী নূরীয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভের পর সৌদি আরবের একটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাকতার পেশায় নিয়জিত আছেন। তিনি দুবার গবেষণার অনুমতি লাভ করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ "আল-ইকতিসাদুল ইসলামী"। বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর অনেকগুলো কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।[৫০] *রাসূল (স.)-এর শানে* লিখিত তার *কাসীদাহ* হতে-

بشر ولم تلد النساء بمثله * قمر الهدى طلع القلوب يضيئها

واذا العوالم أظلمت بضلالة * بعث النبي محمد ليزيلها[৫১]

''তিনি এমন ব্যক্তি, কোন নারী তাঁর মত কাউকে জন্ম দেননি। হেদায়েতের চাঁদ উদিত হয়েছিল (মানুষের) হৃদয়কে আলোকিত করার জন্য।

আর পৃথিবী যখন গোমরাহীতে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল তখন তা দূর করার জন্য নবী মুহাম্মাদ (সা.)-কে পাঠানো হয়েছিল''।

উপসংহার

আধুনিক বিশ্বে সাহিত্য পরিমণ্ডলে আরবী ভাষা সাহিত্যের অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। কেননা এ ভাষার সাহিত্য শিল্প এতটাই বর্ণাঢ্য ও সমৃদ্ধ যে, অন্য কোন ভাষায় তা পরিদৃষ্ট হয়না। ফলে বিশ্ব সাহিত্য

অঙ্গন আজ এর সরল পদচারনায় মুখরিত। এ ভাষা-সাহিত্যে অনেকেই নোবেল পুরস্কার লাভের সুবাদে আধুনিক বিশ্বে এর মর্যাদা ও সমাদর বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর অনারব দেশগুলোতে এ ভাষা দ্রুত গতিতে প্রসার লাভ করেছে এবং এর পঠন-পাঠন ও চর্চার ধারা অব্যাহত রয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে আরবী ভাষা শিক্ষার প্রচলন সূচিত হয়। এ ভাষার বৈশিষ্ট অনুযায়ী কবিতা দিয়েই ভারতবর্ষে আরবী ভাষা চর্চা শুরু হয়েছিল। সপ্তম শতাব্দী থেকে আজ পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে ভারতবর্ষে আরবী সাহিত্য চর্চা অব্যাহতভাবে চলেছে। আরবী সাহিত্যের এমন কোন বিভাগ নেই যে বিভাগে ভারতীয় উপমহাদেশে সাহিত্য চর্চা হয়নি। আরবী যেহেতু ইসলাম ধর্মের বাহক তাই এদেশের ইসলামী ব্যক্তিত্বরাই এ ভাষা চর্চা করেছেন। আর রাসূল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা ইসলামী আদর্শের মৌলিক বিষয়। তাই অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিকগণ রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে কবিতা রচনা করেছেন। বিশেষ করে আরবী সাহিত্যের আধুনিক যুগে এসে ভারতীয় উপমহাদেশের মাটিতে এর জোয়ার উৎলে উঠেছিল। আলোচ্য প্রবন্ধে যাদের রাসূল প্রশস্তি নিয়ে আলোচনা করা হল আশাকরি এর দ্বারা নবদিগন্তের দ্বার উন্মোচিত হবে।

তথ্যনির্দেশ

১. আবুল ফারাজ কুদামা ইব্‌ন জাফর আল-কাতিব আল বাগদাদী, **কিতাবু নাকদিন নাসর** (কায়রো, বুলাক, রাজকীয় প্রেস, ১৯৪১ খ্রি.), পৃ. ৮৯-৯০।

২. ড. যাকী মুবারক, **আল-মাদাইহুন নাবাবিয়্যাহ ফিল আদাব**(বৈরূত, আল-মাকতাবাতুল আসাবিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৯৩৫ খ্রি), পৃ.৫।

৩. খতীব আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া আত-তাবরীযী, **'কিতাবু শারহিল কাসাইদিল আশর** (কলকাতা, দারুল ইমরারাহ, ১৮৫৪ খ্রি.).পৃ. ৪৮; আলহাজ্ব ড. মোহাম্মাদ শহীদুল্লাহ, **প্রাচীন আরবী কবিতা** (কলকাতাঃ বানী বুক স্টল (৬৯-ডি), ৩য় মুদ্রণ, ১৩৯৭ বাংলা), পৃ. ৮৫-৮৬।

৪. ড. ইয়ানত রাসূল, 'আলওয়ানু মিনাশ শি'রিল আরাবী ফিল হিন্দ' **মাজাল্লাতুদ দিরাসিয়্যাতিল আরাবিয়্যাহ** (শ্রীনগর, কাশ্মীর বিশ্বাবদ্যালয়, আরবী বিভাগ, ১৫ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ১৯৩।

৫. আব্দুল হাই আল-হাসানী, **আস-সাকাকাতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল হিন্দ** (কায়রো, মুআসসাসাতুল হিন্দিয়্যাহ লিত্‌তালীমি ওয়াস সাকাফাহ, , ২০১২ খ্রি.) পৃ. ৪৬।

৬. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, **'আখবারুল আখবার'** (দিল্লী, আদনা দুনয়া, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৩২৬।

৭. মাওলানা গোলাম আলী আজাদ বিলগ্রামী, **'সুবহাতুল মারজান ফী আসারি হিন্দুস্তান'** (বৈরুতঃ মাকতাবাতুল মু'মিন কুরায়শ, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৭৩।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

৯. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, **আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশঃ দক্ষিন এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ** (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ২৫২; আল্লামা আব্দুল হাই ইব্‌ন ফাখরুদ্দীন আল-হুসায়নী, **"নুযহাতুল খাওয়াতির ওয়া বাহজাতুল মাসামিউ ওয়ান নাওয়াযির"** (বৈরূতঃ দারু ইব্‌ন হাযম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯ খ্রি./১৪২৩ হি.), পৃ. ৮৬০।

১০. **নুযহাতুল খাওয়াতির ওয়া বাহজাতুল মাসামিউ ওয়ান নাওয়াযির**, পৃ. ৮৬৭।

১১. **সুবহাতুল মারজান ফী আসারি হিন্দুস্তান**, পৃ. ৫; ড. আহমাদ ইদরীস, **আল-আদাবুল আরাবী ফী শিবহিল কররাতিল হিনদিয়্যাহ হাত্তা আওয়াখিরিল করনিল ইশরীন** (কায়রোঃ মুআসসাসাতু আইন লিদ্দিরাসাত ওয়াল বুহুসিল ইনসানিয়্যা ওয়াল ইজতিমাইয়্যাহ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ.৪৪১; মুকাদ্দামায়ে দীওয়ান-ই-আজাদ, পৃ.১; Encyclopedia of Islam. Vol 1, printed in Lahore 1964, .P-104.

১২. **আস-সাকাফাতুল ইসলামিয়্যা ফিল হিন্দ**, পৃ.৪৮; **আল-আদাবুল আরাবীফী শিবহিল কররাতিল হিনদিয়্যাহ হাত্তা আওয়াখিরিল করনিল ইশরীন**, পৃ. ৪১১।

১৩. বিভিন্ন জিনিসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক কবিতাই হলো ওয়াসফ বা বর্ণনামূলক কবিতা। এ বিশ্লেষণ বাস্তবভিত্তিকও হতে পারে আবার রূপকও হতে পারে। দ্র. আয-যাওয়ানী, **শারহু মু'আল্লাকাতিস সাব'ই** (বৈরুতঃ দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৬৩। যে কবিতায় মৃত ব্যক্তির গুণাগুণ, তার ঘটনাবহুল জীবনের আংশবিশেষ নিয়ে আলোচনা করা হয়

তাকে রিসা বা শোকগাঁথা বলা হয়। দ্র. আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, **তারীখুল আদাবিল আরাবী** (বৈরূত, দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ১৫০। যে কবিতার মাধ্যমে কবি তার প্রেয়সীর স্মৃতি চারণ করে থাকেন তাকে গযল বা প্রেমগাঁথা বলে। দ্র. শারহুল মুআল্লাকাতিস সাব'ঈ, পৃ. ২৯। মাদীহ হলো কোন মর্যাদাবান ব্যক্তির উত্তম গুণ উল্লেখ করে কবিতা রচনা করা। দ্র. **তারীখুল আদাবিল আরাবী**, পৃ. ৪১। ২৪ থেকে ১০০ লাইন বা তদূর্ধ দীর্ঘ কবিতাকে আরবীতে কাসীদাহ বলে্ দ্র. ড. এস.এম. আব্দুছ ছালাম, **আরবী-সাহিত্য প্রতিভা** (রাজশাহী, সালেহা পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ, ২০২০), পৃ. ২১১।

১৪. হাসসানুল হিন্দ মাওলানা গোলাম আলী আল-হুসায়নী আল-ওয়াসতী আল-বিলগ্রামী, **আদ-দীওয়ানুল আওয়াল** (হায়দরাবাদ, কানযুল উলূম, তা.বি.), পৃ. ৪৮, ৫১, ৫৩, ৫৫।

১৫. **সুবহাতুল মারজান ফী আসারি হিন্দুস্তান**, পৃ. ২১২-২১৩।

১৬. আলতাফ আহমাদ মালানী, আশ-শি'রুল আরাবী ফিল হিন্দ, **আদ-দিরাসাতুল আদাবিয়্যাহ- ২** (রিয়াদ উজুহ পাবলিশিং ডিসট্রিবিউশন হাউজ, ১৪২০ হি.), পৃ. ১৬৯।

১৭. **আদ-দীওয়ানুল আওয়াল**, পৃ.৫; **সুবহাতুল মারজান ফী আসারি হিন্দুস্তান**, পৃ. ৩০-৩২।

১৮. **আল-আদাবুল আরাবী**, পৃ.৪১১; মুকাদ্দামায়ে **দীওয়ান-ই-আজাদ**, পৃ.১; **"নুযহাতুল খাওয়্যাতির ওয়া বাহজাতুল মাসামিউ ওয়াম নাওয়াযির"**, পৃ.৭৭৩; **Encyclopedia of Islam**, Vol-1, printed in Lahore 1964, p. 106.

১৯. ড. মুহাম্মাদ সদরুল হাসান আন নাদভী, আল-মাদানী, **আল-মাদাইহুন নাবাবিয়্যাহ ফিল হিন্দ** (লাক্ষ্মৌ, মাজলিসুত তারকীব ওয়াল মানশুরাতিল ইসলামিয়্যাহ, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ২১২।

২০. আব্দুর রহমান কোটী আল-ফায়যী, **আল-মাদাইহুন নাবাবিয়্যাহ লিশু'আরাইল হিন্দ** (কালিকোট, কেরালা, মাকতাবাতুল হুদা, ২০১৬ খ্রি.), পৃ.৩৫; **নুযহাতুল খাওয়্যাতির ওয়া বাহজাতুল মাসামিউ ওয়াম নাওয়াযির**, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৪৯-১৯৯।

২১. আবু মুহাম্মাদ আব্দুল কাদির আল-বাকিভী ইব্ন শায়খ আল্লামা ইউসুফ আল-ফাযফারী, **জাওয়াহিরুল আশ'আর ওয়া গারাইবুল হিকায়াত ওয়াল আখবার** (মালিবার, কেরালা, মারকাযুন নাশরাতিল ফাযফারিয়্যা, ২য় প্রকাশ, ১৪৩৪ হি./২০১২ খ্রি.), পৃ. ২৫২; **আল-মাদাইহুন নাবাবিয়্যাহ লিশু'আরাইল হিন্দ**, পৃ. ৫২।

২২. **আল-মাদাইহুন নাবাবিয়্যাহ লিশু'আরাইল হিন্দ**, পৃ. ৫২; **জাওয়াহিরুল আশ'আর ওয়া গারাইবুল হিকায়াত ওয়াল আখবার**, পৃ. ২৫৩।

২৩. **"নুযহাতুল খাওয়্যাতির ওয়া বাহজাতুল মাসামিউ ওয়াম নাওয়াযির"**, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৬।

২৪. **উলামাউ মাযাহিরিল উলূম ওয়া খিদমাতি হিমিল ইলমিয়্যাহ**, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৪।

২৫. **আল-মাদাইহুন নাবাবিয়্যাহ ফিল হিন্দ**, পৃ. ২১৩।

২৬. **নুযহাতুল খাওয়্যাতির ওয়া বাহজাতুল মাসামিউ ওয়াম নাওয়াযির**, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৩-২৫।

২৭. *তদেব, পৃ. ১২৪৯।*

২৮. রিয়ায আহমাদ ইব্ন নূর মুহাম্মাদ, 'শায়খ হাবীবুর রহমান ওসমানী আদ দেওবন্দী ফী মাদাইহিনি নাবাবিয়্যাহ', **মাজাল্লাতুদ দাঈ আশ-শাহরিয়্যাহ**, দারুল উলুম দেওবন্দ, ২৫তম বর্ষ, সংখ্যা ৪-৫, মার্চ-এপ্রিল ২০২১ খ্রি./১৪৩২ হি.।

২৯. সায়্যেদ মাহমুদ রিজভী, **তারিখু দারিল উলূমি দেওবন্দ** (দেওবন্দ, মাকতাবাতু রহীমিয়্যাহ), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪।

৩০. ড. যুবায়ের আহমাদ ফারুকী, **মুসাহামাতু দারিল উলূমি বিদেওবন্দ ফিল আদাবিল আরাবী** (দেওবন্দঃ মাজলিসুল হিন্দ লির রাওয়াবিতিস সাকাফিয়্যাহ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৯৮-৯৯।

৩১. প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আউইব তাজ উদ্দীন খান নাদভী, "আল-মাদীহুন নাবাবিয়্যু ফিল হিন্দ ফিল কারনিল ইশরীন, **মাজাল্লাতুদ দিরাসাতিল আরাবিয়্যা** (শ্রীনগর, কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়, আরবী বিভাগ, ৯ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৯-১০।

৩২. মুকাদ্দামাতু**নুযহাতিল খাওয়াতির**, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০।

৩৩. ড. নিসার আহমাদ আল-আ'জামী, **রায়হানাতুশ শি'র ওয়াশ-শুআরা** (লাক্ষ্মৌ, মাকতাবাতু কাকুরী, অক্টোবর, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ২০০।

৩৪. মুহাম্মাদ ইউসুফ আল-বানাউরী, **"নাফহাতুল আম্বারী ফী হায়াতি ইমামিল আসরি আশ-শায়খ আনওয়ার"** (দেওবন্দঃ বায়তুল হিকমা, ১৪১৪ হি.), পৃ. ৫৬।

৩৫. **মাজাল্লাতুদ দিরাসাতিল আরাবিয়্যা**, পৃ. ১২।

৩৬. **জাওয়াহিরুল আশ'আর ওয়া গারাইবুল হিকায়াত ওয়াল আখবার**, পৃ. ৯।

৩৭. তদেব, পৃ. ২৫৫।

৩৮. তদেব, পৃ. ২৫৬।

৩৯. ড. কিফায়াতুল্লাহ হামাদানী ও ড. হাফিয মুহাম্মাদ বাদশাহ 'আল-মাদাইহুন নাবাবিয়্যাহ ইনদা শু'আরাইল আরাবিয়্যাতিল বাকিস্তানিয়ীন" **মাজাল্লাতুল কিসমিল আরাবী** (লাহোর: পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, ২৫তম জনসংখ্যা, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ১৪০।

৪০. ড. হামিদ আশরাফ হামদানী, **আশ-শিরুল আরাবী ফী বাকিস্তান** (লাহোর, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ২৫১।

৪১. শায়খ আব্দুর রহমান মুহাম্মদ আহমাদ আল-আরীকালী, **দীওয়ান"আল-আরীকালিয়্যাত"** (কালিকোট, কেরালা, বাহজাত পাবলিশিং ক্র, রহমানিয়া, এ্যারাবিক কলেজ, আগস্ট ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৫-৭।

৪২. *তদেব*, পৃ. ৮-৯।

৪৩. শায়খ আব্দুর রহমান মুহাম্মদ আহমাদ আল-আরীকালী, মুকাদ্দামাতু **জাওয়াহিরিল মুনাযযাম**, (কালিকোট, দারুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৩।

৪৪. **দীওয়ান আল-আরীকালিয়্যাত**, পৃ. ১০।

৪৫. শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক **বুখারী শরীফ** (ঢাকা: রশিদিয়া লাইব্রেরী, ২০০২ খ্রি.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩-১০।

৪৬. **মাজাল্লাতুদ দিরাসাতিল আরাবিয়্যা**, পৃ. ১২।

৪৭. **রায়হানাতুর শির ওয়াশ শু'আরা**, পৃ. ৩৫৪।

৪৮. **মাজাল্লাতুদ দিরাসাতিল আরাবিয়্যা**, পৃ. ১৩।

৪৯. তদেব, পৃ. ১৪।

৫০. তদেব ।

৫১. তদেব ।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

ইবন ‘আব্দ রাব্বিহ ও তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু
(Ibn 'Abd Rabbih and The Subject of his Poetry)

মোঃ বাশিরুল্লাহ[*]

Abstract: Ibn 'Abd Rabbih (860-940 AD) is a shining star in the history of Arabic literature in Muslim Spain. He was both a poet and a writer. He was born in 860 AD in the capital of Spain, Cordova. At a young age, he acquired skills in various branches of knowledge and science. As his father was an employee of the palace, he also made his place in the palace. There he composed numerous poems in praise of various caliphs, emirs and nobles from the reign of Muhammad ibn Abdur Rahman (823-886 AD) fifth caliph of Umayyad era in Spain to the reign of Caliph Abdur Rahman An-Nasir (891-961 AD) eighth caliph of Umayyad era in Spain. But he showed more creativity in the love poems written in his youth. Later, in his old age, he composed several Sufi devotional poems. He named that al-mumahhisat, poems that expiate sins. A 23-volume diwan was compiled on his poems in contemporary times. Al Humaidi (1029-1095 AS) found more than 20 volumes of these. Later it was lost to time due to lack of proper preservation. Ibn Abd Rabbih also left behind a large collection of his poetry. Dr. Muhammad At-Tunji and Dr. Ridwan Ad-daya compiled two diwan of Ibn `Abd Rabbih’s poems separately. Studying his Diwan, we find the following topics in his poetry: Love poem (الغزل), appreciative poem (المديح), slanderous poem (الهجاء), mourning poem (الرثاء), mysterious poem (الزهد), poems about drinking (الخمريات), descriptive poem (الوصف), glorious poem (الفخريات) etc. Ibn `Abd Rabbih made outstanding contribution to Arabic literature.

ভূমিকা

মুসলিম স্পেনের আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে ইবন ‘আব্দ রাব্বিহ এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি একাধারে কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তৎকালীন স্পেনের রাজধানী কর্ডোভায় ৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দক্ষতা অর্জন করেন। তার পিতা রাজপ্রাসাদের কর্মচারী হওয়ার সুবাদে তিনিও রাজপ্রাসাদে নিজের জায়গা করে নেন। সেখানে তিনি প্রথম মোহাম্মদ (মৃ. ৮৮৬ খ্রি.) এর শাসনকাল হতে খলিফা আন-নাসির (মৃ. ৯৬১ খ্রি.) এর শাসনকালের মধ্যবর্তী বিভিন্ন খলিফা, আমির ও রাজন্যবর্গের প্রশংসায় অসংখ্য কবিতা রচনা করেন। কিন্তু তাঁর যৌবনকালে লিখিত প্রেমমূলক কবিতায় তিনি অধিকতর সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তীতে বৃদ্ধকালে সুফি সাধনামূলক বেশ কিছু কবিতা রচনা করেন। তিনি সেগুলোর নামকরণ করেন আল মুমাহহিসাত তথা পাপ মোচনকারী কবিতাসমূহ। সমসাময়িককালে তাঁর কবিতামালা নিয়ে ২৩ খণ্ডের একটি দিওয়ান সংকলিত হয়েছিল। আল হুমায়দির (মৃ. ১০৯৫ খ্রি.) বর্ণনামতে- কবির এ বিশাল কাব্যভাণ্ডার যথাযথ সংরক্ষণ হয়নি। ইবন ‘আব্দ রাব্বিহ এর বিশাল কাব্যভাণ্ডার থেকে যা বর্তমানে পাওয়া যায় তার সংখ্যাও কম নয়। কবির রচিত প্রাপ্ত কবিতাগুলো নিয়ে আধুনিক কালে এসে ড. মুহাম্মদ আত-তুনজী ও ড. রিদওয়ান আদ-দায়া স্বতন্ত্র দুটি দীওয়ান সংকলন করেন। দীওয়ান দুটিতে বিষয়ভিত্তিক ও কবিতার কাওয়াফী অনুসারে সন্নিবেশিত করা হয়। ইবন ‘আব্দ

[*] এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

রাব্বিহ আরবি কাব্য সাহিত্যে অসামান্য অবদান রাখেন। তাঁর অসাধারণ অবদান আরবি সাহিত্যকে বহু গুণে সমৃদ্ধ করেছে।

ইবন 'আব্দ রাব্বিহ এর জীবন পরিক্রমা

নাম ও পরিচয়

ইবন 'আব্দ রাব্বিহ-এর প্রকৃত নাম আহমদ। পিতার নাম মোহাম্মদ ও দাদার নাম 'আব্দ রাব্বিহ।[১] তাঁর নসব নামা হলো- আবু উমর আহমদ ইবন মোহাম্মদ ইবন 'আব্দ রাব্বিহ ইবন হাবিব ইবন হুদাইর ইবন সালিম।[২] তার উপাধি শিহাব উদ্দিন ও কুনিয়াত আবু উমর। দাদার নাম অনুসারে তিনি সমাধিক পরিচিতি লাভ করেন।[৩] মুসলিম স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা নগরীতে জন্ম বলে তিনি আল কুর্তুবি নামেও পরিচিত। তার দাদা ছিলেন স্পেনের দ্বিতীয় উমাইয়া খলিফা হিশাম ইবন 'আব্দুর রহমান আদ্ দাখিল এর দাস।[৪]

জন্ম ও শৈশব

তিনি ১০ই রমজান, ২৪৬ হি. মোতাবেক ২৯ শে নভেম্বর, ৮৬০ খ্রিস্টাব্দে কর্ডোভায় জন্ম গ্রহণ করেন[৫] এবং ওখানেই বেড়ে ওঠেন। শৈশবের প্রথম দিকে তিনি দারিদ্রতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিলেন। কিন্তু পরে পিতার কল্যাণে রাজদরবারে প্রবেশের সুযোগ পান। যার ফলে যুবরাজ, রাজ পরিবার, আমির-উমারা, সেনাপতিসহ বিভিন্ন রাজন্যবর্গের দরজা তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। অতপর তিনি তাদের দরবারে গমন করে নিজের জন্য একটি সম্মানের জায়গা তৈরী করে নেন।[৬]

শিক্ষা জীবন

ছোটবেলা থেকেই ইবন 'আব্দ রাব্বিহ জ্ঞান অর্জনের প্রতি অধিক আগ্রহী ছিলেন।[৭] প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি চিকিৎসা ও সংগীত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর তৎকালীন কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকগণের কাছ থেকে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন - কর্ডোভার প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ বাকি ইবন মাখলাদ (৮১৭- ৮৮৯ খ্রি.), বিখ্যাত হাদীস বিশারদ ইবন ওয়াদ্দাহ (মৃ. ৮৯৯ খ্রি.) এবং প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ 'আব্দুস সালাম (মৃ. ৮৯৯ খ্রি.) । তিনি তাদের থেকে ফিকহশাস্ত্র, হাদিসশাস্ত্র, ভাষা, ইতিহাস ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা, স্পেনের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন।[৮] তৎকালীন মুসলিম স্পেনের জনগণ আরবী ভাষা ও সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছিলেন। ফলে তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতির মূল উৎস ছিল আরবদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। সুতরাং ইবন 'আব্দ রাব্বিহ আরবদের ইতিহাস অধ্যয়নের প্রতি আকৃষ্ট হন। আরবদের প্রাচীন ইতিহাস থেকে শুরু করে সমকালীন ইতিহাসের গ্রন্থগুলো অল্প সময়ের মধ্যেই পড়ে ফেলেন। অতঃপর হজ পালন এবং আরবের আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি আরব অঞ্চল ভ্রমণ করেন।[৯] তিনি আরবের পবিত্র ঐতিহাসিক স্থানসমূহও ভ্রমণ করেন এবং আরবের কবি, সাহিত্যিক ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গের সাহচর্য ও সান্নিধ্য লাভ করেন। এ থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতার একটি সুন্দর বিবরণী তিনি তার রচিত আল ইকদুল ফারীদ গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন।[১০] আরবের ইতিহাস বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে তিনি অনেক আরবী কবিতা ও দীওয়ান মুখস্ত করেন এবং আরবী গদ্যের প্রায় সকল শাখা যেমন- আমছাল (الامثال), হিকাম (الحكم), সাজা (السجع), মাকামা (المقامة), খুতবা (الخطبة), রাসায়িল (الرسائل), কাওয়ায়েদ (القواعد) প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন।

ইবন 'আব্দ রাব্বিহ এর কর্মজীবন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। যৌবনে তিনি মদ্য পান ও সঙ্গীতে আসক্ত, ভোগবিলাসে মত্ত কর্মহীন যুবক ছিলেন।[১১] জীবিকার তাগিদে পরে বাবার হাত ধরে রাজ দরবারে গমন করেন। আমির মোহাম্মদ, তাঁর পুত্র মুনযির ও 'আব্দুল্লাহ এবং খলিফা 'আব্দুর রহমান আন

নাসিরের দরবারে তাঁদের প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করে পর্যাপ্ত সম্পদ উপার্জন করেন।[১২] মূলত সাহিত্যচর্চা করে তা থেকে উপার্জন করাই ছিল তাঁর পেশা। শেষ পর্যায়ে এসে এই সাহিত্যিক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে চলাচলের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন।[১৩] দীর্ঘদিন দুর্বিষহ কষ্ট ভোগ করে ১৮-ই জমাদিউল উলা ৩২৮ হি. মোতাবেক ৯৪০ খ্রি. ৩০ শে মার্চ কর্ডোভায় মৃত্যুবরণ করেন।[১৪]

আরবী কাব্য সাহিত্যে ইবন 'আব্দ রাব্বি এর অবদান

ইবন 'আব্দ রাব্বিহ আরবী সাহিত্যের প্রধান দুটি শাখা তথা গদ্য ও পদ্য উভয় শাখাতেই অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। তবে তৎকালীন স্পেন ও আরবের সাহিত্য জগতে তিনি একজন স্বনামধন্য কবি হিসেবেই বেশি পরিচিতি পেয়েছিলেন। আরবী কাব্য সাহিত্যে তিনি বিশাল ভাণ্ডার রেখে গেছেন। সাহিত্য জীবনের প্রথম দিকে তিনি প্রেম ও প্রণয়মূলক কবিতাই বেশি রচনা করেন। অতঃপর তিনি প্রথম মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দুর রহমানের শাসনকাল হতে খলিফা 'আব্দুর রহমান আন নাসিরের শাসনকালের মধ্যবর্তী মারওয়ানি বংশের শাসক, আমির-উমারা, রাজন্যবর্গ ও সেনাপতিদের প্রশংসা মূলক কবিতা রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। পরবর্তীকালে বৃদ্ধ বয়সে তিনি বেশ কিছু সুফি সাধনামূলক বা মরমী কবিতা রচনা করেন। এগুলোকে তিনি আল মুমাহহিসাত তথা পাপমোচনকারী কবিতা হিসেবে নামকরণ করেন। এছাড়াও তিনি শোঁকগাথা, বীরত্বগাথা ও মুওয়াশশাহাত তথা নীতি কবিতা রচনা করেন। খলিফা আল হাকাম আল মনসুরের খিলাফত কালে (৯৬১ - ৯৭৬ খ্রি.) তাঁর নির্দেশে ইবন 'আব্দ রাব্বিহ এর কবিতাসমূহ নিয়ে ২৩ খন্ডের একটি দীওয়ান সংকলন করা হয়। খলিফা আন নাসির-এর নিকট তাঁর প্রচুর কাব্য রচনাবলি সংগৃহীত ছিল। আল হুমায়দি তাঁর দীওয়ানের ২০ খণ্ডেরও বেশি দেখতে পেয়েছিলেন। যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে তাঁর এই দীওয়ানটি কালের গর্ভে হারিয়ে যায়।[১৫] বর্তমানে কবির সেই দীওয়ানটি পাওয়া না গেলেও তাঁর রচিত আল 'ইকদুল ফারীদ, আছ-ছা'আলাবির ইয়াতিমাতুদ দাহার, ইবন হাইয়ানের আল-মুকতাবিস এবং ইবন দিহইয়ার আল মুতরিবসহ বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর বেশ কিছু দীর্ঘ ও খণ্ড কবিতা পাওয়া যায়। বর্তমানে ড. মুহাম্মদ আত-তুনজী ও ড. রিদওয়ান আদ-দায়া কর্তৃক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষনকৃত তাঁর কবিতার দু'টি দীওয়ান পাওয়া যায়। তাঁরা উভয়েই কাফিয়া, বাহর এবং বিষয়বস্তুর আঙ্গিকে কবির কবিতাগুলো সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করেছেন।

ইবন 'আব্দ রাব্বিহ এর কবিতার বিষয়বস্তু

ইবন 'আব্দ রাব্বিহ বিশাল কাব্য ভাণ্ডার রেখে গেছেন। তাঁর রচিত প্রাপ্ত কবিতা গুলো নিয়ে আধুনিক কালে এসে ড. মুহাম্মদ আত-তুনজী ও ড. রিদওয়ান আদ-দায়া স্বতন্ত্র দুটি দীওয়ান সংকলন করেন। ড. মুহাম্মদ আত-তুনজী ديوان ابن عبد ربه الاندلسي مع دراسة لحياته وشعره নামে একটি দীওয়ান সংকলন করেন। এতে তিনি বিভিন্ন বাহার ও কাফিয়ায় রচিত ছোট-বড় মোট ২৯৭ টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং রাযায ছন্দে রচিত الارجوزة العروضية ও الارجوزة التارخية নামে আরো প্রায় ৪২টি দীর্ঘ কবিতা সংকলন করেছেন। অপর দিকে দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. রেদওয়ান আদ্-দায়া ২৮৭ পৃষ্ঠার একটি আলাদা দীওয়ান সংকলন করেছেন। যা ديوان ابن عبد ربه নামে পরিচিত। তিনি এতে মোট ২৮৩ টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত করেছেন। উক্ত দীওয়ানে সংকলক কবির কবিতাসমূহকে বাহর অনুযায়ী নিম্ন বর্নিত বিষয় সমূহে বিন্যস্ত করেছেন। ইবন 'আব্দ রাব্বিহ কবিতার বিষয়বস্তু হল- প্রশংসামূলক, শোকগাথা, প্রেমগাথা, নিন্দামূলক, মরমীবাদ, মদ্যপান, বর্ণনামূলক, গৌরবগাথা প্রভৃতি।

প্রশংসা গাথা (المديح)

المديح এর শাব্দিক অর্থ হলো প্রশংসা, পুরস্কার, বা স্তুতিমূলক সাহিত্য। কারো উত্তম গুনাবলি যেমন-বুদ্ধিমত্বা, সততা, ন্যায়পরায়নতা, দানশীলতা, বীরত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও সুন্দর বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করে তাঁর প্রশংসা কীর্তন করাকে المديح বা প্রশংসামূলক কবিতা বলা হয়।[১৬] প্রশংসা মূলক কবিতা রচনায় ইবন 'আব্দ রাব্বিহ বেশ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। খলিফা 'আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ আন নাসির যখন সিংহাসনে আরোহন করেন, তখন কবি তাঁর প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। কবি তাঁর প্রশংসায় বলেন-[১৭]

والملك غض جديدا * بدا الهلال جديدا

ان كان فيك مزيد * يا نعمة الله زيدي

[রাজ্য নতুন ভাবে সজীবতা পেল এবং নব চন্দ্রের সূচনা হল ।

হে আল্লাহর নেয়ামত, যদি তোমার মাঝে আরো নেয়ামত থেকে থাকে, তাহলে তুমি তা বাড়িয়ে দাও।]

খলিফা 'আব্দুর রহমান আন-নাসির (মৃ. ৯৬১ খ্রি.) ছিলেন স্পেনে উমাইয়া খেলাফতের অধীনে কর্ডোভার প্রথম খলিফা। কবি ইবন 'আব্দ রাব্বিহ এক সময় খলিফা আন-নাসিরের সান্নিধ্যে যান ও তাঁর স্নেহ ভাজন হয়ে ওঠেন। কবি তাঁর প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। তিনি বলেন-[১৮]

اقول في ايام خير الناس * ومن تحلي بالندى والبأس

ومن أباد الكفر والنفاقا * وشرد الفتنه والشقاقا

ونحن في حنادس كالليل * وفتنة مثل غثاء السيل

حتى تولى عابد الرحمن * ذاك الأغر من بني مروان

[আমি মানুষের কল্যাণের সময় বলি- কে দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত?

কে কুফর ও কপটতা লালন করে? কে ঝগড়া ও বিশৃঙ্খলা বিতাড়িত করে?

বরং আমরা তো রাতের আঁধারের মত প্রবাহমান ফিতনার আবর্জনায় ডুবে আছি।

যতক্ষণ না আল্লাহর বান্দা (আন-নাসির) বনূ মারওয়ানের ধোঁকা থেকে ফিরে আসে।]

কবি ইবন 'আব্দ রাব্বিহ খলিফা আন-নাসিরের সময়ের বিদ্রোহ দমন ও বীরত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন-[১৯]

في غزوة مائتا حصن ظفرت بها * في كل حصن غواة للعناجيج

ما كان ملك سليمان ليدركها * والمبتني سدّ يأجوج ومأجوج!

[যুদ্ধে শত শত দূর্গ তুমি জয় করেছ, যে সকল দূর্গ ছিল আবদ্ধ ঘোড়ার আতুড় ঘর তথা যেখানে সদা পাপ, অন্যায় ও বিদ্রোহমূলক কাজ চলতো।

যা বাদশা সোলায়মানও পায়নি। আর ইয়াজুজ মাজুজের ঘরের দরজাও বন্ধ করেছে।]

শোকগাথা (الرثاء)

رثاء শব্দটি ر ث و মূল ধাতু থেকে نصر ينصر এর মাসদার। অর্থ হল বিলাপ করা, আক্ষেপ করা, শোক প্রকাশ করা, শোকসূচক কবিতা, শোকগাথা।[২০] পরিভাষায় কারো মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে তার গুণাবলী তুলে ধরে কবিতা রচনা করাকে الرثاء বলে। জাহেলী যুগে সাধারণত কবিগণ যুদ্ধ-বিগ্রহে নিহত আপনজনদের উদ্দেশ্যে শোকগাথা রচনা করতেন। কিন্তু আধুনিক যুগের কবিগণ তাদের শিক্ষাগুরু, ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মৃত্যুতে الرثاء রচনা করেন। কবি ইবন 'আব্দ রাব্বিহ এর কবিতার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে শোকগাথা। নিজ সন্তান, খলিফা ও তাঁদের সন্তান ও সেনাপতিদের মৃত্যুতে الرثاء রচনা করেন। কবি নিজ সন্তানের মৃত্যুতে কাতর হয়ে বলেন-[২১]

وا كبدا قد تتقطعت كبدي * قد حرقتها لواعج الكمد

ما مات حبي لميت اسفا * اعذر من والد على ولد

[হে আমার কলিজার টুকরা সন্তান, আমার হৃদয় টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। বিষন্নতার দহনে তা দগ্ধীভুত হয়েছে।

কোন মৃত ব্যক্তির জন্য অনুতাপের কারণে আমার ভালবাসার মৃত্যু হয়নি । বরং পিতার পক্ষ থেকে পুত্রের জন্য আবেগ প্রকাশ করছি।]

প্রেমগাথা (الغزل)

غزل এর শাব্দিক অর্থ হলো-প্রেমগাথা, প্রেমকরা, প্রেমালাপ ইত্যাদি। প্রেমিকার প্রতি আসক্ত হয়ে কবি যা রচনা করতেন, সেগুলোকে প্রেমগাঁথা বা الغزل বলা হয়।[২২]

ইবন 'আব্দ রাব্বিহ কবিতার মাধ্যমে তাঁর মনের আবেগ, অনুভূতি, সততা, সৌন্দর্য ও চঞ্চলতা সব কিছু প্রকাশ করেছেন।[২৩]

ايها البدر الذي ضنّ * علينا بالطلوع

أبغ لي عندك قلبا * طار من بين ضلوعي

يا بديع الحسن كم لي * فيك من وجد بديع.

[হে পূর্ণিমার চাঁদ, যা আমাদের উপর উদিত হতে কৃপণতা করছে।

তোমার কাছে আমি আমার হৃদয়টা দিতে চাইলাম। যা আমার পাঁজর (দেহ) থেকে তোমার কাছে উড়ে গেছে।

হে অভিনব সৌন্দর্যের অধিকারী, তোমার মাঝে কতইনা অভিনয় ও ভালবাসা আমি দেখেছি ।]

তিনি আরো বলেন: [২৪]

أَنْتِ دَائي وَفي يَدَيْكِ دَوَائي * يَا شِفائي مِنَ الجَوى وَبَلائي

إِنَّ قلبي يُحِبُّ مِنْ لا أُسَمِّي * في عَنَاءٍ أَعْظِمْ بِهِ مِنْ عَناءِ

كَيْفَ لا كَيْفَ أَنْ أَلذَّ بِعَيْشٍ * مَاتَ صبري بهِ ومَاتَ عَزَائي

[তুমিই আমার রুগ্নতা, আর তোমার হাতেই রয়েছে আমার চিকিত্সা। হে আমার যন্ত্রনা কষ্টের আরোগ্যকারী।

আমার অন্তর তাকেই ভালবাসবে, শত কষ্ট ও বেদনার মধ্যেও আমি যার নাম উল্লেখ করিনা। প্রেমের বেদনা কতইনা কষ্টের!

কিভাবে সম্ভব? কিভাবে জীবন উপভোগ করা যায়? এতে (কষ্টে) আমার ধৈর্যও মারা গেছে, আমার সান্ত্বনাও শেষ হয়ে গেছে।]

নিন্দামূলক কবিতা (الهجاء)

هجاء শব্দটি مديح এর বিপরীত। **هجاء** এর অর্থ হলো-নিন্দা, বিদ্রুপ, কুৎসা রচনা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, বা কারো প্রশংসনীয় গুণাবলীকে খণ্ডন করে তদস্থলে অমর্যাদাকর দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করে রচিত কবিতাকে الهجاء বা ব্যঙ্গ সাহিত্য বলে।[২৫] ইবন 'আব্দ রাব্বিহ তাঁর কবিতার মাধ্যমে সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন। যখন একজন কৃপণকে ব্যঙ্গ করতে চাইতেন, তখন তা উল্লেখ করে তিনি সমাজের অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যতা তুলে ধরতে দ্বীধা করতেন না। তিনি কৃপণ ব্যক্তির কৃপণতার প্রতি ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপাত্বক বক্তব্য কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেন।[২৬]

طعام من ليست له ذاكراً * دق كما دق بأن يذكرا

لا يفطر الصائم من أكله * ولكنه صوم لمن أفطرا

في وجهه من لؤمه شاهد * يكفي به الشاهد أن يخبرا

[এমন খাবারকে (কৃপণের) আমি খাবার হিসেবেই গণ্য করি না। আর তা আমার মনে তেমন করাঘাত করে না। যেমন করাঘাতে কোন বিষয়ের স্মরণ করা যায়।

রোজাদার তার (কৃপনের) খাবার থেকে ইফতার করেনা। অথচ যে ইফতার করায়, 'তা তার জন্য রোজা (রোজা রাখার সমপরিমান সওয়াব)।

তার (কৃপণের) চেহারায় স্পষ্ট ভৎসনার চিহ্নই যথেষ্ট যে, তাকে প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তি তার সম্পর্কে কৃপণতার সংবাদ দিবে।]

মদ্যপান বিষয়ক কবিতা (الخمريات)

الخمريات শব্দটি خمر এর বহুবচন। خمر অর্থ : আচ্ছন্নকরা, ঢেকে ফেলা, মাদকতা সৃষ্টি করা, মদ ইত্যাদি। পরিভাষায় মদপান ও মদের প্রশংসায় রচিত কবিতাসমূহকে الخمريات বলা হয়।[২৭] ইবন 'আব্দ রাব্বিহ্ এর অনেক কবিতায় মদ ও মদপান সংক্রান্ত বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি মদ বিষয়ে কবিতা রচনা করে বলেন, [২৮]

وحامِلَةٍ راحَاً على راحَةِ اليَدِ * مُوَرَّدةٍ تَسْعَى بِلَوْنٍ مُوَرَّدِ

متَى ما تَرَى الإِبْرِيقَ لِلْكأسِ راكِعاً * تصلي لَهُ مِنْ غَيْرِ طُهْرٍ وَتَسجُدِ

[সে (সেবিকা) হাতের তালুতে তার মদ মদ্যপায়ীর নিকট মোহনীয় ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করে।

তুমি যখন মদের পিয়ালায় মদ ঢালতে দেখবে, তখন তুমি তার জন্য অযুহীন অবস্থায়ও নামায ও সেজদা করতে উদ্যত হবে। তথা- মদ পানের জন্য উতলা হয়ে যাবে।]

দুনিয়া বিমুখতা ও মরমীবাদ (الزهد)

الزهد এর শাব্দিক অর্থ হলো: বিরত থাকা, ত্যাগ করা, উদাসীন থাকা, তাপস হওয়া, সংসার ত্যাগী হওয়া, দরবেশ হওয়া প্রভৃতি।[২৯] পরিভাষায়- দুনিয়া বিমুখতা, পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ ত্যাগ করে আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হওয়ার দিকে আহবান করে রচিত কবিতাকে الزهد বলে। কবি মরমীবাদ বিষয়ে কবিতা রচনা করে বলেন,[৩০]

يا وَيلتا مِنْ مَوْقفٍ ما بهِ * أَخْوفُ مِنْ أَنْ يعدِلَ الحاكمُ

أبارزُ اللهَ بعِصيانِهِ * وليسَ لي من دُونِهِ راحِم

يا ربِّ غُفرانَك عن مُذنبٍ * أسرفَ إلا أَنَّهُ نادِمُ

[হায়! আমি আমার পাথেয় নিয়ে বিচারকের ন্যায় বিচারের সামনে উপস্থিত হতে ভীত সন্ত্রস্ত।

আমার পাপ নিয়ে আমাকে আল্লাহর মুখোমোখী হতে হবে, অথচ তিনি ছাড়া কোন অনুগ্রহকারী নেই। হে রব; আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিন, নতুবা আমাকে লজ্জিত হতে হবে।]

বর্ণনামূলক কবিতা (الوصف)

الوصف শব্দটি বাবে ضرب - يضرب এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো: গুণ, বর্ণনা, ইত্যাদি।[৩১] পরিভাষায় এমন বর্ণনা যা কারো মধ্যে রয়েছে এমন গুণ বর্ণনা কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা। স্পেনের প্রাকৃতিক মনোরম চিত্রাকর্ষক দৃশ্যগুলো কবির হৃদয়ে দারুন প্রভাব ফেলেছিল । ফলে তিনি অনেক কবিতায় বিভিন্ন উদ্যানের সৌন্দর্য ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্যগুলো আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরেছেন। একটি কবিতায় কবি বলেন-[৩২]

وروضة عقدت أيدي الربيع بها * نورا بنور وتزويجا بتزويج
بملقح من سواريها وملقحة * وناتج من غواديها ومنتوج

[বসন্তকালে বাগানের সৌন্দর্য্য আমার হাতকে আবদ্ধ তথা বিমোহিত করেছে, যেখানে গাছে গাছে মুকুল একটি অন্যটি সাথে লেগে রয়েছে এবং ফুল-ফল একে অপরের সাথে জড়ো হয়ে আছে।

রাত্রীকালীন বৃষ্টি বর্ষণ যাকে উর্বর করেছে এবং অবিরাম বারী বর্ষণ যাকে ফুলে ফলে সজীবতা দান করেছে।]

গৌরবগাথা (الفخريات)

الفخريات শব্দটি الفخرية এর বহুবচন। এটি فتح يفتح এর মাসদার। এর আরবি প্রতি শব্দ হল: التكبر। শাব্দিক অর্থ- যশ, গৌরব, দাম্ভিকতা বর্ণনা করা। পরিভাষায়- কোন ব্যক্তি বা তার বংশের গুণাবলী, শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা প্রভৃতির বর্ণনা দিয়ে রচিত কবিতাকে الفخريات বলে।[৩৩] কবি ইবন 'আব্দ রাব্বিহ তাঁর কবিতা নিয়ে গর্ব করে বলেন-[৩৪]

هنا تفنى قوافي الشعر في هذا الروي

قواف ألبست خليا من الحسن البدي

تعالت عن جرير بل زهير بل عدي

এই বর্ণনায় এখানে কবিতার অন্তমিল শেষ হয়ে গিয়েছে। (চুড়ান্ত অন্তমিল হয়েছে) এমন অন্তমিল, যেন সৌন্দর্যে অলংকার পড়িয়ে দিয়েছে!

(আমার কবিতার ছন্দমিল) এত সুউচ্চ জারিরের চেয়েও, না বরং যুহাইর, না বরং আদীর কবিতার চেয়েও।

মুমাহহিসাত (الممحصات)

মুমাহহিসাত হলো পাপমোচনকারী কবিতামালা। কবি মুমাহহিসাত কবিতা দ্বারা তাঁর যৌবন কালের বিশৃংখল ও লাগামহীন জীবনের অনুশোচনা করেন। এ জাতীয় কবিতা দ্বারা কবি অতীতের নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য তওবা ও ইস্তিগফার করেন। এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমার আশা করেন। তিনি মুমাহহিসাত রচনা করে বলেন,[৩৫]

يا قادرا ليس يعفو حين يقتدر * ولايقضى له من عيشة وطر

عاين بقلبك إن العين غافلة * عن الحقيقة واعلم انها سقر

[হে সক্ষম ব্যক্তি, সক্ষমতার সময় তার মধ্যে ক্ষমার গুণ ছিল না। জীবনকে সে ক্ষমার জন্য পরিচালিত করেনি এবং তার পিছনেও ছুটেনি।

মনের চোখ দিয়ে দেখ। (কেননা) বাস্তবতা সম্পর্কে চর্ম চক্ষু তো উদাসীন। আর উহা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।]

ইবন 'আব্দ রব্বিহ এর কাব্য প্রতিভা

কবি ইবন আবদ রাব্বিহ তাঁর কবিতা সমূহে যে আবেগ অনুভূতি ও কল্পনার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, তা সহজেই পাঠকের হৃদয়ে স্পর্শ করেছে । তাঁর কবিতার বর্ণনা, সংলাপ এবং ভাষা ছিল সহজ সাবলিল ও সমাজে প্রচলিত। সাধারণত তিনি কবিতার শব্দ চয়নে কঠিন ও দুর্বোধ্যতা এড়িয়ে চলেছেন। তাঁর কবিতায় উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহারে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। যেমন একটি কবিতায় প্রেয়সীর বিচ্ছেদ বেদনায় কাঁতর হয়ে কবি বলেন,[৩৬]

ودَّعتَني بزَفرةٍ واعْتِناقِ * ثم نادَتْ متى يكونُ التَّلاقي

وتصَدَّتْ فأشرقَ الصبحُ مِنها * بينَ تلكَ الجيوبِ والأطواقِ

[উষ্ণ নিঃশ্বাস ও আলিঙ্গনের মাধ্যমে সে (প্রেমিকা) আমাকে বিদায় জানিয়ে প্রশ্ন করল, আবার কবে দেখা হবে? সে হতাশা ও আশার মাঝে নব সূর্যের মত উদ্ভাসিত হল।]

এখানে কবি প্রেয়সীর চেহারার আলোকে প্রভাতের সূর্যের আলোর সাথে তুলনা করেছেন।

উপসংহার

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এ মহান সাহিত্যিক আরবি গদ্য-পদ্য উভয় সাহিত্যেই তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশেষ করে আরবি কাব্য সাহিত্যে অসামান্য অবদান রাখার কারণে সাহিত্য জগতে তিনি কবি হিসেবেই বেশি পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর কাব্যে বাক্য বিন্যাস, বর্ণনাভঙ্গি ও শব্দচয়নে অভিনবত্ব দেখা গেলেও বিষয়বস্ত সমূহ সমকালিন আরব কবিদের প্রায় অনুরুপ। ইবন 'আব্দ রাব্বিহ এর সাহিত্য প্রতিভার বিচ্ছুরণ স্পেন পেরিয়ে তৎকালীন প্রাচ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর অমর সাহিত্যকর্ম বর্তমানেও আরবি সাহিত্য প্রেমীদের আলোড়িত করে। বিশ্ব আরবি সাহিত্যে ইবন 'আব্দ রাব্বিহ এর অবদান চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

তথ্যনির্দেশ

১ ড. ইহসান আব্বাস, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী আসরু সিয়াদাতি কুরতুবা* (বৈরুত: দারুস সাকাফা, ১৯৬৯ খ্রি.), পৃ. ৪৬।
২ ডক্টর সামি আল আনি, *দিরাসাতু ফিল আদাবিল আন্দালুস* (বাগদাদ: আল মুস্তানসিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ২৬৫।
৩ *তদেব*।
৪ ড. মোহাম্মদ আত তুনজী, *দীওয়ানু ইবন 'আব্দ রাব্বিহ মা'আ হায়াতিহি ওয়া শি'রিহি* (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল আরাবী, ১৯৯৩ খ্রি.) পৃ. ১১।
৫ ড. আহমদ দাইফ, *বালাগাতুল আরাব ফিল আন্দালুস* (তিউনিসিয়া: দারুল মা'আরিফ লিত তবা'আতি ওয়া লিন নাশরি, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১০৭।
৬ ড. মোহাম্মদ রিদওয়ান দায়া, *ফিল আদাবিল আন্দালুসিয়া*, পৃ. ৩০০।
৭ *তদেব*।
৮ ওমর ফাররুখ, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালাইন, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ২১০।
৯ ড. সামী আল- আনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৬।
১০ ডক্টর আহমদ আমিন, *যহুরুল ইসলাম*, ৩য় খণ্ড (কায়রো: লাজনাতত তা'লি, ১৯৫৩ খ্রি.), পৃ. ৮৫।
১১ ইবন 'আব্দ রাব্বিহ, *আল 'ইকদুল ফারীদ*, ৫ম খণ্ড (বৈরত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১৩।
১২ আহমদ হায়কাল, *আল আদাবূল আন্দালুসি* (মিশর: দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), পৃ. ২২৪।
১৩ ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাতুল আইয়ান ওয়া আনবাইজ জামান*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারু সাদির, তা.বি.), পৃ. ১১০।
১৪ উমার ফাররুখ, *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১১।
১৫ আল হুমাইদী, *জুযওয়াতুল মুকতাবিস ফী যিকরি উলাতিল আন্দালুস* (মিশর: মাকতাবা'তুস সা'আদাহ, ১৯৫৩ খ্রি.), পৃ. ৯৪।
১৬ ড. ইবরাহিম আনিস ও অন্যান্য, আল মু'জামুল ওয়াসীত (দেওবন্দ: কুতুব খানা হুসাইনিয়াহ, ১৯৯৭খ্রি.) পৃ.৬৭৬; জাওয়াহিরুল আদাব, ২য় খন্ড, পৃ. ২৬।
১৭ ড. মুহাম্মদ আত-তুনজী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।
১৮ ড. সামী আল আনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৫।
১৯ ইবন 'আব্দ রাব্বিহ, *দীওয়ানু ইবন 'আব্দ রাব্বিহ* (দামেশক: দারুল ফিকর, তা.বি.), পৃ. ৪৬-৪৭।
২০ Hans wehr, A Dictionary of Modern written Arabic (New York: Spoken Language Services, Inc. 1976) p.326; লুইস মা'লুফ, আল মুনজিদ ফিল আদাবিল আরাবী ওয়া তারীখিহি, ১ম সংস্করণ (বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালাইন, ১৯৫৯খ্রি.) পৃ. ১২৮।
২১ ড. মুহাম্মদ আত-তুনজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৫।
২২ ইবন মনযুর, লিসানুল আরাব, ১১শ খন্ড (বৈরুত: দারুস সদর , তাবি) পৃ. ৪৯২।
২৩ ড. সামী আল আনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৫।
২৪ ড. মুহাম্মদ আত-তুনজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২-৪৩।
২৫ ড. মুহাম্মদ খলিফা, আর আদাব ওয়ান-নুসূস (কায়রো: আল ইহইয়া উল-'আম্মাতি লি শুউনিল মাতাবি'য়িল আমিরিয়্যাহ, ১৯১৪ খ্রি.) পৃ. ১৯
২৬ *তদেব*, পৃ. ২৭৭।
২৭ মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল আযহারী, আরবী-বাংলা অভিধান, ২য় খন্ড, পৃ. ১২৬৯; ড. ফজলুর রহমান, আল মু'জামুল ওয়াফী, ৪র্থ সংস্করণ (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৭ খ্রি.) পৃ. ৩৭৭-৩৭৮।
২৮ ড. মুহাম্মদ আত-তুনজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭।
২৯ আল মু'জামুল ওয়াফী, পৃ. ৪৪৬-৪৪৭।
৩০ মুহাম্মদ আত-তুনজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০।
৩১ আল মু'জামুল ওয়াসীত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩৬।
৩২ মুহাম্মদ আত-তুনজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯।
৩৩ তদেব, পৃ. ১১৫; আল মু'জামুল ওয়াফী, পৃ. ৬০৬।
৩৪ ড. মুহাম্মদ আত-তুনজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩।
৩৫ তদেব, পৃ. ৯১।
৩৬ তদেব, পৃ. ১২৫-১২৬।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

ইয়াহুদী ধর্ম ও বিশ্বাস : একটি পর্যালোচনা
(Religion of Jews and Beliefs : An Overview)

ড. এফ. এম. এ. এইচ. তাকী*

Abstract: Judaism is a great living religion of the world. The followers of Musa (am.) had named themselves as Yahud. They are called Yahud in Arabic language but in English their religion is famous as Judaism and the followers of this religion are renowned in the name of Jews. Though their thinking is to be the followers of Musa (am.) but ultimately they are the followers of Ibrahim (am.). So they have a long religious back-ground as well as they have a tragic history also. Many times they were attracted by the external-power and they were bound to leave own motherland. According to Belfour treaty they established a Jews state named Israel in 1947. Once upon a time they were suppressed by others and now a day they are oppressing others. Their religious beliefs some are positives and some are very negatives in consideration to Islamic view point. The aims of this article are to discuss their religion and beliefs.

ভূমিকা

বিশ্বের প্রচলিত প্রধান প্রধান ধর্মের অন্যতম ধর্ম হলো ইয়াহুদী ধর্ম। তারা জাতিগত ভাবে বনু ইসরাইল নামে পরিচিত। তারা মুসা আ. (Mose)-এর অনুসারী হলেও নিজেদেরকে ইবরাহীম আ. (Abraham)-এর ধর্মের অনুসারী মনে করে থাকে। তাদের ঈশ্বরের নাম জেহোভা। জেহোভার সঙ্গে মূসা আ. এর চুক্তি অনুযায়ী তারা প্রতিশ্রুত ভূমি জেরুজালেমে শান্তির আবাস গড়ে তোলার স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ে। মূসা আ. এর নেতৃত্বে তারা মিশরের বন্দি দসা থেকে মুক্ত হয়ে কেনানে ফিরে এসে তাবু জীবন যাপন অবলম্বন করে। ইউশা আ. এর নেতৃত্বে একের পর এক আঞ্চলিক বাদশাহদের পতন ঘটিয়ে প্রতিশ্রুত দেশ বিজিত হয় এবং দাউদ আ. এর সময় তারা জেরুজালেমে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে বার বার বহি:শত্রুর আক্রমণে তারা বিধ্বস্ত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৯৭ সালে জেনেভা চুক্তি ও ১৯১৮ সালে বেলফোর (Balfour) চুক্তি অনুযায়ী পশ্চিম জেরুজালেমে ইয়াহুদী বসতি গড়ে ওঠে। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করার পর তারা ১৯৬৭ সালে পশ্চিম জেরুজালেম দখল করে পাশ্ববর্তী অঞ্চলে সম্প্রসারণ নীতি অব্যাহত রাখে। তাদের ধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, উপদল ও বিশ্বাসসমূহ আলোচনা করা হলো।

ইয়াহুদী ধর্মের পরিচিতি

প্রলয়ঙ্কারী মহা প্লাবনের পর নূহ আ. তিন পুত্রকে তিনটি অঞ্চল চাষাবাদের জন্য বণ্টন করে দিয়েছিলেন। লোহিত সাগর থেকে ভূমধ্য সাগরের পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত (এশিয়া) সামকে, পশ্চিম-দক্ষিণাঞ্চল (আফ্রিকা) হামকে এবং ভূমধ্যসাগরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল (ইউরোপ) ইয়াফাসকে দেওয়া হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।[১] সাম সেমিটিক জাতি ও হাম হেমেটিক জাতির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়। অনুমান করা হয় আর্যরা ইয়াফাসের বংশধর। তারা প্রথমে পাশ্চাত্যের দেশ থেকে ইরানে এসে বসবাস শুরু করে পরে ভারতবর্ষে এসে তারা স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। মিশরে হেমিটিক সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। আর

* প্রফেসর (PRL), ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে সেমেটিক সভ্যতার ভাষা ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে। সামের বংশধরগণ বনু কাহতান, বনু ইবরাহীম, বনু ইসমা'ঈল ও বনু ইসরাঈল নামে ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ হয়ে আছে। হযরত ইবরাহীম আ., হযরত মূসা আ., হযরত দাউদ আ., হযরত 'ঈসা আ. ও হযরত মুহাম্মদ সা. এই প্রসিদ্ধ নবীগণ সেমেটিক ('আরব) বংশোদ্ভূত ছিলেন। সেমেটিকদের মধ্যে হিব্রু জাতির ইতিহাস ঐতিহ্যমণ্ডিত। নূহ আ.-এর পর সুপ্রসিদ্ধ নবী হলেন ইবরাহীম আ.। তাঁকে ইয়াহুদী জাতি, খ্রীস্টান জাতি ও মুসলিম জাতি অত্যন্ত সম্মান করে এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব ধর্মকে তাঁরই ধর্মের অনুসরণ বলে মনে করে। এ কারণেই আল-কুরআনে ঘোষণা হয়েছে যে, "ইবরাহীম ইয়াহুদীও ছিলেন না, খ্রীস্টানও ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন উত্তম মুসলমান।"[২]

ইবরাহীম আ. একেশ্বরবাদী ছিলেন। ইরাকের পূর্ব-দক্ষিণে কেনান (প্যালেস্টাইন) অঞ্চলের 'উর' প্রদেশে তাঁর জন্ম।[3] তাঁর ভাষা হিব্রু এবং এই ভাষাভাষী লোকেরা হিব্রু জাতি। ইবরাহীম আ.- এর দুই পুত্র ছিল ইসমা'ঈল (হাজেরার গর্ভজাত) ও ইসহাক (সারার গর্ভজাত)।[৪] ইসহাক আ.- এর পুত্র ই'য়াকুব (য্যাকব) তাঁর অন্য নাম ইসমা'ঈল। তাঁর বার পুত্র ছিল যারা ১২টি মতান্তরে ১০টি বংশ/গোত্রের সৃষ্টি করেছিলেন। ইতিহাসে এরাই ইসমা'ঈলের বংশধর বা বনী ইসরাঈল। তাদের ভাষা হিব্রু হওয়ায় এবং ধর্ম বিশ্বাস ইয়াহুদী হওয়ায় হিব্রু ও ইয়াহুদী সমর্থক হয়ে যায়। অর্থাৎ যারাই ইসরাঈলী তারাই হিব্রু তারাই ইয়াহুদী। জেরিমিয়ার নবুওয়াত কাল (খ্রী. পূ. ৬২৫-৫৮০) হতে ইয়াহুদী ধর্ম বিশ্বাসীদেরকে হিব্রু জাতি থেকে পৃথক করার জন্য Jew নামকরণ করা হয়।[৫] ইয়াহুদীদের ঈশ্বরের নাম যেহোভা (ইয়াহইয়া)।[৬] ওল্ড টেস্টামেন্টের সৃষ্টিতত্ত্বে উল্লেখ আছে, ইয়াহুদী জাতির আদি পিতা আব্রাম (ইবরাহীম আ.)। ঈশ্বর যেহোভার (ইয়াহুইয়া) সঙ্গে আব্রামের (ইবরাহীম) একটি পবিত্র চুক্তি হয়েছিল[7] (Jehova's Holy Covenant with Abraham) যার ধারাবাহিকতায় একেশ্বরবাদী ইয়াহুদী ধর্মের গোড়াপত্তন হয়।

ইবরাহীম আ.-এর জন্মস্থান ছিল অত্যাধিক মূর্তি পূজারী এলাকা দক্ষিণ ইরাকের 'উর' প্রদেশে। তাঁর একেশ্বরবাদিতার সঙ্গে মূর্তিপূজার ঘোর বৈপরীত্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কেনানে (প্যালেস্টাইন) তাঁর ও তাঁর বংশধরদের স্থায়ী আবাসভূমি এবং বন্ধ্যা স্ত্রীর (সারার) গর্ভে পুত্র ইসহাকের মাধ্যমে এক বিশাল গৌরবময় বংশধারার প্রতিশ্রুতি দেন। এই প্রতিশ্রুতির স্থায়ীত্বের নিদর্শন স্বরূপ আল্লাহ তাঁকে খাতনা সম্পন্ন করান এবং ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণকারী সকল পুত্র সন্তানদের জন্মের অষ্টম দিনে খাতনার বিধান দেন।[৮] ইবরাহীম আ.-এর স্ত্রী সারার গর্ভে কোন সন্তান লাভের আশা যখন অসম্ভব মনে হল তখন (বাইবেলের বর্ণনা মতে) সারার পিতা কর্তৃক প্রদত্ত মিশরীয় দাসী আগারকে (হাজেরা) সারার অনুমতিক্রমে বংশরক্ষার জন্য ইবরাহীম আ.- এর নিকট সমর্পণ করা হয়। ইবরাহীম আ.-এর ৮৬ বছর বয়সে হাজেরার গর্ভে ইসমা'ঈল আ.-এর জন্ম হয়।[৯] আল-কুরআনের বর্ণনা মতে আল্লাহর নির্দেশে এবং বাইবেলের বর্ণনা মতে সারার অসন্তুষ্টির কারণে ইবরাহীম আ. মা হাজেরা ও শিশু ইসমা'ঈলকে মক্কায় রেখে আসেন।[১০]

ইবরাহীম আ.-এর ১০০ বছর বয়সে এবং স্ত্রী সারার ৯০ বছর বয়সে আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইসহাক আ.-এর জন্ম হয়।[১১] ইসহাকের ঔরশে স্ত্রী রেবেকার গর্ভে -'এসু' ও য্যাকব (ই'য়াকুব) নামক জমজ পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। শিকার প্রিয় 'এসু' শিকারে গেলে য্যাকব (ই'য়াকুব) মৃত্যুপথযাত্রী পিতা ইসহাকের নিকট থেকে সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব নিজে কবজা করে নেন।[১২] 'এসু' ফিরে এসে ঘটনার জানাজানি হয়ে গেলে ই'য়াকুব আ. ভয়ে গৃহত্যাগ করে মেসোপটেমিয়ার 'হারান'-এ আশ্রয় গ্রহণ করেন। পথে 'ব্যাথল' নামক স্থানে তিনি প্রতিশ্রুত ভূমি কেনানে প্রত্যাবর্তন এবং বহু সন্তান-সন্তুতি লাভের প্রত্যাদেশ পান।[১৩]

ই'য়াকুব আ. 'হারান'-এ মামা লাবানের গৃহে অবস্থানকালে মামাতো বোন রাহিলের প্রেমে পড়েন। মামা নিজ গৃহে সাত বছর শ্রমের বিনিময়ে রাহিলকে ই'য়াকুব আ.-এর সঙ্গে বিয়ে দিতে সম্মত হন। কিন্তু সাত

বছর পর মামা প্রতারণা করে বড় মেয়ে লেয়াকে বিয়ে করতে বাধ্য করেন। পরে আরও সাত বছর শ্রমের বিনিময়ে তিনি রাহেলকে বিয়ে করতে সক্ষম হন। [১৪] পরে দুই স্ত্রী সন্তান-সন্ততি ও প্রচুর ধন-সম্পদসহ কেনানের পথে যাত্রা করেন। পথে এক স্বর্গীয় দূতের সঙ্গে তাঁর মল্লযুদ্ধ হয় এবং তাঁর নাম পরিবর্তন করে ইসরাঈল (আল্লাহর বান্দা) রাখা হয়।[১৫] ইসরাঈলের মোট ১৩ জন সন্তানের মধ্যে একজন কন্যা (নাম ডীনা) সন্তান ছিল। অবশিষ্ট ১২ জন পুত্র বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী ১০টি গোত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল; অন্য বর্ণনা অনুযায়ী ১২টি গোত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। এরাই ইতিহাসে বনি ইসরাঈল নামে খ্যাত।[১৬]

ইসরাঈল (ই'য়াকুব/য্যাকব) আ.-এর কনিষ্ঠ পুত্র ইউসুফ (যোসেফ) পিতার নিকট অত্যন্ত আদরের ছিলেন। তাই অপর ভাইয়েরা ঈর্ষান্বিত হয়ে কৌশলে তাঁকে ১৭ বছর বয়সে পিতার নিকট থেকে নিয়ে গিয়ে বণিকদের কাছে বিক্রি করে দেয় (কুরআনের বর্ণনা মতে তাঁকে কুপে ফেলে দেয়)। বণিকরা তাঁকে (উঠিয়ে) নিয়ে গিয়ে মিশরের বাদশার নিকট বিক্রি করে দেয়।[১৭] তিনি কর্মনিষ্ঠা ও সদাচারণ দ্বারা ফারাউ শাসক বর্গের আস্থাভাজন হন এবং রাজদরবারে উচ্চপদে সমাসীন হন। সে সময় কেনানে দীর্ঘস্থায়ী দূর্ভিক্ষ দেখা দিলে ইসরাঈল (ই'য়াকুব আ.) সন্তান-পরিজনসহ মিশরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইউসুফ আ. তাঁদেরকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং উর্বর কৃষি অঞ্চল 'গোশেনে' তাঁদের আবাসিকতা দান করেন। এখানে ১৭ বছর অবস্থানের পর ইসরাঈল (ই'য়াকুব আ.) ১৪৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[১৮]

ফারাউগণ হিব্রু বা ইসরাঈলীদেরকে বহিরাগত প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করত এবং তাদেরকে শ্রম দিতে বাধ্য করত।[১৯] মোটকথা তারা দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে পড়েছিল। এমন সময় খ্রী.পূ. চতুর্দশ শতকের শেষে মূসার (Mose/মশি) জন্ম হয় এবং সৌভাগ্যক্রমে ফেরা'উনের (দ্বিতীয় রামসেস) বাড়ীতেই লালিত পালিত হন। মূসা আ. এক মিশরীয়কে হত্যার কারণে হিজরত করে মাদায়েনে যান। সেখানে তাঁর সঙ্গে জেহোভার একটি চুক্তি হয় যে চুক্তি হয়েছিল ইবরাহীম, ইসহাক ও ই'য়াকুব আ.-এর সঙ্গে অর্থাৎ মিশর থেকে ইসরাঈলীদেরকে প্রতিশ্রুত কেনানে বের করে নিয়ে আসার জন্য।[২০] মূসা আ.-এর নেতৃত্বে ভ্রাতা হারুনের সহযোগিতায় ইসরাঈলীগণ ফেরা'উনের দাসত্ব মুক্ত হয়ে ইবরাহীম আ.-এর সঙ্গে কৃত জেহোভার প্রতিশ্রুত কেনান ভূমিতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ খুঁজতে থাকে। ফেরাউ'নের প্রথম পুত্রের অকাল মৃত্যুতে রাজা একসময় ইসরাঈলীদের প্রতি কিছুটা নমনীয় হয়ে পড়েন এবং তাদের প্রতি আরোপিত চলাচল বিধি শিথিল করার সুবাদে অনেক চেষ্টা করে মূসা, হারুন আ. ও বোন মিরিয়াম (মরিয়ম) এর নেতৃত্বে বনি ইসরাঈলগণ তাদের সব কিছু নিয়ে লোহিত সাগর তীরে পৌঁছে যায়। অন্যদিকে ফেরা'উনের সৈন্যবাহিনী তাদেরকে ঘিরে ফেলে। এমন সময় জেহোভার নির্দেশে মূসা আ. লাঠি সাগরে ফেলে দিলে পানি দ্বিখণ্ডিত হয়ে শুষ্ক রাস্তা তৈরি হয়। সেই পথে ইসরাঈলীগণ সাগর অতিক্রম করে সিনাই অঞ্চলের দিকে ধাবিত হন। কিন্তু ফেরা'উন সদলবলে সেই পথে অগ্রসর হলে মধ্যসাগরে তাদের সলীল সমাধী হয়।[২১]

সে সময় প্রতিশ্রুত কেনান ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ মূর্তিপূজক আঞ্চলিক বাদশাহের অধীনে ই'য়াকুব আ.-এর স্ব জাতীয় লোকেরা বাস করত। তারা অত্যন্ত প্রভাবশালী হওয়ায় বহিরাগত বনি ইসরাঈলীদেরকে গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে ৪০ বছর ধরে তারা সিনাই মরু অঞ্চলে যাযাবর বা তাবু জীবন যাপন করে। তিনি ৪০ বছর ধরে কেনানে প্রবেশের জন্য তাদেরকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। তারা কেনানের আঞ্চলিক শাসকদের সঙ্গে প্রতিরোধ মোকাবেলার জন্য কখনই সম্মতি দেয়নি। [২২] এ কারণে মূসা আ. স্ব জাতিদেরকে নিয়ে প্রতিশ্রুত কেনানে প্রবেশ করতে পারেননি। অবশেষে ইউশা'কে ('ঈসা বিন নুন) প্রতিনিধি নিযুক্ত করে ১২০ বছর বয়সে মোয়াব দেশে বৈৎপিয়রের কাছে উপত্যকায় ইন্তিকাল করেন।[২৩] ইউশা' আ.-এর নেতৃত্বে একের পর এক আঞ্চলিক বাদশাহর পতন ঘটিয়ে প্রতিশ্রুত দেশ বিজিত হয় এবং যেসব অঞ্চল অবশিষ্ট ছিল তাও পরবর্তীতে অধিভুক্ত হয়। উল্লেখিত ভূমি বনি ইসরাঈলীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। [২৪] মূর্তিপূজক

স্থানীয় বাদশাহদের পরাজয়ের ফলে তথায় একেশ্বরবাদী ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। ফিলিস্তিনে বনি ইসরাঈলী শাসন ব্যবস্থাকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। ১. বিচারকদের যুগ ২. বাদশাহী যুগ ৩. পতনের যুগ।

বিচারকদের যুগ

বনি ইসরাঈলগণ ফিলিস্তিনের কিছু অঞ্চল বিজয় করলেও তারা কেন্দ্রীয় কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। অধিকাংশ শাসকই ছিল বিচারক। ১২ টি গোত্র ভিন্নভাবে বাস করত। পরিবার প্রধানগণ কোন সমাধান করতে না পারলে তখন বিচারকদের স্মরনাপন্ন হতো। আস্তে আস্তে বেদুঈনী জীবনাচার পরিত্যাগ করে তারা ক্রমান্বয় ব্যবসা, কৃষি, যন্ত্রপাতি, যুদ্ধাস্ত্র প্রভৃতি তৈরিতে মনোনিবেশ করে।[২৫]

বাদশাহী যুগ

বিচারকদের যুগে বনি ইসরাঈলগণ যখন ঘুষ, অন্যায়, অত্যাচার ও জঘন্য অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তখন আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারী শাসকদের বিজয় দিয়ে তাদেরকে শাস্তি দান করেন। ঐ সময় অত্যাচারী 'আমালিকা জাতি ফিলিস্তিনের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে নিয়ে জুলুম-নির্যাতন চালায়। সে সময় বনি ইসরাঈলগণ সাময়ীল নবীর নিকট একজন বাদশাহ নিযুক্তির দাবী জানায় যার নেতৃত্বে 'আমালিকাদের প্রতিরোধ করা যায়। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তালুতকে বাদশাহ নিযুক্ত করেছেন। তালুত ৩১৩ জন সৈন্য নিয়ে ফিলিস্তিন আক্রমনের জন্য বাদশাহ জালুতের (বাদশাহ জুলিয়াস) বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। জালুত প্রথমে মল্ল যুদ্ধের জন্য তালুতকে আহবান করেন। তালুতের পক্ষ থেকে অল্পবয়সী যুবক দাউদ আ. জালুতের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং জালুতকে হত্যা করে ইসরাঈলীদের বাদশাহ নিযুক্ত হন।[২৬] তিনি ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন জর্ডান জয় করে জেরুজালেমে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র সুলায়মান আ. বাদশাহ হন। ইয়াহুদীদের হিব্রু বা ইসরাঈলী রাজ্য খ্রী. পূ. ১২২০-১১২৩ সাল পর্যন্ত মোট ১০৩ বছর স্থায়ী ছিল। এটাই বাদশাহী যুগ।[২৭]

পতন যুগ

খ্রী. পূ. ৯৫০ সালে সুলায়মান আ. ইন্তিকাল করলে পুত্র 'রহবিয়াম' নিজেকে ইয়াহুদী রাষ্ট্রের বাদশাহ ঘোষণা করেন, অন্যদিকে প্রাক্তন স্বীয় কর্মচারী 'ইয়ারবিয়াম' পালিয়ে 'নাবুলসে' গিয়ে নিজেকে বাদশাহ ঘোষণা করেন। এভাবে বনি ইসরাঈলীদের প্রতিশ্রুত কেনান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পতন যুগের সূচনা হয়। যার দক্ষিণাংশের নাম ইয়াহুদী রাষ্ট্র, রাজধানী জেরুজালেম এবং উত্তরাংশের নাম ইসরাঈল রাষ্ট্র, রাজধানী নাবলুস (বা সিকিম)।[২৮]

বনি ইসরাঈলদের উভয় রাষ্ট্রে সর্বদা বিদ্রোহ ও অসন্তোষ বিরাজমান থাকায় আশুরিয় বাদশাহ দ্বিতীয় সেরজুন খ্রী. পূ. ৭২২ সালে ইসরাঈল রাষ্ট্র দখল করে নেয় এবং খ্রী.পূ.৬০৮ সালে মিশরের বাদশাহ ফেরা'উন ইয়াহুদী রাষ্ট্র দখল করে নেয়। পরবর্তীতে ব্যাবিলন সম্রাট 'বুখতে নসর' উভয় রাষ্ট্র দখল করে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। সুলায়মান আ.-এর নির্মিত বায়তুল মাকদিস (মসজিদুল আকসা) ধ্বংস করে দেয়। ১ লক্ষ ইয়াহুদী হত্যা করে এবং অনেককে বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে যায়। অবশিষ্টরা ইউরোপ ও 'আরব দেশ সমূহে পালিয়ে যায়। [২৯]

খ্রী.পূ. ৫৩৮ সালে পারস্য সম্রাট 'সাইরাস' ইয়াহুদী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে শর্ত সাপেক্ষে স্বল্প সংক্ষক ইয়াহুদীদেরকে ফিলিস্তিনে আসার সুযোগ দেয়। খ্রী. পূ. ৩৩১ সালে গ্রীক বীর আলেকজান্ডার ফিলিস্তিন দখল করে। খ্রী. পূ. ১০৬ সালে ইয়াহুদীগণ জেরুজালেম পুণরায় দখল করে নেয়। খ্রী. পূ. ৬৪ সালে রোমান সম্রাট 'পম্পি' ফিলিস্তিন দখল করে এবং সম্রাট টাইটাস ৭০ খ্রীস্টাব্দে উপাসনালয় ও পবিত্র স্থানগুলো আগুনে পুড়ে দেয়। ফলে সমস্ত ইয়াহুদী মিশর, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন ও ইউরোপে পলায়ন করে।[৩০]

রোমান শাসনামলে জেরুজালেমে যখন একেশ্বরবাদী ধর্মের দূর্দিন চলছিল। ঠিক সেই সময় ‘ঈসা আ.-এর জন্ম হয়। প্রথম দিকে ইয়াহুদীরা তাদের নবী হিসেবে গ্রহণ করলেও পরবর্তীতে তারা তাঁর বিরোধিতা করে। ‘ঈসা আ.-এর ১২ জন সহযোগী (আনসারী, অ্যাপষ্টল) ‘ঈসা আ.-এর জীবনাচার, দর্শন ও মৌলিক বিধানাবলী একটি সুসংবদ্ধ রূপ দিলে তা ইয়াহুদী ধর্মে আস্তে আস্তে ব্যাপকতা লাভ করে। খ্রীস্টিয় তৃতীয় শতাব্দীতে বাইজান্টাইন সম্রাট কনষ্টানটাইন খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করলে জেরুজালেমে খ্রীস্টান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বায়তুল মাকদিস পুণঃনির্মান করে খ্রীস্টান ধর্মের উপাসনালয়ে রূপান্তরিত করেন।[৩১]

৫৭০ খ্রী. হযরত মুহাম্মদ সা. জন্মগ্রহণ করলে তাঁর মদীনা রাষ্ট্রে ইয়াহুদীগণ চুক্তি ভঙ্গের কারণে ইসলামের শত্রুরূপে চিহ্নিত হয়। ৬৩৮ খ্রী. ‘উমর রা. রোমানদের নিকট থেকে ফিলিস্তিন দখল করে নেন এবং ইয়াহুদীরা এখানে আর বাসের সুযোগ পাবেনা শর্তে শাসনভার খ্রীস্টানদের হাতে ছেড়ে দেন। একাদশ শতাব্দীতে মুসলিমদের অগ্রগতি ঠেকানোর জন্য ক্রুসেড যুদ্ধে খ্রীস্টানরা বায়তুল মাকদিস দখল করে। কিন্তু সালাহ উদ্দীন আইউবী ১১৮৭ সালে তা পুনরুদ্ধার করেন। ১৮৯৭ সালে জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী ইয়াহুদীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হয় এবং বেলফোর (Balfour) চুক্তি হিসেবে ১৯১৮ সালে ইয়াহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯১৯ সালে ইংরেজ জেনারেল ‘এলেনবাই’ ফিলিস্তিন দখল করে সদলবলে জেরুজালেমে ঢুকে পড়ে। ১৯৪৮ সালে ইংরেজ বাহিনী (বৃটেন) ফিলিস্তিন ত্যাগ করে এবং ১৫ই মে ইয়াহুদী রাষ্ট্র হিসেবে বিভিন্ন দেশ স্বীকৃতি দেয়। এ সময় পশ্চিম জেরুজালেম রাজধানী হয়। ১৯৬৭ সালে ইসরাঈল পূর্ব জেরুজালেম দখল করে অখণ্ড জেরুজালেমকে রাজধানী ঘোষণা করে।

উপদল

ইয়াহুদীদের প্রধানতঃ দু’টি দল পরিলক্ষিত হয়। ১. সেদোকী, ২. ফরিসী। এছাড়া তাদের আরও অনেক উপদল রয়েছে।

১. জেরুযালেম-উপাসনালয়ের পুজারীরা গ্রীক শাসকদের সহযোগী ছিল। এরা ‘সেদোকী’ (Sadducees) নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ Zadokites থেকে এ নামের উৎপত্তি।[৩২] এরা সুলায়মান আ.-এর সময় জেরুযালেমের উপাসনালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পুজারী ছিল। ব্যাবিলনে নির্বাসন উত্তরকালে সেদোকী শব্দটি পারিবারিক উত্তরাধিকারে পরিণত হয়। বাইরের শাসকদের সঙ্গে তাদের সহযোগিতার কারণে তাদের মর্যাদা একশ্রেণির আমীরের মত ছিল। জেরুযালেম-উপাসনালয়ে উপঢৌকন ও ট্যাক্স তাদের ব্যক্তিগত বিত্ত-বৈভব বৃদ্ধি করে। সান হেদ্রীন (Sanhedrin) সংস্থাটিও তাদের পৃষ্ঠপোষক ছিল। সাধারণ ইয়াহুদীদের দৃষ্টিতে এরা ঘৃণার পাত্র ছিল।[৩৩]

২. সেদোকীদের পার্থিব লালসার বিপরীতে Scrib (লেখকগণ অর্থাৎ আইন প্রণেতা ও রাব্বি) সম্প্রদায় গির্যা ও মন্দিরগুলোতে খাঁটি শরীয়তের শিক্ষা দিতো। এরা জনগণের দৃষ্টিতে শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। এদের মধ্য থেকে মুত্তাকী দলের উদ্ভব হয় যাদেরকে ‘ফরিসী’ বলা হয়।[৩৪] চতুর্থ এন্তাকিস গ্রীক সংস্কৃতি জোর করে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টাকালে বড় বড় পুজারীরা সহযোগিতা করলেও ফরিসীরা তার বিরোধিতা করে। এই ফরিসীদের প্রচেষ্ঠায় মেকাবী পরিবারের নেতৃত্বে গ্রীক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়। এতে ফরিসীদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। পবিত্রতা, ন্যায়পরায়ণতা ও শরীয়তের প্রতি একনিষ্ঠতা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে মেকাবী পরিবারের পার্থিব-প্রিয়তার কারণে লেখক (Scribes) ও ফরিসীদের সঙ্গে দূরত্বের সৃষ্টি হয়। এই সুযোগে রোমকরা পাম্পীর নেতৃত্বে ফিলিস্তিন অধিকার করে[৩৫] এবং রোমকদের হাতে তারা ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়।

ধর্মতত্ত্ববিদদের মতে ইয়াহুদীদের একাত্তরটি দলের মধ্যে প্রসিদ্ধ দল চারটি এবং অবশিষ্টগুলো এদেরই শাখা-প্রশাখা।

১. ‘ইনানিয়াহ (العنانية): ইনান ইবনে দাউদের অনুসারীবৃন্দ শনিবারে বিশ্রাম ও সাব্বাত পালন বিষয়ে অন্যান্য ইয়াহুদীদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করে। তাদের মতে পাখি, হরিণ ও টিডিড নিষিদ্ধ খাবার। তারা প্রাণির ঘাড়ের পিছন দিক দিয়ে জবাই করে। তারা ‘ঈসা আ. এর নবুওয়্যাত অস্বীকার করলেও তাঁর উপদেশ মান্য বলে মনে করে। তারা শুধু তাওরাত মানে এবং তালমুদকে অস্বীকার করে।[৩৬]

২. ‘ঈসাবিয়্যাহ (العيسوية): আবূ ‘ঈসা ইসহাক ইবনে ইসফাহানী (মতান্তরে উফীদ উলহীম) ‘আব্বাসীয় খলীফা মানসুরের যুগে আবির্ভূত হন। তিনি নিজেকে নবী এবং প্রতিক্ষিত মাসীহের দূত মনে করতেন। তাঁর দাবী হল আল্লাহ তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং জালিম শাসকের অত্যাচার থেকে মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে ‘ঈসা আ. সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। তিনি সকল প্রাণি জবাই বা হত্যা করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং বাধ্যতামূলক দশ ওয়াক্ত নামায প্রবর্তন করেন।[৩৭]

৩. মুকাবারাহ ও ইউযা‘আনিয়াহ (المقاربة و اليوذعانية): হামাদান অধিবাসী ইউযা‘আন (মতান্তরে ইয়াহুযা)-এর অনুসারীবৃন্দ তাকদীরে বিশ্বাসী। তাদের এক দলের মতে আল্লাহর সঙ্গে মানুষের কথোপকথন অসম্ভব। মূসা আ. তুর পাহাড়ে যার সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি একজন ফিরিশতা যে ফিরিশতার মাধ্যমে আল্লাহ নবীদের সঙ্গে কথা বলেন ও বার্তা প্রেরণ করেন।

এদেরই একটি প্রসিদ্ধ উপ শাখার নাম মূশকানিয়াহ (الموشكانية)। মূশকান নেতার অনুসারীরা ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অথবা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা বৈধ মনে করেন। তাদের অনেকেই হযরত মুহাম্মদ (সা) কে ‘আরবদের নবী বলে স্বীকার করে।[৩৮]

৪. সামিরিয়্যাহ (السامرية): এ দলটিকে সামিরিয়্যাহ বলার কারণ হ'ল, এরা ফিলিস্তিনের উত্তরাঞ্চলে সামিরায় বসবাস করতো। সামিরিয়্যাহদের মধ্যে উলফান (الالفان) নামক জনৈক ব্যক্তির আবির্ভাব হয় যিনি নিজেকে নবী ও সেই ব্যক্তি বলে দাবী করেন যার সম্পর্কে মূসা আ. সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। সামিরিয়্যাহদের প্রধান দুটি শাখা দল হল (ক) দুস্তানিয়াহ ও (খ) কুস্তানিয়া। দোস্তানিয়াহরা পরকালের পুরষ্কার বা শাস্তি অস্বীকার করে এবং বলে শাস্তি বা পুরষ্কার যা হবার তা দুনিয়াতেই হয়।[৩৯]

ধর্মবিশ্বাস

১. ঈশ্বর এক আর তাকে ইলোহিম বা যিহোভা নামে আখ্যায়িত করা হয়। তারা শ্যামার মাধ্যমে প্রকাশ করে যে, "শোন হে ইস্রাইল, মহান প্রভুই তোমাদের ঈশ্বর, মহান প্রভু এক। হে ইস্রাইল মহান প্রভুই আমাদের ঈশ্বর, মহান প্রভু এক।"[৪০]

২. তারা আল্লাহর প্রিয়জনের সন্তান বা ঈশ্বর পছন্দ জাতি। কাজেই তারা শয়তান বা শয়তানের প্রভাবে অভিশপ্ত হওয়া আমলে নেয়না।[৪১]

৩. জান্নাতে ইয়াহুদী ছাড়া অন্য কেও প্রবেশ করতে পারবে না এবং তাদের পূর্ব পুরুষেরা অবশ্যই তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবে।[৪২]

৪. সাব্বাৎ দিবস পালন: ‘আরবীতে يوم السبت অর্থ শনিবার আর سبت অর্থ আরাম, অবসর, শান্তি। প্রভু ছয়দিনে বিশ্ব সৃষ্টি করে সপ্তম দিবসে বিশ্রাম করেছেন। কাজেই সাব্বাৎ (শনিবার) দিবস প্রভুর উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট রেখে ঐ দিন বিশ্রাম করা, কোন কাজ না করা।[৪৩]

৫. হযরত মূসা আ. এর পূর্বেও কোন শরী'আত ছিলনা এবং পরেও কোন শরী'আত আসবেনা। মূসা আ. এর শরী'আতই একমাত্র শরী'আত। তাঁদের মতে শর'ঈ বিধান রহিত হওয়া সঙ্গত নয়। তাঁর পূর্বে যে সব সহীফা অবতীর্ন হয়েছিল সেগুলো শরী'আত নয়, সেগুলো ছিল বিবেকী নিয়ম-নীতি ও কল্যাণ জনক বিধি-বিধান।[৪৪]

৬. ইয়াহুদী রাব্বীগণ মুতাযিলাদের ন্যায় তাকদীরকে অস্বীকার করেন এবং কুররাগণ (জাবারীয়াদের ন্যায়) মানুষকে তাকদীরের নিকট অসহায় মনে করেন।[৪৫]

৭. ইয়াহুদীগণ কারো মৃত্যুর পর দুনিয়াতে পুনরাগমনে (عقيدةالرجعة) বিশ্বাস করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা 'উযায়র আ. কে একশত বছর পর পুনরায় জীবিত করেছিলেন। তাঁরা মনে করেন তিনি আল্লাহর পুত্র ছিলেন।[৪৬]

৮. হারুন আ. এর প্রতি বনী ঈসরাঈলের উত্তর উত্তর আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়ায় হিংসাবশত: মূসা আ. তাঁকে তীহ প্রস্তরে তাওরাতের ফলক দ্বারা আঘাত করলে তাঁর মৃত্যু হয়। তাদের বিশ্বাস তাঁর মৃত্যু হলেও অচিরেই তিনি ফিরে আসবেন। কারো কারো মতে তিনি আত্মগোপন করে আছেন, অচিরেই ফিরে আসবেন।[৪৭]

৯. পবিত্র সিন্ধুক (Ark of the Covenent): এই সিন্ধুকে তাওরাতের মূল কপিসহ মূসা ও হারুন আ. উভয়ের স্মৃতিবাহি জিনিসপত্র সংরক্ষিত ছিল। ইয়াহুদীরা এটিকে তাদের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি বলে বিশ্বাস করে। তাই তারা এটিকে স্বদেশে, প্রবাসে ও যুদ্ধক্ষেত্রে সব সময় নিজেদের সঙ্গে রাখত। এক যুদ্ধে ফিলিস্তিনী পৌত্তলিকরা ইসরাঈলীদেরকে পরাজিত করে সিন্ধুকটি নিয়ে গিয়ে তাদের দাজুন দেবতার মন্দিরে স্থাপন করে। এই সিন্ধুকটি যে জনপদ বা শহরে রাখা হয় সেখানেই বিপদ ও মহামারী দেখা দেয়। অবশেষে তারা এটি একটি গরুর গাড়িতে করে চালকবিহীনভাবে ইসরাঈলী বসতির দিকে প্রেরণ করে।[৪৮] নবী সামূয়েল কর্তৃক তালুতকে শাসক নিয়োগের সময় এ ঘটনা ঘটে। এরপর সুলায়মান আ. বাদশাহ হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করে সেখানে এই সিন্ধুকটি স্থাপন করেন।[৪৯] বুখতে নসর (নেবুচাঁদনেজার) জেরুজালেম আক্রমণ করে যে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তাতে বায়তুল মুকাদ্দাস ও সিন্ধুক (হায়কালে সুলায়মানী বা Ark of the Covenent) সবই বিলুপ্ত হয়। ইয়াহুদীরা আজও সিন্ধুকটি পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করে। (কারো কারো মতে এটি ফিলিস্তিনে কোথাও আছে। তাই তারা ফিলিস্তিন দখল করে অনুসন্ধান চালাতে চায়।) তারা আরো মনে করে যে, বায়তুল মাকদিস (বায়তুল মুকাদ্দাস)-এর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব তাদের।

১০. ইয়াহুদীদের বিশ্বাস জাতীয় মুক্তিদাতা রূপে একজন মেসাইয়াহ (Messiah) আগমন করবেন যিনি সারা বিশ্বের ইয়াহুদীদেরকে প্রতিশ্রুত দেশে একত্রিত করবেন।[৫০] সে দেশ হবে লোহিত সাগর থেকে টাইগ্রিস সীমানা পর্যন্ত এবং তিনি সেখানে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। তাঁর আগমনের জন্য 3rd Temple বা ইয়াহুদীদের তৃতীয় উপাসনালয় তৈরি করতে হবে। কারণ সুলায়মান আ. কর্তৃক 1st Temple নির্মাণের প্রায় ৪০০ বছর পরে নেবুচাঁদনেজার কর্তৃক ৫৮৬ সালে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। ৫৩৮ খ্রী.পূ. পারস্য সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় ইয়াহুদীরা জেরুজালেমে পূণর্বাসিত হয়ে ৫১৫ খ্রীস্ট পূর্বে 2nd Temple নির্মাণ করে। রোমান সম্রাট টাইটাস কর্তৃক ৭০ খ্রী. তা আবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

১১. নবীদের প্রতি ভ্রান্ত বিশ্বাস:

ক. লুত আ. মদপান করে তাঁর কন্যাদের সাথে একত্রে রাত যাপন করেন, তাতে উভয়ই গর্ভবতী হয়। লুত আ. তার দুই মেয়েকে সাথে নিয়ে পাহাড়ের গুহায় গমন করেন। তখন বড় মেয়েটি ছোট মেয়েটিকে বলল, আমাদের পিতা বৃদ্ধ অবস্থায় পৌঁছেছেন। অন্য কোনো ব্যক্তি নেই যে আমাদের

দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। চল আমরা পিতার সাথে মদপান করে একত্রে রাত্রি যাপন করি। যাতে আমাদের বংশধারা বিদ্যমান থাকে। সে রাতে তারা পিতার সাথে একত্রে মদপান করে। পরে বড় মেয়েটি পিতার সাথে রাত্রি যাপন করে। পরের দিন বড় মেয়েটি ছোট মেয়েটিকে বলল, আমি গতরাতে পিতার সাথে রাত্রি যাপন করেছি। তুমি আজ মদপান করে পিতার সাথে রাত্রি যাপন কর। অতঃপর ছোট মেয়েটিও পিতার সাথে রাত্রি যাপন করে। অবশেষে উভয়ই গর্ভধারণ করে। বড় মেয়ের গর্ভে যে সন্তান জন্ম লাভ করে তার নাম রাখা হয়, 'মুয়াব' ছোট মেয়ের গর্ভে যে সন্তান জন্ম লাভ করে তার নাম রাখা হয় 'বিন আম্মি'।[৫১]

খ. ইহুদা ইবন ই'য়াকুব তার পুত্রবধুর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তখন তার গর্ভে একত্রে দু'সন্তান জন্মগ্রহণ করে। যাদের একজনের নাম 'পেরস' (ফারিদ) অন্য জনের নাম 'সেরহ' (যারাহ)।[৫২] দাউদ, সুলায়মান ও 'ঈসা আ. সকলে ফারিদের বংশধর।

গ. দাউদ আ. তাঁর সেনাপতি উরিয়ার স্ত্রীর সাথে জ্বীনা করেছেন। তিনি তার সেনাপতি উরিয়াকে যুদ্ধে পাঠালেন এবং একদিন তিনি তাঁর প্রাসাদ থেকে দেখতে পেলেন এক সুন্দরী মহিলা হায়েজ থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করছে। তিনি লোক পাঠিয়ে তাকে নিয়ে আসেন এবং তার সাথে রাত যাপন করেন। ফলে মহিলা গর্ভবতী হয়। তখন সে দাউদ আ. এর নিকট এসে বলে, আমি গর্ভধারণ করেছি অথচ আমার স্বামী দীর্ঘদিন থেকে যুদ্ধের ময়দানে আছে। এ খবর শুনে দাউদ আ. মহিলার স্বামী উরিয়াকে ষড়যন্ত্রমূলক হত্যার ব্যবস্থা করেন এবং তার স্ত্রীকে বিবাহ করেন। তার গর্ভ থেকে সুলায়মান আ. জন্মগ্রহণ করেন।[৫৩]

ঘ. সুলায়মান আ. ফেরা'উনের বংশের মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তার ৭ শত স্ত্রী ও ৩ শত উপ-দম্পতি ছিল। বৃদ্ধ বয়সে তিনি নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হন।[৫৪]

ঙ. আল্লাহ মূসা আ. কে আদেশ দিয়েছেন, তুমি যখন বনি ইসরাঈলদের মিশর থেকে বের হতে বলবে তখন তারা যেন খালি হাতে বের না হয়। বরং আসার সময় যেন ফেরা'উনের বংশের মহিলাদের যাবতীয় স্বর্ণ, রৌপ্য চুরি করে নিয়ে আসে।[৫৫]

চ. ই'য়াকুব আ. বড়ভাই এসকে অন্যায়ভাবে ঠকিয়েছেন। অর্থাৎ বড়ভাই এসকে ঠকিয়ে পিতার দু'আ ও ভাইয়ের সম্পদ আত্মসাৎ করেছেন।[৫৬]

উপসংহার

মূসা আ.-এর অনুসারীরা নিজেদেরকে ইবরাহীম আ.-এর ধর্মমতের অনুসারী মনে করে এবং ইসা আ. নিজেও ইবরাহীম আ. এর ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, "ইবরাহীম আ.ইয়াহুদীও ছিলেন না, খ্রীস্টানও ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একজন প্রকৃষ্ট মুসলমান"। মুহাম্মদ স. এর নিকট আল্লাহ এমর্মে ওহী নাযিল করেন যে, "ইবরাহীম আ. তোমাদের জাতীয় পিতা, তিনিই তোমাদেরকে মুসলিম নামকরণ করেছেন"। কাজেই মুসা আ., ইসা আ. ও মোহাম্মদ স. প্রত্যেকেই ইসলাম প্রচার করেছেন। দূর্ভাগ্যজনকভাবে ইসা আ. (যীশু খ্রীস্ট)-এর অনুসারীরা নিজেদেরকে খ্রীস্টান ও মুসা আ. এর অনুসারীরা নিজেরেকে ইয়াহুদী ধর্মের অনুসারী মনে করে থাকে। ইয়াকুব আ.-এর ১২ পুত্রের মধ্যে একজনের নাম ছিল ইয়াহুদা (ইয়াহুযা)। তার নামানুসারে ইয়াহুদী ধর্ম নামকরণ করা হয় অথবা **انا هدنا اليك** এই আয়াতের প্রেক্ষিতে তাদেরকে ইয়াহুদী বলা হয়। বায়তুল মাকদিস (মসজিদুল আকসা) এই তিন ধর্মমতের অনুসারীদের নিকট সমান গুরুত্বপূর্ণ। অথচ ইয়াহুদীরা মনে করে, তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং বায়তুল মাকদিসের পূর্ণ কর্তৃত্ব তাদের। তারা শুধু ফিলিস্তিনী মুসলিম নয়, সারা বিশ্বের মুসলমানদেরকে শত্রু

বিবেচনায় মুসলিম বিনাশের জন্য প্রটোকল প্রণয়ন করেছে। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসগুলো অনেকটাই অমূলক এবং বিভ্রান্তিকর। ইয়াহুদীদের ধর্ম বিশ্বাসের কিছু ইতিবাচক বিষয় আছে; আবার অনেক নেতিবাক বিষয়ও রয়েছে। ইতিবাচক বিষয়ের পাশাপাশি ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। যেহেতু মূল তাওরাতের অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায়না সেহেতু তাদের যে সব বর্ণনা কুরআনের বর্ণনার নিকটতম তা গ্রহণযোগ্য এবং যে সব বর্ণনা কুরআনের বর্ণনার বিপরীত তা অগ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়।

তথ্যনির্দেশ

১ বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী ইয়া'ফাসের সন্তানদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, "এদের বংশের লোকেরাই শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষা, পরিবার ও জাতি অনুসারে সাগর পাড়ের ভিন্ন ভিন্ন দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল।" দ্র. Kitabul Mokaddos (Dhaka: The Bangladesh Bible Society, 2006), *পয়দায়শ*, ১০:৫। এখানে সাগর পার বলতে ভূমধ্য সাগরের পরপার প্রতীয়মান হয়।

২ সূরাহ আলে-'ইমরান, আয়াতঃ ৬৭.

৩ ....in Babylonia near a place called Ur of chaldees; and there Abraham is said to have been born. Cf. J.B. Noss, *Man's Religions* (New York: The Macmillan Company, Revised Edition, 1956), p.467.

৪ *পয়দায়েশ*, ১৬-১৭।

৫ ৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বুখতে নছর (Nebuchad Nezzer) কর্তৃক জেরুজালেম ধ্বংস হলে নবী জেরিমিয়াহ (Jeremiah) ও তাঁর দরিদ্র অনুগত কিছুলোক ছাড়া অবশিষ্ট সবাই কিছু মিশরে, কিছু ব্যাবিলনে, কিছু নীলনদ অববাহিকায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। তখন যারা জেরুজালেমে অবস্থান করছিল, ঐতিহাসিকগণ তাদের জাতীয় মর্যাদা রহস্যজনকভাবে হিব্রুর পরিবর্তে Jew বলে অবিহিত করেন। দ্র. *Man's Religions*, pp. 504-505.

৬ ইবরাহীমের বিশ্বাস ছিল একেশ্বরবাদী। সেমেটিকদের নিকট এই ঈশ্বরের নাম El অথবা Elim অথবা Elohim যার অর্থ Superhuman being or divinity'। সেমেটিকদের নিকট অন্য সমার্থক শব্দ হল Adoni (Hebrew Adoni) অর্থ Lord; Malak or Moloch (Hebrew Melech) অর্থ King; Baal অর্থ Land Lord. Cf.*Man's Religions,* p.466. প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীমের প্রভু ছিল ﷲ বা ﷲ যা El অথবা Elohim দ্বারা বুঝানো যেতে পারে। তিনি মৃত্যুহীন তাই তাঁর 'আরবী নাম يحى। "I am who I am" God Said to Moses......God said Further to moses " Thus you shall say to the Israelites: 'Yahweh'.......has sent me to you." Cf. *Exodus*, 6:3; *Man's Religions*, p. 471.

৭ Edward J. Jurji, *The Great Religions of the modern World* (New Jersey: Princeton University Press, 1946), p. 225.

৮ *পয়দায়েশ*, ১৭: ২২-২৭; ২১:৩; আদি পুস্তক, ১৭: ১০-১৪; ইবনু কাসীর, *আল-বিদায় ওয়ান নেহায়াহ*, ১ম খণ্ড (পাকিস্তানঃ আল-মাকতাবাতুল কুদসিয়্যাহ, ১৯৮৪ খ্রী.), পৃ. ১৫৬; *সহীহুল বুখারী*, আম্বিয়া অধ্যায়, বাব ১০, হাদীস নং-৩১০৮, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫০।

৯ *পয়দায়েশ*, ১৬: ৩-১৬।

১০ সম্পাদনা পরিষদ, *সীরাত বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪খ্রী.), পৃ. ৪৩৬।

১১ *পয়দায়েশ*, ২১: ৪।

১২ *তদেব*, ২৫: ২২-৩৪; এ ধরণের কাহিনী নবী রাসূলগণের শানের পরিপন্থী। দ্রঃ *জামিল আহমদ*, আম্বিয়া-ই কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫১-২৫২।

১৩ *পয়দায়েশ*, ৩১: ১৩; ইবনু কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী, *আল-মা'আরিফ* (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৭খ্রী./১৪০৭ হি.), পৃ. ২৩।

১৪ *পয়দায়েশ*, ২৯: ২-৩০; *আল-বিদায় ওয়ান নেহায়াহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৫।

১৫ *জেনেসিস*-৩২:২৩-৩১; *আল-বিদায় ওয়ান নেহায়াহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৬।

১৬ *সীরাত বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১৭।

১৭ *পয়দায়েশ* ৩৭: ১৮-৩৬; সূরাহ ইউসুফঃ ১০।

১৮ *পয়দায়েশ*, ৪৭: ২৮; *আল-বিদায় ওয়ান নেহায়াহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২০; *Encyclopedia of Religion*, Vol-7, p. 503.

১৯ ড. আব্দুল করীম যায়দান, *মুজামুল আদইয়ান ফীল কুরআন* (বৈরূতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০২ খ্রী.), পৃ. ৪২।

২০ সূরা আল-মায়িদাহঃ ২১।

২১ *হিজরত*, ১৪ অধ্যায়; আশ-শুয়ারাঃ ৬৩-৬৫।

২২ শুমারী, অধ্যায়, ১৩, ১৪, ৩২, ৩৩; আল-মায়িদাহঃ ২৫-২৬।
২৩ দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায় ৩৪।
২৪ *নবীদের কিতাব*, ইউসা, অধ্যায়-১২; ড. কামিল সাফান, *আল-ইয়াহুদ তারীখান ওয়া আকীদাতান* (কায়রোঃ দারুল ইতিসাম, ১৯৮৮ খ্রী.), পৃ. ১৪।
২৫ ড. আহমদ সালাভী, *মুকারানাতুল আদইয়ানঃ আল-ইয়াহুদীয়াহ*, ১ম খণ্ড (কায়রোঃ মাকতাবাতুন নাহদা আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯৯২ খ্রী.), পৃ. ৭৫-৭৭।
২৬ ১ শামুয়েল, ১৭ অধ্যায়; ২ শামুয়েল, ৫ অধ্যায় ; *আল-বিদায় ওয়ান নেহায়াহ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫-৭।
২৭ ড. আবুল কালাম পাটওয়ারী, *ইয়াহুদী জাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ* (কুষ্টিয়াঃ ২০০২ খ্রী.), পৃ. ১৭।
২৮ *সীরাত বিশ্বকোষ*, খ.৩, পৃ. ২৯৭-২৯৮।
২৯ আহমদ সালাভী, *আল-ইয়াহুদীয়াহ*, পৃ. ৯১।
৩০ *ইয়াহুদী জাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ*, পৃ. ১৮-১৯।
৩১ *সীরাত বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩২; Tomes Hosmer, *The Jews*, P. 138; সিরাজুল ইসলাম, *আল আকসা মসজিদের ইতিকথা* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৫ খ্রী.), পৃ. ৫১।
৩২ *Man's Religions,* p. 527.
৩৩ ড. মাযহার উদ্দীন সিদ্দিকী মূল, মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রহমতী অনূদিত, *ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১ খ্রী.), পৃ. ৯৮।
৩৪ *Man's Religions,* p. 527.
৩৫ *ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম*, পৃ. ৯৮; *Man's Religions,* p. 527.
৩৬ ড. আল-মুসাইরী, *আল-ইয়াহুদ ওয়াল ইয়াহুদিয়্যাহ ওয়াল সিহুনিয়্যাহ*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩২৯।
৩৭ মাওলানা মুহাঃ হেমায়েত উদ্দীন, *ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ* (ঢাকাঃ থানভী লাইব্রেরী, ২০০৪ খ্রী.), পৃ. ৬৪৯।
৩৮ *তদেব*।
৩৯ *তদেব*।
৪০ *Deuteronomy*-6: 4-9; *The Great Religions of the modern world*, p. 233.
৪১ *Deuteronomy*-7: 6-7.
৪২ মুস্তাফা হিলমী, *আল-ইসলাম ওয়াল আদইয়ান আল-উখরা* (আলেকজান্দ্রিয়াঃ দারু দাওয়াহ, ১৯৯১ খ্রী.), পৃ. ১৯৫।
৪৩ *হিজরত*, ৩৫ঃ ১-৩।
৪৪ *ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ*, পৃ. ৬৪৮।
৪৫ *তদেব*।
৪৬ সূরাহ তাওবাহঃ ৩০; আবুল ফিদা মুহাম্মদ ইযযাত, *নিহায়াতুল ইয়াহুদ* (কায়রোঃ দারুল ইতিসাসম, তা.বি.), পৃ. ২৭।
৪৭ *ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ*, পৃ. ৬৪৮।
৪৮ শামুয়েল, অধ্যায় ৫ ও ৬।
৪৯ বাদশাহনামা, ৮ অধ্যায়।
৫০ J.N.D. And erson, *The World's Religions* (London: Staples Printer, 1960), p. 25.
৫১ *পয়দায়েশ*, ১৯:৩০-৩৮।
৫২ *তদেব*, ৩৮ঃ ৬-৩০।
৫৩ *শামুয়েল*, ১১:১-২।
৫৪ বাদশাহনামা, ১১ঃ ১-২।
৫৫ *হিজরত*, ৩:২১-২২। ।
৫৬ *পয়দায়েশ*, ২৫ঃ ২২-৩৪।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

কুর'আন ও হাদীসের আলোকে মৃতব্যক্তির জন্য জীবিতদের করণীয় : একটি পর্যালোচনা
(Obligations of the Living for the Dead in the Light of the Qur'an and Hadith : A Review)

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান*

Abstract: According to Al-Qur'an al-Kareem, every animal on earth is mortal. Every living being has to taste certain death. As humans, we all have to taste death. So it is very important to know what to do for the dead person. Because, through death, all the worldly activities of people stop. all good deeds ar closed. The dead person has no power to do good deeds or bad deeds. But the dead person continues to receive reward or sin of deeds from some means. Islamic guidance provides a precise description of how the pople can benefit the dead. According to the Quran and Hadith, the pople have something to do for the dead. Through which the dead will be rewarded till the Day of Judgment. In this article diseussed the duties of the living pople for the dead person in the light of Qur'an and Hadith, which should be follow to all Muslim.

ভূমিকা

মানুষের মুক্তি নির্ভর করে মূলত নিজের কর্মের উপর। বিশুদ্ধ ঈমানদার সৎ মানুষদের জন্য দো'আও দান করা যায়। কুর'আনুল কারীমে মৃতব্যক্তির জন্য দো'আ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। হাদীসে মৃতব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা, দো'আ ও দান-সাদাকা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের উদ্দেশ্যে জীবিত ব্যক্তির এ সকল কর্মের সাওয়াব তাঁরা লাভ করবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া মৃতের দায়িত্বে হজ্জ পালন বাকি থাকলে তা তাঁর পক্ষ থেকে পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এগুলো সাধারণ নির্দেশনা ও ফযীলত মূলক হাদীস। এখন আমাদের দেখতে হবে রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রা) এই ফযীলতের কর্মটি কীভাবে পালন করেছেন। অর্থাৎ এই কর্মটির ক্ষেত্রে 'সুন্নাহ' কী তা জানতে হবে।

মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে জীবিতদের করণীয়

মৃত্যু হচ্ছে মোহনা-এখানে দুনিয়ার জীবনের সমাপ্তি আবার আখেরাতের জীবনের সূচনা। দুনিয়াকে বলা হয় '*মাযরাআতুল আখিরাহ*' বা আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। দুনিয়ার জীবন যার যেমন কাটবে, পরকালে এর ফলই সে ভোগ করবে। আর যে কোনোকিছু ভালো হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্যে এর সমাপ্তি সুন্দর হওয়া জরুরী। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ.

"আমল তো শেষ অবস্থা অনুসারেই বিবেচিত হবে।"[১]

আমাদের এক পরিচিত প্রবাদ-শেষ ভালো যার, সব ভালো তার। সবমিলিয়ে বলা যায়, আখেরাতে সুন্দর জীবনের জন্যে সুন্দর মৃত্যুর বিকল্প নেই। মৃত্যুর সময় যদি ঈমানটাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়, দুনিয়ার সব দুঃখ-কষ্ট তখন তুচ্ছ। আর যদি এর বিপরীত কিছু হয়, শয়তানের ধোঁকায় কেউ নিজের ঈমান খুইয়ে বসে,

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

জগতে তার চেয়ে হতভাগা আর কে হতে পারে! এজন্যে কোনো মুমূর্ষু ব্যক্তির পাশে যারা উপস্থিত থাকবেন, তাদের প্রথম কর্তব্য-কালেমায়ে তায়্যিবার তালকীন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

"তোমরা তোমাদের মৃত্যুগামী ব্যক্তিদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র তালকীন করো।"[২]

তালকীনের অর্থ হচ্ছে-মুমূর্ষু ব্যক্তির পাশে একটু আওয়াজ করে কালেমা পড়তে থাকা। তবে মনে রাখতে হবে, এ অবস্থায় তাকে কিছুতেই মুখে উচ্চারণ করে কালেমা পড়ার আদেশ করা যাবে না। জোরাজুরি করা যাবে না; এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। তাই নিয়ম হলো, তার পাশে বসে মৃদু আওয়াজে কেবল কালিমা পড়তে থাকা। মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তিকে কালিমা বলুন বা এজাতীয় কিছু না বলা। তার পাশে যখন কালেমা পড়া হবে, তিনি যখন কালেমার আওয়াজ শুনতে পাবেন, আশা করা যায়, তিনি নিজেই কালেমা পড়ে নিতে পারেন। এ কালেমা যার জীবনের শেষ কথা হবে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"যার শেষ কথা হবে-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৩]

মুমূর্ষু ব্যক্তির পাশে থেকে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করার কথাও হাদীসে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اقْرَءُوا (يس) عَلَى مَوْتَاكُمْ.

"মৃত্যুপথযাত্রী যারা তাদের পাশে থেকে তোমরা সূরা ইয়াসীন পাঠ করো।"[৪]

ছোট ও সহজ এ দুটি আমলের পাশাপাশি দূরের-কাছের সকলেরই উচিত-তার জন্যে দো'আ করা। তার মৃত্যু যেন সহজ হয় এবং ঈমানের সঙ্গে হয়-এ দো'আ করা। এ দো'আটুকুর জন্যে পাশে থাকারও প্রয়োজন নেই। কোনো আপনজনের মুমূর্ষু অবস্থার সংবাদ পেলে তার জন্যে যথাসাধ্য দো'আ করা উচিত। এতে শুধু তারই উপকার হবে-এমন নয়; বরং দো'আকারীর উপকারও এতে কম নয়। হাদীসের ভাষ্যানুসারে, কোনো মুসলিম ভাইয়ের জন্যে দূর থেকে কোনো দো'আ করলে ফিরিশতারা বলে-তাকেও (দো'আকারীকেও) যেন এ বিষয়গুলো দান করা হয়। তাই অন্য কারও জন্যে দো'আ করা, কারও মুমূর্ষু অবস্থায় সহজ মৃত্যু এবং ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুর জন্যে দো'আ করলে লাভবান হবে দো'আকারী নিজেও।

কুর'আন ও হাদীসের আলোকে মৃতব্যক্তির জন্য জীবিতদের করণীয়

আল-কুর'আনুল কারীমের ভাষ্যানুযায়ী পৃথীবির প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুবরণকারী। প্রত্যেকটি জীবকে সুনিশ্চিত মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মানুষ হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরও মৃত্যুর স্বাদ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। তাই মৃতব্যক্তির জন্য করণীয় কি তা জানা একান্ত জরুরী। কেননা, মৃত্যুর মাধ্যমেই মানুষের ইহজাগতিক সকল কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় আমলনামা। নেক আমল বদ আমল কোনো কিছুই আর করার ক্ষমতা থাকে না মৃতব্যক্তির। কিন্তু মৃত ব্যক্তি কয়েকটি মাধ্যম থেকে আমলের সাওয়াব কিংবা পাপ অব্যাহতভাবে লাভ করতেই থাকেন। আল্লাহ তা'আলা আল-কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ
فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

> "প্রত্যেক প্রাণিকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর কেয়ামতের দিন তোমাদের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। তারপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ধোঁকার বস্তু ছাড়া কিছুই নয়।"[৫]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

> "প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদের মন্দ ও ভালো দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং তোমরা আমার কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে।"[৬]

আল্লাহ তা'আলা আরোও বলেন,

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ

> "তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। যদি তোমরা সুদৃঢ় দূর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও।"[৭]

মৃতব্যক্তির জন্য জীবিতদের জন্য যে সব বিষয় করণীয় রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

'ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়া মৃতব্যক্তির জন্য করণীয় এর প্রথম কাজ

ধৈর্য ধারণ করা ও 'ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলা মৃতব্যক্তির জন্য প্রথম করণীয় কাজ বিবেচিত হয়। আল-কুর'আনুল কারীমে বর্ণিত আছে, যখন বিপদে পতিত হও, তখন বল: 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন।' আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

> "এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।"[৮]

মৃতব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

যখন কোনো মানুষ মৃত্যুবরণ করবে তখন জীবিত ব্যক্তিদের প্রধান দায়িত্ব-কর্তব্য হবে তার মৃত্যুর সংবাদ মানুষের মধ্যে জানানো। যত বেশি সংখ্যক মানুষের নিকট মৃতব্যক্তির সংবাদ পোঁছানো যাবে ততবেশি মানুষ তার জন্য দো'আ করবেন এবং তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। হাদীসে বর্ণিত আছে,

> عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه أَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَثَبْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُصَلِّي عَلَى ابْنِ أُبَيٍّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا قَالَ أُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ "أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ" فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ "إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ، لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرْ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَمْكُثْ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتِ الآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةَ
وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا... إِلَى قَوْلِهِ ..وَهُمْ فَاسِقُونَ:

"উমর ইবনু খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবদুল্লাহ ইবনু উবায় ইবনু সালুল মারা গেল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু (সা)-কে তার জানাযার সালাত (নামায) পড়বার জন্য আহ্বান করা হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন (জানাযার জন্য) উঠে দাঁড়ালেন, আমি তাঁর কাছে গিয়ে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ইবনু উবায়ের জানাযার সালাত পড়াবেন? অথচ যে লোক অমুক দিন অমুক অমুক কথা বলেছে। উমর ইবনু খাত্তাব (রা) বলেন, আমি তার কথাগুলো রাসূল (সা)-এর সামনে এক একটি করে উল্লেখ করেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুচকি হাসি দিয়ে আমাকে বললেন, হে উমর, আমাকে যেতে দাও। আমি বারবার বলাতে তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন। আমি তা গ্রহণ করেছি। আমি যদি বুঝতে পারি যে, সত্তরবারের চেয়েও অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন, তবে আমি সত্তরবারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করবো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জানাযার সালাত আদায় করলেন এবং (জানাযা) থেকে প্রত্যাবর্তন করে আসার পরই সূরা বারাআতের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, "তাদের কেউ মারা গেলে কখনো তার জানাযার সালাত (নামায) আদায় করবে না। এরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাস করেছে। এবং পাপাচারী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।"[৯]

মৃত্যুর পর আপনজনদের করণীয়

মৃত্যু যেমন এক অনুপেক্ষ বাস্তবতা, মৃত্যুর জন্যে নির্ধারিত সময়ও কারও পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যার জন্যে যতটুকু হায়াত নির্ধারিত, যার মৃত্যুর জন্যে যে সময় লিখে রাখা হয়েছে, এ সিদ্ধান্তের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই কারও। আল-কুর'আনে একাধিক স্থানে মহামহিম আল্লাহ এ ঘোষণাও দিয়েছেন,

اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ.

"তাদের মৃত্যুর নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হয় তখন তারা তা এক মুহূর্তও বিলম্বিত করতে পারবে না, এমনকি মুহূর্তকাল ত্বরান্বিতও করতে পারবে না।"[১০]

নির্ধারিত সময়েই তাই সকলের মৃত্যু হবে। এখানে আমাদের কিছুই করার নেই। আমাদের করণীয় বরং পরবর্তী সময়ে-মৃতব্যক্তির কাফন-দাফন জানাযা ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

মৃত ব্যক্তিকে সুন্দরভাবে গোসল করিয়ে কাফন পরানো এবং তার জানাযার নামায আদায় করে তাকে দাফন করা-এগুলো আপনজনদের করতে হয়। মাটি থেকেই মানুষের সৃষ্টি, দুনিয়ার জীবন শেষ করে মাটিতেই হয় তার শেষ গন্তব্য। কুর'আনুল কারীমে বর্ণিত আছে,

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَ فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى.

"আমি তোমাদেরকে তা (অর্থাৎ মাটি) থেকেই সৃষ্টি করেছি, তাতেই আবার তোমাদের আমি ফিরিয়ে নেব এবং তা থেকেই পুনরায় তোমাদের জীবিত করব।"[১১]

শরীয়তের নির্দেশনা অনুসারে গোসল-কাফন-জানাযা ও দাফন সম্পন্ন করা তো আমাদের জানা বিষয়। তবে এক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ রাখতে হবে- দাফন যেন বিলম্বিত না হয়। নানা কারণেই মৃতব্যক্তির দাফন বিলম্বিত করা হয়। কখনো দূর-দূরান্তের আপনজনদের অপেক্ষায়, কখনো অধিক মুসল্লির অংশগ্রহণে জানাযার নামায আদায় করার জন্যে, কখনো এক এলাকা থেকে মৃতদেহ অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে দাফন বিলম্বিত হয়। দুনিয়ার এ জীবন যার যত বেশি সামাজিক কর্ম, অবদান কিংবা অন্য কোনো দিক থেকে যে যত বেশি মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত, তার বিদায়ের সঙ্গে ঠিক তত বেশি মানুষেরই আবেগ জড়িয়ে থাকে। শেষবারের জন্যে একটু দেখার আকুলতা থাকে। এ সবই সত্য। কিন্তু শরীয়তের নির্দেশনা হলো, কেউ যখন মারা যায়, তখন দ্রুতই যেন তাকে দাফন করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে-

أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

"তোমরা মৃতব্যক্তির জানাযা-দাফন ইত্যাদি দ্রুত করো। সে যদি নেককার মানুষ হয়ে থাকে তবে তো তার জন্যে কল্যাণ ও পুরস্কার রয়েছে, তোমরা তাকে সেই কল্যাণের দিকেই এগিয়ে দিলে। আর যদি সে এমন না হয়, তবে (দাফনের মধ্য দিয়ে) তোমরা তোমাদের ঘাড় থেকে এ মন্দকে নামিয়ে দেবে।"

হাদীসের ভাষ্য তো পরিষ্কার-মৃত ব্যক্তি যেমনই হোক, নেককার হোক কিংবা না হোক, দ্রুত দাফনের মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ, হয়তো তার জন্যে, কিংবা জীবিতদের জন্যে। হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) আলী (রা)-কে বলেন,

يَا عَلِيّ! ثَلَاثٌ لاَ تُؤَخِّرْهَا: الصَّلاَةُ إِذَا أَتَتْ، وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْئًا.

"আলী! তিনটি জিনিস বিলম্বিত করো না-নামায, যখন এর সময় হয়ে যায়; জানাযার নামায এবং উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে মেয়েদের বিয়ে দেয়া।"[১২]

অপর হাদীসে বর্ণিত আছে,

عن حُصَيْنِ بن وحْوَحٍ رضي الله عنه أَنْ طَلْحَةَ بنَ الْبُرَاءِ بن عازب رضِي اللهُ عنْهما مَرِض فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ فَقَالَ إِنِّي لا أُرَى طَلْحةَ إلاَّ قدْ حَدَثَ فِيهِ المَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا بِهِ فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي لجيفَةِ مُسْلِمٍ أنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ

"হুসায়ন ইবনু ওয়াহ্ওয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত, ত্বালহা ইবনুল বারা ইব্‌ন আযিব (রা) রোগগ্রস্ত হয়ে পড়লে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখতে গেলেন। তিনি বললেন, ত্বালহার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে, তার বিষয়ে এছাড়া আমি আর কিছুই চিন্তা করি না। আমাকে তার মৃত্যুর খবর জানাবে। আর তার দাফন-কাফনের কাজ দ্রুত সমাধা করবে। কারণ, মুসলিমের লাশ তার পরিবারবর্গের নিকট আটকে রাখা উচিত নয়।"[১৩]

কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মৃতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

দাফনের পরপরই শুরু হয় তার কবর জগতের প্রশ্নোত্তর পর্ব। পরীক্ষার শুরু সেখানেই। হাদীসে এসেছে,

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحِيرٍ عَنْ هَانِئٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

"উসমান ইবনু আফফান (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতের দাফন শেষ করে সেখানে দাঁড়িয়ে বলতেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং সে যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে সেজন্য দো'আ করো। কেননা তাকে এখনই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"[১৪]

দাফনের পরপর মৃতব্যক্তির জন্যে দো'আ করা, তার সুওয়াল-জবাব যেন সহজ হয়, কবরের প্রতিটি ধাপই যেন সে সহজে পেরিয়ে যেতে পারে-এ দো'আ জীবিতদের নিকট তার অধিকার। হাদীসে দো'আর নির্দেশনা এসেছে আরও ব্যাপক পরিসরে।

মৃতের ঋণ বা ওসিয়্যাত থাকলে তা পরিশোধ করা

মৃতব্যক্তির ঋণ থাকলে, তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে সেসবও পরিশোধ করে দিতে হবে। মৃত্যুর সময় তিনি যে ওসিয়্যাত করে যান, তা আদায় করতে হবে, তবে তা পুরো সম্পদ দিয়ে নয়, বরং সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে। দেনার তালিকায় মানুষের আদায়যোগ্য ঋণ যেমন থাকতে পারে, থাকতে পারে শরীয়তের কোনো বিধানও। এক সাহাবী হজ্জ আদায় না করেই ইন্তিকাল করেন, অথচ তার ওপর হজ্জ ফরয হয়েছিল। তার ছেলে এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বাবা তো হজ্জ না করেই ইন্তিকাল করেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করব? রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন,

أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقّ.

"বলো তো, তোমার বাবার যদি কোনো ঋণ থাকত, তবে কি তুমি তা আদায় করতে? সাহাবী বললেন, হ্যাঁ, করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তবে আল্লাহর ঋণ আদায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ।"[১৫]

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ □ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلاَّ قَالَ صَلُّوا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّىَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ

"আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জানাযা পড়ার জন্য যখন কোন ঋণগ্রস্ত মুর্দাকে হাযির করা হতো, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, ঋণ পরিশোধ করার মত কোন মাল ও ছেড়ে যাচ্ছে কি? সুতরাং উত্তরে যদি তাঁকে বলা হতো যে, "হ্যাঁ, পরিশোধ করার মত মাল ছেড়ে যাচ্ছে- তাহলে তিনি তার জানাযা পড়তেন। নচেৎ বলতেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ে নাও। অতঃপর আল্লাহ যখন তাঁর জন্য বিভিন্ন বিজয় দান করলেন তখন তিনি বললেন, মুমিনদের জন্য তাদের নিজেদের চাইতে আমিই অধিক হকদার (দায়িত্বশীল)।"[১৬]

সুতরাং যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যাবে, তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপর এবং যে সম্পদ রেখে মারা যাবে, তার অধিকারী হবে তার ওয়ারিশগণ।

মৃতব্যক্তিকে দাফন বা কবরস্থ করার সুন্নাত পদ্ধতি

মৃতব্যক্তিকে দাফন বা কবরস্থ করা ফরযে কিফায়া। মাইয়্যেতের দাফন করা অনেক সাওয়াবের কাজ। এ কাজগুলো কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত। তা নিম্নরূপ:

ক. লাশ কবরে আনার সময় তথা খাটিয়া বহন করে কবর পর্যন্ত আনার সময় নির্দিষ্ট কোন দো'আ নেই। এই সময় চুপচাপ আখেরাতের ফিকির করতে হয়। মনে মনে মৃতব্যক্তির জন্য দো'আ করতে হবে। কোনো আওয়াজ করবে না। ইবনু জুরাইজ (রা) বলেন,

أَنّ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا تَبِعَ الْجِنَازَةَ أَكْثَرَ السّكُاتَ، وَأَكْثَرَ حَدِيثَ نَفْسِهِ.

"নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাযার পিছনে চলতেন তখন অধিক চুপ থাকতেন এবং চিন্তায় পূর্ণ মগ্ন থাকতেন।"[১৭]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ، وَلَا نَارٍ.

"জানাযার পিছনে যেন শব্দ না করা হয় এবং আগুন না নেওয়া হয়।"[১৮]

সুনানে কুবরা বায়হাকী ও ইবনুল মুনযিরের আল-আওসাতের এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, সাহাবায়ে কেরামের আমল ব্যাপকভাবে এমনি ছিল; তাঁরা জানাযার পিছনে যাওয়ার সময় কোনো আওয়াজ করতেন না।"[১৯]

এ সকল হাদীস ও আছারের আলোকে ফকীহগণ বলেছেন, "জানাযার পিছনে চলার সময় মূল কাজ হলো আখেরাতের ফিকিরে থাকা। যিকির করতে চাইলে তা হবে অনুচ্চ স্বরে। এক্ষেত্রে যিকির করতে গিয়ে আওয়াজ উঁচু করা ঠিক নয়।"[২০]

খ. কবরে লাশ রাখার সময় এই দো'আ পড়তে হয় **'বিসমিল্লাহি ওয়াআলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ'**। ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

إذا وضعتم موتاكم فى قبورهم فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله

"যখন কবরে মৃতব্যক্তিকে রাখা হবে তখন পড়বে 'বিসমিল্লাহি ওয়াআলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ'।"[২১]

গ. কবরে লাশ রাখার পর মাটি দেবার সময় পড়বে- **'মিনহা খালকনাকুম, ওয়াফীহা নুয়ীদুকুম ওয়ামিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা'**। আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَمَّا وُضِعَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَبْرِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

"যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মেয়ে উম্মে কুলসুম (রা) কে কবরে রাখা হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) পড়েন মিনহা খালকনাকুম ওয়াফীহা নুয়ীদুকুম ওয়ামিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা।"[২২]

ঘ. মাটি দেয়া শেষ হবার পর পড়বে- اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ "হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ্ আপনি তাকে (প্রশ্নোত্তরের সময়) স্থির রাখুন।" এছাড়া মৃতব্যক্তির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনামূলক এবং সুওয়াল জওয়াব সহজ হবার জন্য যেকোনো দো'আই পড়া যাবে। উছমান ইবনু আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

> كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ : اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ
>
> "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতের দাফন শেষ করে সেখানে দাঁড়িয়ে বলতেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং সে যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে সেজন্য দো'আ করো। কেননা তাকে এখনই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"[২৩]

এক কবরে কতজনকে দাফন করা যাবে?

স্বাভাবিকভাবে একটি কবরে একাধিক ব্যক্তিকে দাফন অনুচিৎ। তবে স্থান সংকুলান না হলে বা মহামারির কারণে একাধিক কবর খনন করার মত লোক পাওয়া না গেলে কেবল তখনই এক কবরে একাধিক ব্যক্তিকে দাফন করা যাবে।[২৪] ওহুদ যুদ্ধের দিন একাধিক শহীদকে একই কবরে দাফন করা হয়েছিল।[২৫] হিশাম ইবনু আমির (রা) বলেন, আমরা ওহুদের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের পক্ষে প্রত্যেক শহীদের জন্য পৃথক পৃথক কবর খনন করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "তোমরা কবর খনন কর এবং কবরকে গভীর কর এবং দু'জন বা তিন জনকে এক এক কবরে দাফন কর।" সাহাবীগণ (রা) বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! কাকে প্রথমে রাখব?" তিনি বললেন, أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرآنِ؟ "যে কুর'আন বেশী জানে তাকে প্রথমে রাখ।" রাবী বলেন, "এভাবে আমার পিতা একই কবরের তিন জনের অন্যতম ছিলেন।"[২৬] জাবির (রা)-এর পিতা আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারাম এবং আমর ইবনুল জামূহকে তিনি এক কবরে রাখেন। কেননা তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল।[২৭]

সকল মৃত মুসলমানদের জন্য দো'আ

কুর'আন ও হাদীসের একাধিক স্থানে পিতা-মাতার সাথে সব মুমিনের জন্যই দো'আ করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কুর'আনে এসেছে,

> رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا
>
> "হে আমাদের প্রভু! আমাদের ও আমাদের আগে যারা ঈমান এনেছে, তাদের ক্ষমা করো। আর ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রেখো না।"[২৮]

অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

> رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا
>
> "হে আমার রব! তাদের উভয়ের (পিতা-মাতা) প্রতি রহম করো, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছে।"[২৯]

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কেরামকে মৃতব্যক্তির জন্য দো'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে, উসমান ইবনু আফফান (রা) বলেন, নবী করীম (সা) মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার কবরের

পাশে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, "তোমরা তোমাদের ভাইদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো এবং তার জন্য ইমানের ওপর অবিচল ও দৃঢ় থাকার দো'আ কামনা করো, কেননা এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে।"

মৃতব্যক্তির জন্য যে জানাজার নামায পড়া হয়, সেটি তার জন্য দো'আ করার উদ্দেশ্যেই পড়া হয়। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা) একাধিক হাদীসে কবর যিয়ারত করার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে, فَزُورُوا الْقُبُورَ [৩০] فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ এসব কিছু প্রমাণ করে, মৃতব্যক্তির জন্য জীবিতদের পাঠানো দো'আ ও ইস্তিগফার তার কাছে পৌঁছে এবং এর মাধ্যমে তিনি উপকৃত হন। অন্যথায় তার জন্য জানাযার নামায পড়া তার কবর যিয়ারত করার কোনো অর্থ থাকে না।

মৃতব্যক্তির জন্য দো'আ-মাগফিরাত করা

মৃতব্যক্তির জন্য দো'আ-মাগফিরাত কামনা করা জীবিতদের জন্য দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক, প্রতিবেশী এভাবে সকল মুসলিম উম্মাহর জন্য দো'আ-মাগফিরাত কামনা করা। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে আল্লাহ্‌র নবী ইবরাহীম (আ)-এর দো'আ বর্ণিত হয়েছে,

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

> "হে আমার প্রতিপালক! যেদিন হিসাব প্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও সব ঈমানদারকে ক্ষমা করুন।"[৩১]

অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নূহ আলাইহিস সালামের এ দো'আ বর্ণিত হয়েছে,

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

> "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার পিতা-মাতাকেও এবং যে ঈমান অবস্থায় আমার ঘরে প্রবেশ করেছে আর সমস্ত মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীকেও।"[৩২]

ব্যক্তির মৃত্যুর পরও যে সব আমলের সাওয়াব সে অব্যাহতভাবে পেতে থাকে এবং জীবিতরাও মৃতের জন্য এ সকল কাজের আঞ্জাম দিতে পারেন। হাদীসে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

> "আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন যে, মানুষ যখন মারা যায় তখন তিনটি আমল ব্যতীত তার সকল আমলই বন্ধ হয়ে যায়। ১. সাদাকায়ে জারিয়া, ২. মানুষ উপকৃত হয় এমন ইলম এবং ৩. নেক সন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে।"[৩৩]

মৃতব্যক্তির সাওয়াবের উদ্দেশ্যে দান-সাদাকা করা

মৃতব্যক্তির জন্য প্রকৃতপক্ষে সর্বদা সুযোগ ও আবেগ অনুসারে দো'আ করাই হলো তাঁদের প্রতি স্থায়ী ও নিয়মিত সুন্নাত। কারো পিতা-মাতা বা কোনো আপনজন মারা গেলে হয়ত মৃত্যুর পরেই তাঁদের জন্য কিছু দান করেছেন, জমি ওয়াকফ করেছেন বা অনুরূপ জনকল্যাণমূলক কোনো কাজ করেছেন। কেউ বা তাঁদের হজ্জ বাকি থাকলে হজ্জ আদায় করেছেন। ঈসালে সাওয়াব বা মৃতের জন্য সাওয়াব প্রেরণের জন্য সর্বদা

দো'আ করাই হলো জীবিতদের জন্য করণীয় কাজ। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত আছে। তার কয়েকটি নিম্নরূপ:

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

> عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَرْبَعَةٌ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أُجُورُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ مُرَابِطٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أُجْرِيَ لَهُ مِثْلُ مَا عَمِلَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَجْرُهَا لَهُ مَا جَرَتْ وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَدًا صَالِحًا فَهُوَ يَدْعُو لَهُ

> "আবূ উমামাহ আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন যে, চারটি বিষয়ের সাওয়াব প্রাপ্তি মানুষের মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। ১. আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত প্রহরী, ২. ব্যক্তির এমন (মাসনূন) আমল যা অন্যেরাও অনুসরণ করে, ৩. এমন সাদাকাহ যা সে স্থায়ীভাবে জারী করে দিয়েছে, ৪. এমন নেক সন্তান রেখে যাওয়া যে তার জন্য দো'আ করে।"[৩৪]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মসজিদ, মাদরাসা বা কোনো দ্বীনি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে যাওয়া। অথবা জনকল্যাণমূলক কোনো কাজ করে যাওয়া, যার উপকার মানুষ তার মৃত্যুর পরও ভোগ করতে পারে অথবা এমন সন্তান রেখে যাওয়া, যারা মৃত্যুর পরও তাদের বাবা-মা, আত্মীয়ের জন্য দো'আ করতে থাকবে। কিংবা সে নেক আমল করতে থাকে, যার সওয়াব মৃতব্যক্তি পেতে থাকবে। অথবা এমন ছাত্র তৈরি করে যাওয়া, যারা শিক্ষাবিস্তারে রত থাকে, এতে শিক্ষক তার সওয়াব পেতে থাকেন। কিংবা এমন কোনো দ্বীনি কিতাব রচনা করে যাওয়া, যা পড়ে মানুষ উপকৃত হতে থাকে।

সাহাবায়ে কেরাম (রা) তাঁদের মৃত পিতা-মাতার প্রতি সাওয়াব প্রেরণের জন্য কী কী পন্থা অবলম্বন করেছেন তা বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। যেমন: হাদীসে বর্ণিত আছে,

> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

> "আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জানতে চাইলেন যে, আমার পিতা কিছু সম্পদ রেখে মারা গেছেন কিন্তু তিনি কোনো ওসীয়ত করে যান নি। আমি কি তাঁর জন্য কিছু সাদাকাহ করতে পারি; যাতে তাঁর গুনাহের কাফফারা হতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ পার।"[৩৫]

সা'দ ইবন উবাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম,

> يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ سَقْيُ الْمَاءِ

> "ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আমার আম্মা মারা গেছেন। আমি কি তাঁর জন্য কিছু সাদাকাহ করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ পার। আমি বললাম, কোন্ সাদাকাহ উত্তম? তিনি বলরেন, পানি পান করানো (অর্থাৎ কূপ খনন করে দেয়া)।"[৩৬]

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِي اللَّه عَنْه تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

"সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর অনুপস্থিতিতে তার মা ইন্তিকাল করেন। পরে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা), আমার অনুপস্থিতিতে আমার 'মা' মারা গেছেন। আমি যদি তাঁর জন্য কিছু সাদাকাহ করি তবে কি তা তাঁর উপকারে আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সা'দ (রা) বলেন, "আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমার 'মিখরাফ' নামক বাগানটি আমার মায়ের জন্য সাদাকা করে দিলাম।"[৩৭]

মৃতব্যক্তির কবর যিয়ারত করা ও কবরবাসীর জন্য দো'আ করা

মৃতব্যক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) কবর যিয়ারত করতেন। কবর যিয়ারতের মাধ্যমে নিজেদেরও মৃত্যুর কথা মনে পড়ে। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও মু'মিনদের কবর যিয়ারত করার জন্য আল্লাহর রাসূল (সা) নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেভাবে কবর যিয়ারতের সময় দো'আ করতেন, তার কয়েকটি দো'আ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ – أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

"হে আল্লাহ্, তাকে ক্ষমা করুন এবং তাকে দয়া করুন। শান্তিতে রাখুন এবং তার থাকার স্থানটিকে মর্যাদাশীল করুন। তার কবর প্রশস্থ করে দিন। বরফ ও তুষারের শুভ্রতা দিয়ে, তাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিচ্ছন্ন করে দিন যেমন ময়লা থেকে সাদা কাপড় পরিষ্কার হয়। তাকে দুনিয়ার বাসস্থানের চেয়ে উত্তম বাসস্থান, পরিবার ও সঙ্গী দান করুন, হে মাবুদ, তাকে জান্নাতে দাখিল করুন, তাকে কবর আর দোজখের আজাব থেকে রক্ষা করুণ।"[৩৮]

আল্লাহর রাসূল (সা)-এর সাহাবী আওফ ইব্ন মালিক (রা) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মৃতব্যক্তির জন্য এমন দো'আ করতে দেখে আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম যে, যদি সেই মৃত ব্যক্তিটি আমি হতাম।"

রাসূলুল্লাহ (সা) কবর যিয়ারত করে এভাবে দো'আ করতেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যে, যখন কবর যিয়ারত করবে তখন বলবে, السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا، وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ

"হে কবরস্থানের বাসিন্দাগণ, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের প্রতি আল্লাহ রহম করুন। আমরাও আপনাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব/আপনাদের সঙ্গে মিলিত হব।"[৩৯]

ইব্ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

> "আমি এর আগে তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, তবে এখন থেকে অনুমতি দিলাম, তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা তা তোমাদের দুনিয়াবিমুখ করে এবং পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"[৪০]

মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা পালন করা

মৃতব্যক্তি যদি কাযা রোযা থেকে থাকে, সেগুলোরও ফিদইয়া আদায় করবে। তার পক্ষ থেকে রোযা রাখলে তার সওয়াব সে পাবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এ অবস্থায় যে, তার ওপর রোযা ফরয ছিল তবে তার পক্ষ থেকে তার ওয়ারিশগণ রোযা রাখবে।" হাদীছে বর্ণিত আছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ.

> "ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তার উপর মান্নতের সাওমের কাযা রয়েছে। আমি তার পক্ষ হতে এ সাওম (রোয) আদায় করতে পারি কি? তখন তিনি বললেন, যদি তোমার মায়ের উপর কোন ঋণ থাকত এবং তুমি তা পরিশোধ করে দিতে, তবে তা তার পক্ষ হতে আদায় হতো কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার মায়ের পক্ষ হতে তুমি সিয়াম পালন কর।"[৪১]

মৃতব্যক্তির পক্ষে হজ্জ ও উমরা আদায় করা

মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা যেতে পারে। যদি মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ অথবা উমরা আদায় করে তাহলে তার সাওয়াব অবশ্যই মৃতব্যক্তির কাছে যাবে। এর মাধ্যমে সে উপকৃত হবে। হাদীসে আছে: ইব্নু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকটে এসে বললেন,

> "হে আল্লাহর রাসূল! আমার বোন হজ্জের মান্নত করেছিলেন, কিন্তু তিনি হজ্জ সম্পাদন করার আগেই মৃত্যুবরণ করেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারি?" তিনি বললেন, "তোমার বোনের ওপর যদি ঋণ থাকত তবে কি তুমি আদায় করতে না?" সে বলল, "অবশ্যই আদায় করতাম।" রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "তাহলে তুমি তোমার বোনের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করো। কেননা আল্লাহর দাবি আদায় করার অধিক উপযোগী।"[৪২]

একই রকম প্রশ্ন করেছিলেন এক নারী সাহাবী। তার মা হজ্জের মান্নত করার পর তা আদায় না করেই মারা যান। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বলেছিলেন,

حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللهَ، فَاللهُ أَحَقّ بِالْوَفَاءِ.

> "তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করো। তোমার মায়ের কোনো ঋণ থাকলে তুমি কি তা আদায় করতে না? আল্লাহর ঋণ আদায় করো। আল্লাহর প্রাপ্য আদায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ।"[৪৩]

এ হাদীসদ্বয় থেকেও বোঝা যায়, হজ্জ ফরয হওয়ার পরও যদি আদায় না করেই কেউ মারা যায় তার উত্তরসূরিরা তা আদায়ের ব্যবস্থা করবে। হজ্জ এমন একটি ইবাদত যা একে অন্যের পক্ষ থেকে আদায় করতে পারে এবং এর সওয়াব তার কাছে পৌঁছে।

কোরবানীর সময় মৃতব্যক্তির নামে কুরবানি করা

মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানি করা জায়েয এবং এ জন্য মৃত ব্যক্তি সওয়াব পাবে। রাসূলুল্লাহ (সা) একটি দুম্বা কুরবানি করেন, জবাই করার সময় বললেন, "এটি আমার উম্মতের ওই সব লোকের পক্ষ থেকে, যারা কুরবানি করতে পারেনি।" হাদীসে বর্ণিত আছে,

> حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَنَشٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ.

> "উছমান ইবন আবী শায়বা (র) ... হানাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে দুটি দুম্বা যবাহ করতে দেখে জিজ্ঞাসা করি, ব্যাপার কি? তখন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে এরূপ ওসীয়ত করে গেছেন যে, আমি যেন (তাঁর ইন্তিকালের পর) তাঁর পক্ষে কুরবানি করি। তাই আমি তাঁর পক্ষ হতে এ কুরবানী করছি।"[৪৪]

ঈসালে সওয়াব

মৃতব্যক্তির অধিকার আদায়ের জন্যে এ প্রক্রিয়াটি দীর্ঘস্থায়ী। ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে দান-সাদাকা যেমন করা যেতে পারে, এর পাশাপাশি কুর'আন তিলাওয়াত, নফল নামায, রোযা, কুরবানী, হজ্জ ইত্যাদি সবই করা যেতে পারে।

ওপরের আমলগুলো ছাড়া মৃতব্যক্তির নামে চল্লিশা করা, মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা, মিলাদ পাঠ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও বিদ'আত। বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক স্থানে মৃতব্যক্তির জন্য ভাড়া করা আলিম ও হাফিয দিয়ে কুর'আন পড়ানো হয়। অনেক স্থানে আলিম বা হাফিযদের সাথে টাকা নিয়ে দরদাম হয়। এ ধরনের কর্ম সম্পূর্ণ হারাম ও বিদ'আত। মৃতব্যক্তির জন্য কোনো আলিম, মাওলানাকে ভাড়া করে এনে কুর'আন খতম করানো একটি নিষিদ্ধ ও পরিত্যাজ্য কাজ। পূর্ববর্তী মহামতি কোনো আলিম এ ধরনের কাজের অনুমতি দেননি। পরে কোনো কোনো স্বার্থান্বেষী আলিম নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য এ রকম অনুমতি দিয়েছেন। এ ধরনের কাজ সাধারণত লোকলজ্জার ভয়ে করা হয়ে থাকে। আবার অনেকে ছোট ছোট ওয়ারিশ থাকা সত্ত্বেও তাদের মাল তাদের অনুমতি ছাড়া এসব কাজে খরচ করে, যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুর'আন ও হাদীস সম্মত উপায়ে সমস্ত আমল পরিপালনের তাওফীক দান করুন।

প্রসঙ্গত আমাদের দেশে কেউ মারা গেলে তার নামে তৃতীয় দিন 'কুলখানি' এবং ৪০তম দিনে 'চল্লিশা' নামে যে ভোজনের আয়োজন করা হয়, তা ইসলাম সমর্থন করে না। তবে কেউ যদি মৃতব্যক্তির কাছে সাওয়াব

পৌঁছানের নিয়তে গরিব-দুঃখী ও অসহায়দের খাবার খাওয়ায়, তাহলে সেটা বৈধ। যাকে ইছালে সাওয়াব বলা হয়।

কিন্তু প্রথা বানিয়ে মৃতব্যক্তির বাড়িতে যেভাবে খাবার-ভোজন ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাতে ধনী-গরিব ও বিভিন্ন স্তরের মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। অর্থসংকটসহ নানাবিধ অসুবিধা থাকলেও অনেকে সামাজিক প্রথার কারণে এক প্রকার বাধ্য হয়ে এমনটি করেন। কিন্তু এ ধরনের কাজ সম্পূর্ণ অনুচিত ও পরিত্যাজ্য।

ইসলামী শরীয়াতে কুর'আন-হাদীস ও সাহাবাদের জীবন চরিতে এমন কোনো কাজ প্রমাণিত নয়। তাই এটি ইসলাম বহির্ভুত; উপরন্তু অনেকের জন্য ভীষণ কষ্টসাধ্য। অনেক সময় দেখা যায়, লোক সমাগমের আধিক্য দেখানোর জন্য প্রতিযোগিতামূলক ভোজনের আয়োজন করা হয়। এ ধরনের আয়োজনের খাবার খেতে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (সা) নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্‌নু আব্বাস (রা) বলেন,

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ

"রাসূলুল্লাহ (সা) দুই প্রতিদ্বন্দ্বী অহংকারীর খাবার গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।"[৪৫]

ইসলামের সৌন্দর্য এখানেই যে, কারো মৃত্যুর পর মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে খাওয়া তো দূরের কথা উল্টো তিন দিন মৃতের শোকাহত পরিবারের, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের জন্য খাবার আয়োজন করার নির্দেশ করেছে ইসলাম।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের সমাজে 'কুলখানি', 'চল্লিশা' ইত্যাদির নামে উল্টো তাদের ওপর খরচের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। সমাজের নামে খাবার ও ভোজনের আয়োজন করতে স্নায়ুবিকভাবে তাদের বাধ্য করা হয়। জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল-জালীয়ু (রা) বলেন,

كُنَّا نَرَى الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النِّيَاحَةِ

> "আমরা [রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে] মৃতব্যক্তির বাড়ির আনুষ্ঠানিকতা ও খাদ্যায়োজনকে (শরীয়াত নিষিদ্ধ) মাতাম বলে গণ্য করতাম।"[৪৬]

অতএব, মৃতের বাড়িতে শুধু খাবারের আয়োজন ও ভোজনপর্ব নয়, বরং তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসা, তাদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া মুমিনের কাজ। তাই সাধ্য মোতাবেক মৃতের পরিবারকে সহযোগিতা করা ও মৃতের সওয়াবে জন্য কিছু আমল ও কাজ করা অপরিহার্য। প্রথাসর্বস্ব আয়োজন ও অপচয় থেকে বেঁচে থাকাও ইসলামে কাম্য। আল্লাহ আমাদের উত্তম কাজে তাওফীক দান করুন।

উপসংহার

পরিশেষে একথা নির্দিধায় বলা যায় যে, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, আপনজন কিংবা কাছের ও পরিচিত কেউ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলে, মানুষ তার কষ্টে ব্যথাতুর হয়। তাদের স্মরণ করে প্রতিনিয়ত স্মৃতিকাতর হয়। বেদনার পলেস্তরা জমাট বাধে হৃদয়-মনে। এ বেদনা ও স্মৃতিকাতরতা থেকে জন্ম নেয়, যদি সম্ভব হয় তাদের জন্য কিছু প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু মৃতব্যক্তির জন্য কী করা যায়? ইসলামী শরী'আত মৃতব্যক্তির স্মরণের সুন্দর ও সঠিক নির্দেশনা দিয়েছে। এ জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময়, দিবস বা তারিখের অপেক্ষা করতে হয় না বা বাধ্যবাধকতাও নেই। কোনো অনুষ্ঠানে ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামেরও প্রয়োজন নেই। শরীয়ত অনুযায়ী মৃতব্যক্তির কীভাবে স্মরণ করা যায়, এ নিয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো মৃতব্যক্তির ভালো কাজের আলোচনা ইব্‌ন ওমর (রা) থেকে হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ، وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ

"তোমরা তোমাদের মৃতব্যক্তির ভালো কাজগুলোর আলোচনা করো এবং মন্দ কাজের আলোচনা থেকে বিরত থাকো।"[৪৭]

তথ্যনির্দেশ

১ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল-বুখারী*, ২য় খণ্ড (দারু তাওকিন-নাজ্জার, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি.), বাবুন : আল-আমালু বিল-খাওয়াতিমি, হাদীস নং ৬৬০৭।

২ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম* (বৈরূতঃ দারু ইব্ন হায্ম, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), বাবু তালকীনিল মাওতা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, হাদীস নং (৯১৬) ১।

৩ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস্-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দা'উদ* (বৈরূতঃ আল-মাকতাতাবুল আসরিয়্যাহ, তা.বি.), বাবুন ফিত্-তালকীন, হাদীস নং ৩১১৬।

৪ *সুনানু আবী দা'উদ, বাবুল কিরাআতি ইনদাল মাইয়্যেতি*, হাদীস নং ৩১২১; মুহাম্মদ ইব্নু হিব্বান, *সহীহ ইব্নু হিব্বান*, (বৈরূতঃ মু'আস্‌সাসাতুর রিসালাহ্, ২য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.), ফাযলুন ফিল-মুহতাযির, হাদীস নং ৩০০২।

৫ সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৮৫।

৬ সূরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৩৫।

৭ সূরা আন্-নিসা, ৪ : ৭৮।

৮ সূরা আল-বাকারা ২ : ১৫৫।

৯ *সহীহুল-বুখারী*, ২য় খণ্ড, বাবু মা ইউকরাহু মিনাস সালাতি আলাল-মুনাফিকীনা ওয়াল-ইসতিগফারি লিল-মুশরকীনা, হাদীস নং ১৩৬৬, পৃ. ৯৭; বাবু কাওলিহি ইসতিগফার লাহুম ..., হাদীস নং ৪৬৭১, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৮; আহমাদ ইব্ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ, *সুনানুন্ নাসাঈ*, ৪র্থ খণ্ড (হালবঃ মাকতাবুল মাতবূ'আতিল ইসলামিয়্যাহ্, ২য় সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), বাবু আস্-সালাতু আলাল-মুনাফিকীন, হাদীস নং ১৯৬৬, পৃ. ৬৭।

১০ সূরা আন্-নাহল, ১৬ : ৬১।

১১ সূরা ত্বহা, ২০ : ৫৫।

১২ মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত্-তিরমিযী, *জামি'উত্-তিরমিযী* (মিশরঃ মোস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ খ্রি.), বাবু মাজাআ ফিল-ওয়াকতি আওয়্যালি মিনাল-ফাযলি, হাদীস নং ১৭১-১৭২।

১৩ *সুনানু আবী দা'উদ*, বাবুত্ তা'জীলি বিল-জানাযাতি ওয়াকারাহিয়াতি হাবসিহা, হাদীস নং ৩১৫৯।

১৪ *সুনানু আবী দা'উদ*, বাবু আল-ইসতিগফারি ইনদাল কাবরি লিল-মাইয়্যেতি ফী ওয়াকতিল ইনসিরাফ, হাদীস নং ৩২২১, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৫।

১৫ *সুনানুন্-নাসাঈ*, তাশবীহু কাযাইল হাজ্জি বিকাযাইদ্ দ্বীন, হাদীস নং ২৬৩৯।

১৬ *সহীহ মুসলিম*, বাবু মান তারাকা মালান ফালিওয়ারাছাতিহি, হাদীস নং (১৬১৯)/১৪, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৩৭।

১৭ *মুসান্নাফু আবদুর রায্যাক*, হাদীস নং ৬২৮২; *মুসান্নাফু ইবনু আবী শাইবা*, হাদীস নং ১১৩১৫।

১৮ *সুনানু আবী দা'উদ*, হাদীস ৩১৬৩; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ৯৫১৫।

১৯ *সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৪; ইবনুল মুনযির, *আল-আওসাত*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪২২।

২০ বাদায়উস সানাই'ঈ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭।

২১ *জামি'উত্-তিরমিযী*, হাদীস নং ১০৪৬; *সুনানু ইব্ন মাজাহ্*, হাদীস নং ১৫৫; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ৪৮১২, ৪৯৯০, ৫২৩৩, ৫৩৭০, ৬১১১।

২২ *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ২২১৮৭; *আল-মুস্তাদরাক*, হাদীস নং ৩৪৩৩, *সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী*, হাদীস নং ৬৭২৬; *জামি'উল মাসানীদ ওয়াস সুনান*, হাদীস নং ১১০২৪; *মাযমাউজ যাওয়ায়েদ*, হাদীস নং ৪২৩৯।

২৩ *সুনানু আবী দা'উদ*, হাদীস নং ৩২২১।

২৪ ইমাম নববী, *আল-মাজমূ*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৪৭; উছায়মীন, *আশ-শারহুল মুমতে*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৯।

২৫ ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ্ আল-গালিব, *সীরাতুর রাসূল (ছা)* (রাজশাহীঃ হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় মুদ্রণ, ১৪৩৭ হি./২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৩৮৪।

২৬ *সুনানুন্-নাসাঈ*, হাদীস নং ২০১০; মুহাম্মদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনি, *সুনানু ইব্ন মাজাহ্* (মিশরঃ দারু ইয়াহ্ইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ্, তা.বি.), হাদীস নং ১৫৬০; *মিশকাতুল মাসাবীহ্*, হাদীস নং ১৭০৩।

২৭ ইবনু হিশাম, *আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্*, ২য় খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ্, তা.বি.), পৃ. ৯৮।

২৮ সূরা আল-হাশর, ৫৯ : ১০।

২৯ সূরা বনি ইসরাইল, ১৭ : ২৪।

৩০ *সহীহ মুসলিম*, বাবু ইসতি'যানি নাবিয়্যে (সা) রাব্বাহু আয্‌যা ওয়া জাল্লা ফী যিয়ারাতি কাবরিহি উম্মাতি, হাদীস নং (৯৭৬) ১০৮।

৩১ সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৪১।

৩২ সূরা নূহ, ৭১: ২৮।

৩৩ *সহীহ মুসলিম*, বাবু মা ইয়ালহাকুল ইনসানা মিনাছ-ছাওয়াবি বা'দা ওয়াতিহি, হাদীস নং (১৬৩১) ১৪।

৩৪ আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, *মুসনাদু আহমাদ* (বৈরূতঃ মু'আস্‌সাসাতুর রিসালাহ্‌, ১ম সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.), বাকী মুসনাদিল আনসার, হাদীস নং ২১২১৭, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৬০।

৩৫ *সহীহ মুসলিম*, বাবু ওসুলি ছাওয়াবিস্‌ সাদাকাতি ইলাল-মাইয়্যেতি, হাদীস নং (১৬৩০) ১১; *সুনানু-নাসাঈ*, ফাযলুস্‌-সাদাকাতি আনিল-মাইয়্যেতি, হাদীস নং ৩৬৫২।

৩৬ *সুনানু-নাসাঈ*, *কিতাবুর* ওয়াসায়া, যিকরুল ইখতিলাফি আলা সুফইয়ান, হাদীস নং ৩৬৬৪।

৩৭ *সহীহুল বুখারী*, বাবু ইযা কালা: আরযী আও বুসতানী সাদাকাতুন লিল্লাহি আন উম্মী ফাহুয়া জাইযুন, ওয়ান লাম আবাইয়্যেন লিমান যালিকা, হাদীস নং ২৭৫৬।

৩৮ *সহীহ মুসলিম*, বাবু দো'আই লিল-মাইয়্যেতি ফিস্‌-সালাতি, হাদীস নং (৯০৬৩) ৮৫।

৩৯ *জামি'উত্‌-তিরমিযী*, বাবু মা ইয়াকূলুর রাজুলু ইযা দাখালাল মাকাবির, হাদীস নং ১০৫৩।

৪০ *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ্‌*, বাবু মাজাআ ফী যিয়ারাতিল কুবূরি, হাদীস নং ১৫৭১।

৪১ *সহীহ মুসলিম*, *বাবু কাযাইস্‌ সিয়ামি আনিল-মাইয়্যেতি*, হাদীস নং (১১৪৮) ১৫৬।

৪২ *সহীহুল বুখারী*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৪২।

৪৩ *সহীহুল বুখারী*, বাবু আল-হাজ্জি ওয়ান্‌-নুযূরি আনিল-মাইয়্যেতি, ওয়ার-রাজুলু ইয়াহুজ্জু আনিল-মারআতি, হাদীস নং ১৮৫২।

৪৪ *সুনানু আবী দা'উদ*, বাবু আল-উযহিয়্যাত আনিল মাইয়্যেতি, হাদীস নং ২৭৯০।

৪৫ *সুনানু আবী দা'উদ*, বাবু ফিত্‌-তা'আমিল মুতাবারিইয়ায়নি, হাদীস নং ৩৭৫৪।

৪৬ *সুনানু ইবনু মাজাহ*, বাবু মাজাআ ফিন্‌-নাহ্‌য়ি আনিল ইজতিমা'ঈ ইলা আহলিল মাইয়্যেতি ওয়া সানা'আতিত্‌-তা'আম, হাদীস নং ১৬১২; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ৬৮৬৬।

৪৭ *সুনানু আবী দা'উদ*, বাবু ফিন-নাহয়ি আন সাব্বিল মাওতা, হাদীস নং ৪৯০০; *জামি'উত্‌-তিরমিযী*, বাবু মাজাআ ফী দাফনিন্‌-নাবিয়্যে সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া-সাল্লামা হায়ছু কুবিযা, হাদীস নং ১০১৯।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

সুন্নাহর আলোকে মুসলমানদের সামাজিক জীবন
(Social life of Muslim in the light of Sunnah)

মাইনুল ইসলাম*

Abstract: The method and vision which the Prophet (PBUH) followed is called Sunnah. Muhammad (pbuh) is the last prophet on the one hand, so he is the prophet of the entire human race around the world. The actions of the Prophet (PBUH) throughout his life are his Sunnah. Since the inception of creation, people have been living together in society. Our society consists of relatives or neighbors living next to the house. In people's happiness, sorrow, danger, they are the ones who come forward and extend the hand of help. We can fully know from the Sunnah of the Prophet (S): how this co-operation and good behavior will be with every person in the society. The Prophet (PBUH) specifically instructed to make relations with every person in the society amicable, sincere and compassionate. This instruction is mandatory for every human being. In the discussion article; we will shed light on the title of **'Social Life of Muslim in the Light of Sunnah'**, Insha'Allah.

সারসংক্ষেপ: যে পথ ও মত অবলম্বন করে রাসূল (স.) চলতেন তাকেই সুন্নাহ বলা হয়। মুহাম্মাদ (স.) একদিকে যেমন সর্বশেষ নবী, তেমনি তিনি সারা বিশ্বের সমগ্র মানব মন্ডলীর নবী। রাসূল (স.) এর সারা জিন্দেগীর কাজ-কর্মই হলো তাঁর সুন্নাহ। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে মানুষ পরস্পর সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আসছে। বাড়ীর পাশাপাশি বসবাসকারী আত্মীয় বা প্রতিবেশী নিয়েই আমাদের সমাজ। মানুষের সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে এরাই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে এবং সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করে। সমাজের প্রতিটি মানুষের সাথে এ সহযোগিতা ও সদাচরণের রূপরেখা কেমন হবে তা আমরা রাসূল (স.) এর সুন্নাহ থেকে পরিপূর্ণভাবে জানতে পারি। সমাজের প্রতিটি মানুষের সাথে সম্পর্ককে আন্তরিক ও সহানুভূতিশীল করার লক্ষ্যে রাসূল (স.) বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশ প্রতিটি মানুষের জন্য অবশ্য পালনীয়। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা **'সুন্নাহর আলোকে মুসলমানদের সামাজিক জীবন'** শিরোনামে আলোকপাত করব, ইনশাআল্লাহ।

সুন্নাহর আলোকে মুসলমানদের সামাজিক জীবন সুন্নাহর

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। একে অন্যের সহযোগিতা ছাড়া মানুষ একদিনও চলতে পারে না। তাই সামাজিক জীবনে পরস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম সমাজকল্যাণমূলক ধর্ম। মানব কল্যাণ ও সমাজকল্যাণ ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য। ইসলাম ও সমাজকল্যাণ একটির সাথে অন্যটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।[১] সমাজকল্যাণ বলতে মানুষের কল্যাণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ বুঝায়। আর ইসলাম মানুষকে অন্যের কল্যাণে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা করতে অনুপ্রাণিত করে। মহান আল্লাহ বলেন, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না'।[২] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، '(অন্যের) কল্যাণকামিতাই দ্বীন, (অন্যের) কল্যাণকামিতাই দ্বীন, (অন্যের) কল্যাণকামিতাই দ্বীন'।[৩] দুনিয়াতে সাজিক কল্যাণলাভ ও আখেরাতে মুক্তির জন্য মুসলমানদের সামাজিক জীবনকে পরিপূর্ণভাবে

---

* পিএইচ.ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সুন্নাহর আলোকে ঢেলে সাজানো আবশ্যক। নিম্নে সুন্নাহর আলোকে মুসলমানদের সামাজিক বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করা হল।

সুন্নাহর আলোকে মুসলিম বিবাহ

বিবাহ হলো এমন একটি চুক্তি যাতে 'বিবাহ দেয়া বা বিবাহ করা' ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে উপভোগ বা একত্রে থাকা বা পরস্পর অংশীদার হওয়া বুঝায়।[৪] বিবাহ সমাজ জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ যার মাধ্যমে পরিবার গড়ে উঠে। এর মাধ্যমে পরিবারের সূত্রপাত হয়। এছাড়া বংশবিস্তার ও উত্তরাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইসলামে নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন, বসবাস ও জৈবিক চাহিদা পূরণের একমাত্র পন্থা হিসেবে বিবাহের প্রচলন করা হয়েছে। এজন্য প্রত্যেক অভিভাবককে তাদের অধীনস্থদের বিবাহের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত তাদের বিবাহ দিয়ে দাও। আর তোমাদের চাকর-চাকরাণীর মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদেরও। যদি তারা অভাবী হয়, তাহলে আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে অভাবমুক্ত করে দিবেন। আল্লাহ্ উদারহস্ত ও সর্বজ্ঞানী"।[৫] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

يَا مَعْشَرَالشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"রাসূল (স.) (যুবকদের লক্ষ্য করে) বললেন, হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা রাখে, তাদের উচিত বিবাহ করা। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আর যে বিবাহের দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা রাখে না, তার বিধান (কামভাব দমনের জন্য) সিয়াম রাখা। কেননা সিয়াম কাম-ভাব দমন করে"।[৬] সুতরাং বিবাহ না করে চিরকুমার ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের অনুমতি ইসলামে নেই। 'রাসূল (স.) ওছমান ইবনু মাযঊনকে নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের অনুমতি দেননি। তাকে অনুমতি দিলে আমরা নির্বীর্য হয়ে যেতাম'।[৭] আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই রাসূল (স.) নিঃসঙ্গ জীবন যাপনকে নিষেধ করেছেন'।[৮]

দ্বীনদার পাত্রী নির্বাচন

প্রত্যেক মুসলিম পাত্রের উচিত রূপ, বংশ ও সম্পদের চেয়ে পাত্রীর দ্বীনদারীকে বেশী গুরুত্ব দেয়া। পরিপূর্ণ দ্বীনদারী পাওয়া গেলে অন্য গুণ কম হ'লেও দ্বীনদার মহিলাকেই বিবাহ করা উচিত, তাহ'লে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ হবে। রাসূল (স.) বলেন,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

"মেয়েদেরকে সাধারণত চারটি বিষয় দেখে বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ, বংশ মর্যাদা, রূপ ও সৌন্দর্য এবং তার দ্বীনদারী দেখে। তবে তোমরা দ্বীনদার মেয়ে লাভ করার চেষ্টা কর, তোমাদের কল্যাণ হবে"।[৯]

তবে কোন পাত্রীর মধ্যে যদি দ্বীনদারীসহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলোও বর্তমান থাকে, সেটা আরও উত্তম। কিন্তু কোন মুসলমানের পক্ষেই পাত্রীর তাকওয়া পরহেযগারীর খেয়াল না করে অন্য কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিয়ে করা উচিত নয়।

পাত্র-পাত্রী দর্শন

বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রী পরস্পরকে দেখে নেওয়া উচিত। রাসূল (স.) বলেছেন,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

"তোমাদের মধ্যে হতে কোন ব্যক্তি যখন কোন মহিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করবে, সম্ভব হলে সে যেন তাকে (মহিলাকে) একবার দেখে নেয়"।[১০] মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) বলেন, আমি জনৈক নারীকে বিবাহের প্রস্তাব করলাম। রাসূল (স.) আমাকে বললেন, 'তাকে দেখে নাও। কেননা এতে তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মাবে'।[১১]

মোহরানা নির্ধারণ

বিবাহের পর নারীর যৌনাঙ্গ উপভোগের জন্য পুরুষের উপর যে বিনিময় আবশ্যক হয় তাকে মোহর বলে।[১২] বিবাহের আগে মোহরানা নির্ধারণ করা এবং বিবাহের পর তা স্ত্রীকে দিয়ে দেয়া ফরয। আল্লাহ বলেন, فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً 'তোমরা স্ত্রীদের মোহরানা ফরয হিসাবে প্রদান কর'।[১৩] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, أَحَقُّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوْفُوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ '(বিবাহে) সবচেয়ে বড় শর্ত যেটা তোমরা পূর্ণ করবে, সেটা হ'ল যা দ্বারা তোমরা লজ্জাস্থানকে হালাল কর'।[১৪] অর্থাৎ মোহর। স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীকে মোহরানা দিতে হবে। রাসূল (স.) এক ব্যক্তিকে বললেন, 'তুমি বিবাহ কর, একটি লোহার আংটির বিনিময়ে হ'লেও'।[১৫]

ওয়ালীমা অনুষ্ঠানে দাওয়াত

বিবাহের পরে বরের অন্যতম কর্তব্য হ'ল ওয়ালীমা করা। আলী (রাঃ) যখন ফাতিমা (রাঃ)-কে বিবাহের পয়গাম পাঠালেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'অবশ্যই নববধুর জন্য ওয়ালীমা হ'তে হবে'।[১৬] ওয়ালীমার দাওয়াতে উপহার দেয়া বা নেওয়া রাসূলের সুন্নাহ নয়, সুন্নাহ হ'ল সৎ ব্যক্তিগণকে দাওয়াত দেয়া। দরিদ্র লোকজনকে এসব অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত করা গর্হিত কাজ। রাসূল (স.) বলেন, شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ 'খাদ্যের মধ্যে নিকৃষ্ট খাবার ঐ ওয়ালীমার খাবার যাতে শুধু ধনীদেরকে দাওয়াত দেয়া হয় এবং দরিদ্রদেরকে ত্যাগ করা হয়। আর ওয়ালীমার দাওয়াত যে কবুল করল না, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতা করল'।[১৭]

সুন্নাহর আলোকে পর্দা

গায়রে মাহরাম পুরুষের দৃষ্টি থেকে মুসলিম মহিলা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ঢেকে রাখাকে পর্দা বলা হয়।[১৮] পর্দা ইসলামের সার্বক্ষণিক পালনীয় অপরিহার্য বিধান। এ বিধানকে অমান্য করার কোনো অবকাশ নেই। আল্লাহ বলেন, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا "ঈমানদার মহিলাদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে, যৌনাঙ্গের হেফাযত করে এবং তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। তবে যা সাধরণত প্রকাশমান"।[১৯] রাসূল (স.) বলেছেন, الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ "মহিলারা হলো পর্দায় থাকার বস্তু। সুতরাং তারা যখন (পর্দা উপেক্ষা করে) বাহিরে আসে, তখন শয়তান তাদেরকে (অন্য পুরুষের চোখে) সুসজ্জিত করে দেখায়"।[২০] উম্মে সালমাহ (রা:) হতে বর্ণিত, একদা তিনি এবং মায়মুনা (রা:) রসূলের (স.) নিকট বসা ছিলেন। হঠাৎ সেখানে ইবনে উম্মে মাকতুম এসে প্রবেশ করলেন। রাসূল (স.) উম্মে সালমাহ ও মায়মুনাকে (রা:) বললেন, তোমরা (আগন্তুক) লোকটি থেকে পর্দা কর। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, (স.) লোকটি তো অন্ধ আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। তখন রসূল (স.) বললেন, তোমরা দু'জনও কি অন্ধ যে, তাকে দেখতেপাচ্ছ না?[২১] নারী পুরুষের স্বাধীন ও অবাধ মিলনের ফলে সমাজে নৈতিক অধঃপতনের যে মারাত্মক ব্যাধি দেখা দেয়, তা হতে মুসলিম সমাজকে হেফাযত করার মানসে আল্লাহ মহিলাদের জন্য পর্দা প্রথাকে বাধ্যতামূলক করেছেন।

সুন্নাহর আলোকে মুসলমানদের পারস্পরিক অধিকারসমূহ

সৃষ্টিজীবের প্রতি পারস্পরিক অধিকার মহান আল্লাহ কর্তৃক বিধিবদ্ধ। যার প্রকৃত শিক্ষা আমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট থেকে পেয়েছি। আল্লাহ বলেন,"তোমরা আল্লাহর বন্দেগী কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। উত্তম আচরণ কর পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম, মিসকিন ও প্রতিবেশীদের সাথে, উত্তম আচরণ করবে অসহায় মুসাফির ও তোমাদের চাকর-চাকরাণীদের সাথেও। অবশ্য আল্লাহ দাম্ভিক গর্বিত লোককে পছন্দ করেন না।[২২] মুসলিমের উপর পারস্পরিক হক বা অধিকার আদায় করা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দৃষ্টিতে আমরা মুমিন বলে গণ্য হতে পারি না।

পিতা-মাতার অধিকার

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মুসলমানের নিকট আল্লাহ ও রসূলের পর তার পিতা-মাতার স্থান।[২৩] আল্লাহ বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا "আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি"।[২৪] এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল,

يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ : أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَبُوكَ

হে আল্লাহর রসূল (স.) আমার সর্বোত্তম ব্যবহারের হকদার কে? রাসূল (স.) বললেন তোমার মা। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করল, অতঃপর কে? রাসূল (স.) বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, অতঃপর কে? রাসূল (স.) (এবারও) জওয়াব দিলেন, তোমার মা। লোকটি পুনঃ জিজ্ঞেস করল, অতঃপর কে? এবারে রাসূল (স.) জওয়াব দিলেন তোমার বাপ"।[২৫] রাসূল (স.) বলেছেন,"তার নাক ধূলা-মলিন হোক, তার নাক ধূলামলিন হোক, তার নাক ধূলামলিন হোক। ছাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল, সে (হতভাগ্য ব্যক্তিটি) কে? রাসূল (স.) বললেন, সে হলো সেই লোকটি, যে তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা কোন একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও জান্নাতে যেতে পারল না।[২৬] অতএব, যে ব্যক্তি পিতা-মাতা উভয়কে অথবা তাদের কোন একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও সেবা-শুশ্রুষার মাধ্যমে তাদেরকে সন্তুষ্ট করে জান্নাত লাভ করতে পারল না, তার মত হতভাগা ব্যক্তি আর কেউ হতে পারে না।

স্বামীর অধিকার

মহান আল্লাহ স্বামীকে স্ত্রীর উপর বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন।[২৭] স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা, মনোরঞ্জনে সচেষ্টা থাকা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ এবং তাকে অসন্তুষ্ট করা চরম গোনাহের কাজ। রাসূল (স.) বলেছেন,

إِذَا صَلَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا ، وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا ،فَلْتَدْخُل مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত (নিয়মিত) আদায় করবে, রমযানের সিয়াম রাখবে, নিজের ইজ্জত আবরুর হেফাযত করবে এবং স্বামীর অনুগত থাকবে। জান্নাতের যে কোন দরজা হতে প্রবেশ করার অধিকার তার থাকবে"।[২৮] ঈমানদার স্ত্রী হল সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ। রাসূলকে (স.) প্রশ্ন করা হলো যে, মহিলাদের মধ্যে কোন মহিলাটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, "যার দিকে দৃষ্টি করে স্বামী আনন্দ পায়, যাকে কোন হুকুম করলে সে তা মান্য করে এবং স্বামীর মন মত নয় এমন কোন কাজ সে নিজের কিংবা নিজের সহায় সম্পদের ব্যাপারে করে না"।[২৯] রাসূল (স.) বলেন, সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হলো, ঈমানদার স্ত্রী, যে দ্বীনের কাজে স্বামীকে সাহায্য করে"।[৩০] যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীকে শয়নের বিছানায় ডাকে, আর স্ত্রী অস্বীকার করে, ফলে স্বামী রাত্রিভর স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট থাকে, ভোর পর্যন্ত ফিরেশতারা সে নারীকে লা'নত করতে থাকে।[৩১]

স্ত্রীর অধিকার

স্বামীর কাছে স্ত্রীর কিছু হক বা অধিকার আছে, যেগুলি আদায় করা স্বামীর জন্য অবশ্য কর্তব্য। রাসূল (স.) বলেছেন, "হে জনমন্ডলী, তোমরা মহিলাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। কেননা তোমাদের মহিলারা সংসারে বন্দিনীর ন্যায়। তারা প্রকাশ্যে তোমাদের অবাধ্য না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে কঠোরতা করতে পার না।"[৩২] কোন ঈমানদার পুরুষের পক্ষে ঈমানদার নারীকে ঘৃণা করা ঠিক হবে না। কেননা ঈমানদার স্ত্রীর মধ্যে কোন একটি বিষয় খারাপ থাকলেও বহু উত্তম গুণও থাকে" (যা স্বামীর নিকট খুবই পছন্দনীয়)।[৩৩] রাসূল (স.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে উত্তম, যে তার পরিবার পরিজনের নিকট উত্তম। আমি আমার পরিজনের কাছে তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম। আর তোমাদের কোন সঙ্গী যখন মৃত্যু বরণ করবে, তখন তাকে তোমরা ক্ষমা করে দিবে"।[৩৪] এ অধিকারগুলি যথাযথভাবে প্রদান করলে স্বামীর প্রতি স্ত্রী যেমন অনুগত হয় তেমনি তার প্রতি স্ত্রীর ভালবাসা-মহববত অটুট থাকে।

সন্তানদের অধিকার

পিতা-মাতার উপর সন্তান-সন্ততির অধিকারের মধ্যে অন্যতম হল তাদের মধ্যে ইনসাফ বজায় রাখা। একদা নোমানের পিতা তাকে (নোমানকে) একটি গোলাম দান করলে রসূল (স.) বললেন, "তুমি কি তোমার অন্যান্য ছেলে-মেয়েদেকেও অনুরূপ একটি দান করেছ? তিনি জওয়াব দিলেন না। রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ কর"।[৩৫] রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তিনটি বিষয় এমন আছে যার সওয়াব মৃত্যুর পরও চালু থাকে। তন্মধ্যে একটি হল নেক সন্তান, যে পিতা-মাতার জন্য দোয়া করে।[৩৬] যাকে আল্লাহ কন্যা সন্তান দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছে, অতঃপর সে কন্যাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। কিয়ামতে এ কন্যা তার জন্য দোযখের ঢাল স্বরূপ হবে ।[৩৭] অতএব সন্তানদের জন্য পিতার সর্বোত্তম দায়িত্ব হলো তাদেরকে উত্তম তালীম ও তরবীতে গোড়ে তোলা। আর সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে ইনসাফ না করা শরীয়তের দৃষ্টিতে দোষনীয়। তাছাড়া এর দ্বারা সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া ফাসাদ সৃষ্টি হবে, ফলে পিতা-মাতার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাবে ।

ইয়াতিমের অধিকার

ইসলাম ইয়াতিমের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূল (স.) এরশাদ করেছেন, আমি এবং ইয়াতিমের লালন পালনকারী জান্নাতে এভাবে অবস্থান করব। এ বলে রাসূল (স.) তাঁর শাহাদাত এবং মধ্যাঙ্গুলির মধ্যে সামান্য ফাঁক করে সেদিকে ইঙ্গিত করলেন"।[৩৮] অতএব এতিমের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল হওয়া, তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা, তাদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হওয়া এবং সর্বদা তাদের পাশে থাকা প্রত্যেক ঈমানদারের সামাজিক দায়িত্ব।

প্রতিবেশীর অধিকার

ইসলামে প্রতিবেশীর হক ও অধিকারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রাসূল (স.) বলেছেন, "জিব্রাঈল (আ:) আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে তাকীদ দিচ্ছিলেন। এমনকি আমার ধারণা জন্মেছিল হয়ত প্রতিবেশীকে সম্পত্তিতে হকদার (ওয়ারেছ) করা হবে"।[৩৯] একদা রসূল (স.) তিনবার আল্লাহর কসম করে বললেন, "সে লোকটি কিছুতেই ঈমানদার নয়, যার অনিষ্ট হতে তারপ্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না"।[৪০] যে ব্যক্তি তৃপ্তি সহকারে পেটপুরে ভক্ষণ করে, আর তারই পার্শ্বে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে সে ঈমানদার নয়।[৪১] যে সমাজের লোকেরা পরস্পর প্রতিবেশীর প্রতি সদয় থাকে, ক্ষুধার্ত প্রতিবেশীকে খাদ্য দান করে, প্রতিবেশীর অনিষ্ট সাধন হতে বিরত থাকে এবং প্রতিবেশীর মঙ্গল কামনা করে, সে সমাজ যে একটি আদর্শ সমাজ তা নি:সন্দেহে বলা চলে। আর এ ধরণের আদর্শ সমাজই ইসলামের কাম্য।

চাকর চাকরাণীর অধিকার

ইসলাম ন্যায়সঙ্গত শ্রম প্রদান করা ও চাকর চাকরাণীর অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। রসূল (স.) বলেছেন, (তোমাদের চাকর নকর বা দাস দাসী প্রকৃত পক্ষে) তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ যার ভাইকে তার অধীনস্থ করেছেন, তার উচিত সে যা খায় তাই তাকে খাওয়াবে এবং সে যা পরিধান করে তাই তাকে পরিধান করাবে আর তার উপরে ক্ষমতা বহির্ভূত কোন কাজ চাপাবে না। একান্ত যদি চাপান হয়, তাহলে কাজটি সমাধা করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করবে"।[৪২] অতএব যে কোন শ্রমকেই আমাদের গুরুত্ব দেয়া উচিত। চাকর চাকরাণীর মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষায় সম্ভাব্য সব প্রচেষ্টাই একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ ইসলামী সমাজ গঠন সম্ভব।

গরীব মিসকিনের অধিকার

আল্লাহর রাসূল (স.) সমাজের অসহায়, গরীব, মিসকীন, ইয়াতীম, বিধবা ইত্যাদি অভাবী লোকদের খোজ খবর নিতে, তাদের অভাব মোচন করতে এবং তারা ক্ষুধার্ত থাকলে তাদেরকে খাদ্য দান করতে আদেশ করেছেন। রাসূল (স.) বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিনে (আদম সন্তানকে লক্ষ্য করে) বলবেন, হে আদম সন্তান, আমি তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাদ্য দাও নি। আদম সন্তান বলবে, হে পরওয়ারদেগার, আমি কি করে তোমাকে খাওয়াতে পারি, অথচ তুমিই সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক? আল্লাহ বলবেন, তোমার কি মনে নেই তোমার কাছে আমার অমুক বান্দাহ খাদ্য প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাদ্য দাওনি? তুমি কি জানতে না যে, সেদিন যদি তুমি তাকে খাদ্য দিতে তাহলে অবশ্যই তা তুমি আমার কাছে পেয়ে যেতে।[৪৩] এ ধর্মের মহান শিক্ষাই হচ্ছে, আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের অধিকারী হলে নিজের ও পরিবারের পাশাপাশি সমাজের গরীব মিসকিনের দায়িত্বও পালন করতে হবে।

অসুস্থ ব্যক্তির অধিকার

অসুস্থ কোনো মুসলমান ভাইয়ের সেবায় নিয়োজিত হতে পারা নিজের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। রুগ্ন ব্যক্তির সেবার মাধ্যমে প্রভুর নৈকট্য লাভ করা সহজ। রসূল (স.) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ (কোন এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে আদম সন্তান আমি রোগাক্রান্ত হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে যাওনি। সে বলবে হে আমার প্রতিপালক, তুমি কি করে রোগাক্রান্ত হলে যে, আমি তোমাকে দেখতে যাব অথচ তুমি সারা বিশ্বের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দাহ পীড়িত হওয়া সম্পর্কে তুমি অবগত ছিলে, অথচ তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে, তাহলে আমাকে তুমি সেখানে পেতে"।[৪৪] একজন মুসলমান যখন তার কোন রুগ্ন মুসলমান ভাইকে দেখতে যায়, তখন যেন সে জান্নাতের বাগানে ফল আহরণ করতে থাকে, বাড়ী ফিরে না আসাপর্যন্ত।[৪৫] সুতরাং সমাজে কোন মুসলমান যখন রোগগ্রস্ত হয়, তখন অন্য মুসলমান ভাইয়ের তার খোঁজ খবর নেয়া ও তার পরিচর্যা করা উচিত।

মুসলমানের পরস্পরের উপর পরস্পরের অধিকার

রসূল (স.) বলেছেন, "মুসলমান পরস্পরের ভাই। সুতরাং সে তার উপরে কোন প্রকার যুলুমও করতে পারে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায়ও ফেলতে পারে না। আর যে তার মুসলমান ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তার অভাব পূরণ করবেন। অনুরূপভাবে যে কোন মুসলমানের দুঃখ দূর করে দিবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দুঃখ দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ত্রুটি গোপন করে রাখবে, আল্লাহ হাশরের দিন তার ত্রুটিও গোপন করে রাখবেন"।[৪৬] কারও পক্ষে তার (মুসলমান) ভাইয়ের সহিত

তিন দিন ও রাত্রি সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা বৈধ হবে না, এমনভাবে যে পরস্পর পরস্পর হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে। হ্যাঁ তাদের এ নীরবতা প্রথমে যে সালাম দিয়ে ভঙ্গ করবে সেই উত্তম।[৪৭]

পশু-পক্ষীর অধিকার

ইসলামে শুধু মানবজাতির ক্ষেত্রেই সুবিচার করার আদেশ দেয়া হয়নি বরং পশুপক্ষী প্রভৃতি বাকহীন জীবের বেলায়ও সুবিচার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূল (স.) বলেন, "তোমরা দুনিয়াবাসীকে দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদেরকে দয়া করবেন"।[৪৮] রাসূল (স.) বলেন, বাকহীন পশুগুলোর ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা উত্তম অবস্থায় এর উপর আরোহণ করবে এবং উত্তম অবস্থায় তাকে ছেড়ে দিবে। (অর্থাৎ সুস্থ সবল অবস্থায় এর উপর আরোহণ করবে এবং ক্ষুধায় কাতর হওয়ার পূর্বেই পিঠ হতে অবতরণ করবে)"।[৪৯]

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম মানুষের সম্পূর্ণ সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করেছে। কুরআনের পাশাপাশি রাসূল (স.) এর সকল সুন্নাহর বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত করলে সমাজে শান্তি-শৃংখলা বিরাজ হওয়া সম্ভব। এর ফলে মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে একটি স্বস্তির পরিবেশ বিরাজ করে। মানুষের মৌলিক বিকাশ সাধিত হবার ফলে সমাজের সার্বজনীন কল্যাণ নিশ্চিত হবার পাশাপাশি কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সাধিত হয়।

তথ্যনির্দেশ

১ ড. মুহাম্মাদ আমীন আল মিসরী, *আল মুজতামি'উল ইসলামী*, (কুয়েতঃ দারুল আরকাম, ১ম সংস্করণ, ১৪০০ হি./ ১৯৮০ খ্রি.) পৃ. ০৮।

২ আল-কুরআন, সূরা মায়েদাহঃ ২।

৩ আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনে আশআস, *সুনানু আবি দাউদ*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত : মাকতাবাতুল আছরিয়্যাহ, তা. বি.) পৃ.২৮৬, হা/৪৯৪৪।

৪ ড. সালিহ বিন গানিম বিন আব্দিল্লাহ, *রিসালাতু ফিল ফিকহিল মুয়াস্সার*, (আল মামলাকাতুল আরাবিয়্যাহ আস সাউদিয়্যাহঃ ওয়যারাতুশ শুয়ূন আল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল আওকাফু ওয়াদ্ দাওয়াতু ওয়াল ইরশাদু, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.) পৃ. ১২২।

৫ আল-কুরআন, সূরা নূরঃ ৩২।

৬ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আবু আবদিল্লাহ আল বুখারী, *সহীহ বুখারী*, য়৩ খণ্ড (দারু তুকিন্নাজাহ, ১ম সংস্করণ ১৪২২ হি.) পৃ.২৬, হা/১৯০৫।

৭ *প্রাগুক্ত*, ম৭ খণ্ড, পৃ. ০৪, হা/৫০৭৩।

৮ আবু আব্দির রহমান আহমাদ বিন শুয়াইব বিন আলী আল খুরাসানী আন নানাঈ, *সুনানুস সুগরা লিন নাসাঈ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (হালাবঃ মাকতাবাতুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ ১৪০৬ হি.), পৃ.৫৮, হা/৩২১৩।

৯ মুসলিম বিন আল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী আন নিসাপূরী, *সহীহ মুসলিম*, ২য় খন্ড (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তা. বি.) পৃ. ১০৮৬, হা/১৪৬৬।

১০ *সুনানু আবি দাউদ*, য়২ খণ্ড, পৃ.২২৮, হা/২০৮২।

১১ আবু ঈসা আত তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, ২য় খণ্ড (মিশরঃ শিরকাতু মাকতাবাহ, ২য় সংস্করণ ১৩৯৫ হি.) পৃ. ৩৮৮, হা/১০৮৭।

১২ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আরাফাহ আদ দাসূকী, তাহকীকঃ মুহাম্মাদ ইলয়্যাশ, *হাশিয়াতুদ দাসূকী আ'লা শারহিল কাবীর*, ২য় খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল ফিক্‌র, তা. বি.) পৃ. ২৯৩।

১৩ আল-কুরআন, সূরা নিসাঃ ২৪।

১৪ *সহীহ বুখারী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯০, হা/২৭২১।

১৫ *প্রাগুক্ত*, ম৭ খণ্ড, পৃ. ২০, হা/৫১৫০।

১৬ আবূ আব্দির রহমানমুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, *আদাবুয যিফাফ*, (দারুস সালাম, তা. বি.) পৃ. ১৪৪।
১৭ *সহীহ বুখারী*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৫, হা/৫১৭৭।
১৮ ড. মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইসমাঈল আল মুকাদ্দাম, *আদিল্লাতুল হিজাব*, (ইসকানদারিয়্যাহঃ দারুল আইমান, তা. বি.) পৃ. ৭৬।
১৯ আল-কুরআন, সূরা নূর: ৩১।
২০ *সুনানুত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৮, হা/১১৭৩।
২১ *প্রাগুক্ত*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১০২, হা/২৭৭৮।
২২ আল-কুরআন, সূরা নিসা: ৩৬।
২৩ ইবনে কাসীর, তাহকীক: সামী বিন মুহাম্মাদ সালামাহ, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, ৫ম খন্ড (দারুত তাইয়্যিবাহ, ২য় সংস্করণ ১১৪২০ হি.) পৃ. ৬৪।
২৪ আল-কুরআন, সূরা আনকাবূত: ৮।
২৫ *সহীহ মুসলিম*, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৯৭৪, হা/২৫৪৮।
২৬ *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৯৭৮, হা/২৫৫১।
২৭ *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, ২য় খন্ড (দারুত তাইয়্যিবাহ, ২য় সংস্করণ ১১৪২০ হি.) পৃ. ২৯২।
২৮ মুহাম্মাদ বিন আব্দিল্লাহ আল খতীব আলউমারী আবূ আব্দিল্লাহ ওয়ালিউদ্দীন তিবরিযী, *মিশকাতুল মাছাবীহ*, ২য় খণ্ড (বৈরূত : মাকতাবাতুল ইসলামী, ২য় সংস্করণ ১৯৮৫ খ্রি.) পৃ. ৯৭১, হা/৩২৫৪।
২৯ *সুনানুস সুগরা লিন নাসাঈ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.৬৮, হা/৩২৩১।
৩০ *সুনানুত তিরমিযী*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৭, হা/৩০৯৪।
৩১ *সহীহ বুখারী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৬, হা/৩২৩৭।
৩২ *সুনানুত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৯, হা/১১৬৩।
৩৩ *সহীহ মুসলিম*, ২য় খন্ড, পৃ. ১০৯১, হা/১৪৬৯।
৩৪ *সুনানুত তিরমিযী*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭০৯, হা/৩৮৯৫।
৩৫ *সহীহ মুসলিম*, ৩য় খন্ড, পৃ. ১২৪২, হা/১৬২৩।
৩৬ *প্রাগুক্ত*, ৩য় খন্ড, পৃ. ১২৫৫, হা/১৬৩১।
৩৭ *সহীহ বুখারী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১০, হা/১৪১৮।
৩৮ *প্রাগুক্ত*, ৮ম খন্ড, পৃ. ৯, হা/৬০০৫।
৩৯ *সহীহ মুসলিম*, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২০২৫, হা/২৬২৪।
৪০ *সহীহ বুখারী*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১০, হা/৬০১৬।
৪১ *মিশকাতুল মাছাবীহ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯১, হা/৪৯৯১।
৪২ *সহীহ বুখারী*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৬, হা/৬০৫০।
৪৩ *সহীহ মুসলিম*, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৯৯০, হা/২৫৬৯।
৪৪ *প্রাগুক্ত।*
৪৫ *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৯৮৯, হা/২৫৬৮।
৪৬ *সহীহ বুখারী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৮, হা/২৪৪২।
৪৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১, হা/৬০৭৭।
৪৮ *সূনানুআবি দাউদ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.২৮৫, হা/৪৯৪১।
৪৯ *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩, হা/২৫৪৮।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

ইসলামে শিষ্টাচার ও সংস্কৃতি
(Etiquette and Culture in Islam)

মোঃ মোজাফ্‌ফার হুসাইন*

Abstract: Islam is a complete code of life. In this sense, the prevalence of islamic etiquette and culture is recognized. Living without manners and culture is full of chaos. In building a civilized society, ideal nation, Etiquette education and healthy culture practice is necessary. Without it the welfare of the nation is uncertain. One of the reasons of moral decay and criminality is lack moral education and cultural practices. Correction and reform in individual, family and society are necessary. Basically ethics, values and development covered by manners and culture. Islam includes personal, family, social, economic, cultural and political sphere among others. So in everywhere etiquette and culture are essential.

ভূমিকা

মহান আল্লাহ মানুষের জন্য সু-শৃঙ্খল ভারসাম্যপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করেছেন। ইসলামে রয়েছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ও বিষয়ের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা। মানব জীবনে শিষ্টাচার ও সুস্থ ধারার সংস্কৃতি চর্চা থাকা আবশ্যক। শিষ্টাচারকে ইসলামের সারবস্তু বলা যায়। সমাজে যথাযথ শিষ্টাচার শিক্ষা ও সুস্থ ধারার সংস্কৃতি চর্চা না থাকায় অনৈতিক কর্মকাণ্ড ঘটমান। সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ ভূলুণ্ঠিত। মানুষের নৈতিক অবক্ষয় ও মূল্যবোধ বিনষ্ট হতে চলেছে। শিষ্টাচারহীন মানুষ গুরুজন, পিতা-মাতা, শিক্ষক ও বড়দেরকে সম্মান করে না এবং ছোটরা তাদের নিকট থেকে স্নেহ পায় না। সমাজে প্রতিনিয়ত উগ্রতা ও চারিত্রিক পদস্খলনের মাত্রা বেড়ে চলেছে। বিরাজমান প্রতিকূল এ পরিস্থিতিতে এসব শিষ্টাচারহীন মানুষের কাছ থেকে কল্যাণ আশা করা যায় না। আদর্শ ও সু-শৃঙ্খল সমাজ গঠনে শিষ্টাচার ও সুস্থধারার সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। সুসভ্য জাতি গঠনে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে রয়েছে সর্বোত্তম উপায় ও উপকরণ। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সবর্ত্র শিষ্টাচার ও সুস্থ ধারার সংস্কৃতি বাস্তবায়ন হলে আদর্শ ও সুসভ্য জাতি গঠন ত্বরান্বিত হবে। এটা ছাড়া সু-শৃঙ্খল সমাজ গঠনের চিন্তা করা যায় না। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এটি বাস্তবায়নে গুরুত্বারোপ করতে হবে।

শিষ্টাচার পরিচিতি

‘শিষ্টাচার’ বাংলা শব্দ। শব্দটির বিশ্লেষণে অভিধানে বলা হয়েছে ‘শিষ্ট’ শব্দটির অর্থ শান্ত, ভদ্র, সুশীল, সুবোধ, নীতিমান, মার্জিত; আর ‘আচার’ শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো শিষ্টজনদের অনুমোদিত পদ্ধতি বা নিয়ম। এ দুটি শব্দের সম্মিলিত সন্ধিরূপ শিষ্টাচার। অর্থ ভদ্র ব্যবহার যা ধারণের বিষয়। আরবীতে প্রতিশব্দ ادب এটি একবচন, বহুবচনে اداب এর অর্থ হলো শিষ্টাচার, ভদ্রতা ও সভ্যতা।[১] শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ Etiquette, civility, courtesy, politeness।[২] পারিভাষিক অর্থে আহনাফ কায়েস বলেন, الادب نور العقل كما ان النور فى الظلمة نور البصر আদাব বা শিষ্টাচার বিবেকের জ্যোতি যেমন অন্ধকারে আলো দৃষ্টিশক্তির জ্যোতি।[৩] সংজ্ঞা বিশ্লেষণে বুঝা যায় যে, মানব জীবনে স্থান-কাল ও পাত্রভেদে সার্বিক শৃঙ্খলা রক্ষা করার নাম শিষ্টাচার। যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে কোন বস্তু বা বিষয়

---

* পি.এইচডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পন্ন করা অথবা তাতে অভ্যস্ত হওয়া শিষ্টাচার। কেবল আত্মিক ও চরিত্রগত দিক শিষ্টাচারিতায় সীমাবদ্ধ নয়। বরং শিষ্টাচার জীবন ঘনিষ্ঠ ব্যাপক বিষয়। মানব জীবনে সু-শৃঙ্খল গতি বজায় রাখার যথাযথ ব্যবস্থাপনার নাম শিষ্টাচার।

সংস্কৃতি পরিচিতি

'সংস্কৃতি' বাংলা শব্দ। নতুন বাংলা অভিধানে, এর অর্থ লেখা হয়েছে 'সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ। সাধারণত সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মার্জিত রুচি বা অভ্যাসজাত উৎকর্ষ। আর Culture বা সংস্কৃতি হচ্ছে সভ্যতা বা Civilization যা মানসিক ও রুচিগত ব্যাপার। তাতে থাকা-খাওয়ার নিয়ম-নীতি, সামাজিক-সামষ্টিক আচার-অনুষ্ঠান, স্বভাব-চরিত্র, আনন্দ-উৎসব, শিল্পচর্চা, সামষ্টিক আদত-অভ্যাস, পারস্পরিক আলাপ-ব্যবহার ও আচরণের বিধি শামিল রয়েছে। সংস্কৃতি শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হলো الثقافة। এর অর্থ হলো সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সভ্যতা।[৪] এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো civilization, refinement, culture[৫] ইসলামী সংস্কৃতির সংজ্ঞায় আশ-শাইখ হাসান আইয়ুব বলেন, الثقافة الإسلامية "أنها السلوك الحسن والعمل الصلح والخلق الكريم القائم على التشريع الإسلامي والمنهج الرباني، والملتزم بالخط المحمدي في جميع شؤنه". অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে উত্তম পন্থা, সৎ কর্ম ও সুন্দর চরিত্র যা ইসলামী শরীয়ত ও আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং মুহাম্মদ (স.) এর আদর্শ সম্পৃক্ত।[৬] আসলে সংস্কৃতি হলো বিভিন্ন চিন্তা-চেতনার অগ্রগতির বৈশিষ্ট্য বহনকারী বিষয় যা রাজনৈতিক জ্ঞান, রীতি-পদ্ধতি, ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয় বিশেষত আচার-আচরণ এবং চলার পদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। কুরআন-সুন্নাহর বুনিয়াদে পরিচালিত মানব জীবনের সকল কর্মকাণ্ড, ক্রিয়াকলাপ ও আচরণই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলামের পদ্ধতি অনুসারে কোন কিছু জানা যা চিন্তা-চেতনা, শৃঙ্খলা ও মূল্যবোধে পরিব্যপ্ত এবং যা হতে মানবীয় উত্তরাধিকার যাচাই হয় তা সংস্কৃতি। সংজ্ঞায় প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের অভ্যাসগত দিক ও উৎকর্ষজনিত বিষয়গুলো সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত।

শিষ্টাচার ও সংস্কৃতির শারঈ ভিত্তি

পবিত্র কুরআনের আলোকে শিষ্টাচার ও সংস্কৃতি

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামী শিষ্টাচার ও সংস্কৃতি আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ ও রিসালাত ভিত্তিক, যা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। শিষ্টাচার ও সংস্কৃতি পালনে মানুষের জীবনযাত্রা সুশৃঙ্খল হয়। মানুষ নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়। এতে রয়েছে পার্থিব ও পরলৌকিক কল্যাণ। আল-কুরআনে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। শিষ্টাচার সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا যমীনে বড়াই করে চলো না; তুমি তো কখনো যমীনকে ফাটল ধরাতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনো পাহাড় সমান পৌঁছতে পারবে না।[৭] এ আয়াতে বিনম্রতা অর্জনের শিক্ষা রয়েছে। বিনয়-নম্রতা ও শিষ্টাচারিতার মাধ্যমে মানুষ উন্নত হয়। অপরদিকে অহংকার পতনের মূল। অহংকারে শিষ্টাচার বিনষ্ট হয়। অন্যত্র শিষ্টাচার প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।[৮] নিজের অবস্থান তুলনামূলক উন্নত হলে মানুষ তার নিম্ন শ্রেণীর লোকদেরকে অবজ্ঞা করতে শুরু করে। অবজ্ঞা করা এক সময় কুঅভ্যাসে পরিণত হয়। অবজ্ঞা করার উদাহরণ হল ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা, দূর্বলতার সূযোগে কষ্ট দিয়ে কথা বলা, বিপদে হাসি-তামাশা করা ও আনন্দ-উল্লাস করা। সর্বোপরি নিজের অহমিকা প্রকাশের সুযোগ খুঁজতে থাকা দাম্ভিক মানুষের স্বভাব। এসবই মূলত অবজ্ঞা এবং উদ্ধত আচরণ হিসেবে পরিগণিত, যা শিষ্টাচার পরিপন্থী। তিনি

আরো বলেন, وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, তোমার আওয়াজ নীচু কর; নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ।[৯] অহংকারের সাথে বিলাস জীবন যাপনে কখনই সুখ পাওয়া যায় না। কোন জিনিসের অতিরঞ্জন ভালো নয়। তাতে সীমালঙ্ঘন ও যুলুম মিশ্রিত থাকে। নিজের নফসের উপর বাড়াবাড়ি হয়। কু-অভ্যাস তৈরি হয় এবং সুঅভ্যাস বিনষ্ট হয়। অধিকার হরণের পথ তৈরি হয়। এজন্য মধ্যপন্থা অবলম্বনই যথাযথ। এ পথ অবলম্বন করা বিনয়ী মানুষের স্বভাব। শিষ্টাচারী মানুষের কথায় মাধুর্যতা থাকে। তারা কর্কশভাষী নন। অহেতুক চিৎকার-চেঁচামেচি তারা পছন্দ করেন না। তারা নিচু আওয়াজে কথা বলেন যা মানুষকে প্রভাবিত করে। প্রাণীকুলের মধ্যে গাধার আওয়াজ উচ্চ ও কর্কশ। তাই শিষ্টাচারহীন মানুষের কথা বলার ধরণের সাথে গাধার আওয়াজের তুলনা করা হয়েছে।

এজন্য কথোপকথনের ব্যাপারে মুমিনদেরকে সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর আওয়াজের উপর তোমাদের আওয়াজকে উঁচু করো না এবং তোমরা নিজেরা পরস্পর যেমন উচ্চস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরকম উচ্চস্বরে কথা বলো না। এ আশংকায় যে, তোমাদের সকল কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না।[১০] এ আয়াতের শিক্ষা হল আলিমসহ মর্যাদা সম্পন্ন মানুষের সাথে সুন্দর বচনভঙ্গিতে কথা বলা আবশ্যক। সুন্দর করে কথা বলা মুমিনের অন্যতম গুণ। অবমাননা হয় এমন শব্দ ও বাক্য বলা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। বদ আচরণের কারণে আমল বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে, বিনয়-নম্রতা, প্রাঞ্জলতা ও মাধুর্যতা বজায় রেখে কথা বলার অভ্যাস গড়ে উঠলে অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি হবে। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

নিশ্চয় যারা আল্লাহর রাসূলের নিকট নিজেদের আওয়াজ অবনমিত করে, আল্লাহ তাদের অন্তরগুলোকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করেছেন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।[১১] এসকল আয়াতে শিষ্টাচারিতা সম্পর্কে শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত আছে। কুরআনে সংস্কৃতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا তোমাদের যখন অভিবাদন করা হয় তোমরাও এর চেয়ে উত্তম প্রত্যাভিবাদন করবে অথবা অনুরূপ অভিবাদন করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।[১২] এখানে পরস্পর সালাম বিনিময়ের কথা বলা হয়েছে। এটা একই সাথে বিধান ও ইসলামী সংস্কৃতি।

আল-হাদীসের আলোকে শিষ্টাচার ও সংস্কৃতি

পবিত্র কুরআনের পর হাদীসের বিভিন্ন অধ্যায় পর্যালোচনা করলে মানব জীবনের সকল দিক-নির্দেশনায় শিষ্টাচার ও সংস্কৃতির সংশ্লিষ্টতা ও সর্বজনীনতা প্রমাণিত হয়। কোন কাজ সম্পন্ন করতে হলে নিয়ম কানুন ও আদব কায়দা-বজায় রাখা প্রয়োজন। পানাহার, উঠাবসা, চলাফেরা, আচার-আচরণ, আদান-প্রদান, অভিবাদন, আনন্দ-বিনোদন, শিশুর আক্বিকা, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন বিষয়ে রয়েছে শিষ্টাচার ও সংস্কৃতি। রাসূল (স.) বলেন, **بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ** আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতাপ্রদানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।[১৩] চরিত্রের পূর্ণতা বলতে জীবন ঘনিষ্ট সবকিছুকে বুঝানো হয়েছে। যেখানে আছে মূল্যবোধ, যথার্থতা, সাম্য, শৃঙ্খলা, ন্যায়-নিষ্ঠতা ও নৈতিকতা। শিষ্টাচার ও সংস্কৃতি এমন বিষয় যাতে রয়েছে মানবতা ও কল্যাণ। এটা আল্লাহর একত্ব দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, যা বিশ্বাসীদের জন্য উপকারী। আয়েশা

(রা.) রাসূল (স.) এর চরিত্র সম্পর্কে বলেন, তার চরিত্র হল 'কুরআন'।[১৪] আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, নবী (স.) চারিত্রিক ও মৌখিক অশ্লীলতা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّابًا، وَلاَ فَحَّاشًا، وَلاَ لَعَّانًا، كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ المَعْتِبَةِ: «مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ»

রাসূল (স.) এর শিষ্টাচার সম্পর্কে আনাস বিন মালেক (রা.) বলেন, নাবী (স.) কাউকে গালি দিতেন না, অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করতেন না এবং কাউকে অভিশাপ দিতেন না, কাউকে তিরস্কার করতে হলে শুধু এটুকু বলতেন, 'তার কী হয়েছে; তার কপাল ধুলায় ধূসরিত হোক' ।[১৫]

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ بِالْمَدِينَةِ وَأَنَا غُلَامٌ لَيْسَ كُلُّ أَمْرِي كَمَا يَشْتَهِي صَاحِبِي أَنْ أَكُونَ عَلَيْهِ مَا قَالَ لِي فِيهَا أُفٍّ قَطُّ، وَمَا قَالَ لِي لِمَ فَعَلْتَ هَذَا أَوْ أَلَّا فَعَلْتَ هَذَا»

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। আমি মদীনায় দীর্ঘ দশ বছর রাসূল (স.) এর সেবায় নিয়োজিত ছিলাম। তিনি আমার ব্যাপারে কখনো 'উহ' শব্দটি উচ্চারণ করেননি। আর তিনি কখনো বলেননি, তুমি কেন এটা করেছ কিংবা এটা কেন করনি'?[১৬] রাসূল (স.) বলেন, إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا 'তোমাদের মধ্যে আমার নিকটে সর্বাধিক প্রিয় সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র উত্তম'।[১৭] তিনি আরো বলেন, ক্বিয়ামত দিবসে ঐ ব্যক্তি আমার খুবই নিকটে থাকবে যার চরিত্র ও আচরণ সর্বোত্তম।[১৮] পরিবারকে আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাসূল (স.) বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, وَلاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَباً'তাদের থেকে তোমার শিষ্টাচারের লাঠিকে উঠিয়ে নিও না'।[১৯] সর্বোপরি, এসব হাদীস থেকে শিষ্টাচারিতা প্রমাণিত হয়।

শিষ্টাচার ও সংস্কৃতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামে শিষ্টাচার ও সংস্কৃতি তাওহীদ ও রিসালাত ভিত্তিক। মানব জীবনের সর্বত্র এর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এখানে ভারসাম্যপূর্ণ আচার-ব্যবহার, সংযমশীলতা ও নিয়ন্ত্রিত জীবনের গুরুত্ব সর্বাধিক। দেহ ও আত্মার বিরোধ মিটিয়ে সমন্বয় সাধন করা ইসলামী শিষ্টাচার ও সংস্কৃতির লক্ষ্য। নৈতিক সংগ্রামের উদ্দেশ্য হলো সংস্কারের মাধ্যমে বিভেদকে পরাভূত করা।[২০] এটা অনুশীলনে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক জীবনের ঐকিক কল্যাণ লাভ হয়। এটা বিশেষ কোন গোত্র, বর্ণ, শ্রেণী, বংশ, কাল বা অঞ্চলের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। তাক্বওয়ার ভিত্তিতে এটার সীমা-পরিধি সমগ্র বিশ্বলোকে পরিব্যাপ্ত। শিষ্টাচার ও সংস্কৃতি চর্চায় মানুষ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহভীতি ও তাক্বওয়ার নীতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। ইসলামী শিষ্টাচার ও সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার সন্দেহাতীত বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই মানুষের চিন্তা ও কর্মকে পবিত্র ও নির্দোষ করে তোলে। শিষ্টাচার ও সংস্কৃতির চর্চায় আত্মগঠন ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হয়। ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে শিষ্টাচার ও সুস্থধারার সংস্কৃতি চর্চায় পরিবেশ সংস্কার, রূপান্তর ও নবজন্ম ঘটে। সুশৃঙ্খল জীবন যাপন, ইহকালীন সাম্যতা ও পরকালীন কল্যাণ অর্জনে শিষ্টাচার ও সংস্কৃতি একটি অপরিহার্য বিষয়। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামে শিষ্টাচার ও সংস্কৃতির ভূমিকা অনন্য। সুসভ্য জাতি গঠনের সর্বোত্তম উপায় ও উপকরণ রয়েছে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে। শিষ্টাচার ও সংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রাসূল (স.) বলেন, إِنَّ الْهَدْىَ الصَّالِحَ، وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ، وَالِاقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ 'নিশ্চয়ই উত্তম চরিত্র, ভাল ব্যবহার ও পরিমিত ব্যয় তথা মধ্যপন্থা অবলম্বন করা নবুওয়াতের পঁচিশভাগের একভাগ।[২১] রাসূল (সা.) বলেন, إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا 'তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম, যাদের চরিত্র উত্তম'।[২২] আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রা.) শিষ্টাচার

প্রসঙ্গে বলেন, 'তুমি আদব অন্বেষণ কর। কারণ আদব হল বুদ্ধির পরিপূরক, ব্যক্তিত্বের দলীল, নিঃসঙ্গতায় ঘনিষ্ঠ সহচর, প্রবাসজীবনের সঙ্গী এবং অভাবের সময়ে সম্পদ।[২৩] রাসূল (স.) বলেন, 'কিয়ামতের দিন মুমিনের আমলনামায় সুন্দর আচরণের চেয়ে অধিক ভারী আমল আর কিছুই হবে না।[২৪] রাসূল (স.) বলেন, মানুষের মাঝে নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যার অনিষ্টতার কারণে মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে।[২৫]চরিত্র আচরণের ভিত্তি ও স্বভাবগত বিষয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষের অভ্যাসই তার চরিত্র গঠন করে।[২৬] দার্শনিকদের কেউ শিষ্টাচার প্রসঙ্গে বলেন,لاَ أَدَبَ إِلاَّ بِعَقْلٍ، وَلاَ عَقْلَ إِلاَّ بِأَدَبٍ 'বিবেক ছাড়া শিষ্টাচার হয় না; আর শিষ্টাচার ছাড়া বিবেক হয় না। অর্থাৎ একটি আরেকটির পরিপূরক।[২৭]আহনাফ আল-কায়েস বলেন, الأدب نور العقل كما أن النار نور البصر 'আদব বা শিষ্টাচার বিবেকের জ্যোতি যেমন আলো দৃষ্টিশক্তির জ্যোতি।[২৮] সার্বিক পর্যালোচনায় ইসলামে শিষ্টাচার ও সংস্কৃতির গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

পারিবারিক শিষ্টাচার ও সংস্কৃতি

মানব সমাজের ভিত্তি পরিবার। মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারিবারিক জীবন অপরিহার্য। আদর্শ পরিবারের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। শিষ্টাচার ও সংস্কৃতিতে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক যোগসূত্রতা রয়েছে। পরিবার হলো প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখান থেকে শিশুদের শিক্ষা শুরু হয়। শিশুদের উপর পারিবারিক প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবার গঠনে কর্তাকে অবশ্যই শিষ্টাচার ও সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের মানসিকতা থাকা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও।[২৯] আল্লাহ তা'আলা পরিবারের সদস্য সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলেছেন। তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের কেউ কেউ তোমাদের দুশমন। অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর।[৩০] রাসূল (স.) বলেন, لاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَباً 'পরিবার থেকে তোমার শিষ্টাচারের লাঠিকে উঠিয়ে নিও না'।[৩১] আয়াতদ্বয় ও হাদীস থেকে পরিবার গঠনের কথা স্পষ্ট হয়। আদর্শ পরিবার গঠন করতে হলে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পারিবারিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা আবশ্যক। পরিবারে শিষ্টাচার ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য সুস্থ ধারার উপায়-উপকরণ থাকা প্রয়োজন। তাদেরকে সু-শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। সুশিক্ষাই আলো, সুশিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। মুসলিম জাতির জন্য শিক্ষাব্যবস্থা হবে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক। বিষয় ভিত্তিক শিক্ষা যেটাই হোক তাতে নৈতিকতার শিক্ষা আবশ্যকীয়ভাবে গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বেড়ে চলছে গাণিতিকহারে কিন্তু নৈতিকতার উন্নয়ন তরান্বিত হয়নি। শিক্ষিত সমাজে নৈতিক পদস্খলনের ঘটনা ক্রমাগত ঘটে চলেছে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাঝে বিভিন্ন অপরাধ পরিলক্ষিত হয়। ঘরে ঘরে প্রত্যেকের রয়েছে উচ্চ শিক্ষার সনদ অথচ সিংহভাগ ক্ষেত্রে নেই উত্তম নৈতিক আদর্শ। ফলে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে। বিশ্বব্যাপী বিরাজ করছে এক কঠিন পরিস্থিতি। প্রকৃত অর্থে নীতি-নৈতিকতার অভাবে বিদ্যমান সমস্যা জটিলতর হতে চলেছে। নৈতিকতার শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ, লুটতরাজ ও প্রতারক নন। প্রতিনিয়ত শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। আইন প্রয়োগ করে শিষ্টাচার শিখানো অসম্ভব প্রায়; বরং শিষ্টাচার ও সুস্থধারার সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে মানুষ সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয় আর তৈরি হয় আইনের প্রতি সম্মানবোধ। কেউ মুচকি হেসে কথা বলতে না জানলে আইন করে তাকে মুচকি হাসার নিয়ম শিখাতে হবে বিষয়টি এরকম নয়। রাসুল (স.) জনৈক সাহাবীকে যে

দশটি উপদেশ দিয়েছিলেন সর্বশেষ উপদেশটি ছিল ‘তুমি তোমার পরিবারের উপর থেকে আদবের লাঠি উঠিয়ে নিবে না’। এর অর্থ তুমি তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে থাকবে। লুক্বমান (আ.) তাঁর সন্তানকে শিষ্টাচার অর্জনের নীতিমালা শিখিয়েছেন। সমাজে কোন অপরাধ ঘটলে আমরা সরাসরি রাষ্ট্রকে দোষারোপ করে নিজেদের দোষগুলো এড়িয়ে যেতে চাই। নিজেদের মাঝে রয়েছে পারিবারিক শাসনের অভাব, শিষ্টাচার ও সুস্থধারার সংস্কৃতি চর্চার অভাব, অনিয়ন্ত্রিত চলাফেরা, দুশ্চরিত্র, আদব-কায়দাহীন কর্মকাণ্ড আচরণ। এসব ব্যাপারে আমাদের তেমন দৃঢ় পদক্ষেপ নেই। পরিবারের কোন সদস্য চাঁদাবাজ, সন্ত্রাস, লম্পট ও বখাটে হওয়ার কারণ খতিয়ে দেখতে গুরুত্বারোপ করতে হবে। মূলত শিষ্টাচার শিক্ষা ও সুস্থ ধারার সংস্কৃতি চর্চার অভাব এবং অন্যান্য কারণে পদস্খলন ঘটে। শিক্ষাব্যবস্থায় কতিপয় বৈশিষ্ট্য হলো তাওহীদ ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা বজায় রাখা, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিক শিক্ষা আবশ্যক করা, ছেলে-মেয়ে উভয়ের শিক্ষার জন্য আলাদা পরিবেশ গঠন করা, আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদানের ব্যবস্থা করা, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কেন্দ্রিক সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরার জন্য অভিভাবক সমাবেশের ব্যবস্থা করা, শিষ্টাচার ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রসমূহ স্ববিস্তার বুঝিয়ে দেয়া, সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা, ভালো কাজের রিপোর্ট যাচাই করা, প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর জন্য উপযুক্ত সুস্থ বিনোদন চর্চার ব্যবস্থা করা এবং সংস্কৃতি চর্চার উপায়-উপকরণ প্রস্তুত রাখা, এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য। সন্তানকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে দেশ ও জাতির কল্যাণে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়গণের ভূমিকা অপরিহার্য। এ বিষয়ে তাদেরকে গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয়। হাদীসে সতী নারীকে সর্বোত্তম সম্পদ বলা হয়েছে। এ সম্পদের অর্থই হলো নারীর প্রয়োজনীয়তা। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স.) বলেন।

, مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ

তিনটি জিনিস আদম সন্তানের সৌভাগ্যের কারণ, উত্তম স্ত্রী, প্রশস্ত গৃহ ও উত্তম বাহন। অপরদিকে, তিনটি জিনিস আদম সন্তানের দুর্ভাগ্যের কারণ, অসৎ নারী, অপ্রশস্ত-সংকুচিত গৃহ ও দুর্বল বাহন।[৩২] ইসলামে নারীদের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। ইসলামে একজন মায়ের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। কারণ মা-ই হলেন সন্তানের প্রথম শিক্ষিকা। মায়ের হাতেখড়িতে একজন শিশু সন্তানের মাঝে মানবীয় গুণাবলী ও প্রতিভার বিকাশ ঘটতে থাকে। মা তাকে যে শিষ্টাচার শিক্ষা দিবেন এবং যে সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ তৈরি করবেন তা ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক যা কিছু হোক শিশুর মনে রেখাপাত করে এবং ঐ শিষ্টাচার ও সংস্কৃতিতে শিশু অভ্যস্ত হতে থাকে। যেমন কোন শিশুকে নিয়মিত নাচ-গান শিখালে সে নর্তকী ও গায়ক হওয়ার স্বপ্ন দেখবে। এ চিন্তা-চেতনা নিজের মাঝে সে লালন করবে এটাই স্বাভাবিক। অনুরূপ তাকে কুরআন শিক্ষা দিলে কুরআনের প্রতি তার আগ্রহ তৈরি হবে। তা জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করবে। সন্তান লালন-পালনে মায়ের ভূমিকায় সন্তানের পথ নির্দেশনা স্পষ্ট বিদ্যমান। পিতা-মাতার শিখানো পদ্ধতি ও আচরণে সন্তান প্রভাবিত হয়। এ মর্মে হাদীসের বর্ণনা নিম্নরূপঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ البَهِيمَةِ تُنْتَجُ البَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ»

আবূ হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, প্রত্যেক নবজাতকই জন্মলাভ করে ফিতরাতের (তাওহীদের) উপর। তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী বা খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তুলে। যেমন চতুষ্পদ জন্তু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়, তোমরা কি তাদের মাঝে কোন কান কাটা দেখতে পাও?[৩৩] হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী সন্তানের কৃষ্টি-কালচার, আচার-আচরণ, তার বেড়ে উঠার পরিবেশ সব

কিছুতে রয়েছে পিতা-মাতার অগ্রণী ভূমিকা। সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে রয়েছে কঠিন জবাবদিহিতা। পিতা স্বভাবতই অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে বাইরে বেশি সময় ব্যয় করেন, নিজ কর্মে ব্যস্ত থাকেন। আর একজন মা প্রায় সারাক্ষণ ঘরে অবস্থান করেন। তাই সন্তান মায়ের খুব কাছে থেকে বেশি সময় পায় ও সাহচর্য লাভ করে। এ ক্ষেত্রে সন্তানকে সঠিক শিক্ষাদানের ত্রুটি হলে তার দায়ভার অধিকাংশ মায়ের উপরই বর্তায়। সন্তানের চরিত্র গঠন, সুশিক্ষাদান ও সঠিক পথ দেখানোর গুরু দায়িত্ব মাতাকে পালন করতে হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স.) বলেন, 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল'। কাজেই প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, যেমন জনগণের শাসক তাদের দায়িত্বশীল, সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে, একজন পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে, স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের ও সন্তানের দায়িত্বশীল, সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে, ক্রীতদাস আপন মনিবের সম্পদের সংরক্ষক। কাজেই সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। শোন! তোমরা প্রত্যেকই দায়িত্বশীল। প্রত্যেকেই আপন অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।[৩৪] একটি সুশৃঙ্খল আদর্শ পরিবার তখনই গঠিত হবে যখন নারী ত্যাগ স্বীকার করে বুদ্ধিমত্তার সাথে সংসারে সময় ব্যয় করবে। ফলে ঐ পরিবারের সন্তান হবে সুশিক্ষিত, ভদ্র-নম্র ও চরিত্রবান। তারা হবে একেকজন আদর্শ নাগরিক। তাই পিতা-মাতার ভূমিকায় শিষ্টাচার ও সংস্কৃতির বাস্তবায়ন সম্ভব। পিতা-মাতা ছাড়াও শিশু যে সকল আত্মীয়স্বজনের সাথে সহবস্থান করে তাদেরও ভূমিকা রয়েছে। এতিম অবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুরা আত্মীয়স্বজনের নিকট প্রতিপালিত হয়। আত্মীয়স্বজন তাদেরকে যে পরিবেশে প্রতিপালন করেন ঐ পরিবেশে প্রভাবিত হয়ে তারা বেড়ে উঠে। এ দিক থেকে তারাও নিজেদের অবস্থানে শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে সক্ষম। শিষ্টাচার ও সংস্কৃতি বাস্তবায়নে পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজন যেসব বিষয়ে ভূমিকা পালন করবেন তা হলো; বসবাসরত গৃহকে পাঠশালা হিসেবে গড়ে তুলা, ধর্মীয় জ্ঞানার্জনে উৎসাহ প্রদান, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার পরিবেশ সৃষ্টি করা, ঘরোয়া শাসন অব্যাহত রাখা, অপসংস্কৃতি, মাদকতার ভয়াবহ কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, মার্জিত সুস্থ ধারার বিনোদন চর্চায় উৎসাহদান, সামাজিক মেলামেশার প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানদান, জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা, আত্ম সমালোচনা শিক্ষাদান, নারী উত্ত্যক্তরণের কুফল ও শাস্তি সম্পর্কে সচেতন করা, সামাজিক কল্যাণকর কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি।

সামাজিক শিষ্টাচার ও সংস্কৃতি

মুসলিমদের নৈতিক অধঃপতন শুরু হয়েছে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে। কালের বিবর্তনে বিভিন্ন কৃষ্টি-কালচারে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সামাজিক বিভিন্ন কু-সংস্কার, কু-প্রথা, অপসংস্কৃতির আগ্রাসন, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক নীতিহীন পরিস্থিতির কারণে হারিয়ে যেতে থাকে শিষ্টাচার, চারিত্রিক গুণাবলী ও নৈতিক শিক্ষা। এ অবক্ষয়ের ধারা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সর্বক্ষেত্রে বিদ্যমান। সামাজিক অবক্ষয়ের মাত্রা যত বেশি হবে, শিষ্টাচার ও নৈতিকতা সে তুলনায় বিনষ্ট হতে থাকবে। আসলে ধর্মীয় দিক-নির্দেশনাই সকল চারিত্রিক গুণাবলীকে দৃঢ় করে তোলার ক্ষমতা রাখে। সমাজে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন-হত্যা, ধর্ষণ, সন্ত্রাস, জুয়া, যৌন অপরাধ, মাদকাসক্তি, কালোবাজারি, মাদক ব্যবসা, চোরা চালান, সুদ-ঘুষসহ বিভিন্ন সামাজিক অবক্ষয়ের পিছনে যে যৌক্তিক কারণ নিহিত আছে তা খুঁজে বের করে অবস্থা অনুপাতে সমাধানের পথ বের করা প্রয়োজন এবং সময়ের দাবি। সামাজিক অবক্ষয়জনিত প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে শিষ্টাচার ও নৈতিক বিষয়কে সামনে রেখে মানবগোষ্ঠির উন্নতির কথা চিন্তা করা যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবসম্মত। নৈতিক সংস্কারের ফলশ্রুতিতে সমাজ উন্নতির শিখরে উপনীত হতে পারে এর উদাহরণ ইতিহাসে প্রচুর। শুইটৎসার বলেন, অন্যান্য দিকে উন্নত মানসম্পন্ন সৃজনশীল ব্যক্তিবর্গ ও বুদ্ধিজীবিগণ কাজ করলেও যদি নৈতিক ভিত্তি না থাকে তার কারণে সভ্যতা ভেঙ্গে পড়ে।[৩৫] সুতরাং তার মতে, প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণের চেয়ে মানুষের আচরণের উপর নৈতিকতার নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।[৩৬] মানুষের আচরণকে প্রভাবিত

করে এমন সকল প্রতিষ্ঠানকে সংস্কার করা না হলে মানুষের অবস্থার সার্বিক উন্নয়ন কঠিন হতে পারে। প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পরিবার। একটি শিশুর জীবনে নৈতিক গঠন ও শিক্ষার জন্য পরিবার গুরু দায়িত্ব পালন করে। মূলত পিতা-মাতাই শিশুর গুরু। যদি তারা শিক্ষিত না হন এবং তাদের চরিত্রে শিষ্টাচার, ন্যায়পরায়ণতা এবং নৈতিক শিক্ষা প্রতিফলিত না হয়, তাহলে তাদের দ্বারা দায়িত্বপালন যথাযথভাবে সুসম্পন্ন হবে না। নৈতিকতায় আগ্রহ, মানসিকভাবে সচেতন, সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল, সহযোগিতামূলক ও যত্নশীল একটি প্রজন্ম গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য পিতা-মাতা, সুশীল সমাজ, বিভিন্ন স্তরের সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গকে নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ দায়িত্ববোধ থেকে নিজেদের মাঝে বিদ্যমান ত্রুটিগুলো সংশোধন করে বৃত্তিমূলক সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে সভ্য, নৈতিক ও শিষ্টাচারপূর্ণ সমাজ গঠনে তৎপর হতে হবে এবং সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। সর্বোপরি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে যেসব বিষয় শিষ্টাচার ও সুস্থ ধারার সংস্কৃতি বিরোধী সে বিষয়ে সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হবে। ইসলামে শিষ্টাচার ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র ব্যাপক। অবস্থা অনুপাতে সব ক্ষেত্রেই রয়েছে বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব। বাস্তব জীবনে এমন কিছু বিষয় আছে যা একান্তই ব্যক্তিগত। ঐ সব কাজের মাধ্যমে একজন মুসলিমের ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠে এবং তার রুচিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়, এমন মানুষের প্রতি কারো ভ্রুক্ষেপ থাকে না। সে অন্যকে প্রভাবিত করতে পারে না। সমাজে সে হয় অবহেলিত। নিজের কল্যাণ ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অবশ্যই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যক্তিত্ব বলতে ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট সব ধরণের কর্মকাণ্ড ও আচরণকে বুঝায়। এখানে ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিষয় হচ্ছে, পরিচ্ছন্ন থাকা, নিজেকে পবিত্র রাখা, চিন্তা করে কথা বলা, কথায় মাধুর্যতা থাকা, সহনশীল হওয়া ইত্যাদি। পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকা শিষ্টাচারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নোংরা-অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তি শিষ্টাচারের মর্যাদা বুঝে না। এ জন্য পবিত্রতা অর্জন গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ আপনার পোশাক পবিত্র করুন।[৩৭] তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।[৩৮] ব্যক্তিগত শিষ্টাচারিতার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো লজ্জাশীলতা। এটি অত্যন্ত মূল্যবান বৈশিষ্ট্য। লজ্জাহীন ব্যক্তি পশু সমতুল্য। এমন ব্যক্তির মাঝে শিষ্টাচারিতা থাকে না। রাসূল (স.) বলেন, **إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ** যখন তোমার লজ্জা থাকবে না, তখন যা ইচছা তাই কর।[৩৯] লজ্জাশীলতাকে ঈমানের অঙ্গ বলা হয়েছে। তাক্বওয়া অর্জন, ধৈর্যধারণ, উদারতা, বদান্যতা, হাসি মুখে কথা বলা, রাগ না করা, মার্জিত আওয়াজে কান্না করা, ক্ষমাশীলতা, বিনম্রতা, আত্মসমালোচনা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, আমানত রক্ষা করা, উপহার প্রদান, মার্জিত পোশাক পরিধান, আত্মতৃপ্তি, রসিকতা, সহমর্মিতা, আদান-প্রদান, ন্যায়পরায়ণতা, দৃষ্টি সংযম, অনাধিকার চর্চা না করা, উঠাবসা, পানাহার- এ সবগুলোই সামাজিক শিষ্টাচার ও সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত। এসব বিষয়ে পিতা-মাতা, শিক্ষক, আলিমগণসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ভূমিকা পালন করবেন। শিক্ষকতা মহান পেশা। শিক্ষক হলেন জাতি গঠনের কারিগর। শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষিত শিক্ষকের প্রয়োজন। পিতা-মাতার পরই তাদের স্থান। নিজ গৃহ ছেড়ে শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সময় ব্যয় করে। শিক্ষক মুল্যবোধ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মূল্যবোধ চর্চার শ্রেষ্ঠ জায়গা। বর্তমান মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে। পাশ্চাত্যের রীতি অনুসারে গড়ে উঠছে সমাজ ব্যবস্থা। নগ্নতা, বেহায়াপনা, নোংরামি, অশ্লীলতা, মাদকাসক্তিতে যুব সমাজ ধ্বংসের পথে হাঁটছে। মুল্যবোধের চরম সংকট মূহুর্তে শিক্ষক সমাজকে শ্রেণীকক্ষসহ সমাজ ও রাষ্ট্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। মূল্যবোধকে শিক্ষক সমাজই জাগিয়ে তুলতে সক্ষম। শিক্ষার্থী, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষক সমাজকে। শিষ্টাচার ও সংস্কৃতি বাস্তবায়নে আলিমগণের ভূমিকা অগ্রগণ্য। তারা হলেন জাতির পথনির্দেশক। কারণ তারা সব ধরণের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত। সু-শৃঙ্খল জাতি

গঠনে তারা থাকেন তৎপর। ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে আবহমান কাল থেকে তাদের ভূমিকা ছিল বলিষ্ঠ। জাতি, গোত্র, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানব সমাজ নির্মাণে তাদের অবদান স্বীকৃত। তারা জবাবদিহিতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তারা আল্লাহকে ভয় করেই সব ধরণের ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ দেন। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

বান্দাদের মধ্যে নিশ্চয়ই আলিমগণ আল্লাহকে ভয় করে[৪০]। আয়াত থেকে বুঝা যায়, আলিমগণ আল্লাহর ভয়ে ভীত। যারা আল্লাহর ভয়ে ভীত তারা মানুষের কল্যাণ ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করতে পারেন না। অপসংস্কৃতির আগ্রাসন ও বিশৃঙ্খলার হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে আলিমগণের নেতৃত্ব প্রশংসনীয়। এসবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সৃষ্টি হয় নানা প্রতিবন্ধকতা। প্রতিকূল পরিবেশেও তারা জাতির কল্যাণে দা'ওয়াত দেন। অনেক সময় তারা হয়েছেন জেল-যুলুমের স্বীকার। তাদের মৃত্যু ভয় ছিল না। লক্ষ্য একটাই, সু-সভ্য সমাজনির্মাণ ও সুস্থধারার সংস্কৃতি চর্চা। আলিমগণ জানেন যে, রাসূল (স.) বলেছেন, মানুষের মধ্যে সে-ই উত্তম যে মানব জাতির উপকার করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে।[৪১] উত্তম আদর্শ লালন করে জাতির কল্যাণে আলিমগণ যতবার এগিয়ে এসেছেন সমাজে বসবাসকারী বিরোধীরা ততবার বাধা সৃষ্টি করেছে। অবহেলিত হয়েছেন ঐ সকল কল্যাণকামী আলিম। নিজ ও পরিবারের কথা তাঁরা চিন্তা করেননি। গোটা সমাজ ও জাতিকে নিয়ে ছিল তাঁদের চিন্তা-চেতনা। শরী'আর বিধান অনুসারে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও সার্বিক কল্যাণ অর্জনের আকাঙ্ক্ষা এবং সে কাজে রাষ্ট্রের একটি বড় ভূমিকা পালন, রাষ্ট্রকে পরামর্শ প্রদান ও সাহায্য করার জন্য আলিমগণের ভূমিকা রয়েছে। ছহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, শাসকসহ প্রত্যেকের প্রতি সৎ আচরণের অপর নাম ঈমান।[৪২] শাসকের প্রতি সৎ আচরণের অর্থ হচ্ছে তাদেরকে মনখোলা উপদেশ প্রদান করা, ভালো কাজে সাহায্য করা, অন্যায়-অবিচার করা থেকে বিরত রাখা কিংবা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী বহাল রাখা। ইসলাম মানুষকে সম্মান প্রদর্শন ও শ্রদ্ধাবোধ শিখায়। কারো ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ অপরাধ হিসেবে গণ্য। কারো সামনে কথা বললে সম্মান বজায় রেখে স্বাভাবিক আওয়াজে বলতে হবে। ব্যক্তিত্বের দিকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন। কারণ মানুষের মান-মর্যাদা ও সম্পদ সবই মুসলিমদের নিকট আমানত স্বরূপ। এ সবের প্রতি যারা যত্নবান তাদের তাক্বওয়া বজায় থাকে। এ জন্য নৈতিক জ্ঞান অর্জন ও তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন। রাসূল (স.) বলেন,

أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

অর্থাৎ তোমরা বেশি বেশি সালামের প্রচলন কর, খাদ্য দান কর এবং পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও যেমনটা আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।[৪৩] এ বিষয়ে উপদেশ, শিক্ষাদান করা প্রয়োজন। মূলত ব্যাপকভাবে এটার চর্চা শুরু হলে মানুষের মাঝে তৈরি হবে বিশ্বাস ও মূল্যবোধ। একই সঙ্গে মনস্তাত্বিক পরিবর্তন আসবে। অর্থাৎ গুরুত্বের সাথে সালামের প্রচলন অব্যাহত থাকবে। এটা চর্চার পরিবেশ তৈরি করার জন্য পরস্পরের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধাবোধ থাকা দরকার। মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে এমন সকল প্রতিষ্ঠানকে সংস্কার করা না হলে নৈতিকতা, শিষ্টাচারিতা, সুস্থ ধারার সংস্কৃতি চর্চা এবং সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ সংস্কারের পাশাপাশি শিক্ষক সমাজকে শিখনপদ্ধতি তথা পাঠদানে প্রয়োজনীয় উপকরণসহ বিশেষ কলা-কৌশলের উপর প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য সুস্থ ধারার বিনোদন চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আমল-আখলাক

তথা চারিত্রিক ব্যক্তিগত প্রতিবেদনের উপর বিশেষ নাম্বার প্রদানের নিয়ম আবশ্যকীয়ভাবে চালু করতে হবে যা চূড়ান্ত পরীক্ষায় যোগ হবে। প্রত্যেক শ্রেণীতে শিষ্টাচার, নৈতিকতা শিক্ষা এবং ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে । সব ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলাম শিক্ষা বিষয় আবশ্যকীয়ভাবে চালু করতে হবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাপ্তাহিক আঞ্জুমানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ আঞ্জুমানে শিষ্টাচার, নৈতিকতা ও সুস্থধারার সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে এবং পুরস্কার বিতরণী পর্বের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সাপ্তাহিক প্রতিবেদনের উপর জবাবদিহিতামূলক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রতিষ্ঠানে অভিভাবক সমাবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের সাথে পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব সম্পর্কে মতবিনিময় সভা করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ তোমরা কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর।[৪৪]

সমাজে প্রচলিত বিদ্যমান অপসংস্কৃতির আগ্রাসন প্রতিকার এবং প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে জনমত সৃষ্টি করতে হবে। জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাসহ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সুস্থধারার বিনোদন চর্চায় সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে। মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা সংস্কার সাধনে শাসক ও দায়িত্বশীলদের ভূমিকা পালন করতে হবে। সমাজে ন্যায় বিচার, আইন-শৃঙ্খলা, প্রত্যেকের জীবন, সম্পদ ও ইজ্জতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নিজের ও সমাজের অধিকতর কল্যাণের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যেখানে থাকবে পারস্পরিক আস্থা, সহযোগিতা ও সামাজিক বন্ধন। এভাবে গঠনমূলক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে সমাজে সাম্যতা ফিরে আসবে। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে।

রাজনৈতিক শিষ্টাচার ও সংস্কৃতি

শিষ্টাচার ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অঙ্গন ব্যাপকতর । এটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। জনসাধারণের মাঝে রাষ্ট্রীয় অধিকার ও সার্বিক শৃঙ্খলা রক্ষায় রাজনৈতিক ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। জনগণের কল্যাণে ন্যায়-ইনসাফ বজায় রাখা শিষ্টাচারিতার বৈশিষ্ট্য। যে সাত শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাবে তার মধ্যে ন্যায়বিচারক অন্যতম।[৪৫] রাজনৈতিক অঙ্গনে শিষ্টাচারিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো দায়িত্ব চেয়ে না নেয়া। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا،

আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রা. থেকে বর্ণিত। নবী (স.) আমাকে বলেছেন, হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ! তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিবে না। কেননা যদি চাওয়ার পর তোমাকে তা দেয়া হয়, তাহলে তার সকল দায়িত্বভার তোমার উপরই অর্পিত হবে। আর যদি না চাওয়া সত্ত্বেও তোমাকে তা দেয়া হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা হবে।[৪৬] এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, নেতৃত্ব চেয়ে নিলে নেতাকে জনসাধারণের বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। উদ্ভুত সমস্যা সমাধানের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সাহায্য আসবে না। উপযুক্ত ব্যক্তি জনসাধারণের সম্মতিতে নির্বাচিত হবেন। এখানে নেতৃত্ব চাওয়ার বিষয়টি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কেননা, নেতৃত্ব চাইলে ব্যক্তির নিষ্ঠা প্রমাণিত হয় না। ব্যক্তির চরিত্র ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠে। নেতা সম্পর্কে অহেতুক ধারণা সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি তাকে নিয়ে সমালোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক অঙ্গনে একজন নেতার যে সব গুণ থাকা প্রয়োজন তা হল প্রজা সাধারণের উপর যুলুম না করা, জনগণের হক্বের প্রতি খেয়াল রাখা, মাল আত্মসাৎ না করা, আমানতের খিয়ানত না করা, শপথ ভঙ্গ না করা, সকল ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ এ চেতনায় কাজ করা, ক্ষমতার

অপব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক থাকা, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অবৈধ পন্থায় উপার্জন না করা ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা। সর্বোপরি কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করা। মূলত এসব বিষয় রাজনৈতিক শিষ্টাচার ও সংস্কৃতির অর্ন্তভূক্ত।

অর্থনৈতিক কালচার

ইসলামে অর্থব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও রয়েছে শিষ্টাচার ও সংস্কৃতির ভূমিকা। ইসলামে যাকাত দাতা ও সম্পদ দানকারীর আচরণ, ভূমিকা এবং অর্থ-সম্পদের বৈশিষ্ট্য কেমন হবে এ ব্যাপারে রয়েছে দিক-নির্দেশনা। যাকাত ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। সঠিক পন্থায় যাকাত আদায় ও বন্টনে ঈমানী দায়িত্ব পালন হয়, নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষা হয়।[৪৭] ইমানী চেতনা বিনষ্ট হয়েছে ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্জন, জবাবদিহিতা না থাকা ও অস্থিতিশীলতার কারণে। অর্থনৈতিক অবক্ষয় বিশ্লেষণে দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহার না থাকা এবং আত্মসাৎ করার অপকৌশল প্রয়োগ করায় অর্থনৈতিক সাম্যতা বিনষ্ট হয়েছে, যা শিষ্টাচার পরিপন্থী। মহান আল্লাহ বলেন, ধন-সম্পদ যেন তোমাদের ধনীদের মাঝে আবর্তিত না হয়।[৪৮] আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ তোমরা কখনো সওয়াব অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যয় করবে তা থেকে যা তোমরা ভালবাস।[৪৯] মহান আল্লাহ অপব্যয়, অপচয় সম্পর্কে বলেন, 'তোমরা খাও, পান কর; অপচয় করো না'। অপচয়-অপব্যয়, বিলাসিতা এগুলো দারিদ্র্য সমস্যার কারণ। বিত্তবান লোকেরা অপচয়-অপব্যয় ও বিলাসিতায় যে অর্থ ব্যয় করে তা দিয়ে অনেকাংশে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব। ইসলাম মানুষকে মিতব্যয়ী হতে শিক্ষা দেয়। আল্লাহ বলেন, আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত, মুসাফিরকে তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।[৫০] মহান আল্লাহ অর্থ ব্যয়ের শিষ্টাচার সম্পর্কে বলেন, যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে।[৫১] সুখে-দুঃখে সর্বাস্থায় যথাযথ ক্ষেত্রে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা, নিজেকে অনুকূল-প্রতিকূল উভয় অবস্থায় নিয়ন্ত্রিত রাখা শিষ্টাচারিতার অর্ন্তভূক্ত। শিষ্টাচারহীন দানকারী সম্পর্কে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

হে মুমিনগণ, তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সদকা বাতিল করো না। সে ব্যক্তির মত, যে তার সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে আর সে বিশ্বাস করে না আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি।[৫২] দান করে খোঁটাদানকারী সম্পর্কে রাসূল (স.) বলেন, তিন ব্যক্তির সাথে বিচার দিবসে আল্লাহ কথা বলবেন না। দান করে যে খোঁটা দেয়, টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী, মিথ্যা কসম করে পণ্য বিক্রয়কারী।[৫৩] আয়াত ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, সম্পদ দান করে খোঁটা দেয়া অর্থনৈতিক শিষ্টাচার পরিপন্থী এবং গর্হিত কাজ। অর্থ-সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই অর্থনৈতিক শিষ্টাচার বজায় রাখতে হবে। অর্থ-সম্পদ ব্যবহারের কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা হলো; মালের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা, উপযুক্ত ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য হক্ব বুঝিয়ে দেয়া, দান করার সময় খোটা না দেয়া, সঠিক সময়ে মাল বণ্টন করা, বণ্টনের সময় স্বজনপ্রীতি না করা, সম্পূর্ণ রূপে যাকাত আদায় করা, উৎকৃষ্ট মাল হতে যাকাত বের করা, কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত খাতে যাকাত আদায় করা, যাকাত ও দানের ক্ষেত্রসমূহের মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা, দানে সুনাম অর্জন ও স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য না থাকা, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দান করা, সামর্থবান ও সক্ষম ব্যক্তিকে দান না করা, হারাম পন্থায় মাল উপার্জন না করা, মানুষের নিকট থেকে কেবল উৎকৃষ্ট মাল গ্রহণ না করা, সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর থাকা, সর্বাবস্থায় দানের মানসিকতা থাকা, অর্থ-সম্পদের অপব্যয় না করা এবং সর্বাবস্থায় বিলাসিতা পরিহার করা। এ বিষয়গুলো সামনে রেখে অর্থনৈতিক সাম্যতা বজায় রাখতে হবে।

উপসংহার

আল-কুরআন ও হাদীসে শিষ্টাচার সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। হাদীসে বিস্তারিতভাবে শিষ্টাচার ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। একমাত্র কুরআন-সুন্নাহই শিষ্টাচার ও সংস্কৃতির ভিত্তি। তাই কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয় এমন কোন কিছুকে শিষ্টাচার ও সংস্কৃতি নামে অভিহিত করা ঠিক হবে না। শিষ্টাচার ও সংস্কৃতি বিষয়ে বাড়াবাড়ি হলে তা হবে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী। আদর্শ ও সুসভ্য জাতি গঠনে সর্বোত্তম পন্থা উল্লেখ রয়েছে কুরআন-সুন্নাহয়। এখানে উঠাবসা, আদান-প্রদান, কুশল বিনিময়, পানাহার, আনন্দ-বিনোদন, শোক, সমবেদনা, বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা সব কিছুই ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র সর্ববস্থায় একজন খাঁটি মুসলিমের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত তা স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে ইসলামে। প্রকৃত অর্থে একজন মুসলিম তখনই আদর্শবান ও সুসভ্য মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে, যখন শিষ্টাচার ও সুস্থ ধারার সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে অন্য সকলের চেয়ে আলাদা বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হবে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক. সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সব ক্ষেত্রে তার দ্বারা প্রভূত কল্যাণ লাভ হবে।

তথ্যনির্দেশ

১ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী*, আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান, (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ৭ম সংস্করণ মে, ২০১০খ্রি.), পৃ. ৫৭।
২ Zillur Rahman Siddiqui, *English-Bengali Dictionary*, (Dhaka: Bangla Academy press, Fist Edition, 1993), p.25.
৩ *আল-আদাবুস শারঈয়াহ ওয়াল মিনাহুল মারঈয়াহ*, মাকতাবা শামেলা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫২।
৪ আল-মু'জামুল ওয়াফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫ ।
৫ Zillur Rahman Siddiqui, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।
৬ আশ-শাইখ হাসান আইয়ুব, *তাবসিতুল আক্বাঈদিল ইসলামিয়াহ*, মাকতাবা শামেলা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২।
৭ আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৩৭।
৮ আল-কুরআন, সূরা লুক্বমান, ৩১:১৮।
৯ আল-কুরআন, সূরা লুক্বমান, ৩১:১৯।
১০ সূরা আল-হুজরাত, ৪৯:২।
১১ সূরা আল-হুজরাত, ৪৯:৩।
১২ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:৮৬।
১৩ *মুয়াত্ত্বা মালেক*, বাবু মা যাআ ফি-হুসনিল খুলুক, মাকতাবা শামেলা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩০।
১৪ *শারহুস সুন্নাহ লিল বাগাভী*, বাবু হুসনিল খুলুক, মাকতাবা শামেলা, ১৩ শ খণ্ড, পৃ. ৭৬।
১৫ *সহীহুল বুখারী*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৩।
১৬ *সুনানু আবি দাউদ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৭।
১৭ *মুসনাদ আহমাদ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩০১।
১৮ *সুনানু জামেঈ তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৮।
১৯ *আল-জামে'উস সহীস লিস সুনান*, ওয়াল মাসানিদ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৪।
২০ ড. খলিফা আব্দুল হাকিম, *ইসলামী ভাবধারা*, (ঢাকা: হিকমাহ পাবলিকেশন্স, ৩ য় সংস্করণ, ২০০৪), পৃ. ৯০।
২১ *সুনানু আবি দাউদ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৭।
২২ *সহীহুল বুখারী*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১২।
২৩ ইছবাহানী, *মুনতাখাব; সাফারিঈনী*, গিযাউল আলবাব, ১ম খণ্ড, পৃ:৩৬-৩৭ ।
২৪ আল-জামে' লি ইবনে ওয়াহাব, মাকতাবা শামেলা; ১ম খণ্ড, পৃ.৫৮৯।
২৫ মুয়াত্তা মালেক, মাকতাবা শামেলা; ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩২৮।
২৬ *ইসলামী ভাবধারা*, তদেব পৃ. ১৫২।
২৭ ইবনু আব্দিল বার, আদাবুল মাজালিসাহ ওয়া হামদুল লিসান, (দারুছ ছাহাবাহ লিততুরাছ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ.১০৪।
২৮ ফৎওয়া আল-মিছরিয়া, 'আদব' অধ্যায়, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৯।
২৯ সূরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬।

৩০ সূরা আত-তাগাবুন, ৬৪:১৪।
৩১ *আল-জামিউ'স সহীহ লিস সুনান ওয়াল মাসানিদ*, মাকতাবা শামেলা, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৪।
৩২ *সহীহ ইবনে হিব্বান*, মাকতাবা শামেলা, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৪১।
৩৩ *সহীহুল বুখারী*, বাবু মা ক্বিলা ফি আওলাদিল মুশরিকিন, মাকতাবা শামেলা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০।
৩৪ *মুসনাদ আহমাদ*, মুসনাদু আব্দিল্লাহ ইবনে উমার (রা.), নবম খণ্ড, পৃ.১৫৬ ।
৩৫ তদেব, পৃ. ১৭৪।
৩৬ তদেব, পৃ. ১৭৪।
৩৭ সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির ৭৪:৪।
৩৮ সূরা আল-বাক্বারাহ ২:২২২।
৩৯ জামে' মুআম্মার ইবনে রাশেদ, মাকতাবা শামেলা, ১১ শ খণ্ড, পৃ. ১৪৩।
৪০ সূরা ফাতির, ৩৫:২৮।
৪১ সূরা আলে-ইমরান, ৩:১১০।
৪২ তদেব, পৃ. ১৪৭।
৪৩ *মুসনাদু আহমাদ*, মাকতাবা শামেলা, ১০ ম খণ্ড, পৃ. ৪৮১।
৪৪ সূরা আলে ইমরান, ৩:১৫৯।
৪৫ *সহীহুল বুখারী*, মাকতাবা শামেলা, ২য় খণ্ড, পৃ.১১১।
৪৬ *সহীহ মুসলিম*, মাকতাবা শামেলা, ৩য় খণ্ড, পৃ.১২৭৩।
৪৭ জাবেদ মুহাম্মাদ, *ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় যাকাত* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৮ খ্রি.) পৃ. ৫২-৫৪।
৪৮ সূরা আল-হাশর, ৫৯:৭।
৪৯ সূরা আলে-ইমরান, ৩:৯২।
৫০ সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭: ২৬-২৭।
৫১ সূরা আলে-ইমরান, ৩:১৩৪।
৫২ সূরা আল-বাক্বারাহ, ২:২৬৪।
৫৩ *সহীহ মুসলিম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২; *সুনানু ইবনে মাজাহ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪৪।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

যাকাতের শরয়ী ভিত্তি : একটি পর্যালোচনা
(Shariah Basis of Zakat: A Review)

মো. আশরাফুল ইসলাম*

Abstract: Islam is a perfect, beautiful and balanced way of life. As a complete code of life, the important issues of human life as well as issues related to economy are discussed in detail in Islam. Zakat system is one of the important branches of Islamic economics. The main feature of this provision is to regularly collect a certain portion of the wealth from the rich and well-off people and distribute it among the poor and deprived people. This provision has been described as the third pillar or Rukn of Islam as the main tool for building a society free from discrimination and poverty. One of the pillars of Islam is proven by the four main sources of Shariah namely Qur'an, Hadith, Ijma and Qiyas. Numerous verses of the Qur'an, numerous hadiths narrated by the Prophet (peace be upon him) and the Athars narrated by the Companions have also discussed the issues related to Zakat in detail. In addition, all Muslims have reached a consensus regarding the obligatory nature of Zakat, and this is also proven by Qiyas, the standard of reasoning. The article highlights the Shariah basis of Zakat by mentioning its brief introduction.

Key words: Zakat, Basis of zakat, Shariah, Quran, Hadith, Ijma, Qiyas.

ভূমিকা

ইসলাম একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামে মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তথা অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে যাকাত ব্যবস্থা। সমাজের বিত্তবান ও সচ্ছল ব্যক্তিদের উদ্বৃত্ত সম্পদের নির্দিষ্ট একটি অংশ নিয়মিত আদায় করে দরিদ্র ও বঞ্চিত লোকদের মধ্যে যথাযথ বণ্টন করাই এ বিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বৈষম্য ও দারিদ্রমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের প্রধান হাতিয়ার বিধায় এ বিধানকে ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ বা রুকন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামের অন্যতম এ রুকনটি শরীয়তের চারটি মূল উৎস তথা কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত। আল-কুরআনের অসংখ্য আয়াত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত অসংখ্য হাদীস এবং সাহাবায়ে কিরামের বর্ণিত আছারেও যাকাত সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া যাকাতের বিধান ফরয হওয়ার ব্যাপারে সকল মুসলমান ঐকমত্যে পৌঁছেছেন এবং বিষয়টি কিয়াস তথা যুক্তির মানদণ্ড দ্বারাও প্রমাণিত। আলোচ্য প্রবন্ধে যাকাতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখপূর্বক এর শরয়ী ভিত্তি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

যাকাতের পরিচয়

যাকাত (زَكَاة) শব্দটি আরবী। এটি একবচন, বহুবচনে زَكَوَاتٌ।[১] আভিধানিক অর্থে যাকাত (زَكَاة) শব্দটি পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধতা, প্রাচুর্য, বৃদ্ধি, বরকত, বর্ধিত হওয়া, অতিরিক্ত, প্রশংসা, সংশোধন প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[২] এর ইংরেজি প্রতিশব্দ, purification,[৩] purity, honesty, justification,[৪]

---

* পিএইচ.ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

increase, appreciate ইত্যাদি। আল-কুরআনে যাকাত (زَكَاةٌ) শব্দটি পবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾

"যে ব্যক্তি পবিত্রতা অবলম্বন করেছে সেই সফলকাম হয়েছে।"[৫]

আল-কুরআন ও আল-হাদীসে যাকাত শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে সাদাকা (صَدَقَةٌ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[৬] صَدَقَةٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে صَدَقَاتٌ। শব্দটির একবচনের রূপ ব্যবহার করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾

"আপনি ধনীদের সম্পদ থেকে যাকাত সংগ্রহ করুন।"[৭]

অন্যত্র বহুবচনের রূপ ব্যবহার করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾

"তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা সাদাকা বণ্টনে আপনাকে দোষারূপ করে।"[৮]

পরিভাষায়, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে খুশি করার নিমিত্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পদের একাংশ হাশেমী ও তাদের দাস-দাসী ব্যতিত নির্দিষ্ট শ্রেণির হকদারকে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে প্রদান করাকে যাকাত বলা হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র) (৮০-১৫০ হি.)-এর মতে,

تَمْلِيْكُ جُزْءٍ مَالٍ مَّخْصُوْصٍ مِنْ مَالِ مَخْصُوْصٍ لِشَخْصٍ مَّخْصُوْصٍ، عَيْنِهِ الشَّارِعِ لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى

"নির্দিষ্ট ব্যক্তি তার নির্দিষ্ট সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য মালিক বানিয়ে দেওয়া, যে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত।"[৯]

ইমাম মালিক (র) (৯৩-১৭৯ হি.)-এর মতে,

إِخْرَاجُ جُزْءٍ مَّخْصُوْصٍ مِنْ مَالٍ بَلَغَ نِصَاباً، لِمُسْتَحِقِّهِ، إِنْ تَمَّ الْمِلْكِ، وَحَوْلٍ، غَيْرَ مَعْدَنٍ وَحَرْثٍ

"নিসাব পরিমাণ সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ বের করে তার হকদারকে প্রদান করা। এক্ষেত্রে শর্ত হলো, সম্পদের মধ্যে যাকাতদাতার মালিকানা পূর্ণ হতে হবে, সম্পদের উপর এক বছর অতিবাহিত হতে হবে, এমন সম্পদ হতে হবে যা মা'দিন থেকে প্রাপ্ত নয় এবং কৃষি থেকেও প্রাপ্ত নয়।"[১০]

ইমাম শাফি'ঈ (র) (১৫০-২০৪ হি.)-এর মতে,

بِأَنَّهَا اِسْمٌ لما يخرج عَنْ مَالٍ وَبَدَنٍ عَلَى وَجْهٍ مَّخْصُوْصٍ

"নির্দিষ্ট নিয়মে নির্দিষ্ট সম্পদ থেকে কিছু বের করাই হলো যাকাত।"[১১]

ইমাম আহমাদ (র) (১৬৪-২৪১ হি.)-এর মতে,

هُوَ أَنَّهَا حَقٌّ وَاجِبٌ فِي مَالٍ مَخْصُوْصٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوْصَةٍ فِيْ وَقْتٍ مَّخْصُوْصٍ

"যাকাত হলো, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদে এক অবধারিত হক।"[১২]

যাকাতের শরয়ী ভিত্তি

যাকাতের বিধান ইসলামী শরীয়তের মূল চারটি উৎস তথা কুরআন[১৩], হাদীস[১৪], ইজমা[১৫] এবং কিয়াস[১৬] দ্বারা প্রমাণিত।[১৭] আল-কুরআনের অসংখ্য আয়াতে যাকাত সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত অসংখ্য হাদীস এবং সাহাবায়ে কিরামের বর্ণিত আছারেও যাকাত সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া যাকাতের বিধান ফরয হওয়ার ব্যাপারে সকল মুসলমান ঐকমত্যে পৌঁছেছেন এবং বিষয়টি কিয়াস তথা যুক্তির মানদণ্ড দ্বারাও প্রমাণিত।

আলাউদ্দীন আল-কাসানী (র) (মৃ. ৫৮৭ হি.) বলেন,

أَمَّا الْأَوَّلُ فَالدَّلِيلُ عَلَى فَرْضِيَّتِهَا الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالْإِجْمَاعُ، وَالْمَعْقُولُ

"যাকাত ফরয হওয়ার দলীল হলো কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস।"[১৮]

ইব্ন কুদামাহ (র) (৫৪১-৬২০ হি.) বলেন,

وَالزَّكَاةُ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الْخَمْسَةِ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَإِجْمَاعِ أُمَّتِهِ

"যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের মাধ্যমে, তাঁর নবীর সুন্নতের মাধ্যমে এবং তাঁর উম্মতের ইজমার মাধ্যমে যাকাত ফরয হয়েছে।"[১৯]

সায়্যিদ সাবিক (র) (মৃ. ১৪২০ হি.) বলেন,

وَهِيَ أَحَدُ أَرْكَانُ الْإِسْلَامِ الْخَمْسَةِ، وَقرنت بِالصَّلَاةِ فِيْ اِثْنَتَيْنِ وَثَمَانَيْنَ آيَة. وَقَدْ فرضهَا اللهُ تَعَالَى بِكِتَابِهِ، وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِجْمَاعِ أُمَّتِهِ

"যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। ৮২টি আয়াতে নামাযের সাথে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবের মাধ্যমে, তাঁর নবীর (সা) সুন্নতের মাধ্যমে এবং তাঁর উম্মতের ইজমার মাধ্যমে এটি ফরয করেছেন।"[২০]

ড. ওয়াহাবাহ ইব্ন মুস্তাফা আয্-যুহায়লী (১৯৩২-২০১৫ খ্রি.) বলেন,

وَهِيَ وَاجِبَةٌ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ

"আল্লাহ তা'আলার কিতাবের মাধ্যমে, তাঁর নবীর সুন্নতের মাধ্যমে এবং তাঁর উম্মতের ইজমার মাধ্যমে যাকাত ফরয হয়েছে।"[২১]

নিম্নে শরীয়তের চারটি প্রধান উৎস তথা কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা হলো:

ক. কুরআন ভিত্তিক দলীল

আল-কুরআনের অসংখ্য আয়াতে যাকাত সম্পর্কে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এসকল আয়াতে যাকাত আদায়ের আবশ্যিকতা, যাকাত আদায়ের সুফল, যাকাত আদায় না করার পরিণতি, পূর্ববর্তী

নবী-রাসূল ও তাঁদের উম্মতের যাকাতের ইতিহাস প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা বিবৃত হয়েছে। যেমন ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কূব (আ)-এর ঘটনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (٧١) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (٧٢) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾

"আর আমি তাঁকে ও লূতকে উদ্ধার করে সেই দেশে পৌঁছে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্বের জন্যে কল্যাণ রেখেছি। আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও পুরস্কার স্বরূপ দিলাম ইয়া'কূব এবং প্রত্যেককেই সৎকর্মপরায়ণ করলাম। আর আমি তাদেরকে নেতা করলাম। তারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতেন। আমি তাদের প্রতি ওহী নাযিল করলাম সৎকর্ম করার, নামায কায়েম করার এবং যাকাত প্রদান করার। তারা আমার ইবাদতে ব্যাপৃত ছিল।"[২২]

ইসমা'ঈল (আ)-এর প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (٥٤) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾

"আর কিতাবে স্মরণ করো ইসমাইলের কথা। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন প্রতিশ্রুতিতে সত্যপরায়ণ, আর তিনি ছিলেন একজন রাসূল, একজন নবী। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিলেন।"[২৩]

মূসা (আ) তাঁর নিজের সম্পর্কে দোয়া করে বলেছিলেন, "হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করো।" এর প্রতিউত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা যাকাত দানের বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾

"আর পৃথিবীতে এবং আখিরাতে আমাদের জন্য কল্যাণ লিখে দাও। আমরা তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। তিনি (আল্লাহ তা'আলা) বললেন, আমার শাস্তি– তা দিয়ে আমি আঘাত হানব যাকে ইচ্ছা করব, কিন্তু আমার করুণা– তা সবকিছুই পরিবেষ্টন করে। সুতরাং তা তাদের জন্য লিখে দেব যারা ভয় রাখে, যাকাত প্রদান করে এবং আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।"[২৪]

মূসা (আ)-এর উম্মত তথা বনী ইসরাঈল থেকে আল্লাহ্ তা'আলা যে সকল বিষয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন তার মধ্যে যাকাত প্রদানের প্রতিশ্রুতিও ছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ﴾

"যখন আমি বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও দীন-দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষকে সৎ কথাবার্তা বলবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দেবে, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, তোমরাই অগ্রাহ্যকারী।"[২৫]

অন্যত্র আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾

“আল্লাহ বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বারো জন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম। আল্লাহ্ বলে দিলেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যদি তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত দিতে থাক, আমার পয়গম্বরদের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তাঁদের সাহায্য কর এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম পন্থায় ঋণ দিতে থাক। তবে আমি অবশ্যই তোমাদের গুনাহ দূর করে দিব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করব, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এরপরও কাফির হয়, সে নিশ্চয়ই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।”[২৬]

হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর পূর্বে ঈসা (আ)-ই ছিলেন সর্বশেষ নবী। আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁকেও যাকাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। যেমন দোলনায় থাকাবস্থায় ঈসা (আ) বলেছিলেন,

﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾

“আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে।”[২৭]

এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কেও আল্লাহ তা‘আলা যাকাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾

“আর তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দান করো এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে যারা অবনত হয়।”[২৮]

অন্যত্র আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

“আপনি তাদের (ধনীদের) সম্পদসমূহ থেকে যাকাত সংগ্রহ করুন। আপনি তার দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন এবং তাদের জন্য দোয়া করবেন। নিঃসন্দেহে আপনার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ। বস্তুত আল্লাহ্ সবকিছুই শোনেন, জানেন।”[২৯]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

“আর তিনিই উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যা মাচার উপর তুলে দেওয়া হয় ও যা মাচার উপর তোলা হয় না এবং খর্জুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র যেসবের স্বাদবিশিষ্ট, আর যায়তূন ও আনার সৃষ্টি করেছেন একে অন্যের

সাদৃশ্যশীল ও সাদৃশ্যহীন। (বৃক্ষ) যখন ফলন্ত হয় তখন এগুলোর ফল খাও এবং কর্তনের সময় হক দান করো। আর অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপব্যয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।”[৩০]

যাকাত ব্যয়ের আটটি খাতের পরিচয় প্রদান করে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

“নিশ্চয়ই যাকাত হলো কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে; এই হলো আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।”[৩১]

আল-কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে কারীমায় আল্লাহ্ তা‘আলা যাকাত প্রদানকারীদের জন্য ইহকালীন কতিপয় পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। যাকাত প্রদানকারীদেরকে মহাপুণ্য দান করা হবে মর্মে আল্লাহ্ তা‘আলা ঘোষণা করেন,

﴿لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

“কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানপক্ক ও ঈমানদার, তারা তাও মান্য করে, যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে। আর যারা নামাযে অনুবর্তিতা পালনকারী, যাকাত দানকারী এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতে আস্থাশীল। বস্তুত এমন লোকদেরকে আমি দান করব মহাপুণ্য।”[৩২]

যাকাত প্রদানকারীর উপর আল্লাহ্ তা‘আলার করুণা পরিবেষ্টিত থাকে। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾

“আমার করুণা সবকিছুই পরিবেষ্টন করে। সুতরাং তা তাদের জন্য লিখে দেব যারা ভয় রাখে, যাকাত প্রদান করে এবং আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।”[৩৩]

আল-কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে কারীমায় আল্লাহ্ তা‘আলা যাকাত প্রদানকারীদের জন্য ইহকালের পাশাপাশি পরকালীন বিশেষ পুরস্কারের কথাও ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

“নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎ কাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের জন্যে তাদের পালনকর্তার নিকট পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোনো শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।”[৩৪]

আল্লাহ্ তা‘আলা যাকাত প্রদানকারীদের থেকে তাদের গুনাহ দূরীভূত করবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

﴿لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾

"যদি তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত দিতে থাক, আমার পয়গম্বরদের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তাঁদের সাহায্য কর এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম পন্থায় ঋণ দিতে থাক। তবে আমি অবশ্যই তোমাদের গুনাহ দূর করে দিব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করব, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়।"[৩৫]

আল্লাহ্ তা'আলা যাকাত অনাদায়ের করুণ পরিণতির কথা উল্লেখ করে বলেন,

﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾

"আর মুশরিকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালকে অস্বীকার করে।"[৩৬]

খ. হাদীস ভিত্তিক দলীল

বিশুদ্ধ হাদীসের প্রায় প্রতিটি গ্রন্থেই যাকাত সম্পর্কে পৃথক অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সহীহুল-বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানু আবী দাঊদ, সুনানুত্-তিরমিযী, সুনানুন্-নাসাঈ, সুনানু ইব্ন মাজাহ, মুওয়াত্তা মালিক, মুসনাদু আহমাদ প্রভৃতি গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এসকল গ্রন্থে রাসূল (সা) থেকে বর্ণিত হাদীসে যাকাত সম্পর্কিত বিবরণ সুবিন্যস্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেবল সহীহুল-বুখারীর 'কিতাবুয্-যাকাত' অধ্যায়ে ১৭২টি মারফূ' হাদীস সংকলিত হয়েছে। সহীহ মুসলিমেও মাত্র ১৭টি হাদীস ব্যতিত অবশিষ্ট সকল হাদীসই মারফূ' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। উপরন্তু সাহাবী এবং তাবি'ঈগণের ২০টি উক্তিও তাতে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৭] নিম্নে যাকাতের আবশ্যিকতা সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো:

ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ ব্যতিত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল- এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, (সামর্থ্যবানদের জন্য) হজ্জ পালন করা এবং রমযান মাসে রোযা রাখা।"[৩৮]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কেউ ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা মানে ইসলামের এই পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। এই পাঁচটি ভিত্তি বা খুঁটির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার লক্ষ্যে কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক জীবন পরিচালনার কোনো বিকল্প পথ নেই। যারা এর কোনো একটি নীতিকেও অবমূল্যায়ন করবে তারা দীন ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না।

ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"নবী করীম (সা) মু'আয (রা)-কে ইয়ামানের শাসনকর্তা হিসেবে প্রেরণ করার সময় বলেন, সেখানের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ্ ব্যতিত কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল– এ কথার সাক্ষ্যদানের দাওয়াত দিবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ্ তাদের উপর প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যদি এ কথাও মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে জানিয়ে

দিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পদের উপর সাদাকা (যাকাত) ফরয করেছেন। তাদের মধ্যকার (নিসাব পরিমাণ) সম্পদশালীদের নিকট থেকে (যাকাত) আদায় করে তাদের দরিদ্রদের[৩৯] মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হবে।"[৪০]

জারীর ইব্ন আব্দিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

"আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট নামায প্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান এবং সকল মুসলমানের কল্যাণ কামনা করার জন্য বাইয়াত করেছি।"[৪১]

আবূ হুরায়রা (রা) ও আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন,

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَكَبَّ، فَأَكَبَّ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَبْكِي لَا نَدْرِي عَلَى مَاذَا حَلَفَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فِي وَجْهِهِ الْبُشْرَى، فَكَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، إِلَّا فُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، فَقِيلَ لَهُ: ادْخُلْ بِسَلَامٍ

"একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে তিনবার সম্বোধন করে বললেন, ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! তিনবার বলার পর তিনি উপুড় হয়ে কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠালেন। তাঁর চেহারায় তখন আনন্দের বিচ্ছুরণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল, যা আমাদের নিকট লাল উট অপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিল। এরপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রমযান মাসে রোযা রাখবে, যাকাত প্রদান করবে এবং সাতটি কবীরা গুনাহ পরিত্যাগ করবে, তার জন্য অবশ্যই জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং তাকে বলা হবে, তুমি প্রশান্ত চিত্তে জান্নাতে প্রবেশ করো।"[৪২]

আবূ উমামা (রা) বলেন, বিদায় হজ্জের দিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে হজ্জ করেছি। তিনি বলেন, ...

اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَحُجُّوا بَيْتَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاتَكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করো, এক মাস রোযা রাখো, বায়তুল্লাহর হজ্জ করো এবং তোমাদের ধন-সম্পদ পবিত্র করার জন্য যাকাত আদায় করো। তাহলে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।"[৪৩]

আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أُمِرْنَا بِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، فَمَنْ لَمْ يُزَكِّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

"আমাদেরকে নামায আদায় করার ও যাকাত আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি নামায আদায় করে অথচ যাকাত দেয় না, তার নামায আল্লাহ্র কাছে গৃহীত হয় না।"[৪৪]

আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ، وَذُو أَهْلٍ وَوَلَدٍ، وَحَاضِرَةٍ، فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أُنْفِقُ؟ وَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ، فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ، وَتَصِلُ أَقْرِبَاءَكَ، وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ، وَالْجَارِ، وَالْمِسْكِينِ

"বনু তামীম গোত্র থেকে জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আমি বিপুল সম্পদের অধিকারী। আমার পরিবারের লোকসংখ্যাও প্রচুর, আমার জমিজমাও অনেক এবং আমার নিকট বহু অতিথির সমাগমও ঘটে। এখন আমাকে বলে দিন, আমি কী করব এবং কীভাবে খরচ করব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমার সম্পদ থেকে তুমি যাকাত বের করবে। ওটা তোমাকে পবিত্র করার উপকরণ। তাছাড়া তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনের সাথেও সম্পর্ক রক্ষা করো। দরিদ্র, প্রতিবেশী ও সাহায্য প্রার্থীর হকও চিনে নিও (অর্থাৎ চিনে হক দিও)।"[৪৫]

আইশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

ثَلَاثٌ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ، لَا يَجْعَلُ اللهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ، وَسِهَامُ الْإِسْلَامِ: الصَّوْمُ، وَالصَّلَاةُ، وَالصَّدَقَةُ

"তিনটি কথা আমি শপথ করে বলছি, ইসলামের অংশগুলো যে আদায় করে, তাকে আল্লাহ্ কখনো সেই ব্যক্তির মতো বানাবেন না যে কোনো অংশই আদায় করে না। আর ইসলামের তিনটি অংশ হচ্ছে, রোযা, নামায ও যাকাত।"[৪৬]

গ. ইজমা ভিত্তিক দলীল

যাকাতের বিধান ফরয হওয়ার ব্যাপারে সর্বকালের সর্বযুগের আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[৪৭] রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আবশ্যিক হওয়ার ব্যাপারে সাহাবীগণ ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন, যা থেকেও যাকাতের আবশ্যিকতা প্রমাণিত হয়। আলাউদ্দীন আল-কাসানী (র) বলেন,

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَلِأَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى فَرْضِيَّتِهَا

"ইজমা দ্বারাও যাকাত ফরয সাব্যস্ত হয়। কেননা এই উম্মত যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছে।"[৪৮]

ইব্ন হাজার আল-আসকালানী (র) (৭৭৩-৮৫২ হি.) বলেন,

وَالزَّكَاةُ أَمْرٌ مَقْطُوعٌ بِهِ فِي الشَّرْعِ يُسْتَغْنَى عَنْ تَكَلُّفِ الِاحْتِجَاجِ لَهُ وَإِنَّمَا وَقع الِاخْتِلَاف فِي بعض فُرُوعِهِ وَأَمَّا أَصْلُ فَرْضِيَّةِ الزَّكَاةِ فَمَنْ جَحَدَهَا كَفَرَ

"যাকাত শরীয়তের এমন এক অকাট্য বিধান, যে সম্পর্কে দলীল-প্রমাণের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যাকাত সংক্রান্ত কিছু কিছু মাসআলায় ইমামগণের মধ্যে মতভিন্নতা থাকলেও যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই। যাকাত ফরয হওয়াকে যে অস্বীকার করে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে খারিজ হয়ে যায়।"[৪৯]

ইমাম নববী (র) (৬৩১-৬৭৬ হি.) বলেন,

فَالزَّكَاةُ فَرْضٌ وَرُكْنٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَتَظَاهَرَتْ دَلَائِلُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى ذَلِكَ

"সুতরাং যাকাত হলো ফরয ও ইসলামের একটি রুকন। এটি মুসলমানদের ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। এ ব্যাপারে কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূল ও ইজমা এর দলীলসমূহ একেবারেই সুস্পষ্ট।"[৫০]

ঘ. কিয়াস ভিত্তিক দলীল

কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা ছাড়াও নিতান্ত কিয়াস বা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারাও যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়টি বুঝা যায়। অবশ্য এ বিবেক-বুদ্ধি ঈমানদার লোকদের, বেঈমানদের নয়। ঈমানদার ব্যক্তি মাত্রই আল্লাহ্ তা'আলার ইনসাফ এবং মাখলুকের প্রতি তার অফুরন্ত রহমতের কথা বিশ্বাস করে। আর এক্ষেত্রে অন্তত তিনটি দিক বিবেচনা করা চলে। যথা-

- যাকাত প্রদানের মাধ্যমে অভাবী, দুঃখী ও গরীব-মিসকীনদের সাহায্য করা হয়। যা পেয়ে তারা আল্লাহ্ তা'আলার নেক বান্দা হয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ পায় এবং আল্লাহ্ তা'আলার ধার্যকৃত ফরয আদায় করার যোগ্য হয়।
- যাকাতদাতার মন ও মননকে যাকাত পবিত্র ও পরিশীলিত করে এবং পাপের গ্লানি ও পঙ্কিলতা দূরীভূত করে। তার চরিত্রকে দানশীলতার গুণে ভূষিত করে। সে কার্পণ্য ও লোভ-লালসা হতে নিষ্কৃতি পায়। কেননা মানুষ সৃষ্টিগতভাবে লোভী ও স্বার্থপর। যাকাত দেওয়ার ফলে তার মধ্যে বদান্যতা ও মহানুভবতা জেগে ওঠে। আমানতসমূহ আদায় করতে অভ্যস্ত হয়। পাওনাদারদের পাওনা এবং হকদারের হক দিতে প্রস্তুত হয়।
- আল্লাহ্ তা'আলা ধনী লোকদের বহু নিয়ামত ও প্রয়োজনের তুলনায় বেশি সম্পদ দান করেছেন, বিভিন্ন ধরনের সম্পদ এবং মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। যা দিয়ে তারা সুখে-স্বাচ্ছন্দে জীবনযাপন করে। এজন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করা কর্তব্য। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সে এ কৃতজ্ঞতা আদায়ের সুযোগ লাভ করে থাকে।[৫১]

আলাউদ্দীন আল-কাসানী (র) বলেন,

وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَمِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّ أَدَاءَ الزَّكَاةِ مِنْ بَابِ إِعَانَةِ الضَّعِيفِ وَإِغَاثَةِ اللَّهِيفِ وَإِقْدَارِ الْعَاجِزِ وَتَقْوِيَتِهِ عَلَى أَدَاءِ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ مِنْ التَّوْحِيدِ وَالْعِبَادَاتِ وَالْوَسِيلَةُ إِلَى أَدَاءِ الْمَفْرُوضِ مَفْرُوضٌ وَالثَّانِي أَنَّ الزَّكَاةَ تُطَهِّرُ نَفْسَ الْمُؤَدِّي عَنْ أَنْجَاسِ الذُّنُوبِ

"কিয়াস ভিত্তিক দলীল বিভিন্নভাবে প্রদান করা যায়, উল্লেখযোগ্য একটি কিয়াস এই, যাকাত প্রদান হলো একটি সহযোগিতামূলক কাজ। এর মাধ্যমে দুর্বল ও অসহায়কে সাহায্য করা হয় এবং অক্ষমকে সক্ষম ও তাকে (অক্ষমকে) শক্তি সঞ্চার করা হয় এমন সকল কাজে, যা আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর ফরয করেছিলেন। যেমন- একত্ববাদ ও সকল ইবাদত। (আর নিয়ম হলো) কোনো ফরয আদায়ের মাধ্যমও ফরয হয়ে থাকে। (সুতরাং যাকাত প্রদান অক্ষম ব্যক্তির ফরয বিধানসমূহ আদায়ে সক্ষম হওয়ার মাধ্যম ও অসিলা হওয়ায় যাকাত প্রদানও ফরয)। দ্বিতীয়ত. যাকাত প্রদানের কাজটি যাকাতদাতার অন্তরকে গুনাহের নাপাকী ও অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে। (শরীর থেকে নাপাকী দূরীভূত করা যেমন ফরয তেমনি অন্তরের নাপাকীও দূরীভূত করা ফরয)।"[৫২]

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলামের তৃতীয় ও অন্যতম স্তম্ভ যাকাতের বিধান মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী একটি পন্থা। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এটি মানবজাতির জন্য নিয়ামত স্বরূপ। ইসলামের এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিধানটি স্বাভাবিকভাবেই শরীয়তের মূল চারটি উৎস তথা কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত। আল-কুরআনের অসংখ্য আয়াতে কারীমায় যাকাত সম্পর্কিত বিষয়ে মুসলমানদেরকে বিশদভাবে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এসকল আয়াতে যাকাত আদায়ের নির্দেশের পাশাপাশি যাকাত আদায়ের ফযীলত ও অনাদায়ের কঠিন পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত অসংখ্য হাদীস এবং সাহাবায়ে কিরামের বর্ণিত আছারেও যাকাতের বিভিন্ন বিধি-বিধান সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া যাকাতের বিধান ফরয হওয়ার ব্যাপারে সর্বযুগের সকল মুসলমান ঐকমত্যে পৌঁছেছেন এবং বিষয়টি কিয়াস তথা যুক্তির মানদণ্ড দ্বারাও প্রমাণিত।

তথ্যনির্দেশ

১ লুইস মা'লূফ, *আল-মুনজিদ ফিল-লুগাতি ওয়াল-আদাবি ওয়াল-উলূম* (বৈরূত: আল-মাতবা'আতুল-কাছুলীকিয়্যাহ, ১৯শ সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ৩০৩; ড. মুহাম্মাহ রাওয়াস ও ড. হামিদ সাদিক, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* (বৈরূত: দারুন্-নাফাইস, ৩য় সংস্করণ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.), পৃ. ২৩৩।

২ ইবন মানযূর আল-ইফরীকী, *লিসানুল-আরব*, ১৪শ খণ্ড (বৈরূত: দারু সাদির, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি.), পৃ. ৩৫৮; হুসায়ন ইবন মুহাম্মাদ রাগিব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন* (বৈরূত: দারুল কলম, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ হি.), পৃ. ৩৮০-৩৮১; আশ্-শরীফ আল-জুরজানী, *আত্-তা'রীফাত* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ১১৪; সম্পাদনা পরিষদ, *আরবী-বাংলা অভিধান*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১০৮৭।

৩ Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam* (New Delhi: Rupa & Co, 3rd Impression, 1993), p. 699.

৪ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (New York: Spoken Language Services, Inc, Third Edition, 1976), p. 379.

৫ আল-কুরআনুল কারীম, সূরা আল-আ'লা, ৮৭ : ১৪।

৬ আল-মাওয়ারদী বলেন, যাকাতই সাদাকা এবং সাদাকাই যাকাত। নাম পার্থক্যপূর্ণ হলেও যে জিনিসের নামকরণ করা হয়েছে, তা এক ও অভিন্ন। দ্র. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৩ হি./১৯৭৩ খ্রি.), পৃ. ৪০।

৭ সূরা আত্-তাওবাহ, ৯ : ১০৩।

৮ সূরা আত্-তাওবাহ, ৯ : ৫৮; এছাড়া অত্র সূরার ৬০ নং আয়াতেও (صَدَقَاتٌ) সাদাকাতুন শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে।

৯ ড. ওয়াহাবাহ ইবন মুস্তাফা আয্-যুহায়লী, *আল-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৩য় খণ্ড (দিমাশক: দারুল-ফিক্র, ৪র্থ সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ১৫২।

১০ পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫২।

১১ পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৩।

১২ পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৩।

১৩ **কুরআন:** কুরআন (قُرْآن) শব্দের আভিধানিক অর্থ, পঠিত। পরিভাষায় কুরআন বলতে বুঝায়, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওপর নাযিল করা হয়ছে। এটি মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে সন্দেহাতীতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টি। দ্র. মুফতী মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, *কাওয়া'ইদুল ফিক্হ* (করাচী: মীর মুহাম্মাদ কুতুবখানা, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৪২৬।

১৪ **হাদীস:** হাদীস (الحديث) শব্দের আভিধানিক অর্থ, নতুন। পরিভাষায়, নবী করীম (সা)-এর প্রতি সম্পৃক্ত তাঁর বাণী, কর্ম, মৌনসম্মতি অথবা গুণাগুণকে হাদীস বলা হয়। দ্র. মাহমূদ তাহহান, *তায়সীরু মুসতালাহিল হাদীস* (রিয়াদ: মাকতাবাতুল-মা'আরিফ লিন-নাশরি ওয়াত্-তাওযী', ১০ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৭।

---

১৫ **ইজমা:** ইজমা (إِجْمَاع) শব্দের আভিধানিক অর্থ, ঐকমত্য হওয়া। পরিভাষায়, একই যুগের উম্মতে মুহাম্মাদীর সকল পুণ্যবান মুজতাহিদ কর্তৃক কোনো দ্বীনি বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়। দ্র. *কাওয়া'ইদুল ফিক্হ*, পৃ. ১৬০।

১৬ **কিয়াস:** কিয়াস (قِيَاس) শব্দের আভিধানিক অর্থ, অনুমান করা। পরিভাষায়, ইল্লাত ও হুকুমের মধ্যে শাখাকে মূলের সাথে অনুমান ও যাচাই করাকে কিয়াস বলা হয়। দ্র. *কাওয়া'ইদুল ফিক্হ*, পৃ. ৪৩৭।

১৭ আবুল বারাকাত আন-নাসাফী (র) (মৃ. ৭১০ হি.) বলেন,

لِأَنَّهَا فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ قَطْعِيَّةٌ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَكْفِيرِ جَاحِدِهَا وَدَلِيلُهُ الْقُرْآنُ وَمَا فِي الْبَدَائِعِ مِنْ أَنَّهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْمَعْقُولُ

দ্র. ইব্‌ন নুজায়ম আল-মিসরী, *আল-বাহরুর রাইক শারহু কানযুদ্-দাকাইক*, ২য় খণ্ড (কায়রো: দারুল কিতাবিল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ২১৭; আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-জুযায়রী (র) বলেন,

ودليل فرضيتها: الكتاب، والسنة، والاجماع

দ্র. আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-জুযায়রী, *আল-ফিক্হু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৫৩৬।

১৮ আলাউদ্দীন আল-কাসানী, *বাদাই'উস্-সানাই' ফী তারতীবিশ্-শারাই'*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ২।

১৯ ইব্‌ন কুদামাহ আল-মুকাদ্দিসী, *আল-মুগনী*, ২য় খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতুল কাহিরাহ, ১৩৮৮ হি./১৯৬৮ খ্রি.), পৃ. ৪২৭।

২০ *ফিক্হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৭।

২১ *আল-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৬।

২২ সূরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৭১-৭৩।

২৩ সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৫৪-৫৫।

২৪ সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ১৫৬।

২৫ সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ৮৩।

২৬ সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ১২।

২৭ সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৩১।

২৮ সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ৪৩।

২৯ সূরা আত্-তাওবাহ, ৯ : ১০৩।

৩০ সূরা আল-আন'আম, ৬ : ১৪১।

৩১ সূরা আত্-তাওবাহ, ৯ : ৬০।

৩২ সূরা আন্-নিসা, ৪ : ১৬২।

৩৩ সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ১৫৬।

৩৪ সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৭৭।

৩৫ সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ১২।

৩৬ সূরা হা-মীম আস্-সাজদাহ, ৪১ : ৬-৭।

৩৭ ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল-বারী শারহু সহীহিল-বুখারী*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি.), পৃ. ৩৭৭; *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৫।

৩৮ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল-বুখারী* (বৈরূত: দারু ইব্‌ন কাছীর, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), কিতাবুল-ঈমান, বাবু কাওলিন-নাবিয়্যি (সা) : বুনিয়াল ইসলামু আলা খামসিন, হাদীস নং ৮।

৩৯ যাকাত ব্যয়ের খাত হিসেবে শুধু দরিদ্রদের কথা বলা হয়েছে, অথচ যাকাত ব্যয়ের খাত ৮টি। এর কারণ হলো, তখন ওরাই ছিল বেশি সংখ্যক। দ্র. *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪।

৪০ *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবু ওজূবিয্-যাকাত, হাদীস নং ১৩৯৫।

৪১ পূর্বোক্ত, কিতাবুয্-যাকাত, বাবুল বাই'আতি আলা ঈতাইয্-যাকাতি, হাদীস নং ১৪০১।

৪২ আহমাদ ইব্‌ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ, *সুনানুন্-নাসাঈ* (বৈরূত: দারুল-ফিক্‌র, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫-১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), কিতাবুয্-যাকাত, বাবু ওজূবিয্-যাকাত, হাদীস নং ২৪৩৮।

৪৩ আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, *মুসনাদু আহমাদ* (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.), হাদীসু আবী উমামা আল-বাহিলিয়্যি আস্-সুদায়্যি ইব্‌ন আজলান ইব্‌ন আমর ওয়া ইয়ুকালু ইব্‌ন ওয়াহাব আল-বাহিলিয়্যি আনিন্-নাবিয়্যি (সা), হাদীস নং ২২২৬০।

৪৪ সুলায়মান ইব্‌ন আহমাদ আত্-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর* (কায়রো: মাকতাবাতু ইব্‌ন তায়মিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, তা.বি.), বাবুল আইন, বাবু মান রাওয়া আন ইব্‌ন মাস'উদ আন্নাহু লাম ইয়াকুন মা'আন-নাবিয়্যি (সা) লায়লাতাল জিন্ন, হাদীস নং ১০০৯৫।

৪৫ *মুসনাদু আহমাদ*, মুসনাদু আনাস ইব্‌ন মালিক (রা), হাদীস নং ১২৩৯৪।

৪৬ আহমাদ ইব্‌ন হুসায়ন আবূ বকর আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান* (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ লিন্-নাশরি ওয়াত্-তাওযী', ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.), মুসনাদু আনাস ইব্‌ন মালিক (রা), হাদীস নং ৮৫৯৮।

৪৭ *বাদাই'উস্-সানাই' ফী তারতীবিশ্-শারাই'*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩; *আল-মুগনী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৭; *আল-ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৬; *আল-বাহরুর রাইক শারহু কানযুদ্-দাকাইক*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৭; *আল-ফিক্‌হু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৬।

৪৮ *বাদাই'উস্-সানাই' ফী তারতীবিশ্-শারাই'*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩।

৪৯ *ফাতহুল বারী শারহু সহীহিল-বুখারী*,, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬২।

৫০ মুহীউদ্দীন ইয়াহইয়া ইব্‌ন শারফ আন্-নববী, *আল-মাজমূ' শারহুল-মুহাযযাব*, ৫ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল-ফিকর, তা.বি.), পৃ. ৩২৬।

৫১ ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী ও মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী, *আধুনিক প্রেক্ষাপটে যাকাতের বিধান* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, পরিমার্জিত মুদ্রণ, ২০২১ খ্রি.), পৃ. ২৪।

৫২ *বাদাই'উস্-সানাই' ফী তারতীবিশ্-শারাই'*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

আব্বাসীয় খিলাফত : সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট
(Abbasid Caliphate : Social and Cultural Background)

গুলশান আকতার*

Abstract: The Abbasid Caliphate (750-1258) was established after the fall of the Umayyad Caliphate (661-750). The Abbasid caliphate started a glorious chapter in social, political and economic fields including knowledge and science. During this time the Caliphs were used to modern and advanced and luxurious life. They established a new changed society of different races, which is unmatched even today. Basically, every person who appears in the world is influenced by the contemporary environment in every aspect of life, starting from social thoughts, religious beliefs and values. Similarly, the caliphs of the Abbasid period and the Muslim scientists of that time were influenced by the social context. Therefore, in this article, an attempt has been made to highlight the contemporary social conditions of the Abbasid period to the Muslim nation and the present generation.

শব্দ সূচক : খিলাফত, খলীফা, আব্বাসীয় খিলাফত, সমাজ, সংস্কৃতি।

ভূমিকা

মুসলিম সমাজ, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক বিকাশে আব্বাসীয় আমল এক অনন্য সৃষ্টি। ইতিহাসের পাতায় আব্বাসীয় শাসনামল (৭৫০-১২৫৮) স্বর্ণযুগ হিসেবে স্বীকৃত। এ সময় সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রে যুগান্তকারী বিপ্লব সাধিত হয়। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা উন্নত বিশ্বের আদর্শে রূপায়িত হয়েছিল। আরবীয় সংস্কৃতি এবং পারসিকসহ অন্যান্য বৈদেশিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণে আব্বাসীয় সমাজ এক নব পল্লবে রুপান্তরিত হয়ে মহীরুহে পরিণত হয়েছিল। যার ফলে একটি আধুনিক সংস্কারমূলক সমাজের প্রতিচ্ছবি আব্বাসীয় আমল থেকেই পরিদৃষ্ট হয়েছে। রুচিসম্মত বিলাস সামগ্রী, আমোদ-প্রমোদে আব্বাসীয়গণ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তারা পারসিক রীতি-নীতিতে প্রভাবান্বিত হয়ে উন্নত ও আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ধাবিত হয়। আর তার ফলস্বরূপ বাগদাদসহ উল্লেখযোগ্য নগরী সজ্জিত হয় আধুনিক সব কলা-কৌশল ও সরঞ্জামাদির সমন্বয়ে। প্রকৃতপক্ষে আব্বাসীয় খিলাফতের উত্থানের সাথে সাথে শুধু শাসকবর্গের পরিবর্তন ঘটেনি বরং এর ফলে সামাজিক অবস্থারও বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়।

আব্বাসীয় খিলাফতের পরিচয়

আব্বাসীয় খিলাফত (الخلافة العباسية)-এর মধ্যকার আল-আব্বাসীয় (العباسية) শব্দটি আব্বাস (عَبَّاس) নাম থেকে এসেছে। *আল-খিলাফত* (الخلافة) শব্দটির অর্থ প্রতিনিধিত্ব করা, অন্য কারো স্থানে স্থলাভিষিক্ত হওয়া। আর *‘খলীফা’* শব্দের অর্থ প্রতিনিধি (Deputy) স্থলবর্তী। এর বহুবচন *‘খুলাফা’*[১]। খলীফা শব্দের বিশেষ অর্থ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিনিধি।[২] আল-কুরআনে *‘খলীফা’* শব্দটি একবচন হিসেবে দুবার এবং বহুবচন হিসেবে সাতবার ব্যবহার করা হয়েছে।[৩] খিলাফত হচ্ছে একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (Religious Political Institution) মুসলিম আইনবিদগণ কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে খিলাফতকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন।[৪] খলীফা বলা হয় যিনি খিলাফত পরিচালনা করেন তাকে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

* পিএইচ.ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

> "স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানাতে চাই।"[৫]

মজীদ খাদ্দরী বলেন, "খিলাফত হলো ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইহলৌকিক নেতৃত্বের একটি প্রতিষ্ঠান।"[৬] ইব্নু খালদূনের মতে, "খিলাফত হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মিশনের প্রতিনিধিত্ব করে। সে কারণে খলীফার প্রধান কর্তব্য হলো ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং সাধারণভাবে রাষ্ট্রনীতি সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা।"[৭] ইব্নু খালদূন খলীফার পরিচয় সম্পর্কে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এরপর যাঁরা তাঁর আদর্শ ও দাওয়াত প্রচারণার দায়িত্ব পালন করবেন তাদেরকেই বলা হয় খলীফা।[৮]

ইসলামে '*খিলাফত*' এমন একটি শাসনব্যবস্থার নাম যা আল্লাহ তা'আলার বিধান ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাহ কর্তৃক পরিচালিত। এই শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তিনিই বিশ্ব জগতের স্রষ্টা এবং পরিচালক। মানুষের মর্যাদা হলো সে আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলীফা এবং তার রাজনৈতিক ব্যবস্থা হবে মহান আল্লাহর আইনের অনুগামী। খলীফার কাজ হলো, সর্বোচ্চ শাসক আল্লাহর আইনকে তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য অনুযায়ী কার্যকর করা এবং তাঁর নির্দেশিত পথে রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা।

আব্বাসীয় খিলাফত (الخلافة العباسية) হলো, ইসলামী খিলাফতগুলোর মধ্যে তৃতীয় খিলাফত। এটি আব্বাসীয় বংশ কর্তৃক শাসিত। বাগদাদ এই খিলাফতের রাজধানী। উমাইয়া খিলাফতকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে আন্দালুসে উমাইয়া খিলাফত উৎখাত করা যায়নি। মূলত জাহিলী যুগ থেকে বানূ হাশিম ও বানূ উমাইয়ার মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলে আসছিল, তারই এক রক্তক্ষয়ী পরিণতিতে উমাইয়া রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বানূ হাশিম শাখার প্রাণ পুরুষ আব্বাস (রা)-এর উত্তরসূরীগণ হাশিমী বংশের গৌরব অক্ষুণ্ন রাখার নিমিত্তে বানূ উমাইয়ার ক্ষমতা ধুলিস্যাত করার চেষ্টায় রত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিতৃব্য আব্বাস ইব্ন আব্দিল মুত্তালিব ইব্ন হিশাম ইব্ন আবদ মানাফ আল-কুরায়শী আল-হাশিমী[৯]-এর বংশধরগণই ইতিহাসে আব্বাসীয় যুগের প্রবর্তক।[১০] আল-আব্বাসের নামানুসারে এই বংশ বানূল আব্বাস (بنو العباس) বা আব্বাসীয় বংশ নামে পরিচিত।

আব্বাসীয় খিলাফতের বৈশিষ্ট্য

১. **আব্বাসীয় খিলাফতে ধর্মীয় প্রকৃতি:** খোলাফাউর রাশীদূন ছিল প্রকৃত ও পরিপূর্ণ সুন্নাহ্র ওপর প্রতিষ্ঠিত। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামী সাম্রাজ্যের উমাইয়া খিলাফত আরবদের গোত্রগত, জাতিগত রাজতন্ত্র অনুসরণ করলেও আব্বাসীয় খিলাফত ছিল ইসলামী সাম্রাজ্য ও মুসলিম রাজতন্ত্র সম্পন্ন খিলাফত। আব্বাসীয় খিলাফতের প্রথম খলীফা আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ ইসলামের পরিপূর্ণ শরী'আহ অনুসরণ করে শাসনকার্য পরিচালনার অঙ্গীকার পোষণ করেন। ১৩২ হিজরীর ৩ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর কূফার মসজিদে জুমু'আর খুতবায় (তাঁর প্রথম ভাষণে) তিনি বলেন,

> الحمد لله الذي اصطفي الاسلام لنفسه ... وجعلناه أهله ...، ثم ذكر قرابتهم في أيات القرأن، الي ان قال: فلما قبض الله نبيه قام بالأمر أصحابه الي أن وثب بنو حرب و مروان فجاروا واستأثروا، فاملي الله لهم حينا حتي اسفوه، فأنتقم منهم بأيدينا، ورد علينا حقنا ليمن بنا علي الذين استضعفوا في الأرض، وختم بنا كما افتتح بنا، وما توفيقنا أهل البيت الا بالله، يا أهل الكوفة أنتم محلمحبتنا، ومنزل مودتنا، لم تفتروا عن ذلك، ولم يثنكم عنه تحامل أهل الجور.

> "সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ পাকের যিনি বিধান হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করেছেন এরপর তিনি আল-কুরআনের আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে নিজ পরিবারের বিবরণ দিয়ে বললেন, নবীর (সা) ওফাতের পর ইসলামের সকল কার্যাদি আল্লাহর প্রিয় হাবীব (সা)-এর সাহাবায়ে কিরামের উপর বর্তায়। কিন্তু বানূ হারব আর মারওয়ান তা কুক্ষিগত করে অত্যাচার শুরু করে। তারা অনেক অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। আমাদের প্রাপ্য আমাদের দেয়া হলে আমরা সে যুগের হতদরিদ্রের সেবা করতে পারতাম। যারা আমাদের বংশের সাথে কোনো প্রকার সম্পর্ক রেখেছে তাদেরও সরিয়ে দেয়া হয়েছে। তখন আমাদের আর আহলে বাইতের কোনো প্রকার ক্ষমতাই ছিল না। হে কূফাবাসী! আপনারা আমার ভালোবাসার প্রাসাদ আর বন্ধুত্বের মারকায। আপনারা কখনো আমার ভালোবাসা থেকে দূরে সরে যাবেন না। অত্যাচারীর নির্মম অত্যাচারও আমাদের পৃথক করতে পারবে না।"[১১]

প্রত্যেক আব্বাসীয় খলীফা নিজেকে ইমাম (ধর্মীয় প্রধান) হিসেবে অভিহিত করতেন। যেসব অনৈসলামিক কার্যকলাপের জন্য উমাইয়াদের পতন ঘটে, প্রথম থেকেই সেসবের ব্যাপারে আব্বাসীয় খলীফাগণ সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং জনগণকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে তারা অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। তারা তাদের রাজদরবারে আলেম-উলামা এবং বিজ্ঞানীদের সম্মানের সহিত আপ্যায়ন করতেন। এবং তাদেরকে যথোপযুক্ত মর্যাদায় অভিসিক্ত করে বিভিন্ন পদে মাসোহারা প্রদানপূর্বক নিযুক্ত করেন। ফলে সাম্রাজ্যের শাসনকার্যের ভিন্ন পদে ও ক্ষেত্রে আলেম-উলামা ও জ্ঞানী-গুণীদের পদচারণা ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাসনকার্যে তাঁদের পরামর্শ মেনে চলা হতো। আব্বাসীয় খলীফাগণ ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক বিষয়াদি পর্যন্ত জীবনের সকল স্তরে ধর্মীয় আদর্শের অনুকরণ করতেন। ইসলামী আইন তথা ধর্মীয় বিধিনিষেধ পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করার লক্ষ্যে শাসনকার্যে দক্ষ ও যথেষ্ট জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়।

২. **বিশাল সাম্রাজ্যের ঐক্যের বিলোপ সাধন:** উমাইয়াগণ তাদের শাসনামলে রাজ্য বিস্তারকার্যে অধিক সময় ব্যয় করেছেন। পক্ষান্তরে আব্বাসীয়রা ছিল সম্পূর্ণভাবে তাদের বিপরীত। তারা রাজ্যবিস্তারের পরিবর্তে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্কার সাধন তথা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় চর্চায় মনোনিবেশ করেছেন। জ্ঞানের চর্চায় তাদের শাসনকার্যের মূলগত বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পায়। উমাইয়া খলীফাদের মাধ্যমে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা মুসলমানদের করলগত হয় এবং ইসলামী খিলাফতের ওপর প্রভুত্ব কায়েম হয়; কিন্তু আব্বাসীয়দের সময় সম্পূর্ণরূপে এ ঐক্য চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয়। একে একে স্পেন, মিশর, পূর্বাঞ্চলীয় সিন্ধু ও আফগানিস্তান থেকে আব্বাসীয় প্রভুত্ব বিলীন হয়ে যায়। বিশেষ করে ফাতেমী বংশ (৯০৯ খ্রি.), গজনী বংশ (৮৭২ খ্রি.), তাহিরী বংশ, সাফ্ফারী বংশ, সামানী বংশ, আগলাবী বংশ প্রভৃতি বংশ প্রতিষ্ঠিত হলে আব্বাসীয় বংশ একেবারে সংকুচিত হয়ে পড়ে। এভাবে আব্বাসীয় খিলাফত পশ্চিমাঞ্চলে বিলুপ্ত হয়ে শুধুমাত্র পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার ইরাক হতে খোরাসান অঞ্চল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। ফলে আব্বাসীয় শাসনামলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে এবং আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের ঐক্যও বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে *'History of the Arabs'* গ্রন্থে উল্লেখ আছে,

> For the first time in it's History the Caliphate was not coterminous with islam. Spain and North Africa, Uman, Sind and even Khurasan did not fully acknowledge the new caliph. Egypt's acknowledgment was more nominal than real ... Syria was in constant turmoil.

> "ইতিহাসে এই প্রথম খলীফারা ইসলামী বিশ্বের সঙ্গে অঙ্গীভূত ছিলেন না। স্পেন, উত্তর আফ্রিকা, ওমান, সিন্ধু এবং এমনকি খুরাসান পর্যন্ত নতুন খলীফাকে পুরোপুরি মেনে নিতে

পারেননি। মিশর স্বীকৃতি দিলেও তা ছিল নামকাওয়াস্তে। ... সিরিয়ার গোলমাল লেগেই ছিল।"[১২]

৩. **আন্তর্জাতিক রূপ:** আব্বাসীয় খিলাফতের বৈশিষ্ট্য ছিল আন্তর্জাতিক। উমাইয়াগণ যে আরব জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছিল আব্বাসীয়গণ তার বিলুপ্তি ঘটান এবং তার ওপর এক সংস্কারপূর্বক নতুন সমাজ গড়ে তোলেন। মূলত সেখানে বনেদি মুসলমান এবং নবদিক্ষিত মুসলমানদের সমন্বয়ে একটি সংকর সমাজের উদ্ভব ঘটে। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক P.K. Hitti তাঁর *'History of the Arabs'* গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

> In one respect there was a fundamental differences: the Umyyad empire was Arab, the Abbasid was more international. The Abbasid was an empire of Neo-Moslems in which the Arabs formed only one of the many component race.
>
> "তবে এক দিক থেকে দু সাম্রাজ্যের মৌলিক পার্থক্য ছিল। উমাইয়া সাম্রাজ্য ছিল আরবীয়। আব্বাসীয়রা ছিল অনেক বেশি আন্তর্জাতিক। তা ছিল নয়া মুসলিম সাম্রাজ্যের, যে সাম্রাজ্যে আরবীয়রা বহু জাতির মধ্যে অন্যতম এক জাতি প্রতিষ্ঠা করেছিল।"[১৩]

আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বার উন্মোচিত হয়। যার ফলে অনেক নগর ও বন্দর গড়ে উঠে এবং আমদানি-রপ্তানিও ব্যাপকহারে চলতে থাকে। বিশেষ করে আরবীয় তথা মুসলিম সাম্রাজ্যের কাঁচামাল, শিল্পজাত দ্রব্য সুদূর ভারত, সিংহল, মলয়, জাভা, সুচিত্রা ও চীন পর্যন্ত রপ্তানী করা হতো।

৪. **আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের সাথে পার্থিব ক্ষমতা গ্রহণ:** আব্বাসীয় খিলাফতের দ্বিতীয় খলীফা আল-মনসূর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) মুসলমানদের ওপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার এবং আব্বাসীয় বংশকে শক্তিশালী ও স্থায়ী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য পার্থিব ক্ষমতা গ্রহণের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাদের নীতি অনুযায়ী বলা যায়, এক মানুষের দুই রূপ তথা একই মানুষের মধ্যে সিজার ও পোপ বিদ্যমান। ঐতিহাসিক P.K. Hitti বলেন,

> From the very beginning the idea was cultivated that authority should remain forever in Abbasid hands, To be finally delivered to Jesus (Isa), the Messiah. Later the theory was promulgated that if this caliphate were destroyed the whole universe would be disorganised. As a matter of fact the religious change was more apparent than real.
>
> "গোড়া থেকেই এমন একটি ধারণা প্রোথিত করার চেষ্টা করা হতো যে, কর্তৃত্ব সর্বদাই আব্বাসীয়দের হাতেই থাকবে এবং তা শেষ পর্যন্ত দেবদূত যীশুর (ঈসা) হাতে হস্তান্তরিত হবে। পরে এই তত্ব ঘোষিত হয় যে, এই খিলাফত ধ্বংস হয়ে গেলে গোটা খিলাফত ধ্বংস হয়ে যাবে। আসলে এই ধর্মীয় পরিবর্তন আপাত বাস্তবে প্রকৃত নয়।"[১৪]

৫. **তুর্কীদের প্রভাব বৃদ্ধি:** পারসিকদের পাশাপাশি তুর্কীদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি আব্বাসীয় খিলাফতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পারসিক প্রভাব বিনষ্ট করার লক্ষ্যে আব্বাসীয় খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল (৮৪৭-৮৬১ খ্রি.) তুর্কী দেহরক্ষী বাহিনী গঠন করেন। এ সময় বাগদাদ থেকে রাজধানী সামারায় স্থানান্তরিত করা হয় এবং তুর্কীদের সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। আর তুর্কীরা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধিপূর্বক আব্বাসীয়দের ওপর মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

৬. **পারসিক প্রভাবঃ** ইরানি বা পারসিক প্রভাব আব্বাসীয় খিলাফতের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রাথমিকভাবে আব্বাসীয় খিলাফতে ইসলামী শাসন জারি থাকলেও আরবীয় প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। নানান ধর্ম, ভাষা ও জাতির সমন্বয়ে গড়ে উঠা নতুন মুসলিম সমাজে স্বাভাবিক ভাবেই ইরানি তথা পারসিক প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। পারসিক সভ্যতা সংস্কৃতির অনেকাংশই আব্বাসীয়দের মধ্যে প্রবেশ করে। এ প্রসঙ্গে P.K. Hitti তাঁর *'History of the Arabs'* গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

> Gradually persian titles, Persian wines and wives, Persian mistresses, Persian songs, as well as Persian ideas and thoughts, won the day. Al-Mansur, we are told was the first to adopt the characteristic Persian head-gear (pl. qalanis), in which he was naturally followed by his subjects.
>
> "ধীরে ধীরে পারসি পদবি, পারসি মদ, পারসি বিবি, পারসি প্রেমিকা, পারসি গান, পারসি চিন্তাভাবনাই গ্রাস করে ফেলতে লাগলো সবকিছু। আমরা বলি,আল-মনসূরই প্রথম খলীফা যিনি পারসি টুপি (কালানিস) ধারণ করেন, যা স্বাভাবিক তার প্রজারা অনুসরণ করেন।"[১৫]

উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র উল্লেখ আছে,

> Arabianism fell,but Islam continued, and under the guise of international Islam Iranianism marched triumphantly on.
>
> "আরব জাতীয়তাবাদের পতন ঘটলো, কিন্তু ইসলামী প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকল এবং আন্তর্জাতিক ইসলামের আবরণে ইরানি জাতীয়তাবাদ বিজয়গর্বে এগিয়ে চলল।"[১৬]

৭. **নব নব পদের সৃষ্টিঃ** পূর্ববর্তী শাসনামলে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য উপদেষ্টা পরিষদ থাকতো। কিন্তু সর্বপ্রথম আব্বাসীয়রা ইরানিদের অনুকরণে উজির বা প্রধানমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করেন। ফলে আরবীয় আভিজাত্যের অবসান ঘটে এবং উজিররা সাম্রাজ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। তারা খলীফা নির্বাচন ও অপসারণের ক্ষমতা লাভ করায় সমগ্র সাম্রাজ্যে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেন। এছাড়া আব্বাসীয়গণ সর্বপ্রথম জল্লাদের পদ সৃষ্টি করেন। পূর্বে আরব ও উমাইয়া শাসনামলে জল্লাদ পদ অজ্ঞাত থাকলেও তারা নিজেদের প্রয়োজনে এসব পদ সৃষ্টি করেন। পাশাপাশি তারা জ্যোতিষী তথা গণকদেরও নিজেদের দরবারে লালন-পালন করতে থাকে। এসব গণকরা তাদের শাসনকার্যের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আগাম ভবিষ্যদ্বাণী দিতেন এবং সামরিক অভিযানেও যেতেন।

৮. **পোস্টমাস্টার নিযুক্তিকরণঃ** পোস্টমাস্টার নিযুক্তিকরণ আব্বাসীয় খিলাফতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। পোস্টমাস্টাররা তাদের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্বও পালন করত। মূলত তারা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সকল কর্মকাণ্ড গোপনীয়ভাবে খলীফার নিকট প্রেরণ করত।

৯. **আব্বাসীয় দরবারঃ** আব্বাসীয় দরবার ছিল উমাইয়া দরবার থেকে অনেকাংশই পৃথক। আব্বাসীয় খলীফারা প্রায়ই মোসাহেব পরিবৃত্ত অবস্থায় থাকতেন। এ প্রসঙ্গে *'History of the Arabs'* বির্ণত হয়েছে,

> The time of the Friday prayer the mantle (burdah) once worn by his distant cousin, the Prophet.
>
> "তার দূর সম্পর্কের ভাই হযরত মুহাম্মদ (সা) একসময় যে আঙরাখা (বুরদা) পরতেন, শুক্রবারের নামাযের সময় তিনিও তাই পরতেন।"

আব্বাসীয় দরবারে ক্রমানুসারে হাসেমী, খোরাসানী এবং সামরিক প্রধানদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা প্রভাব বিস্তার লাভ করতে থাকে। খলীফার পরেই ছিল প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা। মন্ত্রিপরিষদবর্গ পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যের সকল কাজ করতেন। এমনকি খলীফাদের প্রশাসনিক দায়িত্বও তারা পালন করতেন। ফলে খলীফাগণ কাঠের পুতুলে পরিণত হন। খুতবায় শুধু তাদের নাম সমোচ্চারিত হতো।

১০. **ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা:** ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আব্বাসীয় খিলাফতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। আব্বাসীয় খলীফারা ধারণা করতেন যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের পর ইসলামের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তারাই ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তাই তাঁরা মদিনা থেকে মুহাদ্দিসগণকে বাগদাদে আমন্ত্রণ জানান। তাঁরাই কুরআনের ব্যাখ্যা বা হাদীস মানুষের সামনে উপস্থাপন করতেন এবং সে অনুযায়ী সমাজের যাবতীয় বিচারকার্য সম্পন্ন করতেন। আল্লাহ তা'আলা ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

"সুবিচার কর এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী।"[১৭]

১১. **সামরিক শক্তির বিলুপ্তি:** সামরিক শক্তির বিলুপ্তি আব্বাসীয় খিলাফতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আব্বাসীয় খলীফারা উমাইয়া খলীফাদের মতো রাজ্য বিস্তারের দিকে মনোযোগ দেননি। ফলে তাদের সামরিক শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে দূর্বল হয়ে পড়ে। এককথায় সামরিক বাহিনী তাদের রণ কৌশল হারিয়ে পর্যায়ক্রমে অচল হতে থাকে। ইতঃপূর্বে তারা কিছু সমৃদ্ধ অঞ্চল জয় করে এবং সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদ লাভ করে। যদিও সে বিজয় পতাকা ধরে রাখতে পারেনি তারা। আব্বাসীয় খলীফারা অন্তঃপুরে মদ, নারী প্রভৃতি বস্তুর বিলাসব্যসনে মত্ত হয়ে পড়ে যার কারণে সামরিক বাহিনীর দিকে সেভাবে নজর না দেওয়ায় প্রশাসনে সামরিক শক্তির বিলুপ্তি ঘটে।

১২. **রাজধানী পরিবর্তন:** ইরাক তথা বাগদাদের অধিবাসীরা আব্বাসীয় আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কার্যক্রম চালায়। আব্বাসীয় আন্দোলনের প্রতি ইরাকবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন স্বরূপ আব্বাসীয়রা ক্ষমতাগ্রহণপূর্বক সিরিয়ার দামেস্ক থেকে ইরাকের বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তর করে। তখন থেকেই সব উন্নতির স্রোতোধারা পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে বইতে আরম্ভ করে। ফলে সিরিয়াবাসীর দীর্ঘদিনের ক্ষমতা ও প্রভাবের অবসান ঘটে। *'History of the Arabs'* গ্রন্থে উল্লেখ আছে,

> With the fall of the Umayyads the glory of Syria passed away. its hegemony ended. The Syrians awoke too late to the realization that the centre of gravity in Islam had left their land and shifted eastward.
>
> "উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের পর সিরিয়ার স্বর্ণযুগ কেটে গেল। তার আধিপত্যের জামানা শেষ হলো। সিরীয়রা অনেক বিলম্বে বুঝতে পারল যে, ইসলামের ভারকেন্দ্র তাঁদের হাতছাড়া হয়ে পূর্বমুখী হয়ে পড়েছে।"[১৮]

পরবর্তীতে স্বাভাবিকভাবে বাগদাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। পর্যায়ক্রমে বাগদাদ নগরীর জৌলুস ও খ্যাতি বৃদ্ধি পেতেই থাকে। P.K. Hitti তাঁর *'History of the Arabs'* গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

> In 762 al-Mansur, who had laid the foundation stone of his new capital, Baghdad. The new location opened the way for ideas from the East. In a few years the town grew into an emporium of trade and commerce and a political centre of the greatest international

> importance. As if called into existance by ... to the power and prestige of Ctesiphon, Babylon, Nineveh, Ur and other capitals of the ancient Orient, attained a degree of prestige and splendour unrivalled in the Middle Ages, except perhaps by Constantinople, and after many vicissitudes was recently re-suscitated as the capital of the new Iraqi kingdom under a truly Arabian king, Faysal.
>
> "৭৬২ খ্রিস্টাব্দে আল-মনসূর বাগদাদে নতুন রাজধানীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। নতুন জায়গায় রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় ভৌগোলিক দিক দিয়ে প্রাচ্যের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ তৈরি হয়। কয়েক বছরের মধ্যে শহরটি শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পেলো কেন্দ্র হিসেবেও। যেন অচিরেই প্রাচীন কালের প্রাচ্যের রাজধানীগুলোর সমান মর্যাদা লাভে সমর্থ হলো। টেসিফোন, ব্যাবিলন, নিনেভ, উর এবং প্রাচীন প্রাচ্যের অন্যান্য রাজধানীর মর্যাদার ঐতিহ্যের অনুসারী হয়ে পড়ে এই নতুন রাজধানীও। মধ্যযুগে সম্ভবত কনস্ট্যান্টিনোপল ছাড়া কোন শহরই এর সমকক্ষ হতে পারেনি। অনেক উত্থান-পতনের পর আবার প্রকৃত আরবীয় রাজা ফয়সালের নেতৃত্বে এই শহরটিই ইরাকের নতুন রাজধানী হিসেবে পুনর্নির্মিত হয়।"[১৯]

১৩. **অনারবদের প্রাধান্য:** আব্বাসীয় খিলাফতে অনারবদের প্রাধান্য বেশ লক্ষণীয়। নবদীক্ষিত মুসলিম ও আরব মুসলিমরা সমান নাগরিক সুযোগ সুবিধা ও মর্যাদা লাভ করে। যার ফলে আরব ও অনারবদের মধ্যে কোনও পার্থক্য না থাকায় ক্রমান্বয়ে অনারবদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। সকল ক্ষেত্রে অনারবদের প্রাধান্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় যার নমুনা P.K. Hitti এর দুটি বাক্যেই নমুনা পাওয়া যায়। তিনি উল্লেখ করেন,

> In two fields only did the Arabian hold his own; Islam remained the religion of the state and Arabic continued to be the Official language of the state registers.
>
> "মাত্র দুটি ক্ষেত্রে আরবীয়রা নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখেছিলেন। ইসলাম ধর্ম রাষ্ট্রের ধর্ম হিসেবে এবং আরবী ভাষাই সরকারি ভাষা হিসেবে রয়ে গেলো।"[২০]

১৪. **স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা:** স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা ছিল আব্বাসীয় খিলাফতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। খিলাফতের শাসনকার্যে বা রাজনীতিতে জনগণের কোনো ভূমিকা ছিল না। খলীফারা একনায়কতন্ত্র স্বরূপ। তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তারা সর্বদা পরিষদবর্গ ও সেনাবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। এ প্রসঙ্গে *'History of the Arabs'* গ্রন্থে আছে,

> Here the caliphs built up a government modelled on Sasanid Chosroism. Arab Islam succumbed to Persian Influence; the Caliphate became more of a revival of Iranian despotism and less of an Arabian Seikhdom.
>
> "এভাবে খলীফারা সাসানীয় শাসনের আদর্শ গ্রহণ করে সরকার গঠন করেন। পারসী প্রভাবে আরবীয় ইসলাম ধর্মের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠে। খলীফারা আরবীয় শেখতন্ত্রের চেয়ে ইরানি স্বৈরতন্ত্রের পুনর্জাগরণেই বেশি উৎসাহী ছিলেন।"[২১]

১৫. **জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধন:** উমাইয়া আমল ছিল রাজ্য সম্প্রসারণের যুগ। আর আব্বাসীয় যুগ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগ। উমাইয়া শাসনামলে ব্যাপকহারে রাজ্য বিস্তারের ফলে

আব্বাসীয় আমলে খলীফারা রাজ্য সম্প্রসারণের বিষয়াদি বাদ দিয়ে জ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করেন। আব্বাসীয় খলীফা আল-মনসূর, হারুন-অর-রশীদ, আল-মামুন ছিলেন জ্ঞানপিপাসু খলীফা। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও মৌলিক গবেষণায় ব্যাপক অবদান রাখেন। জ্ঞানের গবেষণায় তারা বায়তুল হিকমাহ, দারুল হিকমাহ নামে গবেষণাগার স্থাপন করেন। বিজ্ঞানীদের পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দরবারে আমন্ত্রণ জানাতেন। তাদের কাউকে কাউকে মাসোহারাও প্রদান করতেন এবং শাসনকার্যের অনেক উচ্চপদে আসীনও করেন। বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফল স্বরূপ এ সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা পত্র-পল্লবে ও ফুলে-ফলে সুসজ্জিত হয়ে বিরাট মহিরুহে আচ্ছাদিত হয়। এ আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখায় মৌলিক গবেষণার পাশাপাশি অনুবাদকার্যও সম্পাদিত হয়। ব্যাপক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা বা গবেষণা স্বরূপ আব্বাসীয় আমলকে স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ প্রসঙ্গে *'History of the Arabs'* গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে,

> Persian Influence, it should be noted,softened the rough edges of the primitive Arabian life and paved the way for a new era distinguished by the cultivation of science and scholarly persuits. The Baghdad caliphate founded by al-Saffah and al-Mansur reached its Prime in the period between the reigns of the third caliph, al-Mahdi, and the ninth, al-Wathiq, more particularly in the days of Harun al-Rashid and his son al-Mamun.
>
> "এটা বলা উচিত, সাবেক আরবীয় জীবনের কঠোর দিকগুলি পারসি প্রভাবে কোমল হয়ে ওঠে।এর ফলে বিজ্ঞান চর্চায় গুরুত্ব দিয়ে এক নতুন দিগন্ত খুলে যায় এবং বহু পণ্ডিতের জন্ম হয়। আস-সাফ্ফাহ এবং আল-মনসূরের প্রতিষ্ঠিত বাগদাদী খিলাফত স্বর্ণযুগ ছিল তৃতীয় খলীফা আল-মাহদীর আমল থেকে শুরু করে নবম খলীফা আল-ওয়াসিকের সময় পর্যন্ত। বিশেষত হারূন-অর-রশীদ এবং তার পুত্র আল-মামূনের আমলে তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে ওঠে।"[২২]

আব্বাসীয় খিলাফতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

উমাইয়া সমাজে অনারবদের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। মূলত তা ছিল আরবীয় গোত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আব্বাসীয় সমাজে আরব আভিজাত্যের অবসান ঘটে এবং সেখানে কালের পরিক্রমায় আরব, পারসিক, তুর্কী এবং আল-মাগরিবাহ শ্রেনির আগমন ঘটে।[২৩] ফলে আব্বাসীয় সমাজ বহু জাতির সংমিশ্রণে আন্তর্জাতিক এক নব সমাজে পরিণত হয়।[২৪] অনারবগণ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আব্বাসীয়গণ অনারবদের মধ্যে পারসিকদের উপরই অত্যধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তারা খিলাফতের সূচনালগ্নেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আব্বাসীয় আমলে তাদের মধ্য থেকেই উজির, সামরিক কর্মকর্তাসহ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদ অলংকৃত করেন। তারা প্রশাসনিক বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত হওয়া মাত্র ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে এবং প্রশাসন পরিচালনায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে।[২৫]

আব্বাসীয় আমলে বিশেষত খলীফা আল-মুতাসিমের শাসনামলে (৮৩৩-৮৪২ খ্রি.) আরব ও পারসিকদের পাশাপাশি তুর্কী শ্রেনির উদ্ভব ঘটে। তুর্কীরা ছিল মরুচারী, দৈহিক ক্ষমতার অধিকারী, সাহসী, অভিজ্ঞ তীরন্দাজ এবং রণাঙ্গণে বীরযোদ্ধা। দাস-দাসী হিসেবে বাগদাদে তাদের আগমন ঘটলেও একটা পর্যায়ে তারা প্রশাসনের সিংহভাগ স্থান দখল করে নেয়। এর পশ্চাতে হেতু হিসেবে তুর্কী দাসীরা লাবণ্যময় ও আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী হওয়ায় তারা খলীফাগণের রাজপ্রাসাদ ও বিত্তবানদের ঘরে অধিক হারে স্থান লাভে সক্ষম হয়।[২৬] এভাবে খলীফাগণ ও সমাজের ধনিক শ্রেনি অনারব মহিলাদের পানি গ্রহণ শুরু করেন। এ আমলের অধিকাংশ খলীফার মাতা ছিল অনারব ক্রীতদাসী।[২৭] অথচ উমাইয়া আমলের দ্বাদশ খলীফা

তৃতীয় ইয়াযিদ ছাড়া অন্য কোনও খলীফা অনারব রমনীর সন্তান ছিলেন না।[২৮] রক্তের এই পারস্পরিক সংমিশ্রনের ফলে আরবদের স্বকীয়তা, জাতীয় সত্তা এবং সামাজিক মর্যাদা দারুন ভাবে বিঘ্নিত হয়।[২৯] শুধু তুর্কী দাসীগণ নয় তুর্কী দাসও অধিকহারে আব্বাসীয় সমাজে প্রবেশ পূর্বক প্রশাসনের বিভিন্ন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেয়। খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ এশিয়া মাইনরের মামলুকদের (দাস) সমন্বয়ে একটি বিশেষ তুর্কী বাহিনী গঠন করেন।[৩০]

আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রনের ফলে মিশ্র জাতির বিবাহ একটি সাধারণ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়। এর ফলে শাসনকার্যে পারসিক, তুর্কী, সিরিয়, বার্বার, গ্রিক এবং স্লাভ প্রভৃতি জাতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও পারসিক এবং তুর্কী প্রভাব ছিল তুঙ্গে।[৩১]

এ প্রসঙ্গে P.K.Hitti তাঁর *'History of the Arabs'* গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

> In bringing about this fusion of the Arabians with their subject peoples polygamy, concubinage and the slave trade proved effective methods. As the pure Arabian element receded into the background non-Arabs, half breeds and sons of freed women began to take their place. Soon the Arabian aristocracy was superseded by a hierarcy of officials representing diverse nationalities, at first preponderantly Persian and later Turkish.[৩২]
>
> "আরবীয় শাসকদের সামনে প্রজাদের সংমিশ্রন ঘটানোর পিছনে বহুগামিতা, উপ-পত্নী প্রথা এবং ক্রীতদাসত্ব সক্রিয় ভূমিকা নেয়। খাঁটি আরবীয় শক্তি এর ফলে পিছিয়ে পড়ে। পরিবর্তে সামনে চলে আসে অ-আরবীয়, বর্ণসংকর এবং মুক্ত ক্রীতদাসীর সন্তানরা। আরবীয় আধিপত্যের স্থান নেয় বিভিন্ন দেশের লোকজনকে দিয়ে তৈরি সরকারি আমলাগোষ্ঠী। এদের মধ্যে পারসী এবং তুর্কীই ছিলেন বেশি।"

আরব-অনারব সংমিশ্রণকে কতিপয় লেখক ও ঐতিহাসিক ভালো দৃষ্টিতে দেখেননি। তাঁদের মতে, আরব-অনারবদের মধ্যে বিবাহবন্ধনসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্মিলিত অংশগ্রহণের ফলে আরবদের স্বকীয়তা, জাতিসত্তা এবং সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়, আরবগণ নিজেদের স্বীয় রক্তের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে, ফলে জাতীয় ঐক্য ভেঙ্গে পড়ে। এমনকি অনুপ্রবেশকারী গোষ্ঠী সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করায় আরবদের মৌল আভিজাত্য হারিয়ে যায়।[৩৩] তবে এ বিষয়টি অমূলক ছিল না। বরং তা ছিল বাস্তবসম্মত এবং বিশ্বজনীন সভ্যতা বিনির্মাণের মৌলভিত্তি। কেননা উগ্র জাতীয়তাবাদী চিন্তা জাতিতে জাতিতে কেবল দূরত্ব ও সংঘাতই সৃষ্টি করে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ অনুসন্ধান করলে তার বাস্তব প্রমাণ লক্ষ্য করা যায়। তাই ইসলাম উগ্র জাতীয়তাবাদী চিন্তাকে পরিহার করে বর্ণ, গোত্র,ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষকে এক তাওহীদের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাম্য, মৈত্রী ও সহাবস্থানের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

> "হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের সেই প্রভুর দাসত্ব কর, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন। যেন তোমরা তাক্ওয়া অর্জন করতে পার।"[৩৪]

আল্লাহ তা'আলার নিকট আরব-অনারব, সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নিচু এগুলো মর্যাদার কোনো মাপকাঠি নয়। বরং মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে 'তাকওয়া'। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

> "হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যিনি তোমাদের মধ্যে বেশি তাকওয়াবান।"[৩৫]

সংকীর্ণ ও উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনা পরিহার করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى.

> "হে মানবমণ্ডলী! এমন নয় যে তোমাদের রব এক এবং তোমাদের পিতাও এক, প্রকৃতপক্ষে একজন অনারবের উপর আরবের কোনো অগ্রাধিকার নেই ও একজন অনারবের উপর আরবেরও অগ্রাধিকার নেই এবং তাক্ওয়া ব্যতীত একজন কৃষ্ণবর্ণের উপর শুভ্রবর্ণের ও শুভ্রবর্ণের উপর কৃষ্ণবর্ণের কোনো অগ্রাধিকার নেই।"[৩৬]

উপর্যুক্ত আল-কুরআন ও আল-হাদীসের বক্তব্যসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আরব অনারবদের মাঝে বিভাজন সৃষ্টি করা আদৌ ইসলাম ও বাস্তবসম্মত ছিল না। তাই আমাদের মতে আব্বাসীয় খলীফাদের উদারনীতি মৌলিক কোনো ভ্রান্ত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলনা। বরং আন্তর্জাতিক নীতি অবলম্বন করার ফলে তাঁরা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নয়নসহ শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ইতিহাসখ্যাত অবদান রাখার সুযোগ লাভ করেছিলেন।

তবে গভীরভাবে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আব্বাসীয় খিলাফতে অনারব অনুপ্রবেশের মৌল ভিত্তি তৈরি হয়েছিল উমাইয়া আমলেই। কেননা উমাইয়া খলীফাগণ অনারব তথা মাওয়ালীদের[৩৭] পরিপূর্ণ সামাজিক মর্যাদা প্রদান করতেন না। ফলে অধিকার বঞ্চিত গোষ্ঠী উমাইয়া খিলাফত পতনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সঙ্গত কারণে আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন মূল আরব ভূখণ্ড থেকে পরিচালিত না হয়ে পারস্য এবং খুরাসান থেকে পরিচালিত হয়।[৩৮] ফলে খিলাফতের নিয়ন্ত্রণভার বাহ্যিকভাবে আব্বাসীয়দের হাতে থাকলেও আন্দোলনের ফসল চলে যায় অনারবদের নিয়ন্ত্রণে। প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে অনারবদের অধিষ্ঠিত হওয়া তারই বাস্তব প্রমাণ। আব্বাসীয় খলীফাগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে বিপ্লব সাধন করলেও রাজ্য বিস্তারসহ প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদর্শনের ব্যাপারে পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে পারেননি।[৩৯]

আব্বাসীয় আমলে জনগণের জীবনযাত্রার মান বিচারে তাদেরকে অভিজাত ও সাধারণ এই দুই শ্রেনিতে বিভক্ত করা হতো। অভিজাত শ্রেনির মধ্যে খলীফা, রাজপরিবারবর্গ, রাজকীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাঁদের অনুচর ও সহচরবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমাজের অভিজাত শ্রেনি সাধারণত আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করত। সংখ্যাগরিষ্ঠ তথা জাতির বৃহত্তর অংশ ছিল সাধারণ শ্রেনির জনগণ। তারা আবার পেশার দিক থেকে বিভিন্ন শ্রেনিতে বিভক্ত ছিল। যেমন আলিম, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, কৃষিজীবী, কারিগর, দাস-দাসী এবং সাধারণ প্রজা। এদের অধিকাংশই ছিল আর্থিকভাবে অসচ্ছল।[৪০] অভিজাত শ্রেনি ও সাধারণ শ্রেনির মানুষের সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক অবস্থার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত ছিল। দশম শতাব্দীর বিখ্যাত ভূগোলবিদ ইবনুল ফকীহ বারমাকীর মতে, আব্বাসীয় আমলে সমাজের জনগণ চার শ্রেনিতে বিভক্ত ছিল। যেমন শাসক, উযীর, ধনবান উচ্চ শ্রেনি ও মধ্যবিত্ত।[৪১]

আব্বাসীয় সমাজে আলিমগণ আবার দুশ্রেনিতে বিভক্ত ছিলেন। প্রথম শ্রেনির আলিমগণ তুলনামূলকভাবে আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল ও সুখী ছিলেন। তারা কাজী, খতিব হিসেবে রাষ্ট্রীয় কার্যের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন। আর অন্য শ্রেনির আলিমগণ ছিলেন আর্থিকভাবে দরিদ্র। তাদের উপার্জনের পথ সুগম ছিল না বললেই চলে। তাঁরা সরকারী দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন না। এমনকি এঁদের সরকারি উচ্চ পদে যোগদান করতে প্রস্তাব পেশ করা হলেও তাঁরা নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত জ্ঞান সাধনা চালিয়ে যাবার নিমিত্ত প্রভৃতি পদ প্রত্যাখ্যান করতেন।[৪২] তাঁরা পার্থিব সম্মান কিংবা প্রতিপত্তির কোনো লোভ না করে নিরলস জ্ঞান সাধনা করতেন।[৪৩]

আব্বাসীয় সমাজে সর্বনিম্ন অবস্থানে ছিল দাস-দাসী। প্রাচীন সমাজে সকল ধর্মের ন্যায় মুসলমানদের মধ্যেও দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। আব্বাসী আমল তথা মুসলিম সমাজে স্বাধীন জনগণের তুলনায় দাস-দাসীগণ নিম্ন মর্যাদার অধিকারী হলেও তাদের আইনী অধিকার পরিপূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাদের সঙ্গে যথেষ্ট উদার ব্যবহার করা হতো।[৪৪] সাধারণত অমুসলিম সম্প্রদায় এবং যুদ্ধবন্দীদের মধ্য হতে দাস-দাসীগণকে সংগ্রহ করা হতো। এদের মধ্যে তুর্কী, নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গরাই ছিল বেশি। শ্বেতাঙ্গরা ছিল মূলত গ্রিক, স্লাভ, আর্মেনীয় এবং বার্বার জাতিভুক্ত।[৪৫] ক্রীতদাস ব্যবসাকে আব্বাসীয় সমাজে এক শ্রেনির মানুষ পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিল।[৪৬] এই ক্রীতদাসদের বাজারে আমদানী করা হতো তুর্কিস্তান, মধ্য আফ্রিকা, ইরান, স্পেন, গ্রিক ও ফ্রান্সের বিস্তৃত ভূ-খণ্ড থেকে।[৪৭]

সময়ের আবর্তে এসব দাস-দাসীরা বাজার হয়ে খলীফা, উযীর এবং ধনী ব্যক্তিদের প্রাসাদে স্থান করে নেয়।[৪৮] তারা গৃহভৃত্য, সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্তবিনোদনের জন্য এবং উপপত্নী হিসেবে ব্যবহৃত হতো। নপুংসক বা খোজা ভৃত্যরা হারেমের কাজে লিপ্ত থাকতো।[৪৯] এছাড়াও 'গিলমান' নামক এক শ্রেনির নপুংসক দাস ছিল যারা খলীফাগণের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি লাভ করেছিল। তারা সর্বদা মূল্যবান দৃষ্টিনন্দিত পোশাক পরিধান করত এবং সুগন্ধি লাগিয়ে পরিপাটি হয়ে থাকতো। এই 'গিলমান' শ্রেনির ক্রীতদাসের কথা জানা গিয়েছে খলীফা হারুন-অর-রশীদের (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) আমলে।[৫০] তৎকালীন সমাজে সুশিক্ষিত এবং সুশ্রী দাস-দাসীদের খুব বেশি কদর ছিল। তাই লোকজন সকল ধরনের দাস-দাসীদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি সুদৃষ্টি রাখতেন। এ শিক্ষা-দীক্ষা অর্জনের ফলে সমাজে ক্রীতদাসদের মূল্য কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেতো।[৫১] আবার দাসীদের মধ্যে উম্মু ওয়ালাদের[৫২] সর্বোচ্চ মর্যাদা ছিল। সামরিক বাহিনীতেও তারা উচ্চপদস্থ ছিল। এমনকি খলীফা হারুন-অর-রশীদ তাঁর জাদ আল-খাল নামক এক দাসীর অনুরোধে তার স্বামীকে পারস্যের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করেছিলেন। খলীফা আল-আমীন (৮০১-৮১৩ খ্রি.) একদল দাসীকে বিশেষ প্রশিক্ষণপূর্বক পুরুষের পোশাকে বিশেষভাবে সজ্জিত করে নৃত্যগীতের জন্য প্রস্তুত করে রাখতেন।[৫৩] এ সকল দাস-দাসীদের অনেকেই উচ্চ শিক্ষিত ও সংস্কৃতমনা ছিল।[৫৪] এভাবে খলীফা হারুন-অর-রশীদের হারেমে নর্তকী, গায়িকা ও সুরা পরিবেশনকারী দাসীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় দুই হাজার, খলীফা মুকতাদীরের (৯০৮-৯৩২ খ্রি.) প্রাসাদে এগারো হাজার গ্রিক ও সুদানী খোজা এবং খলীফা মুতাওয়াক্কীলের দরবারে চার হাজার দাসীর সমাবেশ ঘটেছিল। যারা সকলেই তাঁর উপপত্নী বা শয্যাসঙ্গিনী ছিল।[৫৫] উপর্যুক্ত ক্রীতদাস-দাসীদের সংখ্যা হতে আব্বাসীয় আমলের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

প্রাথমিকভাবে আব্বাসীয় সমাজের নারীগণ উমাইয়া সমাজের নারীদের মতোই সামাজিক মর্যাদা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা লাভ করেন। কিন্তু দশম শতাব্দীর শেষের দিকে ক্রমান্বয়ে অবরোধপ্রথা ও নারী পুরুষের মাঝে পৃথকীকরণের প্রচলন ঘটে।[৫৬] তবে আব্বাসীয় খিলাফতের প্রাথমিক দিকে অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেনির নারীগণ সমাজে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তারা রাষ্ট্রীয় কাজে সক্রিয় ছিলেন। তারা রাজদরবার ছাড়াও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।[৫৭] তাদের পাশাপাশি অনেক সাধারণ নারীও যুদ্ধে অংশগ্রহণ, সৈন্য পরিচালনা এবং পুরুষদের সাথে কবিতা ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন

বিষয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।[৫৮] আব্বাসীয় আমলের নারীদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। বিখ্যাত আরব্য উপন্যাসে তাদের নৈতিক অধঃপতনের পরিচয় পাওয়া যায়।[৫৯] এ সময় নারীদের সামাজিক মর্যাদা ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়ার পিছনে হারেম[৬০] প্রথা দায়ী।

পোশাক ও আসবাব পত্রের ক্ষেত্রে আব্বাসীয়রা পারসিক রীতি অনুসরণ করে। খলীফাগণ উন্নত ও মহাড়ম্বরপূর্ণ চাকচিক্যময় পোশাক পরিধান করতেন। খলীফাগণ মূলত জানুর নিম্ন পর্যন্ত আবা পরিধান করে মনিমুক্তা খচিত কোমরবন্দ কোমরে বেঁধে, কাধের উপর মূল্যবান চাদর জড়িয়ে রাখতেন। খলীফা আবূ জা'ফর আল-মনসূর পারসিক রীতি অনুযায়ী চোখা মাথা বিশিষ্ট টুপি পরিধান করার প্রচলন করেন। তখন থেকেই খলীফারা এই টুপি পরিধান করতে থাকেন। দেহরক্ষীগণ কারুকার্য খচিত ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় খোলা তরবারি হাতে নিয়ে খলীফাদের প্রহরা দিত। সিংহাসনের ডানে ও বামে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও যুবরাজগণ সারিবদ্ধ থাকতেন। খলীফা প্রথমে পর্দার অন্তরালে থাকতেন। এরপর পর্দা উত্তোলিত হলে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নাম উচ্চারণপূর্বক তারা খলীফাকে অভিবাদন জানিয়ে আসন গ্রহণ করতেন। ভাবী উত্তরাধিকারী খলীফার পার্শ্বে একটি আসনে উপবিষ্ট থাকতেন। সভাসদগণ সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে বংশ ও পদ মর্যাদানুযায়ী দুসারিতে উপবেশন করতেন।[৬১]

সমাজের অভিজাত ব্যক্তিগণ বেশ-ভূষায় খলীফাদের অনুকরণ করতেন। তারা রেশমী আচ্ছাদন পরিধান করে তরবারি ও বর্শা নিয়ে অশ্ব পৃষ্ঠে যাতায়াত করতেন। এছাড়াও তাদের পুরুষদের পোশাক ছিল ঢিলা পাজামা, কামিজ, জ্যাকেট (কুফতান), আবা বা জুব্বা, কালো টুপি প্রভৃতি। খলীফা হারুন-অর-রশীদের আমলে বিচারপতি আবূ ইউসুফের নির্দেশক্রমে ধর্মীয় নেতা ও আইনজ্ঞগণকে কালো রঙ্গের পাগড়ি, তায়লামান নামক রুমাল ও ঢিলা জামা পরতে হতো। ধনী পুরুষ ও মহিলাগণ রেশমী, পশমী পোশাক এবং চামড়ার মুজা ও পায়ে জুতা ব্যবহার করতেন। আর সাধারণ লোকদের পোশাকের মধ্যে ইজার কামিজ, ছোট জামা, লম্বা আবরনী এবং কোমরবন্দ অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৬২]

পর্দানশীন মহিলাগণ সাধারণত প্রয়োজন ছাড়া রাস্তায় বের হতেন না। আর তাদের বেশভূষায় বেশ বৈচিত্র পরিলক্ষিত হতো। ধনাঢ্য মহিলাগণ মনি-মুক্তা খচিত গম্বুজাকৃতির টুপি পরিধান করতেন। এ টুপির নিচের দিকে মনি, স্বর্ণ, হীরা বসানো বৃত্তাকার মালা থাকতো।[৬৩] সাধারণত মহিলারা সজ্জিত হওয়ার জন্য হাতে বালা, পায়ে মল এবং সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য কৃত্রিম ফোঁটার ব্যবহার করত।[৬৪]

আসবাবপত্রের মধ্যে আব্বাসীয়দের ঘরে ডীবান বা সোফার উল্লেখযোগ্য প্রচলন ছিল। এই সোফা ঘরের তিন দিকে স্থাপিত হতো। আর সাজানো সোফার সামনে ছোট টেবিল রেখে তার উপর পিতলের বা রূপার তৈরি বড় গোল ট্রেতে খাবার দেওয়া হতো। কাঠের টেবিলকে অবলুস বলা হতো, যা ঝিনুক বা কচ্ছপের খোল দ্বারা খচিত করে সুসজ্জিত করা হতো। তারা বিলাসিতার জন্য বিছা,গুবরে পোকা এবং বেজি পুষতেন। আর মেঝের উপর পাতা ছোট চারকোনা মাদুরের উপর বিছানো গদীর প্রচলন বেশ জনপ্রিয় ছিল। বাসনপত্র ছিল চিনামাটি অথবা রূপার তৈরি। অভিজাত গৃহে জানজাল নামে দুই দাঁত বিশিষ্ট এক প্রকার কাঁটা চামচ ব্যবহার করা হতো।[৬৫]

আব্বাসীয়দের মধ্যে আরবীয়দের ন্যায় খাদ্য হিসেবে রুটির প্রাধান্য ছিল বেশ। তারা ভাতকে বিষাক্ত খাবার মনে করতেন। তবে কালের পরিক্রমায় তাদের রুচিতে আসে পরিবর্তন। সভ্য সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে নানান রকম সুস্বাদু পারসিক খাবারে অভ্যস্ত ছিলেন তারা। ফালুদা নামক মূল্যবান মিষ্টি, বাদাম, রুটি, সিকবাজ নামক স্টু ও মসলা ভর্তি আস্ত মুরগি প্রভৃতি খাবার তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। শরবত বিশেষত চিনির পানিতে তৈরি মিষ্টি শরবত নানা ফলের নির্যাস দিয়ে সুবাশিত করে পরিবেশন করা হতো। খেঁজুর এবং কিসমিস দ্বারা তৈরি মাদকতাবিহীন নাবীয নামক পানীয়ও প্রচলিত ছিল। কতিপয় ফকীহের মতে নাবীয

পান বৈধ ছিল। ইব্ন খালদূন বলেন, "খলীফা হারূন-অর-রশীদ এবং আল-মামূন এই নাবীয পান করতেন।"[৬৬]

ইসলামে মদ্যপান নিষিদ্ধ[৬৭] থাকা সত্ত্বেও উমাইয়া ও আব্বাসীয় উভয় যুগের কিছু সংখ্যক খলীফা ব্যতীত সকলেই মদ্যপান করতেন। সে যুগের অনেক কবির কবিতায় সঙ্গত কারণেই মদের প্রশংসা পাওয়া যায়। কবি আবূ নুওয়াসকে ঐতিহাসিকগণ "شاعر الخمر" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কিতাবুল আগানীতে মদের প্রশংসামূলক কবিতা ও আরব্যরজনীতে মাতলামির যে সমস্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তাতেই আব্বাসীয় আমলে মদ্যপানের বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। এ প্রথা পারস্য রাজদরবার থেকে উৎসারিত হয়ে আব্বাসীয় খলীফাদের মাধ্যমে সমাজের সর্ব মহলে ছড়িয়ে পড়ে।[৬৮] স্বয়ং খলীফা নিজে এবং উযীর, উচ্চপদস্থ কর্মচারীসহ অনেকেই মদপান করতেন।

সঙ্গীতের জলসায় এবং নাচের আসরে মদ্যপান বহুল প্রচলিত ছিল। চিত্তবিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে এ সমাজে সাময়িক আনন্দ মেলা বা পানোৎসব, যাকে বলা হয় 'দ্রাক্ষা কন্যা' (The daughter of the vine) ও গানের আসর ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এ সমস্ত মেলায় যে সকল অর্ধনগ্ন গায়িকা অংশগ্রহণ করত তাদের প্রভাবে তৎকালীন যুবকদের যে নৈতিক পদস্খলন দেখা দিয়েছিল তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তৎকালীন আরবী সাহিত্যে।[৬৯] তবে রুচিসম্মত বিলাস সামগ্রী, আমোদ প্রমোদে আব্বাসীয়গণ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। খলীফা হারুন-অর-রশীদের স্ত্রী যোবাইদা স্বর্ণ, রৌপ্য নির্মিত তৈজসপত্র এবং রত্নখচিত জুতা ব্যবহার করতেন। খলীফা আমীন ইবরাহীমের সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে তাকে এককালীন তিন লক্ষ দিনার উপহার দেন। তিনি সমুদ্র ভ্রমণের জন্য কতিপয় বজরাও তৈরি করেন। প্রতিটির নির্মাণ খরচ পড়ে ত্রিশ লক্ষ দিরহাম।[৭০]

আব্বাসীয় সমাজে বিনোদনের অন্যতম অংশ ছিল বিয়ে অনুষ্ঠান। ধনী-গরীব নির্বিশেষে এ অনুষ্ঠান তৎকালে বিশেষভাবে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে আড়ম্বরপূর্ণভাবে উদযাপিত হতো।[৭১] এ অনুষ্ঠান আনন্দ উপভোগ করা ছাড়াও আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।[৭২] এছাড়াও সেই সময় বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় উৎসব পালিত হতো।[৭৩]

উমাইয়া আমলের খলীফাগণের ন্যায় আব্বাসীয় খলীফা ও শাহজাদাগণের নিকট পশু পাখি শিকার ছিল বিনোদনের অন্যতম আরেকটি মাধ্যম। খলীফা আমীন সিংহ শিকার করতে ভালোবাসতেন। তাঁর এক ভাই শিকারে গিয়ে বুনো শুয়োরের আক্রমণে মারা যায়। পারসিকদের অনুকরণে পোষা পাখি ও কুকুরের সাহায্যে হরিণ, খরগোশ ও বুনোহাঁস শিকারও আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এছাড়া তারা প্রতিযোগিতামূলক মৎস্য শিকার করত। খেলাধুলার মধ্যে তীর ধনুক, তলোয়ারবাজী ও বর্শা নিক্ষেপ এবং ঘোর দৌড় প্রধান ছিল। খলীফাগণের অনেকেই আনুষ্ঠানিক ঘোর দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন চিত্তবিনোদনের জন্য। এ সময় কিছু গৃহাভ্যন্তরীণ খেলা জনপ্রিয় হয়ে উঠে তন্মধ্যে দাবা ও পাশা খেলা ছিল অন্যতম। এছাড়াও নার্দ (ব্যাকগ্যামন) নামক একটি ভারতীয় খেলা আব্বাসীয় গৃহাভ্যন্তে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠে।[৭৪]

পাশ্চাত্যে প্রাথমিক যুগে পবিত্রতা অর্জনকে প্রাধান্য দেওয়া হতো না। গোসলকে ঘৃণার চোখে দেখা হতো। কিন্ত ইসলামে পবিত্রতার গুরুত্ব অপরিসীম। এবং পবিত্রতাকে ঈমানের অংশ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।"[৭৫] ইসলাম আগমন থেকে অদ্যাবধি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই বাণী মুসলিম জাতিকে পবিত্রতা অর্জনে উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগিয়ে আসছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এই ধরাধামে আগমনের পূর্বে আরবে পবিত্রতা অর্জনের জন্য কোনও গোসলখানা ছিল না। তবে আব্বাসীয়রাই সরকারিভাবে সর্বপ্রথম গোসলখানা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর ফলে আরবের

সর্বত্র গোসলখানার ব্যাপক প্রচলন ঘটে। তৎকালে এসব স্নানাগার শুধু নিছক পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম ছিল না বরং তার পাশাপাশি বিলাশ ব্যসনেরও কেন্দ্রে পরিণত হয়। নারী-পুরুষদের জন্য পৃথকভাবে এই হাম্মাম বা গোসল খানা পর্যায়ক্রমে বড় বড় শহরে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। ঐতিহাসিকদের মতে আব্বাসীয় আমলে শুধু বাগদাদ শহরেই জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য অসংখ্য স্নানাগার নির্মিত হয়েছিল। সুদৃশ্য ডিজাইন ও উন্নত সরঞ্জামাদির দ্বারা মনোরম পরিবেশে এসব স্নানাগার তৈরি হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে এক বিস্ময়কর অট্টালিকা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল ট্রাইগিস নদীর তীরে নির্মিত সবুজ গম্বুজ (green dome)।[৭৬] আব্বাসীয় আমলের স্বর্ণযুগে নির্মিত হাম্মাম বা গোসলখানা সম্পর্কে P.K. Hitti তাঁর *'History of the Arabs'* গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

> And as having permitted men to enter them for purposes of cleanliness only, each wearing a cloth. In the time we are studying, however, public baths had become popular not only for ceremonial ablutions and for their salutary effects, but also as resorts of amusement and mere luxury. Women were allowed their use on specially reserved days Baghdad, according to al-khatib, boasted in the days of al-Muqtadir (908-932) some 27,000 public baths, and in other times even 60,000, all of which ... like most figures in Arabic Sources ... seem highly exaggerated. Al-Yaqubi makes the number 10,000 not long after the foundation of Baghdad. The Moorish traveller ibn Battutah, who visited Baghdad in 1327, found in each of the thirteen quarters composing its west side two or three baths of the most elaborate kind, each supplies with hot and cold running water. Then as now the bath-house comprised several chambers with mosaic pavements and marble-lined inner walls clustering round a large central chamber. This innermost chamber, crowned by a dome studded with small round glazed apertures for the admission of light, was heated by steam rising from a central jet of water in the middle of a basin.The outer rooms were used for lounging and for enjoying drinks and refreshment.[৭৭]

> "পবিত্রতা অর্জনের জন্য কেবল পুরুষরাই হাম্মামে প্রবেশ করতে পারতো। অবশ্য প্রত্যেককে পোশাক পরে যেতে হতো। আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করছি, সে সময় স্নানাগার (হাম্মখানা) শুধু আনুষ্ঠানিক ধৌত করার জন্য জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি, পাশাপাশি তা বিনোদন এবং বিলাসিতারও কেন্দ্র হয়ে ওঠে। মহিলাদের এইসব স্নানাগার 'বিশেষ দিনে' ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হতো। আল-খতীবের বর্ণনা অনুযায়ী, আল-মুকতাদিরের আমলে (৯০৮ -৯৩২ খ্রি.) বাগদাদে ২৭ হাজার স্নানাগার ছিল। পরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৬০ হাজারে দাঁড়ায়। তবে আরবীয় সূত্রগুলির অনেকাংশের মতো এসবের মধ্যেও যথেষ্ট অতিরঞ্জন রয়েছে। আল-ইয়াকূবী এর তথ্য অনুযায়ী, বাগদাদ প্রতিষ্ঠার পরে পরেই এরকম স্নানাগারের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার। আফ্রিকার পর্যটক ইব্ন বতুতা ১৩২৭ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ সফরে আসেন। তিনি বাগদাদে এমন ১৩ টি বাড়ির প্রতিটির পশ্চিম দিকে দুটি বা তিনটি করে আধুনিক স্নানাগার দেখেছিলেন। প্রতিটি স্নানাগারে ছিল গরম এবং ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা। এখনকার মতো এইসব স্নানাগারে একাধিক ঘর ছিল। মোজাইকের মেঝে এবং মার্বেল পাথরের দেওয়াল ছিল। স্নানাগারের মাঝে ছিল একটি বড় ঘর স্নানাগারের অন্তস্থলের এই ঘরটির মাথায় ছিল গম্বুজ। গম্বুজের মাথায় ছিল চকচকে এমন কিছু ছিদ্রসহ বস্তু/ঘন্টি, যাতে বাইরের আলো আসার সুবিধা হয়। এছাড়া জলাধারের মাঝে বাষ্পশক্তির সাহায্যে জল গরম করার বন্দোবস্ত ছিল। স্নানাগারের বাইরের ঘরগুলি ব্যবহৃত হতো মেহমানখানা এবং মদ্যপান ও ফুর্তির জন্য।"

উপসংহার

আব্বাসীয়গণ খিলাফত লাভের পর পরই স্বতন্ত্র সামাজিক রূপ পরিগ্রহ করতে প্রয়াস চালান। উমাইয়া আমলের আরবীয় আভিজাত্যের শিকল ভেঙ্গে তারা বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে এক নব রুপান্তরিত সমাজের আবির্ভাব ঘটান। তাদের দৈনন্দিন জীবন প্রণালীতে উন্নত ও আধুনিক রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তারা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল জাতি ও ধর্মাবলম্বী মানুষের চিন্তাধারার বিকাশ পরিস্ফুটিত করেন। সেখানে মূলত পাশ্চাত্য ভাবধারারই ক্রম বিকাশ সাধিত হয়েছে। তাই বলা চলে সর্বপ্রথম আরবীয় এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির ভাব বিনিময় হয় আব্বাসীয় আমলেই। তারা এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার ভিত্তিতে আজকের আধুনিক সমাজের পরিণয় ঘটেছে।

তথ্যনির্দেশ

১ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Macdonald and Evants Ltd. 1980), p. 257.

২ সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ৯ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ৩৯৩।

৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭০।

৪ আমীর মুহাম্মদ নসরুল্লাহ (বাহাদুর) ও আ.ন.ম. আবদুল মাবুদ *'ইসলামি সরকার ব্যবস্থায় খিলাফত: আল-মাওয়ার্দী ও আল-গাজ্জালীর দৃষ্টিভঙ্গি'* Journal of Islamic Administration, Vol. 4-5, Winter 1998-99, No.1, p.106.

৫ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ৩০।

৬ মজীদ খাদ্দুরী, *তারীখ উমাম ওয়াল-ইসলামিয়াহ,* ২য় খণ্ড (কায়রো: ১৯৩৪ খ্রি.), পৃ. ১৭১।

৭ ইব্ন খালদূন, *আল-মুকাদ্দিমাহ,* ৩য় খণ্ড, Eng. Tr.F. Rosenthal (New York: 1958-59), পৃ. ৩৮৮।

৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০; আব্দুল ওয়াহাব নাজ্জার, *খুলাফায়ে রাশেদূন* (কায়রো: ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ৪।

৯ ড. শাওকী দায়্যিফ, *তারীখুল আদাবিল আরবী আল-আসরুল জাহিলী* (মিশর: দারুল মা'আরিফ, ত.বি.), পৃ. ১৮৫; ড. সালাহ রিযক, *আশ-শি'রুল জাহিলী আস-সিয়াক ওয়াল মালামাহ* (কায়রো: দারুল গারীব, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৭৫।

১০ ড. শাওকী দায়্যিফ, *আল-আসরুল জাহিলী,* পৃ. ১৫৮; Raynold A. Nicholson, *A Literary History of the Arabs* (Cambridge: Cambridge University press, 1962), p.75; *The Encyclopedia of Islam,* Vol.1, New Edition, Edited by B. Lewis, CH. Pellat and J. Schacht (Leiden: E.J. Brill, 1965), p. f584.

১১ জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা* (দেওবন্দ: মাকতাবাতিত তাহানুবী, তা.বি.), পৃ.২০৭।

১২ P.K. Hitti, *History of the Arabs,* p. 289.

১৩ Ibid, p. 289.

১৪ Ibid, Pp. 288-289.

১৫ Ibid, p. 294.

১৬ Ibid.

১৭ Ibid, p. 288.

১৮ সূরা আল-মায়েদা, ৫: ৮।

১৯ P.K. Hitti, *History of the Arabs* ,Pp. 292-293.

২০ Ibid, p. 294.

২১ Ibid, p. 294.

২২ Ibid, Pp. 294, 297.

২৩ ড. হাসান ইবরাহীম হাসান, *তারীখুল ইসলাম,* ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল জীল, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৩২৫ ।

২৪ ইবন নাদীম, *আল-ফিহরিস্ত* (বৈরূত: মাকতাবাতুল খাইরাত, ১৯৭২ খ্রি.), পৃ.২৪৯-২৬৫; মফিজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০১ খ্রি.),পৃ. ১০২; P.K.Hitti, *History of the Arabs* (London :Macmillan st Martin Press, 1972), p. 333.

২৫ মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক,* ষষ্ঠ খণ্ড (কায়রো: মাতবা'আতুল ইস্তাকামাহ, ১৩৫৮ হি.), পৃ. ৭৮, ৪৪৪; *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ,* পৃ. ১০২; *তারীখুল ইসলাম,* ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৩; ইবন কুতায়বাহ, *আল মা'আরিফ* (মিশর: মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৩৫৩ হি.),পৃ.১৬১-১৬২; আবুল ফিদা, *আল-মুখতাসার ফী আখবারিল বাশার,* ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুত তাবা'আতিল আরাবিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ১৩০।

২৬ ড. আহমদ আমীন, *দুহাল ইসলাম,* ১ম খণ্ড (মিশর: মাকতাবাতুন নাহয়্যা ওয়াল মিশরিয়্যাহ, ১৯৭২ খ্রি.), পৃ. ৭৮; *তারীখুল ইসলাম,* ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫২ ।

২৭ আব্বাসীয় খলীফাগণের মধ্যে আবুল আব্বাস, আল-মাহদী ও আল-আমীন এ তিনজন মাত্র স্বাধীন আরব রমণীর গর্ভজাত ছিলেন।অন্য সকলেই অনারব ক্রীতদাসীর পুত্র ছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, খলীফা আল-মু'তাসিমের মাতা মারযাহ, আল-মুতাওয়াক্কিলের মাতা খারযুমিয়্যাহ, আল-মুকতাফির মাতা হীসফ এবং আল-মুতাযিদ বিল্লাহ মাতা ছিলেন তুর্কী দাসী। দ্র. *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ,* পৃ. ১০২; ড. আহমদ আমীন, *দুহাল ইসলাম,* ১ম খণ্ড (মিশর: মাতবা'আতুল লাজনাহ ওয়াল তা'লীফ, তা.বি.), পৃ. ৩৫ ।

২৮ P.K.Hitti, *History of the Arabs,* p. 333.

২৯ মফিজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ,* পৃ. ১০২।

৩০ ইবন তাগরী বারদী, *আন্-নুজূমুয যাহিরাহ ফী মুলুকি মিশর ওয়াল কাহিনী,* ২য় খণ্ড (মিশর: ওয়াযারাতুস ছাকাফাহ ওয়া ইরশাদ, ১৪৮০ খ্রি.), পৃ. ২৩৩; *তারীখুল ইসলাম,* ২য় খণ্ড,পৃ. ৩২৩; জোসেফ হেল, *আরব সভ্যতার,* মোজাম্মেল হক অনূদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৩৭৫ খ্রি.),পৃ. ১০৫; *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক,* ৭ম খণ্ড, পৃ. ২২৩-২৩০।

৩১ খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ,* ২য় খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতুল খানিজী, তা.বি.), পৃ. ২২-২৩; *দুহাল ইসলাম,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৮; ইয়াহইয়া আরমাজানী, *মধ্যপ্রাচ্য: অতীত ও বর্তমান,* মুহাম্মদ ইনাম উল হক অনূদিত (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০০খ্রি.), পৃ. ৮৪; জুরজী যায়দান, *তারীখু তামাদ্দুনিল ইসলামী,* ১ম খণ্ড (মিশর:দারুল হিলাল,১৯৫৮ খ্রি.), পৃ. ৯৪; রাগিব আত-তাব্বাখ, *তারীখুল আফকার ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ,* ২য় খণ্ড (দিল্লী: মারকাযী মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ৩৭; P.K.Hitti, *History of the Arabs,* p. 333.

৩২ P.K.Hitti, *History of the Arabs*, p. 332.

৩৩ ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *ইমাম তাহাভী র. : জীবন ও কর্ম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১৩; মোঃ কারদ আলী, *আল-ইসলাম ওয়াল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাহ,* ২য় খণ্ড (মিশর: মাকতাবাতু দারিল কুতুবিল মিশরিয়্যাহ, ১৯৩৬ খ্রি.), পৃ. ৮; সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক,* অনূদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ৬১।

৩৪ সূরা আল-বাকারা, ২ : ২১।

৩৫ সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১৩।

৩৬ আহমদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদু আহমাদ* (বৈরূত: মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ২০০১ হি./১৪২১ খ্রি.), হাদীস নং ২৩৪৮৯, ৩৮তম খণ্ড, পৃ. ৪৭৪।

৩৭ **মাওয়ালী:** এ শব্দটি আরবী, যা মাওলা শব্দের বহুবচন। অনারব মুসলমান যারা আরবীয় বংশোদ্ভূত নয়; তাদেরকে মাওয়ালী বলা হতো। রাসূলুল্লাহ (সা) সাম্যের ভিত্তিতে বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মুসলমানদের মাঝে সমতা বিধান করেন। অথচ উমাইয়া আমলে মাওয়ালীদের দ্বিতীয় শ্রেনির নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হতো। যুদ্ধে গনীমতের অংশ পেলেও নিয়মিত ভাতা পেতো না। তারা পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করত। তারা কোনো আরব রমণীর হাতে পানিও গ্রহণ করতে পারতো না। দ্র. *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ,* পৃ. ৯২।

৩৮ ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল আরবী,* ৪র্থ খণ্ড (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৭৩ খ্রি.), পৃ. ৯।

৩৯ *তারীখু বাগদাদ,* ২য় খণ্ড, পৃ. ২২-২৩; *দুহাল ইসলাম,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৮; *তারীখু তামাদ্দুনিল ইসলামী,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৪; রাগিব আত-তাব্বাখ, *তারীখুল আফকার ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ,* ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭; P.K. Hitti, *History of the Arabs,* p. 333.

৪০ ড. আহমদ আমীন, *যুহুরুল ইসলাম,* ১ম খণ্ড (মিশর: মাতবা'আতুল লাজনাহ ওয়াত তা'লীফ, তা.বি.), পৃ. ১১৪; মুহাম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৪০৭ বঙ্গ./২০০০ খ্রি.), পৃ. 121; P.K. Hitti, *History of the Arabs,* p. 334.

৪১ মফিজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ,* পৃ. ১০৩।

৪২ ড. আহমদ আমীন, *যুহুরুল ইসলাম,* ১ম খণ্ড,পৃ. ১২১; ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *ইমাম তাহাভী র.: জীবন ও কর্ম,* পৃ. ১৪।

৪৩ আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী, *তাহযীবুল আছার,* ১ম খণ্ড (মক্কা: মাতাবি' আস্-সাফা, ১৪০২ খ্রি.), ভূমিকা, পৃ. ১–১; *তারীখু বাগদাদ,* ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩-১৬৫।

৪৪ মফিজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ,* পৃ. ১১৭; ড. ওসমান গণী, *কোরআনের আলোকে আব্বাসীয় খেলাফত* (কলকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৯৭; P.K.Hitti, *History of the Arabs,* p. 334.

৪৫ P.K.Hitti, *History of the Arabs*, p. 341.

৪৬ শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম,* ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৮।

৪৭ ইয়াহইয়া আরমাজানী, *মধ্যপ্রাচ্য : অতীত ও বর্তমান,* পৃ. ৯৪।

৪৮ আহমদ আমীন, *দুহাল ইসলাম,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭।

---

৪৯ *তারীখু তামাদ্দুনিল ইসলামী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৮; মফিজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পৃ. ১১৮; P.K. Hitti, *History of the Arabs,* p. 334.

৫০ P.K. Hitti, *History of the Arabs,* p. 341.

৫১ সঙ্গীত নৃত্যে পারদর্শী সুন্দর দাসীদের মূল্য ছিল সবচাইতে বেশি। যোগ্যতাসম্পন্ন একজন দাসীর মূল্য এক হাজার থেকে এক লক্ষ দীনার পর্যন্ত ছিল। তাওয়াদ্দুন নামক এক ক্রীতদাসী চিকিৎসা বিজ্ঞান, আইন, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, সঙ্গীত, গণিত বিদ্যা, অলংকার বিদ্যা, ব্যাকরণ, কাব্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে খ্যাতি অর্জন করায় খলীফা হারুন-অর-রশীদ তাকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রায় ক্রয় করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।
দ্র, *তারীখু তামাদ্দুনিল ইসলামী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৮; *দুহাল ইসলাম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৩; আবুল হাসান আলী ইবনুল খণ্ডসায়ন আল-মাসউদী, *মুরূযুয যাহাব*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৪০৮ হি./ ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৩৯০; আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, *আল-আগানী*, ৫ম খণ্ড (বৈরূত: মুওয়াসসাসাহ মামলাকাহ, তা.বি.), পৃ. ৪৩; মুহাম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১১০।

৫২ মনীবের উপপত্নী হিসেবে ব্যবহারের ফলে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে উক্ত দাসীকে উম্মে ওয়ালাদ (সন্তানের মা) বলা হয়। সন্তানের গর্ভধারিনী হিসেবে আজীবন মনীবের আশ্রয়েই তারা রয়ে যেতো। মুনিব তাদেরকে বিক্রয় করতে পারতেন না।
দ্র. *দুহাল ইসলাম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮২।

৫৩ আল-মাস'উদী, *কিতাবুত তানবীহ ওয়াল আশরাফ*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: মাকতাবাতু খায়্যাত, ১৯৬৫ খ্রি.), পৃ. ৩৬৫; আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, *কিতাবুল আল-আগানী*, ১১ শ খণ্ড,পৃ. ৯২৬; *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২২৩; মুহাম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১২০; মফিজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পৃ. ১১৮; P.K. Hitti, *History of the Arabs,* Pp. 341-342.

৫৪ Muhammad Manazir Ahsan, *Social life under the Abbasids* (London: William close & Son's Ltd. 1979), p. 61-63.

৫৫ ড. আহমদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯; আল-মাস'উদী, *কিতাবুত তানবীহ ওয়াল আশরাফ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৫; P.K. Hitti, *History of the Arabs,* p. 341; *Islamic Culture,* Vol. 1, p. 57.

৫৬ মফিজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পৃ. ১১৩; ড. মফিজুল্লাহ কবীর (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪ খ্রি.), *ইসলাম ও খিলাফত*, পৃ. ৩২৫; P.K. Hitti, *History of the Arabs,* Pp. 333-35.

৫৭ খলীফা হারুন-অর-রশীদের স্ত্রী যুবায়দা রাজকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করতেন। তিনি প্রতিভাবশালিনী ও বহুগুণ সম্পন্ন নারী ছিলেন। তিনি ত্রিশ লক্ষ দীনার ব্যয়ে মক্কার পঁচিশ মাইল দূরে এক ঝর্ণা থেকে পয়: প্রণালীর সাহায্যে মক্কা শরীফে হজ্জ যাত্রীদের জন্য পানির ব্যবস্থা করেন। অদ্যাবধি পয়:প্রণালী তাঁর নামের স্বাক্ষর বহন করছে। আল-মামূনের পত্নী বুরানও গুণগত ও দানশীলা রমনী ছিলেন। খলীফা মাহদীর বেগম (হারুন-অর-রশীদের মাতা) খায়যুরান ও মাহদীর কন্যা উলাইয়া রাষ্ট্র ও সমাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। খলীফা মুক্তাদীরের মাতা দরবারে আসীন হয়ে সভাসদ ও বৈদেশিক দূতদেরকে সাক্ষাৎকার দিতেন। দরখাস্তকারীদের আবেদন শুনতেন এবং পুরুষদের মতো রাজকার্য নির্বাহ করতেন।
দ্র. *তারীখুল ইসলাম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫১; *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পৃ. ১১৩; *ইসলাম ও খিলাফত*, পৃ. ৩২৫-৩২৬; *আব্বাসীয় খেলাফত*, পৃ. ১৯৭-১৯৮; *History of the Arabs,* p. 333.

৫৮ খলীফা মনসূরের সময় দুজন মহিলা বর্ম পরে বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করেন। খলীফা মু'তাসিমের শাসনামলে (৮৩৩-৮৪১ খ্রি.) তবলা বিশারদ উবায়দা নিপুণ তবলা বাদিকা হিসেবে উবায়দা আত-তুনবুরিয়া উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। খলীফা মুতাওয়াক্কীলের শাসনামলে (৮৪৭-৮৬১ খ্রি.) ফযল নাম্নী এক রমনী কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। শায়খা শুহদা নাম্নী এক মহিলা দ্বাদশ শতাব্দীতে বাগদাদে ইতিহাস ও সাহিত্যের উপর অপূর্ব বক্তৃতা দান করে জনগণকে বিমোহিত করে তুলতেন। অনুরূপভাবে জয়নব নামে এক মহিলা আইন বিশারদ রূপে খ্যাতি অর্জন করে। গরীয়সী মহিলা তাকিয়াহ হাদীস শাস্ত্রে অসামান্য ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।
দ্র. *তারীখুল ইসলাম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫১; *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পৃ. ১১৩-১১৪; *ইসলাম ও খিলাফত*, পৃ. ৩২৫-৩২৬; *কোরআনের আলোকে আব্বাসীয় খেলাফত*, পৃ. ১৯৮; *History of the Arabs*, p. 333.

৫৯ P.K. Hitti, *History of the Arabs,* p. 333.

৬০ রাজা বাদশাহ ও অভিজাত শ্রেনির পরিবারের প্রধান তাদের স্ত্রী, দাসী ও সন্তানদেরকে প্রাসাদ বা গৃহের যে অংশে আবদ্ধ করে রাখেন তাকে হারেম বলা হয়। এ প্রথা উচ্চ ও অভিজাত শ্রেনির মধ্যেই প্রচলিত ছিল। বি. দ্র. *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পৃ. ১১৪।

৬১ *তারীখুল ইসলাম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৮; *ইসলাম ও খিলাফত*, পৃ. ৩২৪-৩২৫; *History of the Arabs,* p. 334.

৬২ *তারীখুল ইসলাম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯; *কোরআনের আলোকে আব্বাসীয় খেলাফত*, পৃ. ১৯৯; ইসলাম ও খিলাফত,পৃ. ৩২৫; *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পৃ. ১০৬-১০৭; *আরব জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১১৫; *History of the Arabs,* p. 334.

৬৩ খলীফা হারুন-অর-রশীদের বৈমাত্রেয় ভগ্নি উলাইয়া এই টুপির প্রচলন করেন।

দ্র. *তারীখুল ইসলাম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৫; *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পৃ. ১০৭; *কোরআনের আলোকে আব্বাসীয় খেলাফত*, পৃ. ১৯৯; *ইসলাম ও খিলাফত*, পৃ. ৩২৫; *History of the Arabs,* p. 334.

৬৪ *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পৃ. ১০৭; *কোরআনের আলোকে আব্বাসীয় খেলাফত*, পৃ. ১৯৯; *ইসলাম ও খিলাফত*, পৃ. ৩২৫; *History of the Arabs,* p. 334.

৬৫ পূর্বোক্ত।

৬৬ হাসান খামীস, *আদাব ওয়ান নুসূস* (সৌদি আরব: ১৪১০ হি./১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ১৪৩; *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পৃ. ১০৭; *ইসলাম ও খিলাফত*, পৃ. ৩৩৭; *আরব জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১১৬; *History of the Arabs,* p. 335.

৬৭ আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

দ্র. সূরা আল-মায়েদা, ৫: ৯০।

৬৮ আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, *কিতাবুল আল-আগানী*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৯৩০; *কোরআনের আলোকে আব্বাসীয় খেলাফত*, পৃ. ২০০; *History of the Arabs,* p. 335-337.

৬৯ আবুল কাসিম মুহাম্মদ, *শাখসিয়্যাহ আদাবিয়্যাহ মিন আল-মাশরিক ওয়াল মাগরিব* (বৈরূত: দারুল মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ৭১-৭২; হাফিয ইমামুদ্দীন ইবন কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ,* ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: মাকতাবাতুল মা''ারিফ, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ৯২; *আদাব ওয়ান নুসূস*, পৃ. ১৪৩; *History of the Arabs,* p. 337.

৭০ *কোরআনের আলোকে আব্বাসীয় খেলাফত*, পৃ. ২০০।

৭১ ৮২৫ খ্রিস্টাব্দে খলীফা আল-মামূনের সঙ্গে উজীর কন্যা বুরানের বিবাহোৎসবে পাঁচ কোটি দিরহাম ব্যয় কথা হয়েছিল। উজীর নিজ প্রাসাদে রাজকীয় বরযাত্রীদেরকে ১৭ দিন পর্যন্ত আপ্যায়িত করেন। নব-দম্পত্তি মনি মুক্তা খচিত এক সোনার পাটির উপর দাঁড়ান। এমতাবস্থায় নববধুর মাতাময়ী কর্তৃক একটি স্বর্ণের বারকোষ থেকে অনুপম আকৃতি ও সৌন্দর্যের এক হাজার মুক্তা তাদের উপর ছিটিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ে মজলিসের হল ঘরটিকে আশি পাউণ্ড ওজনের সুগন্ধি আম্বার দ্বারা প্রস্তুত প্রদীপে আলোকিত করা হয়েছিল। এ বাতি স্থাপিত ছিল স্বর্ণের শামাদানের উপর। বিদায়ের সময় উযীর কর্মচারিগণকে খিলাত উপহার দেন এবং বরযাত্রী যুবরাজ ও প্রধান ব্যক্তিদের উপর মৃগনাভীর গোলা বর্ষণ করেন। এ গোলার ভিতরে ছিল একটি টিকেট। এতে জায়গির, ক্রীতদাস, অশ্ব অথবা অনুরূপ দানের নাম উল্লিখিত ছিল। সাধারণ লোকদের মধ্যেও তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, মৃগনাভি ও আম্বার ছড়িয়ে দেন। এ ব্যয় নির্বাহের জন খলীফা মামূন উযীর শ্বশুর হাসানকে ফারস ও আহওয়াযের এক বছরের রাজস্ব দান করেন।

দ্র. *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক,* ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৪৯; *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পৃ. ১১০-১১১; *আরব জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১০২-১০৩।

৭২ *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পৃ. ১১০।

৭৩ ধর্মীয় আনন্দ উৎসবের মধ্যে ছিল রমজানের একমাস রোযার শেষে উদযাপিত ঈদোৎসব ও যিলহজ্জ মাসে পালিত কুরবানীর ঈদ্যোৎসব ও যিলহজ্জ মাসে পালিত কুরবানীর ঈদ্যোৎসব। এছাড়া রাসূললুল্লাহ (সা)-এর জন্ম দিন (এবং মৃত্যু দিবস) সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়েছে। সূফী দরবেশের উরস (জন্মদিন) উপলক্ষে তাঁদের মাজারে স্থানীয় এলাকার লোকজন বিশেষ আন্দোৎসব ও মেলায় মিলিত হতো। পারস্য ও অন্যান্য মুসলিম দেশে জন সাধারণের মধ্যে বিভিন্ন ঋতুর আগমনে নানা উৎসব পালিত হতো। শী'আদের মধ্যে ইমাম হুসাইনের শাহাদতের স্মরণে মহররম মাসের দশ তারিখে শোকানুষ্ঠান বিশেষভাবে পালিত হতো।

দ্র. *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পৃ. ১১৩।

৭৪ *শাখসীয়্যাত আদাবিয়্যাহ*, পৃ. ৭১- ৭২; *আব্বাসীয় খিলাফত*, পৃ. ২০১-২০২; *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পৃ. ১১০; *ইসলাম ও খিলাফত*, পৃ. ৩২৭-৩২৮; *Islamic Culture,* vol. 1, PP. 57 -60; *History of the Arabs,* P. 339-340; *Social life under the Abbasids,* p. 243.

৭৫ মুসলিম ইবনুল হাজ্জজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম,* হাদীস নং (২২৩)/১, পৃ. ২০৩; আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৪১০ হি.), পৃ. ৩৮।

৭৬ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মসজিদের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ২৪১; Guy Le Strange, *Baghdad During the Abbasid Caliphate* (Oxford: 2nd Edition, Without date), P. 31.

৭৭ P.K. Hitti, *History of the Arabs*, Pp. 338-339.

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

A Complete and Unique Guide to Space Design for Theatre

Dr. Mir Mehbub Alam*

Abstract: This comprehensive guide presents a unique approach to space design specifically tailored for theatres. It combines artistic creativity with practical considerations, providing theatre professionals and designers with a holistic understanding of creating immersive and impactful spaces. The guide covers various aspects of space design, including stage layout, set design, lighting, sound, and audience seating arrangements. It explores innovative techniques, and expert insights, offering a step-by-step process for designing spaces that enhance the theatrical experience. By exploring the principles, techniques, and innovative approaches employed in theater space design, this guide equips designers, directors, and theater enthusiasts with the necessary knowledge to create captivating and impactful theatrical experiences. From traditional proscenium stages to experimental black boxes, this guide celebrates the diverse possibilities and provides practical insights to guide the process of crafting unique and immersive theater spaces. Considering the interplay between aesthetics, functionality, and audience engagement, this guide empowers theater practitioners to reveal the full potential of their spaces and create unforgettable performances.

Keywords: Space design, theatre, theatre design, proscenium stage, black box theatre, stage layout, set design, lighting, sound, audience seating, immersive, impactful, artistic creativity, practical considerations, innovative techniques, expert insights, aesthetics, functionality, audience engagement, and performance.

I. Introduction

Importance of Space Design in Theatre

The design concept is an overarching notion that is visually expressed. When we think of theatre, we often focus on the actors, the script, and the overall production value. However, one crucial element that can significantly impact the audience's experience should be noticed - space design. A theatre's layout and design are crucial for the audience to experience a beautiful and immersive environment. It sets the stage for the magic to happen. Space designers comprehend aesthetic facets to generate an environment for the performers and the performance, which reverberations the mood and style of the production.

On the other hand, scene designer frequently creates a design concept comparable to the director's concept to convey information. A compelling design concept is even more important when a play's time and setting are changed. The conceptual framework for the stage setting that a scene designer creates is closely related to the main image or metaphor.

* Professor, Department of Theatre, University of Rajshahi.

Role of Space Design in Enhancing the Audience's Experience

Space design must not only be unswerving with the play; it should also have integrity.[1] Such design comprehends various aspects, including the theatre's architectural layout, seating arrangement, lighting, sound, and overall ambiance. Each of these elements contributes to the audience's overall experience, making it imperative to consider space design.

1. Architectural Layout: The architectural layout of a theatre can greatly influences the audience's engagement with the performance. Each design offers a unique perspective and interaction between the actors and spectators, from proscenium to thrust stages, and 'all that need be involved are the two groups of people who are essential to all drama: actors and audience; any space will serve.'[2] The layout also affects sightlines, acoustics, and the overall flow of the performance.

2. Seating Arrangement: The seating arrangement in a theatre affects the audience's comfort and ability to view the stage. Factors such as seat spacing, sightlines, and seat quality can significantly impact how engaged the audience feels throughout the performance. A well-designed seating arrangement ensures that every audience member has a clear view of the stage and can fully immerse themselves in the production.

3. Lighting: Lighting design is a powerful tool to enhance a performance's mood, atmosphere, and visual appeal. Properly designed lighting can create dramatic effects, highlight key moments, and guide the audience's focus. 'It also covers the varying and improving standards of aesthetic appreciation.'[3] From subtle changes in intensity to vibrant colour palettes, lighting design can bring the stage to life and evoke emotions in the viewers.

4. Sound: Sound design encompasses both the amplification of the actors' voices and the use of sound effects or music. A well-designed sound system ensures that the audience can hear every word and nuance of the performance, enhancing their connection to the story. 'Rapid advances in technology allow for sophisticated delivery in a theatre of both sound reproduction— sound effects and such— and sound reinforcement of [...] the human voice.'[4] It also enables the integration of audio elements that can transport the audience into different worlds and intensify their emotional engagement.

5. Ambience: The overall ambience of the theatre can significantly impact the audience's experience. From the time they enter the lobby toward the setting during the pre-show in the theatre, the ambience sets the tone for the performance. Attention to detail in interior design, decor, and the overall atmosphere of the theatre can elevate the audience's anticipation and make them feel a part of something special.

Space design in theatre is not merely a matter of aesthetics; it plays a fundamental role in enhancing the audience's experience. A well-thought-out design creates a conducive environment for storytelling, immerses the audience in the performance, and amplifies the emotional impact of the production. By prioritizing space design, theatre practitioners can create unforgettable experiences that resonate with the audience long after the final curtain call.

II. Pre-Production Stage

Following the initial thrill of getting selected for a theatre production, the real work begins during the pre-production stage. This is the crucial phase where the creative team comes together to understand the play and its requirements and build the foundation for a successful production.

Understanding the Play and its Requirements

1. Analyzing the script and identifying key elements: The first step in the pre-production stage is to analyze the script thoroughly. In order to fully comprehend the script's themes, characters, and narrative structure, the director and the remaining members of the creative team read and dissected it with great care, and a '[...] a theatregoer must be prepared to respond to a bewildering variety of styles, themes, dramaturgies, and dramatic effects.'[5] This analysis helps identify key elements such as the play's tone, style, and the character's emotional journey.

2. Discussing directorial vision and concept: Once the script analysis is complete, the directorial vision and concept for the production start taking shape. The director conveys their interpretation of the play to the team, discussing ideas about the setting, visual aesthetics, and overall direction. This conversation establishes a framework for the creative team's collaboration with the director, ensuring everyone is on an identical page and working toward the same objective.

Collaborating with the Production Team

1. Meeting with the director set designer and lighting designer: Collaboration is key to a successful theatre production. '[...] the theatre has always been and always will be a group art, [...]'[6] and during the pre-production stage, meetings are held with the production team members to exchange ideas and discuss possibilities. The director, set designer, and lighting designer share their perspectives and insights, exploring how the script's themes can be visually denoted on stage.

2. Sharing ideas and brainstorming concepts: These collaborative meetings provide a platform for sharing ideas and brainstorming concepts that will shape the production's overall design. The creative team engages in lively discussions, considering different artistic approaches and pushing the boundaries of creativity. This collaborative process fosters a dynamic environment where new ideas can flourish, and innovative solutions can be discovered.

Conducting Site Visits and Assessing the Space

1. Examining the physical characteristics of the theatre: Understanding the physical characteristics of the theatre is essential for designing the production. 'All theatrical design has common aims and uses similar means; frequently the same person designs all of the visual elements.'[7] The creative team conducts site visits to the theatre, observing its layout, size, and technical capabilities. They examine the stage, backstage areas, and seating arrangement to understand the available space comprehensively.

2. Taking measurements and noting any architectural constraints: During site visits, measurements are taken to plan the set design accurately and ensure it fits within the given space. Any architectural constraints, such as pillars, low ceilings, or local access points, are noted to ensure they are incorporated into the design or addressed creatively. This attention to detail in assessing the space helps the production team make informed decisions during the subsequent stages.

The pre-production stage is critical for laying the groundwork for a successful theatre production. By understanding the play and its requirements, collaborating with the production team, and conducting thorough site visits, the designers can lay a strong foundation for the production, allowing the rest of the team to succeed. This phase sets the stage for the next step: the production design stage, where the visual elements of the play are brought to life.

III. Spatial Layout

In the world of theatre, the spatial layout of a performance space plays a crucial role in shaping the overall theatrical experience. From determining the stage configuration to allocating spaces for performance, audience, and backstage, every decision contributes to the seamless flow of movement and the optimal viewing experience. This section will discuss the key points to consider for designing the spatial layout of a theatre.

Determining the Stage Configuration

The first step in designing the spatial layout of a theatre is to determine the stage configuration. There are three main options: the proscenium, thrust, and theatre-in-the-round setups. Each configuration offers its own set of benefits and limitations.

1. Choosing between Proscenium, Thrust, or Theater-in-the-Round Setups: The proscenium stage is the most traditional and widely used configuration. The audience can see the performance through a sizable, framed opening (the proscenium arch). This setup provides a clear separation between the performers and the audience, allowing for a focused and controlled viewing experience.

As an alternative, the thrust stage expands into the crowd seated on three of the stage's sides. This configuration creates a more intimate and immersive experience, as

the performers are closer to the viewers and can engage with them from multiple angles.

The theatre-in-the-round setup places the stage at the centre of the audience, with spectators seated on all sides. This configuration allows for a highly immersive experience, with performers surrounded by the audience. It offers unique staging possibilities and encourages a strong connection between performers and viewers.

2. Assessing the benefits and limitations of each configuration: When choosing a stage configuration, it is essential to consider the specific requirements of the production and the desired audience experience. Proscenium stages are well-suited for large-scale productions with elaborate sets and complex lighting designs. Thrust stages work best for intimate performances emphasizing proximity between performers and audience members. Theatre-in-the-round setups lend themselves to experimental and immersive productions that thrive on a close relationship between performers and viewers.

Allocating Spaces for Performance, Audience, and Backstage

Once the stage configuration is determined, allocating spaces for performance, audience, and backstage areas is essential. This includes designing the stage area, planning the seating arrangement, and incorporating accessibility features.

1. Designing the stage area: The stage area encompasses the visible performance space, wings, fly system, trapdoors, and other technical elements. It should provide sufficient space for performers to move smoothly and execute scene changes. The design should also accommodate specific production requirements, such as special effects, set pieces, or large-scale props.

2. Planning the seating arrangement and sightlines: The seating arrangement is a crucial aspect of the theatre's spatial layout, directly impacting the audience's viewing experience. The design should ensure that every seat has good sightlines to the stage, allowing viewers to see the performances. Balconies, mezzanines, and box seats should be strategically positioned for optimal viewing angles.

3. Incorporating accessible seating and accommodations: Accessibility is an essential consideration in theatre design. The spatial layout should include designated areas for accessible seating, ensuring that individuals with disabilities have equal access to enjoy the performances. Additionally, accommodations such as wheelchair ramps, elevators, and accessible restrooms should be incorporated to cater to the needs of all audience members.

Establishing the Circulation and Flow of Movement

To create a seamless theatrical experience, the circulation and flow of movement backstage are crucial. The spatial layout should consider the pathways for actors and crew members to move between dressing rooms, backstage areas, and the stage itself.

1. Designing pathways for actors and crew backstage: Backstage areas should be designed to facilitate efficient movement for performers and crew members during scene changes and costume transitions. Clear and well-marked pathways, along with properly organized dressing rooms and storage spaces, contribute to a smooth workflow and prevent any disruption to performance.

2. Ensuring ease of access for scene changes and costume transitions: The spatial layout should prioritize easy access to the stage for scene changes and costume transitions. This may involve incorporating quick-change areas backstage or even hidden passageways that allow performers to move swiftly and discreetly on and off stage.

By carefully considering the stage configuration, allocating spaces for performance, audience, and backstage, and establishing the circulation and flow of movement, the spatial layout of a theatre can greatly enhances the overall theatrical experience. From the curtain's opening until the very last bow, the design choices made in the spatial layout play a significant role in bringing the magic of theatre to life.

IV. Set Design

Set design is the most important components when creating a successful theatrical production. The set serves as the visual world of the play, providing a backdrop for the actors and enhancing the storytelling experience for the audience. This segment will reconnoiter the key elements involved in set design and how they contribute to the production. In this piece of art, the designer incorporates line, mass and composition, texture, color, and visual rhythm.

Creating the Visual World of the Play

1. Developing a set design concept that aligns with the director's vision: The first step in set design is understanding the director's vision for the play. This involves collaborating closely with the director to grasp the intended mood, theme, and style of the production. We know, '[...] the theatre is not life: it resembles life.'[8] By doing so, the set designer can create a concept that harmonizes with the director's vision, ensuring a cohesive and immersive theatrical experience.

2. Choosing appropriate materials, colors, and textures: Once the design concept is established, the set designer must carefully select materials, colors, and textures that reflect the desired atmosphere of the play. The choice of materials can range from wood and metal to fabric and glass, depending on the production requirements. 'The combination of colors, fabrics, furniture, and styles tells the viewer exactly where he or she is.'[9] The colors and textures used should evoke the appropriate emotions and enhance the overall aesthetic of the play.

Incorporating Set Elements

1. Designing and constructing scenery, including flats, platforms, and set pieces: The set designer is responsible for designing and constructing the physical elements of the set. This includes creating flats (large, lightweight set pieces), platforms, and other

structures that define the stage space. The design must consider practical aspects such as ease of movement for the actors and efficient scene changes while also aligning with the artistic vision of the production.

2. Integrating set props and furniture to enhance storytelling: Set props and furniture play a crucial role in enhancing the storytelling aspect of the play. The set designer works closely with the props master to ensure that the props and furniture complement the set design and contribute to the overall narrative. Whether it is a carefully placed piece of furniture or a prop that holds symbolic significance, these elements help create a more immersive and engaging theatrical experience.

Collaborating with Other Designers

1. Coordinating with the lighting designer for effective illumination: 'Stage Lighting has become an integral part of modern production techniques,'[10] and it is also integral to set design as it helps create mood, highlight specific areas of the stage, and establish the overall atmosphere. The set designer collaborates closely with the lighting designer to ensure the set elements are appropriately lit. This coordination is essential for achieving the desired visual effects and ensuring that the set design and lighting work harmoniously.

2. Ensuring the set design complements the costume and sound design: A cohesive production requires all design elements to work together seamlessly. The set designer collaborates with the costume and sound designers to ensure the set design complements their visions. The set's colors, textures, and overall aesthetic should align with the costumes and sound design, creating a unified visual and auditory experience for the audience.

Set design plays a crucial role in the success of a theatrical production. By developing a design concept that aligns with the director's vision, selecting appropriate materials and elements, and collaborating with other designers, the set designer creates a visually stunning and immersive world that enhances the storytelling experience. The careful integration of set elements, props, and furniture, along with coordination with lighting, costume, and sound design, ensures a cohesive and engrossing performance that makes an impression on the audience.

V. Lighting Design

'Lighting— historically the last design element incorporated in theatre production— is perhaps the most advanced in terms of equipment and techniques.'[11] Using lighting in production is crucial for setting the tone and ambience. Working carefully with the director to comprehend and apply their vision to effect work is collaborative. 'Controlled light on stage helps in establishing visibility, highlighting selective areas, creating environment and revealing the three dimensional quality of the object and actors.'[12] Now this section will examine the various facets of lighting design and how they enhance the theatrical experience.

Establishing the Mood and Atmosphere

1. Collaborating with the director to understand the desired lighting effects: One of the first steps in lighting design is to have extensive discussions with the director to understand their artistic vision for the production clearly. For a perceptible and effective lighting design—

> The lighting designer ordinarily conceives a lighting design out of a synthesis of many discrete elements: the play, the director’s approach or concept, the characteristics of the theatre building [...], the basic scenery design, the costumes and movements of the actors, and the available lighting instruments.[13]

This collaboration allows the lighting designer to comprehend the play or performance's emotional tone, themes, and desired impact. ‘Light, together with scenery and costumes, can help performers create a mood.’[14] The lighting designer can bring the director's vision to life by aligning their creative ideas.

2. Using color, intensity, and direction to evoke emotions: Lighting designers have many tools to create specific moods and evoke emotions. They can manipulate the color palette by using different filters or gels on lighting fixtures, allowing them to bathe the stage in warm or cool tones. The light intensity can be changed to produce stark contrasts or delicate gradations. Additionally, the direction of the light can shape the focus and depth of the scene, highlighting key elements or creating shadows for a more mysterious ambience.

Designing Lighting Plots and Cue Sheets

1. Determining the placement and focus of lighting fixtures: ‘Ordinarily, the two major preparations required of the lighting designer are the light plot and the cue sheet.’[15] Once the artistic vision is established, the lighting designer starts designing lighting plots, which outline the placement and types of lighting fixtures required for the production. This includes determining the positions of overhead lights, spotlights, and other specialized fixtures. The placement and focus of these fixtures are crucial in achieving the desired effects and highlighting specific areas of the stage.

2. Creating cues for different scenes and transitions: Cue sheets are an essential part of the lighting design process. These sheets outline the timing and sequence of lighting changes throughout the production. Lighting cues are meticulously designed to synchronize with the action on stage, ensuring smooth transitions between scenes and creating the desired impact. The lighting designer collaborates closely with the stage manager and other production team members to ensure the cues are executed flawlessly during performances.

Incorporating Special Effects and Technology

1. Utilizing intelligent lighting systems and automated fixtures: Advancements in technology have greatly expanded the possibilities for lighting design. Intelligent

lighting systems like moving and programmable fixtures allow lighting designers to create dynamic and intricate effects. These fixtures can be controlled remotely and programmed to move, change color, or project patterns, adding a new level of creativity to lighting design.

2. Incorporating projections, gobos, and other visual elements: Lighting design can go beyond traditional fixtures and incorporate other visual elements. Projections can display images or videos on stage, transforming the environment and enhancing storytelling. Gobos, stencils placed in front of lighting fixtures, can project patterns or textures onto the set or actors, creating visually captivating scenes. These additional elements provide even more opportunities for the lighting designer to shape the visual landscape of the production.

'Light is the basic condition for theatrical appearance; without light, nothing is to be seen.'[16] Lighting design is vital to theatrical productions, establishing the mood, atmosphere, and emotional impact. By collaborating with the director, designing lighting plots and cue sheets, and incorporating special effects and technology, lighting designers bring the stage to life, creating an immersive and visually stunning encounter for the audience.

VI. Sound Design

A well-executed sound design can elevate any production, whether a film, theatre performance or virtual experience. According to Wilson— 'One form of sound reproduction is *sound effects*, which can be defined as any sound produced by mechanical or human means to create for the audience a noise or sound associated with the play.'[17] The auditory elements of production play a crucial role in enhancing the overall experience for the audience.

Enhancing the Auditory Experience

1. Creating a soundscape that complements the overall production: Sound designers are responsible for creating a soundscape that immerses the audience in the production world. This involves carefully selecting and manipulating sounds to evoke the desired emotions and enhance the storytelling. Whether it is a suspenseful scene with eerie background sounds or a romantic moment with a soft, melodic score, the soundscape should complement the visual elements and effectively convey the intended mood.

2. Considering sound effects, music, and ambient sounds: Sound effects, music, and ambient sounds are essential for sound design. Sound effects help bring the actions on screen or stage to life, while music sets the tone and heightens the emotional impact of a scene. Ambient sounds create a realistic atmosphere, providing a sense of time and place. The sound designer must carefully choose and integrate these elements to create a cohesive, immersive auditory experience.

Selecting and Placing Audio Equipment

1. Choosing appropriate speakers and microphones: Selecting the right audio equipment is crucial for delivering high-quality sound to the audience. This comprises choosing appropriate speakers and microphones based on the venue and production requirements. Different spaces may require different speaker configurations, such as surround sound setups for cinemas or distributed speaker systems for large theatres. Similarly, selecting the right microphones ensures clear and balanced sound capture for actors or live performers.

2. Ensuring even sound distribution and clarity throughout the space: Even sound distribution is essential to maintain consistency and clarity throughout the entire venue. Sound designers work closely with audio engineers to optimize speaker placement for uniform coverage and minimal interference. This ensures that every seat in the audience has a similar auditory experience, allowing everyone to immerse themselves in the production fully.

Coordinating with Other Design Elements

1. Syncing sound cues with lighting and set changes: In a live performance, sound cues must be precisely synchronized with lighting and set changes to create a seamless and cohesive production. A well-coordinated design incorporates sound transitions that seamlessly blend with the visual elements, enhancing the overall impact and maintaining the audience's engagement. This requires close collaboration between the sound designer, lighting designer, and stage crew to ensure smooth transitions between scenes.

2. Collaborating with the director to balance sound and dialogue: Balancing sound and dialogue is a delicate task in sound design. The director and sound designer collaborate closely to maintain comprehensible dialogue, even when competing with other sound elements. This may involve adjusting sound levels, using acoustic treatments to minimize echo or reverberation, and fine-tuning the audio mix to achieve the desired balance between dialogue, music, and sound effects.

Sound design is exigent to any production, adding depth, emotion, and realism to the overall experience. By carefully crafting a soundscape, selecting appropriate equipment, and coordinating with other design elements, sound designers create a truly immersive auditory journey for the audience.

VII. Accessibility and Safety Considerations

When designing a space or facility, it is crucial to prioritize accessibility and safety for all individuals. Creating an inclusive and accommodating environment for people with diverse needs demonstrates a commitment to equal access and enhances the overall experience for everyone. Additionally, implementing appropriate safety measures ensures the well-being of occupants and mitigates potential risks. The essential factors for guaranteeing accessibility and safety in design will be discussed in this section.

Ensuring Compliance with Accessibility Standards

1. Providing accessible entrances, seating, and restrooms: One of the fundamental aspects of accessibility is to provide barrier-free access to all individuals. This includes designing entrances wide enough for wheelchair users, installing ramps or lifts for elevation changes, and ensuring doorways are easily operable. Additionally, it is crucial to allocate designated seating areas for individuals with disabilities, allowing them to navigate the space and enjoy the facilities comfortably. Moreover, accessible restrooms with appropriate grab bars, sinks at accessible heights, and ample maneuvering space must be incorporated to cater to the needs of all individuals.

2. Incorporating assistive listening systems and captioning options: Hearing impairment should never be a barrier to participation. Individuals with hearing difficulties can enjoy clear and amplified audio by incorporating assistive listening systems, such as hearing loops or FM systems. Captioning options on screens and live presentations provide accessibility for individuals with hearing impairments and those with limited proficiency in performance language. These features ensure that everyone can fully engage with the content and activities within the space.

Implementing Safety Measures

1. Ensuring proper emergency exits and signage: Any space should be designed with safety as its top priority. Marked emergency exits, with illuminated signage that is visible even in low-light conditions, help occupants quickly locate and evacuate the area in case of an emergency. The pathways to emergency exits should be unobstructed and well-maintained to facilitate swift and safe evacuation. Complying with local building codes and regulations is essential to meet all safety requirements.

2. Incorporating fire safety systems and equipment: Fire safety is critical in any facility. Installing fire alarm systems, smoke detectors, and sprinkler systems can help detect and suppress fires early, minimizing potential damage and harm. Additionally, providing fire extinguishers at appropriate intervals throughout the space ensures that individuals can respond effectively to small fires before they escalate. Regular maintenance and testing of these systems are essential to ensure their reliability and functionality.

By prioritizing accessibility and safety considerations in your design, you create a welcoming and secure environment for everyone. This not only complies with legal requirements but also demonstrates a commitment to inclusivity and the well-being of your occupants. Remember to consult with accessibility experts and comply with local regulations to ensure that your design meets the highest standards of accessibility and safety. By doing this, you establish an environment that is truly inclusive and favorable to everyone having positive experiences.

VIII. Conclusion

Summarizing the Importance of Space Design in Theatre

Throughout the discussions, we explored the various elements contributing to effective space design, including stage layout, lighting, sound, and audience seating. As we conclude our journey, it is essential to summarize the importance of space design in theatre.

Space design is not merely an afterthought in the realm of theatre; it is an integral aspect that sets the stage for the performers and impacts the audience's overall experience. A well-designed theatre space can enhance storytelling, elevate emotions, and captivate the imagination of the spectators. It is the canvas upon which the theatrical masterpiece comes to life.

Emphasizing the Collaborative Nature of the Design Process

Creating a successful theatre space is a collaborative effort involving various professionals' collective vision and expertise. Architects, set designers, lighting designers, sound engineers, and many others collaborate to bring a director's artistic vision to culmination. Each individual plays a crucial role in crafting a space that supports the narrative, engages the audience, and enables the performers to shine.

The design process requires effective communication, teamwork, and an understanding of the artistic objectives. Through this collaborative spirit, theatre spaces come alive, providing a platform for actors to perform, directors to direct, and audiences to engage with the magic of live performance.

Highlighting the Impact of Well-designed Spaces

A well-designed theatre space has a profound impact on the overall theatrical experience. When the audience enters a theatre, they enter a world of storytelling, and the environment should immerse them in that narrative. They should feel a sense of anticipation and wonder when they take their seats.

Lighting and sound design, for example, can transform a stage into various locations and evoke different moods. The stage layout can enhance the performers' interactions and create dynamic stage pictures. Comfortable and strategically positioned seating ensures the audience fully engages with the performance without distractions. To create a truly immersive experience, all of these components work together.

Moreover, a well-designed theatre space can enhance the acoustics, ensuring that every word spoken or note played reaches the audience with clarity and impact. It can also provide the technical infrastructure to support intricate set changes, special effects, and seamless transitions.

In conclusion, the importance of space design in theatre cannot be discreet. It establishes the foundation for the growth of theatrical art, allowing performers to tell stories, directors to bring their visions to life, and audiences to be transported to new

worlds. As we appreciate the beauty and magic of live performance, let us also recognize and celebrate the incredible craftsmanship and creativity behind the scenes. These designers shape the spaces that make theatre an unforgettable experience.

References

[1] Edwin Wilson, *The Theatre Experience*, (New York: McGraw-Hill, Inc., 1994), p. 330
[2] Stephen Joseph, *New Theatre Forms*, (London: Sir Isaac Pitman & Sons Ltd., 1968), p. 23
[3] G.N. Dasgupta, *Guide to Stage Lighting*, (New Delhi: Pauls Press, 1986), p. 2
[4] Edwin Wilson, *ibid*, p. 385
[5] Robert Cohen, *Theatre*, (California: Mayfield Publishing Company, 1983), p. 172
[6] Francis Hodge, *Play Directing, Analysis, Communication and Style*, (New Jersey: Prentice Hall Inc., 1994), p. 330
[7] Oscar G. Brockett, *The Theatre An Introduction*, (New York: Holt, Rinehart and Winston Inc., 1974), p. 516
[8] Edwin Wilson, *ibid*, p. 323
[9] *Ibid*
[10] G.N. Dasgupta, *ibid*, p. 28
[11] Edwin Wilson, *ibid*, p. 367
[12] G.N. Dasgupta, *ibid*, p. 28
[13] Robert Cohen, *ibid*, p. 119
[14] Edwin Wilson, *ibid*, p. 372
[15] Robert Cohen, *ibid*, p. 119
[16] *Ibid*, p. 116
[17] Edwin Wilson, *ibid*, p. 382

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

বাংলাদেশের মঞ্চে *কোকিলারা* : পাণ্ডুলিপি থেকে প্রযোজনা
(Kokilara on Stage in Bangladesh : Production from Manuscript)

ড. সুমনা সরকার*

Abstract: Now, the idea of equal rights of men and women has became a National issue. Women have learned to talk about the neglect of past history ; Became aware in all areas. Such a narratives of women's lives have taken an important place in theatre of Bangladesh. Actress have spontaneously appeared in front of the audience. The importance of actress, theatre and stage has increased; distinct of bangla theatre has been created. The contemporary lifestyle of Bengali women continues to enrich the history of Bangla theatre in artistic consideration.*Kokilara* written by Abdullah Al Mamun is considered as a milestone in the history of bangla drama and stage. The scope of this article is *kokilara*, the first single character Based theatre to come to the stage of Bangladesh.*Kokilara*is timeless in terms of both literary and stage values. This article therefore analysis the manuscript and production of *Kokilara*. The research work is mainly conducted by text analysis method and observational method. In necessary, interview method has also been adopted. In terms of creation, this study follows the Chikago stylemanual. Basically, the production journey from the manuscript to p[roduction of *Kokilara*'s has been given importance in this research.

ভূমিকা

শিল্পিত প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে নাটক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে জগৎ ও জীবনে। দৃশ্য ও শ্রব্যের মিলনে নির্মিত এ শাখা দ্রুত জনমনে প্রভাববিস্তারকারী। স্বাধীনতাত্তোর সময়ে বাংলাদেশে গ্রুপ থিয়েটারের চর্চা শুরু হয়। শুধু তাই নয়, এ চর্চা অবারিত হবার সুযোগও পায়। বহুমুখী নিয়মিত নাট্যচর্চা বাংলাদেশের সংস্কৃতিকেও ইতিবাচক ক্রম-বিবর্তনের দিকে এগিয়ে দিয়েছে।একটি নাটক (পাণ্ডুলিপি) মূলত মঞ্চে হাজির হয় নাট্যরূপে; সংযুক্তশিল্পরূপে। দলগত প্রয়াস হিসেবেই নাট্যচর্চার পরিচিতি। এক একটি নাট্যদল মানে সংহত-সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতিনিধি। এ রূপেই অগ্রসরমান বাংলাদেশের মঞ্চনাটকচর্চা। সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনের বিজ্ঞানে নাট্যচর্চায় যুক্ত হয়েছে সম্ভাবনার সূত্র; বেড়েছে নিরীক্ষা। পরিচিত বিষয়কে অন্য এক মর্যাদায় আসীন করতে আঙ্গিক হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ। সমকালের নাট্যচর্চায় যুক্ত হয়েছে মাইক্রো রিসার্চ; বিন্দুঘিরে সিন্ধুর সন্ধান।

নাটকের পাণ্ডুলিপি প্রথমত সাহিত্য অতঃপর মঞ্চ। সাধারণত নাট্য-পাণ্ডুলিপির জন্মই হয় মঞ্চায়নের অভিপ্রায়ে, দাবি নিয়ে। সাহিত্য হলো পাঠকনির্ভর আর মঞ্চ হলো দর্শকনির্ভর। উভয়ক্ষেত্রের প্রাথমিক ভিত্তিই পাণ্ডুলিপি। পাণ্ডুলিপি ছাড়া নাটক মঞ্চায়ন অসম্ভব। ইম্প্রোভাইজড প্রযোজনার ক্ষেত্রে লিখিত কোনো পাণ্ডুলিপি না থাকলেও শেষাবধি তা একটি পাণ্ডুলিপিতে রূপ নেয়। ছোট ছোট অনেকগুলো ঘটনা অভিনয়ের মাধ্যমে একটি বৃত্তরূপে মঞ্চায়ন হয়। তাই মঞ্চনাটকের ক্ষেত্রে লিখিত বা অলিখিত, প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত যাই হোক না কেন পাণ্ডুলিপি অনিবার্য।

> Since the script (or a working outline of some sort) is the usual starting point for any theatrical production, the process through which it comes into being is of primary importance.[১]

---

* সহযোগী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

বস্তুত পাণ্ডুলিপি হলো প্রথম শর্ত। নাট্য-পাণ্ডুলিপি পাঠকের রস আস্বাদনের পাশাপাশি একজন নির্দেশকের নির্দেশনায় মঞ্চরূপ পেয়ে দর্শক সম্মুখে আসার দাবি রাখে। অর্থাৎ মঞ্চনাটক শিল্পের এমন এক শাখা যেখানে প্রথমেই পাণ্ডুলিপির সাহিত্যমূল্য বিচার্য তারপর মঞ্চমূল্য। 'নাটকবিচারে মঞ্চ-সাফল্যের সঙ্গে সাহিত্যিক সাফল্যও (literary success) অবশ্য বিচার্য এবং সাহিত্যিক সাফল্যের মধ্যেই নাটকের ভালত্ব ও বড়ত্ব নিহিত থাকে'।[২]

এটা ঠিক, বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্য স্থবির নয় বরং গতিশীল এবং ক্রমোন্নতির দিকে ধাবমান। তা সত্ত্বেও মঞ্চোপযোগী পাণ্ডুলিপির সংকটের কথা অস্বীকার করা যায় না। উপন্যাস বা গল্পের পাণ্ডুলিপি রচিত হয় পাঠকের কাছে প্রকাশিত হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। সাধারণত প্রকাশের পর পাঠকের রস-আস্বাদন পর্যন্ত এর পরিধি। কিন্তু নাট্য-পাণ্ডুলিপি প্রকাশের অভিপ্রায়কে ছাপিয়ে দর্শক সমীপে মঞ্চায়নের দাবি উত্থাপন করে। যার বিস্তৃতি পাঠকের গণ্ডি থেকে দর্শক পর্যন্ত। অনেক নাট্যপাণ্ডুলিপি আছে যা শুধু সাহিত্যমানেই বিবেচিত। আবার এমন কিছু পাণ্ডুলিপি আছে যা মঞ্চ ও সাহিত্য উভয়মূল্যেই উত্তীর্ণ। মূলত—

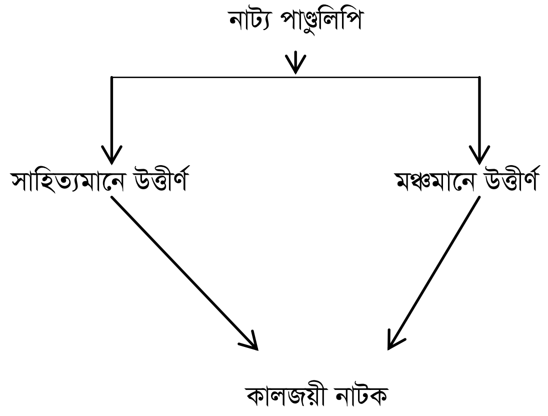

নাট্যপাণ্ডুলিপি→সহিত্যমূল্য + মঞ্চমূল্য = কালজয়ী নাটক। কিন্তু অনেক পাণ্ডুলিপি রয়েছে সাহিত্যবিচারে সফল কিন্তু মঞ্চবিচারে সফলতা অর্জন করতে পারেনি বা মঞ্চবিচারে সফল কিন্তু পাণ্ডুলিপি হিসেবে সাহিত্যমূল্যে বিবেচিত হতে পারেনি। 'সাহিত্য হিসেবে অনেক উঁচুমার্গের পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায় বটে, সেগুলোর বেশিরভাগ উপস্থাপনীয় জটিলতায় আক্রান্ত। আবার পরিবেশনযোগ্য অসংখ্য কাহিনিবিন্যাস পাওয়া যায় সেগুলোর সাহিত্যমূল্য অনেকাংশে তুল্য নয়।'[৩] যদি সাহিত্যমূল্য অধিক সফল হয়, আর মঞ্চমূল্য তুলনামূলকভাবে কম সফলতা অর্জন করে অথবা এর বিপরীতটা হয় তবুও তা কালজয়ী হতে পারে না। দুইয়ের সম সফলতা প্রয়োজন। কালজয়ী নাটক হতে হলে পাঠকনন্দিত যেমন হতে হয় তেমনি হতে হয় দর্শকনন্দিতও।

প্রকৃত অর্থে মণিকাঞ্চন যোগ হয় সাহিত্যমূল্য ও মঞ্চমূল্য উভয়ের সহযোগে। কালজয়ী নাটক হয়ে উঠবার ক্ষেত্রে ভালো নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যমূল্যনির্ভর পাণ্ডুলিপি প্রয়োজন। এখানে মঞ্চ তথা দৃশ্যের সমান্তরালে গুরুত্বপূর্ণ হলো কাব্য অর্থাৎ সাহিত্য। ÔA dramatic work must always be regarded from a double point of view, how far it is poetical and how far it is theatrical.'[4]

বাংলাদেশের মঞ্চনাটকে বর্তমানে সাহিত্য ও মঞ্চমূল্য উভয় বিচারেই জিতে গেছে একক নারীচরিত্রের নাটক। অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি মূলত নাট্যসাহিত্যের ধারাকে মাথায় রেখেই রচিত, পরবর্তী সময়ে নির্দেশকের নির্দেশনায় তা হয়ে উঠে মঞ্চোপযোগী। একক নারীচরিত্রের প্রায় সব পাণ্ডুলিপিই রচিত হয়েছে মঞ্চে প্রয়োগ-

ভাবনাকে মাথায় রেখে। লেখা হয়েছে অভিনয় করবার অভিপ্রায়ে, তাই লেখার আগেই এসব পাণ্ডুলিপি হয়েছে অভিনয় করার যোগ্য। অর্থাৎ মঞ্চমূল্যকে মাথায় নিয়ে বা মঞ্চে আসবার অভিপ্রায়েই রচিত হয়েছে একক নারীচরিত্রের পাণ্ডুলিপিগুলো। অনেক পাণ্ডুলিপি মঞ্চায়ন হবার অনেক পরে প্রকাশিত হয়েছে।চরিত্র, নাট্যদল, বিষয়, অভিনেত্রীকে মাথায় রেখেই রচিত হয়েছে বা নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে একক নারী চরিত্রের পাণ্ডুলিপিগুলো।

বাংলাদেশে একক নারীচরিত্র বিশিষ্ট নাটকের পাণ্ডুলিপিগুলোর বিষয় হিসেবে বিবেচিত স্বভূমি ও মানুষ। ভূমি বলতে বঙ্গভূমি তথা বাংলাদেশ। বঙ্গভূমির বাস্তবতা, সমকাল, সমাজ, মুক্তিসংগ্রাম; আর মানুষ বলতে নারীজীবনের চালচিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে। প্রতারিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত, অবহেলিত, প্রান্তিক, ত্যাগী, মুক্তিকামী, সংগ্রামী নারীর আখ্যান বর্ণিত হয়েছে এ নাটকগুলোতে।

পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গ

বাংলাদেশের মঞ্চনাটকে প্রথম একক নারীচরিত্রের পাণ্ডুলিপি *কোকিলারা (১৯৮৯)*। *কোকিলারা* আবদুল্লাহ আল মামুন (১৯৪২-২০০৮) রচিত এবং নাটকটি মঞ্চায়িত হয় তার নির্দেশনাতেই। ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুক্তধারা প্রকাশনী থেকে তা প্রকাশ পায়। পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশের আগেই নাটকটি মঞ্চে এসেছে। ১৯৮৯ সালের ১৯ জানুয়ারি নাটকটির প্রথম মঞ্চায়ন হয়। প্রকাশিত পাণ্ডুলিপির প্রচ্ছদে একই নারীর তিন রূপ প্রকাশিত। তিনটি ছবি যেন সমাজের তিন শ্রেণির প্রতিনিধি। নাটকটিতে একক নারীচরিত্রে অভিনয় করেন ফেরদৌসী মজুমদার (১৯৪৩)।*কোকিলারা* দিয়েই বাংলাদেশের মঞ্চনাটকে একক নারীচরিত্রের অভিনয়ের যাত্রা শুরু। একক নারীচরিত্রের পাণ্ডুলিপির মধ্য দিয়ে মূলত নারীর চোখেই নারীকে দেখানো হয়েছে।নাট্যকার এ নাটকটি ফেরদৌসী মজুমদারের অভিনয়ের জন্যই লিখেছেন।

নাটকটি নাট্যকারের মৌলিক রচনা। সামাজিক বাস্তবতায় নারী-জীবনের আখ্যান বর্ণিত হয়েছে এনাটকে। নাটকটির তিন পর্বের তিনজন নারীর নামই কোকিলা। কোকিল একটি পাখির নাম, যা স্বভাবগতভাবেই সুকণ্ঠী পাখি হিসেবেই সুপরিচিত। কোকিল পাখি নিজে কখনো বাসা বাঁধতে পারে না এজন্য কোকিলকে বলা হয় পরজীবী বা পরনির্ভরশীল পাখি। কোকিল শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ কোকিলা। নামকরণের মধ্য দিয়ে নাট্যকার স্ত্রী বা নারীকে বুঝিয়েছেন; অতঃপর বাংলাদেশের নারীর পরনির্ভরশীলতাকে দেখিয়েছেন তিনটি ভিন্ন চরিত্রে— একজন গৃহপরিচারিকা, একজন উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহিণী অপরজন ব্যারিস্টার। কিন্তু তিনজনই নির্ভর করে পুরুষশাসিত সমাজের পুরুষের ওপর।

আবদুল্লাহ আল মামুনের মঞ্চনাটক *কোকিলারা*র বিষয়বস্তু সমকালীন সমাজে নারীর অবস্থান চিহ্নিতকরণ। নারীর চেতনায় নারী পুরুষের যে অসম সামাজিক সম্পর্ক এবং শেষাবধি সর্বক্ষেত্রে নারীরা বশ্যতার শিকার হয় তার একটি চূড়ান্ত রূপ পরিলক্ষিত হয় নাটকটিতে। সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে এখনও বিরাজমান সামন্ততন্ত্র। *কোকিলারা*য় নারীর পারিবারিক বা সামাজিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি বরং সকল ক্ষেত্রেই নারীরা হয়েছে পুরুষশাসিত। সামাজিক, পারিবারিক এমনকি রাষ্ট্রিক বাস্তবতায় পুরুষের কাছে নারীরা অনেক বেশি মর্যাদাহীন, দুর্বল, অবহেলিত এবং নির্যাতিত। নাট্যস্থিত এই নারীরা সমাজের সকল স্তরের নারীদের আজও করছে স্বাধীনতা অনুসন্ধানী।

> নাটকটির রচনাকাল ছিল প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের সময়। এরশাদের সময়কে বলা হতো স্বৈরাচারী আমল। এই স্বৈরাচারী মনোভাব পুরুষতন্ত্রের প্রতিচ্ছবি। আমাদের বিবেচনার স্বৈরাচার, পুরুষতন্ত্রেরই একটি বর্ধিত রূপ-অবশ্য এর সঙ্গে অন্যান্য অনেক উপাদান যুক্ত হয়। স্বৈরতন্ত্রে কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং এই কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সনাতন ঐতিহ্যকে (প্রথা, ধর্ম, পীরতন্ত্র, নারীর প্রতি সমাজের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি)

> শাসক ব্যাবহার করে থাকে। এক ধরনের ভয়-ভীতি আক্রান্ত সংস্কৃতির ভিতরে বসবাস করতে হয় জনগণকে। বিশেষ করে নারীসমাজ থাকে সংকটে।[৫]

মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ে সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর যে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এ নাটকে নির্মিত হয় তাতে নারী ভোগ্যবস্তু-পুরুষের হাতের ক্রীড়নক এবং দুর্বলচেতা। নারী যেন শুধুই খেলার পুতুল। নাটকটিতে সমাজবাস্তবতার চিত্র চিত্রিত করেছেন নাট্যকার যৌক্তিকভাবে। নাটকটির বিষয় ও নির্মাণশৈলীতে নবরূপ নিরীক্ষার স্বাক্ষর রাখেন নাট্যকার আবদুল্লাহ আল মামুন। পরিপ্রেক্ষিতরূপে সমাজবাস্তবতা, প্রাধান্য পেয়েছে নারীচরিত্র। নারী একজন কিন্তু একজনের মধ্য দিয়ে তিন নারীর জীবনের বাস্তবতা অঙ্কিত। এই তিন নারীর বর্ণনায় সন্ধান মেলে ১৫টি চরিত্রের।

পাণ্ডুলিপিটিতে অঙ্ক বা দৃশ্য বিভাজন নেই। কাহিনি বর্ণনা তিনটি পর্বে বিভক্ত। তিন পর্বে উঠে এসেছে তিনটি শ্রেণির কোকিলার জীবনবাস্তবতা। পুরুষশাসিত সমাজে অত্যাচারিত, নির্যাতিত কোকিলার বাস্তব পরিস্থিতি ত্বরান্বিত করেছে নাট্যঘটনা। নাটকটিতে স্পষ্ট হয় নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত কিংবা পরনির্ভরশীল, আত্মনির্ভরশীল যাই হোক না কেন পুরুষশাসিত সমাজে সকল স্তরেই নারীরা প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত। এই অত্যাচারের আঙ্গিক স্তরভেদে কিছুটা ভিন্ন। এই সামাজিক বাস্তবতা ও নারী-পুরুষের লৈঙ্গিক বৈষম্যকে মূল বিষয় করে আবদুল্লাহ আল-মামুন রচনা করেছেন *কোকিলারা*। সমাজ-সংসারে নারী-পুরুষের সম্পর্ক যে বৈষম্যমূলক ও নিপীড়ণমূলক তা এই নাটকে প্রতীয়মান।

তিন পর্বের শুরুতেই বর্ণনায় রয়েছে এক নারী, এক জীবন ও একক অভিনয়ের কথা। যা প্রমাণ করে পাণ্ডুলিপিটি একক নারীচরিত্রনির্ভর। প্রথম পর্বে নাট্যকার অপর চরিত্রের (যিনি মঞ্চে অনুপস্থিত। যেমন— খালাম্মা, খালুজান, বাবু, আনুভাই) সংলাপও কোকিলার সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। যা প্রাচীন ভারতীয় ধ্রুপদী নাট্যকলার 'ভাণ'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য আকাশভাষিতার অনুরূপ। সহজ-সরল সংলাপে পাণ্ডুলিপিটি পেয়েছে ভিন্ন মাত্রা। যা সব শ্রেণির দর্শক বোধগম্য। কেননা— 'The period of dialougue is one whice is as yet unformed and simpler than that of history. It hardly reveals the fact that it is a period.'[৬]

প্রতিনিয়ত জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া নারীর নাম কোকিলা। প্রথম পর্বেও কোকিলা গ্রামের এক সহজ-সরল মেয়ে। বাবার মৃত্যুর চল্লিশ দিন পার না হতেই মা দ্বিতীয় বিয়ে করে। কোকিলা মাকে বোঝাবার চেষ্টা করে বারংবার ব্যর্থ হয়। কারণ পুরুষ-শাসিত এ সমাজে সকল স্তরের নারীরাই পুরুষের উপর নির্ভর করে।

> ঐ বুইরার লগে বিয়া না বইলে, একজন পুরুষ না থাকলে এই রাক্ষসের দুনিয়ায় না আমি বাঁচতে পারুম, না তরা বাঁচতে পারবি।...পুরুষ পোলা হইয়া জন্মাইতে পারলি না? ক্যান ক্যান মাইয়া হইয়া জন্মাইলি? মাইয়া মানুষের একমাত্র ভরসা হইতাছে পুরুষ। পুরুষ ছাড়া মাইয়া মানুষ বাঁচে না।[৭]

পুরুষশাসিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এ সংলাপে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। নারীজীবন যে পরনির্ভরতার জীবন এবং পুরুষরাই কর্তৃত্বকারী তা কোকিলার মায়ের কথায় প্রতীয়মান। কোকিলার মনে কথাটি নাড়া দেয়। কোকিলা আর বাধা দেয় না। মায়ের বিয়ে হয়। যেন 'নারীরা নিজেদের দাসত্বে বেঁধে সমস্ত পৃথিবীটাকে দাসত্বে বেঁধে রেখেছে। দাসত্বে আবদ্ধ মায়ের গর্ভে স্বাধীন জাতি জন্ম নিতে পারে না।'[৮] মায়ের দ্বিতীয় বিয়ের পর একরাতে কোকিলা অনুভব করে তার পাশে সৎ বাবার উপস্থিতি। সৎ বাবার থাবা থেকে কোকিলা নিজেকে রক্ষা করে; বুঝতে পারে মার বলা কথা ভুল।

> দিলাম লাতথি বুইরারে। গুইনা গুইনা দশখান লাতথি দিলাম। ততক্ষণে বুইরা ফিট। আমারও বোজা শ্যাষ, আসলে এই দুনিয়ায় পুরুষ মানুষেরাই মাইয়া মানুষ ছাড়া বাঁচে না।[৯]

পুরুষ জাতির ওপর ঘৃণা জন্মে তার। সম্পর্কে সৎ বাবা, কিন্তু বাবা শব্দটি জড়িত, আবার নিজের বাবার চেয়েও অধিক বয়স যে সৎ বাবার, সে কী করে কোকিলার শয্যাসঙ্গী হতে আসে। পুরুষের লাম্পট্যের বাস্তব ও নির্মম চিত্র অঙ্কিত হয় কোকিলার মনে।

পরের দিন সকালেই গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে কোকিলা। কাজ নেয় একটি বাসায়। আর্থ-সামাজিক বিবেচনায় এই কোকিলা সমাজের নিম্ন মধ্যবিত্ত, শিক্ষাবঞ্চিত নারীদের প্রতিনিধি। গৃহপরিচারিকা কোকিলার মধ্য দিয়ে সমাজের নিম্ন মধ্যবিত্ত, অশিক্ষিত বা নিচু-স্তরের নারীদের জীবন-বাস্তবতা তুলে ধরেছেন নাট্যকার। নাট্যকার পাঠককে জানাচ্ছেন— 'নাটক শুরু হচ্ছে নিম্ন মধ্যবিত্ত মেজাজে। শিল্পি অর্থাৎ কোকিলা এই পর্বে গ্রাম থেকে আসা সহজ সরল এক রমণী।'[১০]সকাল থেকেই শুরু হয় চাকরিজীবী পরিবারে কোকিলার হাড়ভাঙা পরিশ্রম। একের পর এক কাজ করতে গিয়ে মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে পড়ে কোকিলা। একটা কাজ শেষ হতে না হতেই ছুটতে হয় আর একটা কাজের জন্য। সব কাজ নীরবে করে। মাঝে মাঝে যখন সবাই চলে যায় কোকিলা নিজে একটু সময় পায় তখন একা একা বলে—

> আরে, কোকিলা মা দুগগা নিহি, যে দশখান হাত আছে তার? পাইছিলো এই এক কোকিলারে। খুশীমতন দাবরাইয়া নিল। এত কাম, একলা মানুষ আমি, ক্যামনে করি? যামুগা গার্মেন কোম্পানিতে। ঘড়ি ধইরা কাপর সিলামু। মাস গেলে হাজার টাকা ব্যাতন লমু আর ঠ্যাং-এর উপুর ঠ্যাং তুইলা খামু দামু।[১১]

সাবলীল সংলাপের ঢঙে প্রকাশিত গৃহপরিচারিকা কোকিলাও যে একজন মানুষ তা ভুলে যাওয়ার চিত্র। কীভাবে এতো কাজ করবে তা জানার বা ভাবার অবকাশ নেই কারো। শুধু জানে কোকিলাকে কাজটা করতে হবে। দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে-পরে বাঁচবার জন্য কোকিলা হয় দশভূজা নারী; প্রতিদিন করে অমানবিক পরিশ্রম। মুক্তি লাভের আশায় ভাবে গার্মেন্টস কোম্পানিতে যাবে। কিন্তু গৃহপরিচারিকা হলেও তার মধ্যে মানবিকতা অসীম। এই বাড়িতে গড়ে ওঠা সাতবছরের সম্পর্ককে সে ছিন্ন করতে পারে না। শিশু সন্তানটির উপর তার যে মায়া তা তাকে সবসময় পিছু টানে।

সেই বাসার খালুজান, খালাম্মা আর তাদের ছোট সন্তানকে নিয়ে ভালোই সময় কাটে কোকিলার। কিন্তু ভালো সময় সবসময় থাকে না। আবারও পুরুষের রোষাণলে পড়তে হয় তাকে। খালুজানের বড় ভাইয়ের ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়-পড়ুয়া আনু হোস্টেলে থাকে। রাজনৈতিক সংঘর্ষে আহত হয়ে কয়েকদিনের জন্য চাচার বাসায় থাকতে আসে সে। খালুজান-খালাম্মা চাকরি করে তাই আনুর দেখাশোনা করার পুরো দায়িত্ব এসে পড়ে গৃহপরিচারিকা কোকিলার ওপর। কোকিলার সেবা-শুশ্রূষায় আনু সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু ততদিনে আনু কোকিলার চারপাশে ভালোবাসার ফাঁদ পাতে। সরল মনে কোকিলা বিশ্বাস করে মিথ্যে বিয়ের প্রলোভন। কিন্তু গৃহপরিচারিকাকে বিয়ে করা যায় না, এ সমাজের পুরুষ এতোটা মানবিক বা উঁচুমনের হতে পারেনি বা পারে না। অবুঝ কোকিলা তাকে বিশ্বাস করে মর্যাদা দিয়েছিলো। যৌবনের সহজাত প্রবৃত্তির জন্য কোকিলা শিকার হয় আনুর যৌনলালসার।

> কোনো ভয় নেই। আমি, এই তোর মাথায় হাত রেখে বলছি, আমি তোকে বিয়ে করব। উপরে কে আছে জানিস তো? আল্লা। আল্লাকে সাক্ষী রেখে আমি বললাম, আজ, এই মুহূর্ত থেকে তুই আমার বউ। আল্লার উপর তো আর কিছু নেই। কিরে আছে?[১২]

আনু দ্রুত চলে যায় বাসায় কেউ ফিরবার আগেই। প্রতিদিন আসবার কথা আনুর। পথ চেয়ে থাকে কোকিলা। কিন্তু আনু আর আসে না, এভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মূলত কোকিলাদের প্রতি পুরুষের আচরণকে বোঝানো হয়েছে আনুর আচরণের মধ্য দিয়ে। কোকিলারা যে নারী, পুরষ প্রধান সমাজে মানুষ নয় এই দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। প্রতারকের চিহ্ন বহন করতে হয় কোকিলার মতো নারীদের। আনুরা দৈহিক সুখ নিয়ে পাড়ি জমায় বিদেশে। একদিন কোকিলা অনুভব করে তার ভিতরে নতুন প্রাণের উপস্থিতি। খালাম্মা বুঝতে পেরে কোকিলাকে পরামর্শ দেন পেটের সন্তানটিকে নষ্ট করবার। কিন্তু কোকিলা তাতে রাজি হয় না। সে আনুর মতো প্রতারককে শাস্তি দিতে চায়। আনু তো ততদিনে স্কলারশীপ নিয়ে বিদেশে চলে গেছে। এদিকে খালাম্মা-খালুজানের সাজানো নাটকে পুলিশ এসে চুরি করবার দায়ে কোকিলাকে ধরে নিয়ে যায়। কোকিলা সাত বছরের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের দাম পেয়ে যায়। একজন নারী হয়েও সেদিন গৃহকর্ত্রী কোকিলার পাশে দাঁড়ায়নি। পাছে যদি সমাজে তাদের অসম্মানিত হতে হয়। পড়ে থাকে কোকিলার সাত বছরের সম্পর্ক; পিছুটান। সবকিছুর পুরস্কারস্বরূপ সে হয়েছে প্রতারিত এবং মাথায় নিয়েছে মিথ্যে চুরির অববাদ। থানায় পুলিশও তাকে উপহাস করে। কোকিলার কাছে মনে হয়—

> পুরুষের বাচ্চারা কেবল মাইয়া মানুষগো লইয়া ফূর্তি করতেই জানে।...তদ্দিনে আমার বোজা সারা, এই দুনিয়াটা আল্লায় বানাইছে কেবল পুরুষ গো লিগা। এইহানে মাইয়া মানুষর বাচনের পথ নাই। এই দুনিয়া পুরুষের বাচ্চার ফূর্তির জায়গা।[১৩]

শাস্তি হয় নির্দোষ কোকিলার। একমাসের জেল। দুনিয়ায় কোকিলারাই শাস্তি পায়, হেরে যায় তারাই। পুরুষশাষিত সমাজে কোকিলাকে বারবার পুরুষের— সৎ বাবার, বিশ্বাসঘাতক আনুর, পুলিশের, সবার থাবা থেকে নিজেকে বাঁচাতে হয়। নারী-পুরুষের সামাজিক বৈষম্যে, মিথ্যে চুরির দায় মাথায় নিয়ে, আনু নামক পুরুষকে ভালোবেসে প্রতারণা আর অবৈধ সন্তানের মাতৃত্বকে বরণ করে কোকিলা বেছে নেয় আত্মহননের পথ। শেষ হয়ে যায় প্রথম কোকিলা আর তার গর্ভের নিষ্পাপ সন্তান। শ্রেণি বৈষম্যের শিকার হয়ে কোকিলা আত্মহননের মধ্য দিয়ে খুঁজে নেয় নারী জীবনের মুক্তির পথ।

নাটকের দ্বিতীয় কোকিলা উচ্চ-মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহবধূ। এ কোকিলার নির্যাতিত হবার ধরনটা একটু ভিন্ন। অর্থ-প্রতিপত্তি, স্বামী, সন্তান, সংসার সব ছিলো তার। ছিলো না শুধু স্ত্রীর মর্যাদা। স্বামী হাবীব খন্দকার অন্যরকম পুরুষ; খাবারের মতো নারী-শরীরের স্বাদ বদলাতে হয় তার। তাই সংসারের প্রতি, স্বামীর প্রতি, সন্তানদের প্রতি যে নারী (কোকিলা) দায়িত্ব পালনে কখনো অবহেলা করেনি সে নারীকেও হতে হয়েছে প্রতারিত। দিতে হয়েছে বিশ্বাসের চরম মূল্য। স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের খবরে কেঁদে ওঠে কোকিলা। কিন্তু কোকিলা কোথাও যায় না। আধুনিক সমাজব্যবস্থায় লুটপাটের প্রতিনিধি হিসেবে হাবীব খন্দকার মূলত ভোগের প্রকাশ ঘটাতেই দ্বিতীয় বিয়ে করে প্রথম স্ত্রী কোকিলার বিশ্বাসকে ভেঙে দেয়। পঁচিশ বছরের সংসার জীবনের কষ্ট, যন্ত্রণা, অপমানের বিপরীতে কোকিলার অবস্থান।

> ফিরিয়ে দাও আমার মানসম্মান, ফিরিয়ে দাও আমার স্ত্রীর মর্যাদা, ফিরেয়ে দাও আমার পঁচিশ বছরের সংসার, ফিরিয়ে দাও আমার সন্তান। পঁচিশ বছর ধরে আমি তোমার ভোগ লালসার আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছি। তোমার ক্ষুধার অন্ন জুগিয়েছি।...আমার হিসেব মিটিয়ে দাও।[১৪]

স্বামী নামক পুরুষের প্রতি অন্ধবিশ্বাসী কোকিলা খুব কঠিন হয়ে প্রথম দাবি করে স্ত্রীর অধিকার, স্ত্রীর মর্যাদা। কিন্তু এ সমাজে যেন পুরুষ কোনো অন্যায় করতে পারে না, সকল অন্যায় নারীদের। দ্বিতীয় বিয়ের আগে প্রথম স্ত্রীর অনুমতিও হাবীব খন্দকার নেননি;

ভোগবৈচিত্র্য তার লক্ষ্য—

> এই আমার আসল রূপ, তোমার সাথে পঁচিশ বছর বসবাস করে আজ আমি ক্লান্ত। আমার ভাল লাগে না প্রতিদিন একই ঘরে একই মুখ দেখতে। আমি জীবনে বৈচিত্র্য আনতে চাই।[১৫]

স্বামীর কাছে প্রতারিত হবার পরও অসহায় কোকিলা স্বামীর পা জড়িয়ে কেঁদে ভিক্ষে চায় তার বাড়িতে থাকবার। শুধু স্ত্রীর পরিচয়ে বাকি জীবনটা বাঁচতে চায়। কিন্তু তাও তার কপালে জোটেনি। মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি শুরু হয় শারীরিক নির্যাতন। নির্যাতিত কোকিলা দেওয়ালে মাথা লেগে আহত হয়। অপমানে জর্জরিত, বিধস্ত কোকিলার এক জীবন বিলীন হয়ে যায় পুরুষশাসিত সমাজের কালের গর্ভে। কোকিলা নিম্নবিত্ত বা উচ্চবিত্ত যাই হোক না কেন অত্যাচারিত হয় পুরুষ শাসিত সমাজে প্রতিনিয়ত।

নাটকের তৃতীয় পর্বের কোকিলা নারী হিসেবে আত্মনির্ভরশীল— ব্যারিস্টার। প্রথম পর্বের কোকিলা এবং দ্বিতীয় পর্বের কোকিলার ওপর নির্যাতনের যে চিত্র চিত্রিত তার বিচার চাইতে আসে তৃতীয় পর্বের কোকিলা— ব্যারিস্টার। নারী হিসেবে সে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে গৃহপরিচারিকা কোকিলার মৃত্যুর জন্য আনোয়ার হোসেন এবং গৃহবধূ কোকিলার মৃত্যুর জন্য তার স্বামী হাবীব খন্দকার দায়ী। কিন্তু রায় হয়—

> [...] আদালত এই মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। সেমতে আদালত জনাব আনোয়ার হোসেন ও জনাব হাবীব খন্দকারকে বেকসুর খালাস প্রদান করছে।[১৬]

সমস্ত যুক্তি তর্ক হেরে যায়। এই রায় আর সমাজের সকলের হাসির তোপে আইনজীবী কোকিলাও হঠাৎ উচ্চস্বরে হাসতে শুরু করে— একসময় কান্নায় ভেঙে পড়েন। সমাজে নারী অস্তিত্বের টানাপোড়েন স্পষ্ট হয় এবং তার মধ্য দিয়েই শেষ হয় *কোকিলারা* নাটকটি।

আলোচ্য নাটকে নারী প্রতিনিধি হিসেবে দুই কোকিলা মূলত পরিবার ও পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতা দ্বারা এবং তৃতীয় কোকিলা আইন-আদালত সর্বোপরি রাষ্ট্রব্যবস্থা দ্বারা দমিত-পরাভূত। প্রাসঙ্গিকভাবে সমালোচকের মন্তব্য—

> তৃতীয় কোকিলা গর্জে উঠে দুই কোকিলার স্বপক্ষে গণ-আদালতে। শেষ পর্বে পুরুষের তৈরি আইনে দোষীরা শাস্তি পায় না। কিন্তু কোকিলার তীব্র তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে প্রকাশ হয়ে পড়ে সমাজের কিছু নগ্নসত্য।[১৭]

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্প-সাহিত্যে নারীকে যতটা মহান বা মর্যাদাপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা হয় সমাজবাস্তবতায় নারীর ক্ষেত্রে ঘটে একবারে তার উল্টো। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারীকে অর্ধাঙ্গী বলেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম বলেছিলেন 'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর/অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।'[১৮] কিন্তু বাস্তবতা একবারেই ভিন্ন।

এ পাণ্ডুলিপিতে তিন পর্বের তিন নারী জীবনের সমস্যার কোনো সমাধান দিতে পারেননি নাট্যকার। তিন নারীই হয়েছেন লাঞ্ছিত। এখানে পরিবার-সমাজের বন্দিত্ব থেকে নারী মুক্তির পথ নির্মিত হয়নি। এ সমাজে নির্যাতনের বেড়াজাল ছিন্ন করতে নারীদের কী করণীয় তা পাণ্ডুলিপিতে স্পষ্ট নয়। নারীর ত্রিমাত্রিক রূপের শিল্পমূর্তি পুরুষশাসিত সমাজের বুকে নারীর সামগ্রিক অবস্থানকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে মাত্র। তৃতীয় কোকিলা পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষের কাছেই বিচার চেয়েছে— এটা পাণ্ডুলিপির সীমাবদ্ধতা। তবে সমকালীন পুরুষশাসিত সমাজজীবনের সঙ্গে *কোকিলারা* নাটকটির নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করেছেন নাট্যকার। মূলত স্বাধীনতা-উত্তরকালে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যুগে (১৯৭৬-১৯৯০) রচিত নাটকটিতে

নাট্যকার সমাজের নারী ও পুরুষের মধ্যে আদর্শগত ও মূল্যবোধের পার্থক্য চিহ্নিত করেছেন সুনিপুণভাবে। আধুনিক সময়ের হয়েও এ নাটকের নারীরা প্রতিবাদী হতে পারেনি; অধিকার আদায় করার প্রচেষ্টাও লক্ষণীয় নয়। আবার এও ঠিক যে হাবীব খন্দকারের স্ত্রী কোকিলার কোন কোন দিকের কারণে ভালো না লাগার সৃষ্টি হয়েছে তারও উল্লেখ নেই। সুযোগ ছিলো প্রথম দুজন কোকিলার স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার; তারা তা করেনি। প্রথাগত পতিপ্রাণা নারী হয়ে বিশ্বাস ও ধর্মের উপর নির্ভর করেছে। প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় এর উল্টোচিত্রও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নারীরা অপেক্ষাকৃত বঞ্চিত, প্রতারিত সে সত্যই *কোকিলারা* নাটকের প্রাণ। ঘটনার ক্রমোন্নতি, দ্বন্দ্বসৃষ্টি, চরিত্রের হয়ে ওঠা, সংলাপের সাবলীলতা এমনকি পরিণতির আবহসৃজনে এবং মঞ্চমূল্যে নাট্যপাণ্ডুলিপিটি উত্তীর্ণ।

প্রযোজনা-প্রসঙ্গ

নাটকের পাণ্ডুলিপি পাঠক থেকে দর্শকের কাছে আসে প্রযোজনার রূপ নিয়ে। পাণ্ডুলিপি যখন প্রযোজনারূপে পরিবেশিত হয় তখন তা নাট্য মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়। নাটক দৃশ্যকাব্যরূপে বিবেচিত হওয়ায় প্রযোজনায় তার পূর্ণতা আসে। পাণ্ডুলিপি লিখিত রূপ আর প্রযোজনা ব্যবহারিক রূপ; একটির নিরব উপস্থিতি কাগজের পাতায় আর অন্যটি সরব উপস্থিতি মঞ্চের পাটাতনে। পাঠের অধিক প্রিয়তা অর্জন করেছে প্রযোজনা। একটি প্রযোজনায় সেট, প্রপস, পোশাক, মেক-আপ, আবহ সঙ্গীত, লাইট সহযোগে একজন নিদের্শকের নির্দেশনায় মঞ্চে অভিনয় করেন অভিনয়শিল্পিরা। মঞ্চনাটক এমন এক শিল্পমাধ্যম যেখানে সরাসরি দর্শকের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে বিভিন্ন নির্দেশনারীতির প্রয়োগে মঞ্চনাটক সম্ভাবনার জায়গা তৈরি করতে পেরেছে। নানা রীতি অবলম্বনে তা সমৃদ্ধ রূপও নিয়েছে। তবে যে রীতিতেই নিদের্শনা দেওয়া হোক না কেন সবক্ষেত্রেই প্রথমে একটি পাণ্ডুলিপি নির্বাচন করতে হয়। পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের পর মঞ্চে আসবার আগে পর্যন্ত জার্নি থাকে দর্শকের অগোচরে। আর পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের পর নিদের্শকের প্রথম কাজ পাণ্ডুলিপিটির মধ্য দিয়ে নাট্যকার কোন্ প্রেক্ষাপটে, কোন্ ভাবনায়, কোন্ ম্যাসেজ পাঠককে দিতে চেয়েছেন তা খুঁজে বের করা। তারপর শুরু হয় মহড়ার কাজ। পাণ্ডুলিপি, চরিত্র নির্বাচন, প্রপস, সেট পরিকল্পনা, রূপসজ্জা ও পোশাক পরিকল্পনা, আলোক পরিকল্পনা, আবহ সঙ্গীত পরিকল্পনা ইত্যাদি সহযোগে প্রযোজনা পরিবেশিত হয়।নাটক মূলত নির্দেশক ও অভিনয়শিল্পির যৌথ-প্রচেষ্টায় নাট্যরূপে মঞ্চে আসে। নির্দেশকের নির্দেশনায় অভিনয়শিল্পির দক্ষতায় প্রযোজনা মঞ্চস্থ হয়। প্রযোজনার জন্য অনিবার্য হয় একজন নির্দেশক। মূলত—

> [...] the director is the most responsible for the artistic elements. He must decide how the script is to be interpreted, and he must coordinate the efforts of all the other theatre artistic into a unified performance. An effective director, therefore, is of primary importance to the success of any play.[১৯]

যথার্থ নির্দেশনায় প্রযোজনা পূর্ণতা পায়। নাট্যপ্রযোজনা সাধারণত দলগত প্রয়াস বলেই আমরা জানি। দলগত প্রয়াসের পাশাপাশি বাংলাদেশের মঞ্চনাটক এখন ভিন্ন একটি ধারাপথ নির্মাণের চেষ্টা করছে। নানা সংকট উত্তরণের অভিপ্রায়ে নাটক এখন এককে রূপ নিয়েছে। সংকট উত্তরণের পাশাপাশি একক চরিত্রের অভিনয় একজন অভিনয়শিল্পির দক্ষতার পরিচয়ও বহন করছে। প্রতিনিয়ত মঞ্চে আসছে একক নাটক। বাংলাদেশে এ চর্চা ক্রমবর্ধমান। তবে বাংলাদেশের একক পুরুষচরিত্রের নাটকের তুলনায় একক নারীচরিত্রের প্রযোজনা বেশি। একটি প্রযোজনা দর্শকসাফল্য অর্জন করে সবকিছু মিলিয়ে— অর্থাৎ সেট, প্রপস, আবহ সঙ্গীত, আলো, পোশাক, মেক-আপ, অভিনয় ইত্যাদির সমন্বয়ে। বলাবাহুল্য একক চরিত্রের অভিনয়ের ক্ষেত্রে অভিনয়শিল্পির অভিনয় অধিক গুরুত্ব পায়। কারণ পুরো নাট্যকাহিনি বর্ণিত হয় একজনের অভিনয়ে।

বাংলাদেশের মঞ্চনাটকচর্চায় রচনা, নির্দেশনা এবং অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য নাট্যব্যক্তিত্বের মধ্যে অন্যতম আবদুল্লাহ আল-মামুন। বাংলা নাট্যাঙ্গনে ত্রয়ীসত্তার অধিকারী এই নাট্যব্যক্তিত্বের মৌলিক রচনা ও নির্দেশনায় মঞ্চে আসে *কোকিলারা*। বাংলাদেশের গ্রুপ থিয়েটারচর্চার ইতিহাসে "থিয়েটার" অনিবার্য নাম। নাটকের এ গ্রুপটি যাত্রা শুরু করে ১৯৭২ সালে। *কোকিলারা* "থিয়েটার"র প্রযোজনা। এ নাটকে একক চরিত্রে অভিনয় করেন ফেরদৌসী মজুমদার। তার অভিনয়দক্ষতা বাংলাদেশের মঞ্চনাটকে প্রথম একক নারীচরিত্রের অভিনয় হিসেবে দর্শকের মনে নান্দনিক আসন তৈরি করতে পেরেছে। সমাজে অনেকাংশেই প্রেম ও সাংসারিক নাগপাশে নারীরা বন্দী। সমাজ সংসারে তাদের ত্যাগের বা অবদানের মূল্যায়ন খুব কমই হয়। সামাজ, রাষ্ট্র বা পরিবারে প্রতিনিয়ত নিগৃহীত হয়ে অনেকেই হারিয়ে যায় অন্ধকারের গহ্বরে। কেউ কেউ বেছে নেয় আত্মহননের পথ। সমাজের ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের শিকার এ নাটকের তিন কোকিলা। শো হয়েছিলো ৬৭টি। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর দর্শকপ্রিয়তা এবং অভিনয়ের প্রতি ফেরদৌসী মজুমদারের ভালোবাসা এ নাটকটিকে নতুন করে মঞ্চে আনে। আবদুল্লাহ আল-মামুনের মৃত্যু এবং ফেরদৌসী মজুমদারের শারীরিক প্রতিবন্ধকতায় নাটকটি বন্ধ হয়েছিলো। পরে সুদীপ চক্রবর্তী বিনির্মাণ করেন *কোকিলারা* (২০১১)।

আবদুল্লাহ আল-মামুন নির্দেশিত প্রযোজনায় পাণ্ডুলিপির তিনটি পর্বই বর্তমান। প্রথম পর্বের কোকিলা একজন গৃহপরিচারিকা, দ্বিতীয় পর্বের একজন গৃহবধূ এবং তৃতীয় পর্বের কোকিলা একজন আইনজীবী। সুদীপ চক্রবর্তী নির্দেশিত *কোকিলারা* নাটকে দুই কোকিলাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। বাদ দেয়া হয়েছে মধ্যপর্ব; গৃহবধূ। তাতেও যেন কোনো ঘাটতি ঘটেনি প্রযোজনাটির।

কাহিনি

এ প্রযোজনাটিতে কাহিনিরূপে দুই কোকিলা উপস্থাপিত। পাণ্ডুলিপিতে তিনটি পর্ব থাকলেও সর্বশেষ প্রযোজনায় দুটি পর্ব। প্রথম কোকিলা আইনজীবী এবং দ্বিতীয় কোকিলা গৃহপরিচারিকা। আইনজীবী কোকিলার বয়ানে উঠে আসে গৃহপরিচারিকা কোকিলার জীবনকাহিনি। নাট্যকাহিনি এগিয়ে চলে গৃহপরিচারিকার জীবনকাহিনির উপর ভর করে। প্রতি সকালেই কোকিলার ব্যস্ততা বেশি। কর্মব্যস্ত কোকিলার দিন চাকরিজীবী গৃহকর্তা-গৃহকর্ত্রী ও তাদের একমাত্র শিশু সন্তানকে নিয়ে ভালোই কাটে। কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী। গৃহকর্তার বড় ভাইয়ের ছেলে আনোয়ারের মিথ্যে ভালোবাসার ফাঁদে কোকিলা অন্তঃসত্ত্বা হয়। আনোয়ার স্কলারশীপ নিয়ে বিদেশে পাড়ি জমায়। গৃহকর্তা-গৃহকর্ত্রী সমাজে মান-সম্মানের ভয়ে এ দায় নিতে চায় না। তাই সাজানো চুরির দায়ে কোকিলাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। পেছনে পড়ে থাকে তার সকল স্মৃতি। পুরুষশাসিত সমাজের কাছে কোকিলা হেরে গিয়ে বরণ করে নেয় নিজের অসহায়ত্ব। ট্রেনের নিচে আত্মাহুতি দেয় কোকিলা। গৃহপরিচারিকা কোকিলার হয়ে গণআদালতের কাছে অপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করে আইনজীবী কোকিলা। এই দাবির মধ্য দিয়েই শেষ হয় *কোকিলারা* নাটকের কাহিনি।

অভিনয়

কোকিলারা **নাটেকের অভিনয়ে ফেরদৌসী মজুমদার**

কোকিলারা নাটকটির অভিনয়ে বার্টোল্ট ব্রেখট এর অভিনয় পদ্ধতিরপ্রয়োগ হয়েছে। ডায়ালেকটিক্যাল থিয়েটারের জন্য অভিনয়ের বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতির এক অভিনয় পদ্ধতির কথা বলেছেন ব্রেখট। এই পদ্ধতিতে অভিনেতা তার অভিনীত চরিত্রকে নানাভাবে ভাগ করে নেন। *কোকিলারা* নাটকটিতে ফেরদৌসী মজুমদার একাই কয়েকটি চরিত্রে নিজেকে রূপায়ণ করেছেন। অভিনীত চরিত্রটির ভাব, ভাবনা, অনুভূতি, পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া এবং পার্শ্ব চরিত্রের অভিব্যক্তিও আলাদা আলাদাভাবে সাজিয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। একটি নারী চরিত্রের রূপায়ণ করতে গিয়ে রূপ দিতে হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি চরিত্রের। দুইজন কোকিলা, বাবা-মা, খালুজান, খালাআম্মা, আনু, পুলিশ এবং কথক। মঞ্চের প্রতিটি সেটকে ব্যবহার করেছেন জীবন্ত চরিত্ররূপে। কখনো নিজে হয়েছেন কোকিলা, সেট হয়েছে খালাআম্মা, খালুজান এবং মা। কখনো নিজের শরীরী অবস্থানের পরিবর্তন করে কোকিলা চরিত্রের নান্দনিক ও অভিনব অভিনয়ের প্রয়োগ কৌশল পরিলক্ষিত। যা প্রথম নির্মিত *কোকিলারা* নাটকে ছিলো না। প্রথম নির্মিত নাটকে অভিনেত্রী ফেরদৌসী মজুমদার স্থান পরিবর্তন করে মঞ্চের এক পাশে দাঁড়িয়ে চরিত্রগুলোর পরিবর্তন দেখান। পরে স্থান পরিবর্তনের ক্ষেত্রগুলোতে বাচিক অভিনয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

> একক অভিনয়ে ফেরদৌসী মজুমদার যখন দ্বৈত ভূমিকায় রূপদান করেছিলেন, যেমন প্রভু ও পরিচারিকা, তখন তিনি মাঝে মাঝে মঞ্চের উপর স্থান পরিবর্তন করে অভিনয় করেছিলেন, যা অভিনয়কে হাল্কা করে দিচ্ছিল। এই ধরনের একাধিক চরিত্র চিত্রনের জন্য অভিনেত্রীর বাচিক অভিনয়ই যথেষ্ট।[২০]

ফলে বাচিকাভিনয়ও অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। গলার স্বরের পরিবর্তন অন্য চরিত্রাভিনয়ে সহায়ক হয়েছে। বলা যায় নাটকটি ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে অভিনেত্রীর কণ্ঠস্বরের জন্য। কণ্ঠস্বর একটু মোটা ধরনের— যাকে বলে মাসকিউলিন ভয়েস (Masculine Voice)। প্রতিটি চরিত্রের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি, শারীরিক ভঙ্গিমার ভাষার পার্থক্যও পরিলিক্ষিত। যা অভিনয়ে বৈচিত্র্য এনেছে।

> তবুও বলব একক অভিনয়ে একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর ভিন্ন থেকে ভিন্নতর রূপে চরম শিল্প দক্ষতা দেখানোর সুযোগ থাকে। ফেরদৌসী মজুমদারের বৈচিত্র্যময় কুশলী অভিনয় 'কোকিলারা' কে এক মুহূর্তের জন্যেও ক্লান্তিকর হতে দেয় না যা একক অভিনীত নাটকের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি বলে বিবেচিত।[২১]

চরিত্রের সঙ্গে বসবাস করে, ম্যাজিক ইফ লালন করে ফেরদৌসী মজুমদার তার অভিনয়দক্ষতা দেখিয়েছেন। নাটকে যখন প্রথম কোকিলার চরিত্রটি দর্শকের সামনে আসে তখন কোকিলার সজীবতা সমাজের প্রতি কটাক্ষবিহীন নিয়তিনির্ভর জীবনের প্রতি এক ধরনের অনুরক্ত। অভিনেত্রীর দক্ষতার পরিচয় মেলে চরিত্রের বাস্তবিক রূপদান। বলেন—

> যখন Wings এর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতাম তখন কিন্তু আমি 'কোকিলা'ই হয়ে যেতাম। তখন নিজেকে মনে রাখলে তো হবে না। আমার পোশাক আমার সব তো আর আমি না, সবটাই কিন্তু অন্য একজন।[২২]

অভিনয়ের ক্ষেত্রে মাইম বা মূকাভিনয়ের ব্যবহার লক্ষণীয়। ভারি বালতি নিয়ে কাজ করা, গৃহকর্তার ছোট্ট ছেলেকে স্কুলের জন্য তৈরি, আনুর মতো করে সিগারেট খাওয়া, হাত ধরে ছোট কোকিলার মেলায় যাওয়ার দৃশ্যগুলো, ঘটে যাওয়া অতীতের দৃশ্য দর্শকের নিকট ইমেজ তৈরি করেছে। বাচিক ও আঙ্গিক উভয়ক্ষেত্রেই ফেরদৌসী মজুমদারের সাবলীল অভিনয় প্রযোজনাটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। এ প্রদর্শনীটিতে শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে সংলাপ প্রক্ষেপণের গতির সাথে Movement বা চলনের অসামঞ্জস্য লক্ষ্যণীয়। তবে নাটকের শেষে আইনজীবী চরিত্রাভিনয়ে বলিষ্ঠ অভিনয় দৃশ্যত। চরিত্রের অন্তর্গত অভিযাত্রা স্তানিস্লাভস্কির অভিনয়পদ্ধতির প্রতিফলন।

মঞ্চসজ্জা

প্রযোজনাটির মঞ্চ নির্মাণে নান্দনিক-ভাবনা পরিলক্ষিত। মঞ্চ নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে প্রতীকী সেট। নাটকের প্রথম দৃশ্যে যখন আইনজীবী কোকিলা আদালতে দাঁড়িয়ে কথা বলেন তখন কোকিলার পেছনে কাঠের নির্মিত বৃত্ত যার ওপর দিয়ে রাখা কাগজের দুই অংশ একটি নারীমূর্তির প্রতীকী ভাবনার রূপায়ণ। বলা যায় কোকিলার চরিত্রের প্রতিমূর্তি। আইনজীবী কোকিলা বাংলাদেশের কোকিলাদের সঙ্গে কথা বলার সময় হাতের ইশারায় অবয়বটিকে কোকিলার প্রতিমূর্তি হিসেবেও চিহ্নিত করেন। সেট হিসেবে মঞ্চে (মেঝেতে) একটি গোলাকার বৃত্ত অঙ্কনরেখা পরিলক্ষিত এবং ত্রিভূজ কোণার তিনটি টুলের অবস্থান লক্ষণীয়। দ্বিতীয় দৃশ্যে কাঠের গোলাকৃতির দুটি অংশ দুপাশে অবস্থিত অর্ধবৃত্ত দুটি অংশ। যা পরবর্তী ঘটনা ও দৃশ্য ভেদে চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত। যেমন ঘটনাক্রমে কোকিলা চরিত্রটি যখন তার মায়ের বিয়েতে অমত দেবার জন্য মায়ের সাথে কথা বলে তখন ডান পাশে অবস্থানরত অর্ধাংশটি হয়ে যায় মা। ঠিক একইভাবে খালা আম্মা ও খালুজানের চরিত্রকে রূপ দিতে সেটের ব্যবহার অভিনয়ের ভিন্ন প্রয়োগ কৌশল। টুলগুলো প্রয়োজনে কোকিলার সহায়ক চরিত্র হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। চরিত্র পরিবর্তনে নির্দেশক টুলের ব্যবহার করেছেন। চরিত্রের পরিবর্তন করেছে টুলে বসার মধ্য দিয়ে। গণ আদালতের দৃশ্যে গোলাকার

রেখার খণ্ডাংশ দুইটি একত্রিত হয়ে গোলাকার আকৃতি তৈরি করে। সেটে গোলাকার রেখার ব্যবহার নাটকটির বিষয়বস্তুর অর্থবহতা প্রকাশ করে। গোলাকার রেখা অর্থাৎ একটি বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ। মূলত নারী আত্মনির্ভরশীল বা পরনির্ভরশীল যাই হোক না কেন নারীরা যেন প্রতিনিয়তই শোষিত, বঞ্চিত। এমন চিত্রই প্রতিভাত হয় দর্শকমনে। নির্মিত মঞ্চসজ্জা রূপক ও অর্থবহ হয়েছে যা দর্শকনন্দিত।

আলোক পরিকল্পনা

প্রথমদিকে *কোকিলারা* নাটকে অভিনয়ে সবাই যখন প্রশংসা করেছেন তখন নাটকের নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন বলেন—

> ফেরদৌসীর অভিনয় ভালো হয়, কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু অভিনয়ের সঙ্গে যে আনুষঙ্গিক অন্য কিছুও খেয়াল করতে হয় সেটা তার মাথায় থাকে না। আপনি এতো মগ্ন হয়ে অভিনয় করেন যে আলোর কথা আপনার খেয়ালই থাকে না। কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আপনি সংলাপ বলে যাচ্ছেন কিন্তু অন্ধকারে দর্শক আপনার অভিব্যক্তিই দেখতে পাচ্ছে না।[২৩]

মঞ্চাভিনয়ের ক্ষেত্রে আলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অন্ধকারে থাকলে দর্শক শুধু তার সংলাপ শুনতে পাবে অভিব্যক্তি দেখতে পাবে না, তাতে অভিনয় সার্থক হয় না। *কোকিলারা* নাটকের সেদিনের প্রযোজনার পর অভিনেত্রী এই ভুল আর কখনো করেননি, তারপর থেকে তিনি সচেতনভাবেই অবচেতনে পৌঁছেছেন। অর্থাৎ অভিনয়ে মগ্ন হয়েছেন সচেতনভাবে এবং তার সহ-অভিনেতা যদি কখনো আলো নিতে ভুল করে থাকেন তবে তিনি কায়দা করেই তাদেরকে আলোতে টেনে এনেছেন। এমনকি মঞ্চে কেউ তাকে ব্লক করলে তিনি সামান্য সরে গিয়েও নিয়েছেন আলো।

আলো প্রযোজনাটিকে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা। নাটকীয় মুহূর্ত ও নাট্য আবহ নির্মিত হয়েছে আলোর প্রয়োগে। আলোর সাথে চরিত্রের মঞ্চে প্রবেশ ও চলে যাওয়া মিশ্রণটা অভিনব। এ যেন আলোর যাত্রা; আঁধারের বুক চিড়ে আলোর সঙ্গে জীবনচলা। গভীর ভালোবাসা ও কষ্টের প্রতিফলনরূপে ঘটনার অর্থবহতা তৈরি হয়েছে নীল আলোর ব্যবহারে। কোকিলার প্রতিমূর্তিরূপে বিমূর্ত কাঠের অবয়বে আলোর ব্যবহার সেটটির আলাদা অর্থ তৈরি করেছে। এছাড়া বেশিরভাগ সময় আলো স্বাভাবিক রাখা হয়েছে। দৃশ্য পরিবর্তনের সময় আলো fade out করে মঞ্চকে করা হয়েছে অন্ধকার।

প্রপস

নাটকে প্রপসের ব্যবহার তেমন নেই বললেই চলে। জলের বালতি, চিরুনি, টেলিফোন-এর উল্লেখ থাকলেও নির্দেশক অভিনেত্রীর অভিনয় শৈলীকে কাজে লাগিয়ে মূকাভিনয়ের মাধ্যমে তা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন দর্শক সম্মুখে। প্রপস হিসেবে লাল একটি ওড়নার দ্বিবিধ ব্যবহার লক্ষণীয়। এক. দড়ি হিসেবে ব্যবহৃত কোমড়ে বেঁধে থানায় নিয়ে যাবার দৃশ্যে, দুই. গর্ভবতী হওয়ার দৃশ্য বাস্তবিক করে তুলতে। এর বাইরে কোনো প্রপস ব্যবহার করা হয়নি নাটকে। সীমিত প্রপসের বিবিধ ব্যবহারে প্রযোজনাটি দৃষ্টান্তস্বরূপ।

আবহ

প্রযোজনাটি শুরু হয় বনলতা সেনের কবিতাটির মধ্য দিয়ে। অন্ধকার মঞ্চে বনলতা সেনের কবিতাটি আলাদা অনুভুতি সৃষ্টি করে দর্শকমনে। কোকিলা যখন আনুর মিথ্যে প্রেমে বন্দী হয় তখন শব্দের ব্যবহারে প্রযোজনায় তৈরি হয়েছে ঝড়-বৃষ্টির আবহ; যা প্রতীকী। মূলত কোকিলার মনের ঝড়ের পূর্বাভাস। কোকিলা যখন আত্মাহুতির কথা বলে তখন দূরে রেলগাড়ির শব্দ শোনা যায়। ক্রমশ শব্দ বাড়তে থাকে। রেলগাড়ির চাকার শব্দে কোকিলার আর্তনাদ নিমেশে মিশে যায়। রেলগাড়িটি যান্ত্রিক সভ্যতার একটি প্রতীকী রূপ। যা নগরসভ্যতা ও আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। আলোচ্য নাটকের প্রযোজনায় আবহ সঙ্গীতের ব্যবহার নাট্যকাহিনিকে করেছে বাস্তবিক ও প্রাসঙ্গিক।

পোশাক

দুটি চরিত্র; দুই নারী। একজন গৃহপরিচারিকা আর অন্যজন আইনজীবী। নিম্নবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি গৃহপরিচারিকা কোকিলাকে দেখা যায় শাড়ি পরিহিত অবস্থায়, যা বাংলাদেশের পেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক। সবুজ পাড়ের হলুদ শাড়ি, নীল রং এর ঘটি হাতা ব্লাউজ পরিচারিকা চরিত্রটিকে বাস্তবিক করেছে। আইনজীবী চরিত্রাভিনয়ে একই শাড়ির উপর কালো এপ্রোন ব্যবহার করা হয়েছে।

সবমিলিয়ে *কোকিলারা* প্রযোজনায় নির্দেশকের নান্দনিক প্রয়োগকৌশল হয়েছে দর্শকনন্দিত। অভিনেত্রী ফেরদৌসী মজুমদারের অভিনয়দক্ষতা প্রযোজনাটিকে প্রশংসিত করেছে। মঞ্চসফলতা নাটকটিকে বাংলাদেশের মঞ্চনাটকের ইতিহাসে দিয়েছে বিশেষ স্থান।

উপসংহার

নাটকটির বিষয়ভূমির নেপথ্যে নারীজীবনের আখ্যান বর্ণিত। এই নারীজীবন এই ভূখণ্ডের জীবনবাস্তবতা ও রাষ্ট্রিকবাস্তবতাকে ধারণ করে বিষয়রূপে বিবেচিত। পাণ্ডুলিপিতে তিন নারী জীবনের উল্লেখ থাকলেও প্রযোজনায় দুইজন নারীচরিত্র পরিলক্ষিত। জীবন ও যুগবাস্তবতায় নির্মাণে এসেছে নবনবভাবনা। যন্ত্রনির্ভর বাস্তবতায় মূল্যবোধের পাশাপাশি সময় ও ঐক্যের সংকট দেখা দিলে সাধারণত নতুন পথের সন্ধান মেলে। একসময় সে ধারাটি গ্রহণীয় মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়। বাংলাদেশের মঞ্চনাটকের চর্চায় একক নারীচরিত্রের নাটকসমূহ সেরকমই একটি সমৃদ্ধ নতুন পথসূত্ররূপে স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে*কোকিলারা*র হাত ধরে। প্রযোজনার মান নিয়ে অপরাপর সাধারণ প্রযোজনায় প্রশ্ন দেখা দিলেও বাংলাদেশের মঞ্চে একক নারীচরিত্রনির্ভর প্রযোজনাগুলো পেয়েছে প্রশ্নাতীত মাত্রা। পাণ্ডুলিপি থেকে প্রযোজনা নির্মাণের ক্ষেত্রে কিছু সংযোজন-বিয়োজন করা হয়েছে তবে তা নাটকের মূলভাবকে অক্ষুন্ন রেখে।

তথ্যনির্দেশ

১ OSCAR G. BROCKETT, *The Theatre An Introduction*,(New York: HOLD, RINEHART AND WINSTON, INC., 1964), P. 456
২ ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, *নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা* (কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ১৯৬৩), পৃ. ৫০৫
৩ আবু সাঈদ তুলু, "বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় সংকট ও সম্ভাবনা", *কালি ও কলম*, আবুল হাসনাত সম্পাদিত (ঢাকা: ষষ্ঠ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, ২০০৯), পৃ. ৩৩৭
৪ উদ্ধৃত: দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, *নাট্যতত্ত্ব বিচার* (কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯১), পৃ. ২৭
৫ সাজেদুল আউয়াল, *বাংলা নাটকে নারী-পুরুষ ও সমাজ* (ঢাকা : মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯), পৃ. ৮৪
৬ Aristotle, *Poetics and Rhetoric* (London: jn. Dent and Sons Ltd., 1953), P. 205
৭ আবদুল্লাহ আল-মামুন, *কোকিলারা* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৯০),পৃ. ৪
৮ কুলসুম আরা বেগম, "৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস", *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ মার্চ ১৯৮৪, পৃ. ১১। উদ্ধৃত: শামসুন নাহার, বাংলাদেশের নারী সমাজ : সংবাদপত্র ভিত্তিক একটি সমীক্ষা (১৯৭১-১৯৯০), পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), ২০০৭, পৃ. ২০৯, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
৯ আবদুল্লাহ আল-মামুন, *কোকিলারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪
১০ তদেব, পৃ. ১
১১ তদেব, পৃ. ৩
১২ তদেব, পৃ. ১০
১৩ তদেব, পৃ. ১৫
১৪ তদেব, পৃ. ২৮
১৫ তদেব, পৃ.৩০
১৬ তদেব, পৃ. ৪১
১৭ শিখা বসু, "এই নাটক দেখে মেয়েরা হাঁটুতে বুক লুকায়", *যুগান্তর* (কলকাতা: ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০)। উদ্ধৃত: মোঃ ছাইদুল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলা নাটক : বিষয়-বৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ* (অপ্রকাশিত এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ), ২০০৬, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।
১৮ কাজী নজরুল ইসলাম, "নারী", *নজরুল রচনাবলি* ২য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭), পৃ. ৮৯
১৯ O G Brockett, *The Theatre An Introduction* (New York: Holt, Rinehart and Winston Inc., 1974), p. 465
২০ আতাউর রহমান, *পাদ প্রদীপের আলোয়* (ঢাকা: লেখনী, ২০০৬), পৃ. ৫২
২১ তদেব,পৃ. ৫০ ও ৫১
২২ "ফেরদৌসী মজুমদারের সঙ্গে আলাপচারিতা", *আনর্ত*, রহমান রাজু সম্পাদিত (রাজশাহী: ১ম খণ্ড, ২০১৭), পৃ. ১৭৩
২৩ তদেব, পৃ.৭৪

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে উন্নয়ন-নাট্যের প্রয়োগ
(Application of Theatre For Development (TFD) in the socio-economic progress of Bangladesh)

মো: মোহসিন আলী*

Abstract: Theater for Development (TFD) is theater techniques to promote social change, community development and education. It is often used in developing countries as a tool to promote development and address social issues such as poverty, health, education and human rights. By conducting developmental awareness programs through theatre, common people get a chance to know themselves. As a result intellection and knowledge becomes easy. If theatre is thought of as a mirror of the soul, Theater for Development (Unnayan Natya) exposes that reflection to the common people. As a result, common people get a chance to see and know themselves in the mirror of theatre. Only when a citizen knows himself fully will the means of development come to him. That is, there is no doubt that theatrics plays a role in opening the doors of the soul. If development theatre is given more importance, it can play an important role in socio-economic development of Bangladesh. TFD can emerge as a citizen's eye-opener. The role of both theater workers and citizens is essential to make TFD more attractive. How TFD a big role in development? The aim of this research is to find out what is the main work of TFD, Theatre for Development : perspective of Bangladesh, and which institutions in Bangladesh are working on TFD.

সাধারণত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রের অবকাঠামোর আধুনিকায়নের মানদণ্ডকে আমরা 'উন্নয়ন' বলে থাকি। উন্নয়নের নানাবিধ প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে থিয়েটার অন্যতম অনুসঙ্গ। ব্রাজিলিয়ান শিক্ষাবিদ Paulo Freire (1921-1997) প্রণীত শিক্ষানীতির ধারণাকে কাজে লাগিয়ে আরেক ব্রাজিলিয়ান নাট্যনির্দেশক Augusto Boal (1931-2009) একটি নতুন নাট্যভাবনা সৃষ্টি করেন যা 'উন্নয়ন-নাট্য' হিসেবে পরিচিত। এই উন্নয়ন-নাট্যের কাজ হলো কোনো একটি নাট্য দ্বারা উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা। অর্থাৎ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যে নাট্য নির্মাণ ও পরিবেশন করা হয় তা'ই উন্নয়ন-নাট্য বা Theatre For Devlopment (TFD)। উন্নয়ন নাট্য হল সামাজিক পরিবর্তন, সম্প্রদায়ের উন্নয়ন এবং শিক্ষার প্রচারের জন্য নাটক এবং থিয়েটার কৌশল। এটি প্রায়শই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উন্নয়ন প্রচার এবং দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং মানবাধিকারের মতো সামাজিক সমস্যাগুলি মোকাবেলার একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সমাজতন্ত্রের বিপরীতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কর্তৃক আধুনিকায়নের নামে 'উন্নয়ন' ধারণাটির উদ্ভব ঘটে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। সাধারণত দু'ধরনের দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়নকে ব্যাখ্যা করা হয়। প্রথমটি ব্যক্তিগত ও দ্বিতীয়টি সামাজিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ। অনুন্নত দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, সামাজিক-রাজনৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা উন্নয়নের আরেকটি উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। শিল্পোন্নত দেশগুলোর উন্নয়নসংস্থা অনুন্নত দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য ঋণদান কর্মসূচির পাশাপাশি মানব উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অন্যান্য কর্মসূচিতে জোর দিতে শুরু করে। এছাড়াও বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক গবেষণা চলতে থাকে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন উন্নয়নের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন –

* এম.ফিল গবেষক, নাট্যকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

> সাবেক উন্নয়ন তত্ত্বের প্রধান তথ্যগত ক্রটি এই যে, এ তত্ত্বের জোর দেয়া হয়েছে জাতীয় উৎপাদন, মোট আয় এবং বিশেষ বিশেষ পণ্যের মোট সরবরাহের উপর। মানুষের স্বত্বাধিকার এবং সেই স্বত্বাধিকার থেকে পাওয়া ক্ষমতার দিকে নজর দেয়া হয়নি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের সক্ষমতা সৃষ্টি।[১]

অন্যদিকে বিকল্প ধারার উন্নয়ন সম্পর্কে বোদেনার্ভ বলেছেন –

> কিছু ব্যক্তির উন্নয়নের জন্য উন্নয়নের অর্থ হলো অদক্ষদের কাছে প্রযুক্তি হস্তান্তর করা যাতে তারা আরো উৎপাদনক্ষম হয়ে উঠতে পারে, অন্যদের জন্য তা হল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা জাগ্রত করা যাতে তারা নিজেরাই সমাজের কাঠামোটাকে বদলে ফেলতে পারে।[২]

অর্থাৎ বঞ্চনার উন্নয়ন বা দারিদ্র আসে ব্যক্তির স্বরপিত কারণ ও অন্তস্থিত ঘাটতিসমূহ থেকে এবং পূরণের পরিবর্তে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের মাধ্যমে এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ সম্ভব। প্রচলিত সমাজ কাঠামোর কারণে ক্ষমতাশীলদের চাপে নির্যাতিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে এই অসম সমাজ ব্যবস্থার মূল কারণ দূর করার মাধ্যমে উন্নয়ন করা সম্ভব। বিশেষজ্ঞের মতে উন্নয়নের প্রথম ধারণাটি অত্যাচারী শ্রেণীর সার্থকে সংরক্ষণ করে এবং দ্বিতীয়টি অত্যাচারিতদের স্বার্থকে সমর্থন করে, যা মূলত ফ্রেইরিয়ান বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

তৃতীয় বিশ্বে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বিশ্লেষণী সচেতনতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি হলো উন্নয়ন। বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থাগুলো শুধুমাত্র সংস্কৃত জনগোষ্ঠীর আত্মনির্ভরশীলতার উপর জোর দিচ্ছে। গবেষক আনিসুর রহমানের মতে –

> আত্মনির্ভরশীলতার অর্থ হল যে কোন কাজে নিজের সম্পদ ও শক্তিকে মৌলিক সম্পদ ও শক্তি বলে গণ্য করা-অপরের সম্পদ সম্মানজনক শর্তে ব্যবহার করলেও এই চেতনা থাকবে যাতে তার উপর এমন নির্ভরশীলতা দেখা না দেয় যে, সেই সম্পদ না পেলে কিছুতেই চলে না। এই ধরনের নির্ভরশীলতা অপরের দ্বারা শোষণের দ্বার উন্মুক্ত করে।[৩]

অর্থাৎ এখান থেকে বোঝা যায় যে, উন্নয়ন হলো আসলে নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি দিয়ে স্বনির্ভর করে তোলা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা উন্নয়ন ঘটাতে গিয়ে মানুষের মধ্যে নির্ভরশীলতার শিকল গড়ে তুলছে যা ইতিবাচক নয়।

অনেকের মতে ব্যক্তিগত উন্নয়ন একটি অস্থায়ী প্রক্রিয়া। কেননা এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত সমস্যার আপাত সমাধান সম্ভব হলেও সমস্যাকে একেবারে নির্মূল করা যায় না। সমস্যা তার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে যায়। ফলে সৃষ্টি হয় পরমুখাপেক্ষীতা বা পরনির্ভরশীলতা। অর্থাৎ উন্নয়ন সম্পর্কিত দ্বিতীয় ধারণাটি অধিক যৌক্তিক। কারণ উক্ত ধারণায় বস্তুর পরিবর্তে অধিক প্রাধান্য পেয়েছে মানুষ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই ধারণাটি ড. অমর্ত্য সেনের মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন চিন্তার প্রভাব যুক্ত। সম্পর্কিত আলোচনা থেকে বলা যায় উন্নয়ন হচ্ছে উন্নয়ন বঞ্চিত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বা উদ্যোগে বিদ্যমান নেতিবাচক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন। আর উন্নয়নের ক্ষেত্রে হিসেবে বিবেচিত হয় মানব এবং মানবের সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয়। তবে এই বিষয়টি স্থান-কাল পাত্র ভেদে ভিন্ন হতে পারে।

'তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারী সংস্থার নাট্যকলা ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল দেশের গ্রামীণ কৃষকদের 'উন্নয়ন'।'[৪] উন্নয়ন বা পরিবর্তনের জন্য সামাজিক এবং ব্যক্তিগত অবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন। উন্নয়নের

ক্ষেত্র শুধুমাত্র দরিদ্র বা বঞ্চিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠী নয়। উন্নয়ন দরকার সমাজের উপরের কাঠামো থেকে শুরু করে নিম্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে। তেমনি ক্ষমতায়ন বা সচেতনতাই উন্নয়নের একমাত্র দিক নয়। বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা এবং তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এই বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্র হিসেবে উন্নয়ন নাট্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

উন্নয়ন নাট্য তাদের নিজস্ব উদ্বেগ এবং সমস্যাগুলিকে সমাধান করে এমন নাটক নির্মাণ এবং অভিনয়ে সম্প্রদায়ের সদস্যদের অংশগ্রহণ জড়িত। এটি একটি সহযোগিতামূলক এবং ইন্টারেক্টিভ প্রক্রিয়া যা দর্শকদের অংশগ্রহণ এবং প্রতিক্রিয়া জড়িত। উন্নয়ননাট্যর নাটকগুলো প্রায়শই সম্প্রদায়ের সদস্যদের বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় এবং সামাজিক সমস্যাগুলোর বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সংলাপকে উদ্দীপিত করার লক্ষ্য থাকে। লক্ষ্য হলো বাইরের সাহায্যের উপর নির্ভর না করে সম্প্রদায়গুলোকে পদক্ষেপ নিতে এবং তাদের নিজস্ব সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়ার ক্ষমতা দেওয়া। সামগ্রিকভাবে, উন্নয়ন-নাট্য হলো সামাজিক পরিবর্তন এবং সম্প্রদায়ের উন্নয়নের প্রচারের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার, কারণ এটি সম্প্রদায়কে একটি সৃজনশীল এবং অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় জড়িত করে যা সংলাপ, প্রতিফলন এবং কর্মকে উৎসাহিত করে।

উন্নয়ন-নাট্য : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

'পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন নাট্যের কর্মপ্রক্রিয়ার আলেচনার মধ্য দিয়ে বংলাদেশের উন্নয়ন নাট্যেও প্রতিতুলনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো বিগত সময়ে এই নাট্য প্রক্রিয়াকে প্রচারণার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।'[৫] বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছরে সল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিনত হয়েছে। এক বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের এই উত্তরণ ও অর্জন সম্ভব হয়েছে। অগ্রগতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলেই সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতি হয়েছে। বিগত অর্ধশতক সময়ে বাংলাদেশের এই উন্নয়ন সাধনের পথে সরকারি ও বেসরকারিভাবে নানাবিধ উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। সেই উদ্যোগসমূহের অন্যতম একটি উন্নয়ন-নাট্য। যা দ্বারা প্রতি বছরই বাংলাদেশ সরকার সচেতনতার কাজ ও উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে প্রায় দুই যুগ ধরে 'উন্নয়ন নাট্যে'র বিভিন্ন রূপ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। তারই এক পর্যায়ে ২০০০ সালে উন্নয়ন-নাট্য সম্পর্কিত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় খুলনায়। এই নাট্য নিয়ে নিরীক্ষা চালিয়েছে এমন অনেকেই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার মাধ্যমেই নানা জটিল বিষয় সহজ হয়ে ওঠে। 'যথাযথ শারীরিক, আবেগগত এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচর্যার মাধ্যমে প্রত্যেককেই বিকশিত করা যায়।'[৬] আর এভাবেই কর্মশালার মধ্য দিয়ে উন্নয়ন-নাট্যের সংজ্ঞা, প্রক্রিয়া, সহায়ক ও অংশগ্রহনকারী সম্পর্কিত সব ধারনা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের উন্নয়ন-নাট্য নিয়ে আলোচনার পূর্বে খুলনার সেই কর্মশালায় (International Integrated Theatre for Development Workshop'2000) উন্নয়ন নাট্যকে কীভাবে প্রতীয়মান করা হয় তা দেখে নেওয়া যাক–

- উন্নয়ন নাট্য একটি সক্রিয় উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং বাস্তব ঘটনার উপস্থাপন যার মধ্য দিয়ে সমাজের সমস্যা, সমস্যার কার্যকারণ এবং তার সম্ভাব্য সমাধান বের করা কিংবা এলাকাবাসীদের মতামতের ভিত্তিতে দৃষ্টিগোচর, শ্রুত এবং বোধগম্য সমাধান সৃষ্টির সহায়তা করে। তাই উন্নয়ন নাট্য একটি মাধ্যম বা পদ্ধতি অথবা প্রক্রিয়া হতে পারে আবার সবও হতে পারে।

- উন্নয়ন নাট্য হচ্ছে উন্নয়নের জন্য এমন একটি নাট্য যা সংলাপাত্মক, পারস্পরিক ক্রিয়াশীল এবং অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া যেখানে অংশগ্রহণকারীরা (দর্শক এবং অভিনেতা-নেত্রী) ক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে উন্নয়নকে তরান্বিত করে।
- উন্নয়ন নাট্য হচ্ছে ঐ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বাস্তবতার চিত্র উন্মোচিত হয় যা পরিবর্তনকে সম্ভাবনার দিকে নিয়ে যায়। এটি পরিবর্তনের জন্য সাংস্কৃতিক ক্রিয়া বা চর্চা প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক অর্থে, সাংস্কৃতিক ক্রিয়া বা চর্চা হচ্ছে বাস্তবতার মধ্যস্ততা।[৭]

উন্নয়ন-নাট্য বাংলাদেশে কয়েক দশক ধরে সামাজিক পরিবর্তন, সম্প্রদায়ের উন্নয়ন এবং শিক্ষা প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে TFD এর ব্যবহার দারিদ্র্য, লিঙ্গ বৈষম্য, স্বাস্থ্য এবং মানবাধিকারের মতো সমস্যাগুলি মোকাবেলায় বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছে।

বাংলাদেশে টিএফডির একটি উদাহরণ হল "বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন" (বিসিডিজেসি) নামে একটি বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) কাজ। বিসিডিজেসি নারীর অধিকার, নারীর প্রতি সহিংসতা এবং বাল্যবিবাহের মতো বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে উন্নয়ন নাট্য ব্যবহার করেছে। এছাড়াও তারা উন্নয়ন নাট্য ব্যবহার করেছে স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য, বিশেষ করে HIV/AIDS এবং যক্ষ্মা রোগের আশেপাশে। আরেকটি উদাহরণ হলো এনজিও 'সেন্টার ফর মাস এডুকেশন ইন সায়েন্স' (সিএমইএস) এর কাজ, যেটি বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা ও সাক্ষরতার প্রচারের জন্য উন্নয়ন-নাট্য ব্যবহার করেছে। সিএমইএস এমন নাটক এবং নাটক তৈরি করেছে যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জগুলির সম্মুখীন হয় তা মোকাবেলা করে এবং এই নাটকগুলোকে সংলাপকে উদ্দীপিত করতে এবং সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপের প্রচারের জন্য ব্যবহার করেছে। বাংলাদেশে পরিবেশ সচেতনতা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন-নাট্য ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এনজিও "বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ" (বিসিএএস) টিএফডি ব্যবহার করেছে বন উজাড়, জল দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো সমস্যাগুলির বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে এবং এই সমস্যাগুলির জন্য সম্প্রদায়-ভিত্তিক সমাধান প্রচার করতে। সামগ্রিকভাবে, উন্নয়ন-নাট্য বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তন এবং সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য একটি কার্যকরী হাতিয়ার হয়েছে, কারণ এটি একটি অংশগ্রহণমূলক এবং সৃজনশীল প্রক্রিয়ায় সম্প্রদায়কে নিযুক্ত করে যা তাদের নিজেদের সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার ক্ষমতা দেয়।

উন্নয়ন-নাট্য স্বাধীনতা লাভের পর থেকে গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উন্নয়ন-নাট্য বাংলাদেশে দারিদ্র্য, লিঙ্গ বৈষম্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবাধিকার এবং পরিবেশগত স্থায়িত্ব সহ বিস্তৃত সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় ব্যবহৃত হয়েছে। উন্নয়ন-নাট্য বাংলাদেশের উন্নয়নে অবদান রাখার অন্যতম প্রধান উপায় হল গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা ও শিক্ষার প্রচার করা। উন্নয়ন-নাট্য সম্প্রদায়কে তাদের অধিকার সম্পর্কে শিক্ষিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, নারীর অধিকার সহ, এবং বাল্যবিবাহ, গার্হস্থ্য সহিংসতা এবং মানব পাচারের মতো সামাজিক সমস্যাগুলি মোকাবেলায় পদক্ষেপ নিতে তাদের উৎসাহিত করতে। উন্নয়ন-নাট্য বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত টেকসইতা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এনজিও এবং সম্প্রদায়-ভিত্তিক সংস্থাগুলি এইচআইভি/এইডস, যক্ষ্মা, এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের মতো স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং জল সংরক্ষণ এবং বৃক্ষ রোপণের মতো পরিবেশগতভাবে টেকসই অনুশীলনগুলিকে প্রচার করতে উন্নয়ন-নাট্য ব্যবহার করেছে। বাংলাদেশে সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক সংহতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও উন্নয়ন- নাট্য কার্যকর হয়েছে। নাটক ও নাটকের বিকাশ এবং অভিনয়ের সৃজনশীল প্রক্রিয়ায় সম্প্রদায়ের সদস্যদের জড়িত করার মাধ্যমে, উন্নয়ন-নাট্য লোকেদের তাদের গল্প এবং অভিজ্ঞতা ভাগ করে

নেওয়ার জন্য এবং সাধারণ সমস্যার সমাধান খুঁজতে একসঙ্গে কাজ করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করেছে। সামগ্রিকভাবে, গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যাগুলির বিষয়ে সচেতনতা ও শিক্ষার প্রচার, স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত স্থায়িত্বের প্রচার, সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক সংহতি গড়ে তোলার মাধ্যমে উন্নয়ন-নাট্য বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) রয়েছে যারা সামাজিক পরিবর্তন এবং সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য থিয়েটার ফর ডেভেলপমেন্ট (টিএফডি) এর সাথে কাজ করে। *বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন* (বিসিডিজেসি)-বিসিডিজেসি বাংলাদেশের একটি নেতৃস্থানীয় এনজিও যেটি স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা এবং মানবাধিকারের মতো ক্ষেত্রে সামাজিক ও আচরণগত পরিবর্তনের জন্য উন্নয়ন-নাট্য ব্যবহার করে। *সেন্টার ফর ম্যাস এডুকেশন ইন সায়েন্স (CMES)*- উন্নয়ন-নাট্য ব্যবহার করে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা ও সাক্ষরতার প্রচারের জন্য কাজ । বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ (BCAS)-BCAS পরিবেশগত সমস্যা, যেমন জলবায়ু পরিবর্তন এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং টেকসই উন্নয়ন অনুশীলনের প্রচার করতে উন্নয়ন নাট্য ব্যবহার করে। ব্র্যাক বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ এনজিও এবং দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং মানবাধিকার সহ বিস্তৃত সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় উন্নয়ন-নাট্য ব্যবহার করে। নোবেল বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনুস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক, বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন নাট্য ব্যবহার করে। *রূপান্তর* পটগানকে উপজীব্য করে উন্নয়ন-নাট্য পরিচলনা করে আসছে। সামাজিক পরিবর্তন এবং সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য একটি হাতিয়ার হিসাবে উন্নয়ন-নাট্য ব্যবহার করার জন্য প্রতিটি সংস্থার নিজস্ব নির্দিষ্ট ফোকাস এবং পদ্ধতি রয়েছে। উন্নয়ন-নাট্য এর সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কোন বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) সবচেয়ে সফল তা নির্ধারণ করা কঠিন, কারণ উন্নয়ন নাট্য উদ্যোগের সাফল্য বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসহ প্রকল্প, টার্গেট অডিয়েন্স এবং স্থানীয় প্রসঙ্গ জড়িত রয়েছে। বাংলাদেশের বেশকিছু এনজিও উক্ত বিষয়সমূহকে কেন্দ্র করে তাদের উন্নয়ন-নাট্যের কার্যক্রম চালিয়েছে। স্বাধীনতাত্তোর কোন কোন দশকে কোন কোন এনজিওসমূহ বাংলাদেশে উন্নয়ন-নাট্যের সাথে অধিকতর কাজ করেছে দেখা যাক তার তালিকাসমূহ :

৭০'র দশক

সেন্টার ফর মাস এডুকেশন ইন সায়েন্স (CMES) একটি বাংলাদেশি এনজিও। বাংলাদেশের একটি জাতীয় এনজিও হিসাবে, এটি বর্তমানে ঢাকা সহ ২০টি জেলায় অবস্থিত তার ২৫টি ইউনিটের মাধ্যমে কাজ করছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে তাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্য নিয়ে CMES ১৯৭৮ সাল থেকে সুবিধাবঞ্চিত কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে কাজ করছে। এটি সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সুবিধাবঞ্চিত কিশোর-কিশোরীদের জন্য একটি উপযুক্ত গণশিক্ষার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে চিন্তাভাবনা এবং ক্রিয়াকলাপকে উৎসাহিত এবং প্রচার করতে কাজ করে। উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে তারা উন্নয়ন-নাট্যের সহযোগিতা নিয়েছে। যাত্রা শুরুর কিছুদিন পরই অর্থাৎ সত্তুরের দশকের শেষভাগেই CMES বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা এবং সাক্ষরতার প্রচারের জন্য উন্নয়ন-নাট্য ব্যবহার করে, বিশেষ করে এমন এলাকায় যেখানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অ্যাক্সেসযোগ্য নয়। পরবর্তীতে তারা উন্নয়ন-নাট্য ভিত্তিক উদ্যোগের একটি বড় পরিসর তৈরি করেছে। তন্মধ্যে পাপেট-শো, পথনাটক এবং ভ্রাম্যমান থিয়েটার পারফরমেন্স অন্যতম। যা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে শিক্ষা এবং সাক্ষরতার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করেছে। CMES তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে শিক্ষা, উপযুক্ত প্রযুক্তি, জেন্ডার এবং যুবদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে

নতুন নতুন পদ্ধতি এবং নতুন অর্জন যোগ করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে উন্নয়ন-নাট্য পদ্ধতি হাজার হাজার যুবক-যুবতীকে শিক্ষিত এবং দক্ষ ব্যক্তি হিসেবে তৈরী হওয়ার জন্য সহযোগিতা করেছে।

৮০'র দশক

বাংলাদেশের একটি সুপরিচিত বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) *প্রশিকা*, যেটি দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং টেকসই উন্নয়নের উপর কাজ করে যাচ্ছে। সম্প্রদায়ের উন্নয়নে প্রশিকা সৃজনশীল পদ্ধতির জন্য পরিচিত এবং তাদের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলির মধ্যে একটি হলো 'পপুলার থিয়েটার'। ১৯৭৯ সালে 'পপুলার থিয়েটার' নাম দিয়ে উন্নয়ন-নাট্যের যাত্রা শুরু করে প্রশিকা। 'পপুলার থিয়েটার'র মাধ্যমে প্রশিকা দারিদ্র্য, লিঙ্গ বৈষম্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বের মতো বিষয়গুলিকে সংযুক্ত করেছে। তারা স্থানীয় শিল্পী এবং অভিনয়শিল্পীদের ব্যবহার করে একটি বিনোদনমূলক এবং আকর্ষক পদ্ধতিতে শক্তিশালী বার্তা প্রদানের জন্য গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলোতে নাট্য পরিবেশনা সংগঠিত এবং মঞ্চস্থ করেছে। *প্রশিকার* 'পপুলার থিয়েটার' পারফরমেন্সগুলি প্রায়ই শ্রোতাদের বিমোহিত করতে এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বার্তাগুলি প্রকাশ করতে সঙ্গীত, নৃত্য, নাটকের সহায়তা নিয়ে থাকে।। এই পারফরম্যান্সের লক্ষ্য সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণকে শিক্ষিত করা, অনুপ্রাণিত করা এবং উৎসাহিত করা, ব্যক্তিদেরকে পদক্ষেপ নিতে এবং তারা যে চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হয় তা মোকাবেলা করা। প্রশিকার 'পপুলার থিয়েটার'র ব্যবহার বৈচিত্র্যময় দর্শকদের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় যেখানে ঐতিহ্যগত বিনোদনের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব রয়েছে। থিয়েটারের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে, *প্রশিকা* সফলভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে যুক্ত করেছে, আলোচনার সুবিধা দিয়েছে এবং ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের সূত্রপাত করেছে। জুন ১৯৯৯ পর্যন্ত প্রশিকা মোট ৭,৩৯৫ জন সদস্য বিশিষ্ট ৪৯৩টি সাংস্কৃতিক দল সংগঠিত করেছিল, যাদের বেশিরভাগই মহিলা। এই দলগুলো ১৯৯৭-১৯৯৮ সালে, ২,৫৮৫টি গ্রামে ৪,৬৯১টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করেছে। দলগুলো বাংলাদেশ টেলিভিশনে ছয়টি টেলিপ্লে করেছে।

বাংলাদেশে যারা সামাজিক পরিবর্তন এবং সম্প্রদায়ের উন্নয়নে উন্নয়ন-নাট্য এর সফল ব্যবহারের জন্য স্বীকৃত তন্মধ্যে একটি এনজিও হল '*বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন* (BCDJC)। BCDJC আশির (৮০) দশকের শেষভাগে অর্থাৎ ১৯৮৭ সালে তার সূচনা থেকে কাজ করছে এবং স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা এবং মানবাধিকারের মতো ক্ষেত্রে, সামাজিক এবং আচরণগত পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে থিয়েটারের উদ্ভাবনী এই কার্যকরকে ব্যবহার করেছে। BCDJC কমিউনিটি থিয়েটার গ্রুপ, স্ট্রিট থিয়েটার পারফরম্যান্স এবং রেডিও নাটক সহ উন্নয়ন-নাট্য-ভিত্তিক উদ্যোগের একটি পরিসর তৈরি করেছে, যা সারা বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছেছে। তাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন নাট্য উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে 'জীবন শোংলাপ' (জীবন সংলাপ) প্রোগ্রাম, যা মা ও শিশু স্বাস্থ্যের প্রচারে উন্নয়ন নাট্য ব্যবহার করে এবং 'মুক্ত বিহঙ্গ' (মুক্ত পাখি) প্রোগ্রাম, যা উন্নয়ন-নাট্য ব্যবহার করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করেছে।

৯০'র দশক

১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে প্রতিষ্ঠিত একটি অলাভজনক সংস্থা *রূপান্তর*। খুলনা ও বাগেরহাট জেলা থেকে শুরু করে ১৯৯৪ সালে লোকনাট্য, পটগান এবং জনপ্রিয় প্রকাশনা দিয়ে, এনজিওটি মূলধারার উন্নয়ন কর্মসূচিতে তার কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে আসছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে গণতন্ত্র ও শাসন, শান্তি ও সহনশীলতা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন, মানবাধিকার, নিরাপদ অভিবাসন, পরিবেশ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিশু সুরক্ষা এবং বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন। ২০০২ সালে, *রূপান্তর* এশিয়া

(চীন, লাওস, কম্বোডিয়া এবং ভারত) এবং ইউরোপ (সুইডেন এবং যুক্তরাজ্য) জুড়ে লোকনাট্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী কাজ শুরু করে।

সুন্দরবন অঞ্চলের জন্য কর্মসূচী তৃণমূল নারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন করে। হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ। বন ব্যবহারকারীদের পরিবেশের বাসস্থান, সংস্কৃতি সংরক্ষণ, এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, ন্যায়সঙ্গত লিঙ্গের জন্য কর্মকাণ্ডের উন্নতি, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে গণতন্ত্র, সুশাসন এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং লোকসংস্কৃতি চর্চা পুনরুজ্জীবিত ও প্রচার। আমাদের বাস্তবায়নের মধ্যে রয়েছে আলোচনা, সংলাপ সভা, এবং নাগরিক, নারী নেতা, যুবক, কিশোর, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি এবং মাঠ প্রশাসনের কর্মীদের প্রশিক্ষণ।

একটি উন্নয়ন সংস্থা হিসাবে রূপান্তর লোকনাট্য, পটগান এবং জনপ্রিয় প্রকাশনার রূপান্তর-পদ্ধতি (রূপান্তরের নিজস্ব একটি উন্নয়ন-নাট্যের ধারা আছে বলে তারা দাবী করে) ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহুরে পর্যায়ে জনসাধারনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করে। নিম্নে রূপান্তরের কর্মসূচী/ক্রিয়াকলাপগুলি রয়েছে যাতে মহিলাদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের সাথে রূপান্তর মেথড অফ ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন ব্যবহার করা হয় :

- মহিলা সংগঠন বিল্ডিং এবং নেতৃত্ব উন্নয়ন
- তৃণমূল পর্যায়ের নারী নেত্রীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন
- লিঙ্গ এবং উন্নয়ন
- সুন্দরবন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ সংরক্ষণকরন
- সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনের জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সরকারের অভিনেতা ও জনগণের অংশগ্রহণকে শক্তিশালী করা।
- সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
- নারীর প্রতি সহিংসতা হ্রাস করা
- নারী ও শিশু পাচার কমানো
- নারী ও শিশু অধিকার সহ মানবাধিকার সুরক্ষা
- ভোটার শিক্ষা এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষণ
- শান্তি গড়ে তোলে এবং সামাজিক সম্প্রীতি সৃষ্টি করে

রূপান্তর মেথড অফ ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশনের পটগান এবং লোকনাট্য গভীরভাবে অধ্যয়নের দাবি রাখে।

রূপান্তর-এর মৌলিক শিক্ষা এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে যে, সংস্কৃতি এবং টেকসই উন্নয়ন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই সংযোগ উন্নয়ন বিশ্বে একটি উদীয়মান ধারণা। একটি সমাজের সংস্কৃতি সৃজনশীল অভিব্যক্তি (ইতিহাস, গান, নৃত্য, সঙ্গীত, সাহিত্য, স্থাপত্য, শিল্প ইত্যাদি) এবং সম্প্রদায়ের অনুশীলন (প্রথাগত নিরাময় পদ্ধতি, ঐতিহ্যগত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে অনেক স্বতন্ত্র উপায়ে নিজেকে প্রকাশ করে।) যদিও একটি সমাজের পরিচয় মূলত তার সংস্কৃতি দ্বারা নির্ধারিত হয়, তবুও যে কোনও সমাজের পক্ষে সংস্কৃতির স্থির ধারণা থাকা কঠিন। সমাজ ও সংস্কৃতি উভয়ই যুগপৎ পরিবর্তনশীল।

> সংস্কৃতি এবং উন্নয়নের মধ্যে সংযোগ অন্তত তিনটি উপায়ে কাজ করে। প্রথমত, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য জাতীয় সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাই ঐতিহ্য, বিভিন্ন ঐতিহ্য, লোকগীতি, নৃত্য-নাটক এবং থিয়েটার ইত্যাদি পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ করা অপরিহার্য। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতিকে মানুষের মধ্যে বিশেষ করে নিরক্ষর মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে, থিয়েটার, লোকগীতি এবং বিনোদনের অন্যান্য দেশীয় ধরনগুলিকে সচেতনতা বাড়াতে এবং মানুষকে নতুন ধারণা জানানোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া, সাংগঠনিক ক্ষমতা, বিরোধ নিষ্পত্তি এবং সুশাসন নিশ্চিত করার জন্যও এই ধরনের বিনোদন মিডিয়া ব্যবহার করা যেতে পারে। তৃতীয়ত, প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি, রীতিনীতি এবং বিশ্বাসের নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। এই জনপ্রিয় সংস্কৃতির কিছু দিক হল লিঙ্গ-সমতা বিরোধী, প্রগতি বিরোধী ইত্যাদি। টেকসই উন্নয়ন হস্তক্ষেপের জন্য, এই নেতিবাচক শক্তিগুলিকে প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। রূপান্তর তিনটি উপায়েই সংস্কৃতি-উন্নয়ন সংযোগকে সম্বোধন করার চেষ্টা করে।[৮]

রূপান্তর সুন্দরবন অঞ্চলের স্থানীয় লোকসংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা শুরু করে যাতে লোকসংস্কৃতিকে উন্নয়নে মূলধারায় আনার সুযোগ খুঁজে পাওয়া যায়। বিস্তর গবেষণার পর রূপান্তর বিলুপ্তপ্রায় কিছু লোকসংস্কৃতি মাধ্যম চিহ্নিত করেছেন যেগুলো অতীতে শিক্ষা ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের জন্য এই সাংস্কৃতিক মাধ্যমগুলোকে উন্নত ও আপডেট করা হচ্ছে উন্নয়ন নাট্যের মাধ্যমে।

রূপান্তর তৃতীয় প্রজন্মের থিয়েটার 'অল্টারনেটিভ লিভিং থিয়েটার (ALT)' ফর্মে লোকনাট্যকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। *রূপান্তর* এই পদ্ধতির লোকনাট্য পরিবেশনের জন্য আলংকারিক আলো, ভারী মেকআপ, ব্যয়বহুল প্রপস এবং স্টেজের প্রয়োজন নেই। অভিনয়শিল্পীদের সাথে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে স্ক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হয়। কম খরচে বিপুল সংখ্যক দর্শকের জন্য এ ধরনের নাটক করা সম্ভব। এটি একটি শক্তিশালী মিডিয়া যা দর্শকদের নাটকটি আকর্ষণীয়ভাবে উপভোগ করতে সহায়তা করে। নাটকের এই ফর্মটি শিক্ষা এবং যোগাযোগের জন্য এবং সাধারণত সমস্যা ভিত্তিক এবং পছন্দসই বার্তাগুলি আকর্ষণীয় শৈলী এবং ছন্দময় আকারে পৌঁছে দেওয়া হয় যা প্রত্যেককে থিমটি বুঝতে দেয়। ALT সমস্যাটি খুঁজে বের করে, অর্থাৎ বাস্তব জীবন থেকে চিত্রিত করার বিষয় এবং ওভ করার উপায় দেখানোর চেষ্টা করে।

২১ শতকের প্রথমভাগ (২০০০-বর্তমান)

২১ শতকের প্রথম ভাগে এসে দেশব্যাপী লিঙ্গ সমতা, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারীর প্রতি সহিংসতা, সুশাসন, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, অভিবাসন, (এইচআইভি)-এইডস, সড়ক নিরাপত্তা, কৃষি এবং স্থানীয় ও জাতীয় তাৎপর্যপূর্ণ অন্যান্য বিষয়ের মতো বিস্তৃত বিষয় নিয়ে বিভিন্ন এনজিও কাজ শুরু করে। এছাড়াও পপুলার থিয়েটারের মাধ্যমে মহিলাদের স্বনির্ভরশীলতা, গতিশীলতা এবং অংশগ্রহণকেও ত্বরান্বীত করার কাজ শুরু হয়। উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করার জন্য উন্নয়ন নাট্য পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে অগ্রসর ভূমিকা পালন করে আসছে ব্রাক নামক একটি এনজিও।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সদস্যদের নিয়ে *ব্রাক* গঠন করে '*গ্রাম সংগঠন*'। গ্রামকে কেন্দ্র করে এই সংগঠন গঠিত হয়। গ্রামে গঠিত তিন বা ততোধিক সংগঠনকে নিয়ে ওয়ার্ড পর্যায়ে গঠিত হয় *পল্লী সমাজ*। '*গ্রাম সংগঠন*' ও 'পল্লী সমাজ'র সদস্যগণ যথাক্রমে সপপ্তাহে একদিন ও দুইমাসে একদিন সভা করে থাকেন। উক্ত সভায় সদস্যবৃন্দ তাদের নিজস্ব এলাকার সমস্যাসমূহ (যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, অন্যায়-অবিচার,

পরিবেশ, স্বাস্থ্য ইত্যাদি) নিয়ে আলোচনা করে। আর এই আলোচনার উপর ভিত্তি করেই 'সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচীর একটি কার্যক্রম হিসেবে ব্রাক ১৯৯৮ সাল থেকে গণনাটকের কার্যক্রম শুরু করে।'[৯]

ব্র্যাক বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ এনজিও এবং দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে উন্নয়ন-নাট্য এর সাথে কাজ করছে। সংস্থাটি দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং মানবাধিকারসহ বিস্তৃত সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে উন্নয়ন নাট্য ব্যবহার করে। ব্র্যাকের উন্নয়ন-নাট্য উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে কমিউনিটি থিয়েটার গ্রুপ, রেডিও নাটক এবং স্ট্রিট থিয়েটার পারফরমেন্স, যা এই সমস্যাগুলি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং সম্প্রদায়-ভিত্তিক সমাধান প্রচার করতে সাহায্য করেছে। তাদের উল্লেখযোগ্য কিছু উন্নয়ন-নাট্য উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে 'মনোশি' প্রোগ্রাম, যা মা ও শিশু স্বাস্থ্যের প্রচারে থিয়েটার ব্যবহার করে এবং 'অপরাজিতা' প্রোগ্রাম, যা নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে থিয়েটার ব্যবহার করে। সংক্ষেপে, এই এনজিওগুলি বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তন এবং সম্প্রদায়ের উন্নয়নে উন্নয়ন-নাট্য এর সফল ব্যবহারের জন্য স্বীকৃত হয়েছে। প্রতিটি সংস্থার নিজস্ব নির্দিষ্ট ফোকাস এবং উন্নয়ন-নাট্য ব্যবহার করার পদ্ধতি রয়েছে, কিন্তু সকলেই উদ্ভাবনী এবং কার্যকর উদ্যোগ তৈরি করেছে যা সারা দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছেছে। *ব্র্যাক*, বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ এনজিও, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং মানবাধিকার সহ বিস্তৃত সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় উন্নয়ন নাট্য ব্যবহারে সফল হয়েছে। ব্র্যাকের উন্নয়ন নাট্য উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে কমিউনিটি থিয়েটার গ্রুপ, রেডিও নাটক এবং স্ট্রিট থিয়েটার পারফরমেন্স, যা এই সমস্যাগুলো সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং সম্প্রদায়-ভিত্তিক সমাধান প্রচার করতে সাহায্য করেছে।

'আর্থ-সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষকে সংগঠিত করে তাদের অংশগ্রহণ এবং সমন্বিত উদ্যোগে অধিকতর সমতাপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য কাজ করা'[১০] স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি (SUS)'র লক্ষ্য। স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি (SUS) ১৯৯৯ সাল থেকে নেত্রকোনা জেলার পিছিয়ে পড়া মানুষদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সহায়তায় উন্নয়ন-নাট্য পরিচালনা করে আসছে। তারা তাদের ২০০১-২০০৫ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 'মানবাধিকার ও আইন সেবা' কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন-নাট্যকে সম্পূর্ন নিজস্ব কার্যক্রম হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করে।

নেত্রকোনা জেলার আরেকটি স্থানীয় এনজিও উইমেন্স ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (WDO) সাসের (SUS) মতো উদ্দেশ্য নিয়ে পপুলার থিয়েটারভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। WDO এবং SUS এর মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই, কারণ সাসের কিছু কার্যক্রম WDO তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়ে থাকে। উক্ত কর্মসূচী পরিচালনার জন্য আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রশিক্ষকবৃন্দের কাছে তারা নাট্য-নির্মাণ বিষয়ক বেশকিছু কর্মশালা করে এবং সেই প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে তারা তাদের কর্যক্রম চালিয়ে যায়।

পরিশেষে বলা যায় উন্নয়ন-নাট্য দেশের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এমনভাবে জড়িত যে, জনগন ও সমস্যাসমূহকে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করায়। আদর্শিক অবস্থার বিশ্লেষণ ও বোধশক্তি শানিতকরণের মূল হাতিয়ার উন্নয়ন-নাট্য। উন্নয়ন-নাট্য শেখায় সংলাপের মূল্য এবং একজনের মতের প্রতি অপরজনের সম্মানবোধ। অতএব বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী যেসব এনজিও উন্নয়ন-নাট্যের সাহায্যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা করেছে তাদের এবং পরবর্তীতে যেসব এনজিও চেষ্টা করবে তাদের সবাইকে সত্যনিষ্ঠ বক্তব্য প্রচার করতে হবে। নাটকের এই সত্যনিষ্ঠতাই সমাজের উন্নয়নের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

তথ্যনির্দেশ

১ উদ্ধৃত, আহসান খান, *প্রায়োগিক নাট্যকলা-উন্নয়ন নাট্য প্রক্রিয়া*, (ঢাকা : ভাষা চিত্র, ২০১৭) পৃষ্ঠা ১১।

২ প্রাগুক্ত।

৩ প্রাগুক্ত।

৪ সৈয়দ জামিল আহমেদ, *তৃতীয় বিশ্বের বিকল্প নাট্যধারা উন্নয়ন নাট্য : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, (ঢাকা– সমাবেশ, ২০০১), পৃষ্ঠা ৫০।

৫ ড. মীর মেহবুব আলম, "উন্নয়ন নাট্যের চিত্র-বিচিত্র প্রয়োগ এবং প্রভাব", *আনর্ত*, রহমান রাজু (সম্পাদিত), (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : ২২৩ খ, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ভবন, পঞ্চম বছর, ষষ্ঠ পাঠ, মে-২০২১), পৃষ্ঠা ৭৩।

৬ বাট্রাণ্ড রাসেল, *শিক্ষা প্রসঙ্গে*, শেখ মাসুদ কামাল অনূদিত, (ঢাকা– বাংলা একাডেমী, ২০০৪), পৃষ্ঠা ৭১।

৭ মোহাম্মদ আহসান খান, *বাংলাদেশের উন্নয়ন নাট্য বহুস্তরায়িত ক্ষমতা-সম্পর্ক : বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান*, (ঢাকা– বাংলা একাডেমী, ২০১৩), পৃষ্ঠা ২২।

৮ http://rupantar.org/

৮ মোহাম্মদ আহসান খান, *উন্নয়ন নাট্য প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা-সম্পর্ক বিশ্লেষণ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, (নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ২০০৭), পৃষ্ঠা ৬৭।

১০ মোহাম্মদ আহসান খান, "উন্নয়ন নাট্য : অনুশীলনের ধারা", *পরিশেনা শিল্পকলা*, ইসরাফিল শাহীন (সম্পাদিত), (ঢাকা– বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃষ্ঠা ৩৭৭।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

হাফিজের কাব্যদর্শনে প্রেম ও শরাব
(Love and Wine in Hafiz's Poetry)

ড. মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম*

Abstract: Hafiz Siraji is one of the greatest Sufi mystics and philosophers, poet and literature of the 14th century. He had an extraordinary poetic talent. He has left a unique talent signature in almost all branches of Persian poetry literature. Hafiz was born in Siraji in 1326. His full name is Khwaja Shamsuddin Mohammad Hafiz Siraji. His real name is Muhammad. The last name of Shamsuddin is the last name of Hafiz and it is famous all over the world with this name. He is called Siraji because he was born in Siraji. His mother's name is unknown. But he was from Kajron. Hafiz Bahauddin's father was one of the famous merchants of Isfahan. He lost his father when he was a child and had financial problems. After his father's death, his two brothers left Siraji and went to another place. Hafiz lived with his mother in Siraji. He started earning money by working in a bakery since he was a child. At the same time, Maulana Qawam al-Din Abul al-Baqa'i Siraji studied the Holy Quran with Siraji. And based on this source, he is known as "Hafiz" all over the world. Along with that, he acquired knowledge of philosophy and philosophy from Shams al-Din Abdallah Siraji and Qazi Azd al-Din Abd al-Rahman Yahya. Hafiz was one of the great scholars of interpretation, hadith, philosophy, Persian literature and Arabic literature. During his working life, he was engaged in teaching religion and philosophy. This famous poet died on January 10, 1389. The only work of Hafiz Siraji is Daftar Shaer Divan (a collection of poems). This poetry collection has about 599 poems. In most of his poems, spiritual thoughts and philosophical expansion are revealed.

ভূমিকা

হাফিজ শিরাজি ছিলেন চর্তুদশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ মরমী-অতিন্দ্রীয়বাদী এবং সুফি দার্শনিক কবি। তিনি অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ফারসি কাব্যসাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। হাফিজ ১৩২৬ খ্রিষ্টাব্দে পারস্যের শিরাজ শহরে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পূর্ণ নাম খাজা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ হাফিজ শিরাজি । প্রকৃত নাম মোহাম্মদ। উপাধি শামসুদ্দিন। উপনাম হাফিজ, আর সারা বিশ্বে তিনি এ নামেই প্রসিদ্ধ। ইরানের শিরাজ শহরে জন্ম গ্রহণ করেছেন বলে তাঁকে শিরাজি বলা হয়। তাঁর মাতার নাম জানা যায় না। তবে তিনি 'কাযেরুন' এর অধিবাসী ছিলেন। হাফিজের পিতা বাহাউদ্দিন ছিলেন ইস্পাহানের একজন খ্যাতিমান ব্যবসায়ী। তিনি শৈশবেই পিতাকে হারিয়ে অর্থকষ্টে নিপতিত হন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর দুই ভাই শিরাজ ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। মাকে নিয়ে হাফিজ শিরাজেই জীবনযাপন করতে থাকেন। শৈশবে একটি রুটির দোকানে কাজ নিয়ে জীবিকা নির্বাহের সূচনা। একই সাথে মাওলানা কাওয়ামুদ্দিন আবুল বাকায়ে শিরাজির নিকট প্রাথমিক শিক্ষাসহ পবিত্র কোরআন হিফজ করেন । আর এ সূত্র ধরেই তিনি সমগ্র বিশ্বে 'হাফিজ' নামে পরিচিত। এরই পাশাপাশি তিনি শামসুদ্দিন আব্দুল্লাহ শিরাজি এবং কাজি আযদুদ্দিন আব্দুর রহমান ইয়াহিয়ার নিকট দর্শন ও তাসাউফ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করেন। হাফিজ তাফসির, হাদিস, দর্শন, পারস্য সাহিত্য ও আরবি সাহিত্যের একজন

* সহযোগী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সুপণ্ডিত ছিলেন। কর্মময় জীবনে তিনি ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। স্বনামধন্য এই কবি ১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ১০ ই ডিসেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[১] তিনি শিরাজের 'খাকে মুসাল্লা' নামক স্থানে চির নিদ্রায় শায়িত হন। হাফিজ শিরাজি একমাত্র রচনা হলো 'দিওয়ান' (কাব্য সংকলন) কাব্যগ্রন্থ। এ কাব্য সংকলনের প্রায় ৫৯৯ টি গজল রয়েছে। তাঁর অধিকাংশ কবিতাগুলোতে আধ্যাত্মিক ভাবধারা ও দার্শনিক চিন্তার বহিপ্রকাশ ঘটেছে।

হাফিজের কাব্যদর্শনে প্রেম ও শরাব

ফারসি সাহিত্য হলো প্রেম-ভালোবাসা ও অধ্যাত্মবাদের সাহিত্য। পৃথিবীতে অন্যান্য সাহিত্যের ন্যায় ফারসি সাহিত্যেও অগণিত কবি-সাহিত্যিক তাঁদের কাব্যে অত্যন্ত চমৎকারভাবে প্রেম ও শরাবের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। কবি হাফিজ শিরাজিও তাঁর কাব্যে প্রেম ও শরাবের বিবরণ অতি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। নিম্নে প্রেম ও শরাব সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছি।

প্রেম

প্রেম শব্দের ফারসি প্রতিশব্দ হলো এশক (عشق), মুহাব্বাত (محبت) ও দেলবাস্তেগি (دلبستگی)। আরবি প্রতিশব্দ হলো হুব্ব (حب)। যার আভিধানিক অর্থ হলো: প্রেম, ভালোবাসা, দয়া, স্নেহ, ভক্তি, প্রণয়, প্রীতি ইত্যাদি।[২] পরিভাষায় প্রেম বলতে সাধারণত নর-নারীর হৃদয়ের গভীর এক অন্তর্নিহিত অনুভূতিকে বুঝায়। মন যাকে ভালো বলে বিবেচনা করে স্বভাবতঃ তার প্রতি এক প্রকার আকর্ষণ জন্মে; সেই আকর্ষণকে মহব্বত বলা হয়। আর ঐ আকর্ষণ প্রবল ও শক্তিশালী হলে তাকে এশ্‌ক বা প্রেম নামে অভিহিত করা হয়।[৩] অন্য অর্থে মানবের ঐ ভাব বা অনুভূতির নাম প্রেম যা দ্বারা পরকে আপন করা যায়।[৪] *মাসনবি শরিফের পয়গাম, তাফসির বাণী ও ভাষ্য* গ্রন্থে বলা হয়েছে, অন্তর চোখ দিয়ে প্রেমাস্পদের ভেতরের সৌন্দর্য অবলোকন করাই প্রেম।[৫] আহমাদ আল্লামা ফালসাফির ভাষায়-স্রষ্টার প্রতি প্রকৃত ভালোবাসাই হলো এশ্‌ক বা প্রেম।[৬]

প্রেমের আলোচনা হাফিজের কাব্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। হাফিজ শিরাজী তাঁর কাব্যে দু'ধরনের প্রেমের উল্লেখ করেছেন। তাহলো এশ্‌কে মাজাযি (عشق مجازی) বা রূপক প্রেম এবং এশ্‌কে এলাহি (عشق الهی) বা আল্লাহর প্রেম। প্রেম যখন শুধুমাত্র বাহ্যিক বিষয়াবলি তুলে ধরে, এবং প্রকৃত সত্যের সন্ধান দেয় না তখন তা হয় এশকে মাজাযি বা রূপক প্রেম । হাফিজের গজলে রূপক প্রেমের লক্ষ করা যায়। এ কথা প্রণিধানযোগ্য যে, কবির যে কবিতাগুলো মদ্যপান, প্রেমোন্মদনা আর উচ্ছৃঙ্খলায় ভরপুর সেগুলো সবই সঠিক ও সত্য। তবে এ কবিতাগুলো মূলত কবির যৌবনকালের।[৭] যেমন তিনি একটি কবিতায় লিখেন-

زخط یار بیاموز مهر با رخ خوب
که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن[৮]

'প্রেয়সীর ধনুক বাঁকা ভ্রু থেকে সুদর্শনাদের সাথে দয়ালু আচরণের পদ্ধতি শিখে নাও,
কারণ সুদর্শনাদের মুখে নতুন গজানো চুলের চার ধারে ঘোরা ভালো কাজ।'

دل بدان رود گرامی چه کنم گر ندهم
ما در دهر ندارد پسری بهتر ازین[৯]

'আমি ঐ সুন্দর সুদর্শন যুবকের প্রতি আসক্ত না হয়ে কি করি?

জগত এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বালক আর জন্ম দেয়নি।'

কবি অপর একটি গজলে বলেন-

خط عذار یار که بگرفت ماه ازو

خوش خلقه ایست لیک بدر نیست راه ازو[১০]

'প্রেয়সীর মুখে নতুন গজানো লোমসমূহ যা তার চন্দ্রমুখকে চন্দ্রগ্রহণ কবলিত করেছে,

যা ভালো একটি কড়া (যাকে আঁকড়ে ধরা যায়), আর এছাড়া অন্য কিছু করারও নেই?

উল্লেখ্য যে, প্রেমের বিচিত্র রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রে কবি অত্যন্ত সংযত ভাষা ব্যবহার করেছেন। প্রেমের আস্থাবলি বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর গজলসমূহের কোথাও অসংলগ্ন কথামালার লেশমাত্র নেই।[১১]

আর এশ্‌কে এলাহি হলো, যে প্রেম আল্লাহর সান্নিধ্যে উপনীত হবার দিক নির্দেশনা প্রদান করে তাকে বলা হয় এশকে এলাহি বা আল্লাহর প্রেম। কবি এ প্রেমের আবেশেরই প্রতীকী নাম দিয়েছেন শরাব। আর যিনি কবির হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার করেন সেই মুর্শিদ হলো তাঁর সাকি বা শরাব পরিবেশনকারী। কবি তাঁর দিওয়ানের প্রথম গজলে বলেন-

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها

که عشق آساد نمود اول ولی افتاد مشکلها

به بوی نافه ای کآخر صبا زان طره بگشاید

ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها[১২]

'হে সাকি, শরাব পেয়ালার ঢাল এবং সবাইকে বিলিয়ে দাও

প্রেমের পথটি প্রথমে সহজ মনে হচ্ছিল, কিন্তু এখন দেখছি তা মুশকিলে পরিপূর্ণ।

অবশেষে প্রভাত সমীরণে প্রিয়ার কেশ থেকে কস্তরীর সুগন্ধি ভেসে আসছে

তার কেশের সুগন্ধির আর্কষণ হৃদয়কে রক্তাক্ত করে দিয়েছে।'

প্রেমের পথ বিপজ্জনক এ কথা কবি তাঁর কাব্যে বারংবার আলোচনা করেছেন। হাফিজের ভাষায় প্রেম কোনো সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। প্রেম সলিলে অবগাহন করতে হলে প্রেমিকের জন্য অফুরন্ত ও অসীম সাধনার প্রয়োজন।

হাফিজের ভাষায়-

طریق عشق طریقی عجب خطرناک است

نعوذ بالله اگر ره به مقصدی نبری

به یمن همت حافظ امید هست که باز

اری اسامر لیلای لیلة القدری[১৩]

'প্রেমের পথ সে তো অদ্ভুত বিপজ্জনক পথ

মহান আল্লাহর আশ্রয় চাই যদি গন্তব্যে না পৌছায়।

হাফিজ! স্বীয় চেষ্টা ও হিম্মতের আশা করে যে ফের,

চাঁদনী রাতে লাইলীর সাথে হবে নিশিযাপন।[১৪]

প্রেমের বিপজ্জনক এই পথের যাবতীয় দুঃখ কষ্ট স্বীকার করে নিতে হয়। কারণ এর কোনো প্রতিষেধক নেই। তাই কবি নিজেকে সম্বোধন করে বলেন–

حافظ اندر درد او می سوز و بی درمان بساز

زانکه درمانی ندارد درد بی آرام دوست [১৫]

'হে হাফিজ! দুঃখ ও বেদনায় যদি জ্বলিতে থাক তবে প্রতিকারের কোন খেয়াল কর না

কেননা প্রেমের বেদনার কোনো চিকিৎসা ও আরোগ্যকর প্রতিষেধক নাই।'

প্রেম প্রেমাস্পদ তথা প্রিয়ার সহিত ঐক্য ও একাত্মতাবোধ জাগ্রত করে। প্রেমের মোহনায় প্রেমিক প্রেমাস্পদ তথা আশেক মাশূক মিলে মিশে একাকার একীভূত হয়ে যায়। যা কিছু সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল এর মূলে রয়েছে প্রেম। সর্বত্রই প্রেমের জয়জয়কার । সর্বকালে, সর্বদেশে, কাব্যে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, ইতিহাস-ঐতিহ্যে, শিল্পকলার প্রেমের শাশ্বত মহিমা চিত্রিত, অংকিত, বর্ণিত, জংকৃত এবং রূপায়িত হয়েছে। প্রেম শর্তহীন। দেশ কাল পাত্রের গন্ডী বর্হিভূত। মানুষের সাথে মানুষের, ধর্মের সাথে ধর্মের, বর্ণের সাথে বর্ণের, গোত্রের সাথে গোত্রের, জাতির সাথে জাতির সকল বৈষম্যের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে এই প্রেম। প্রকৃত প্রেম কোনো নির্দিষ্ট বস্তু বা স্থানে আবদ্ধ থাকে না। এই প্রেমের জন্য কোনো শর্ত নেই। মসজিদ, গির্জা, খানকা, পানশালা সকল স্থানই প্রেম ও প্রেমিকদের স্থান। হাফিজ বলেন-

همه کس طالب یا رند چه هشیار و چه مست

همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت[১৬]

'বিচক্ষণ বা মাতাল সকলেই বন্ধু অন্বেষণ করছে

সর্বস্থানই প্রেমের স্থান কী মসজিদ কী গীর্জা ।'

কবি অন্যত্র আরো বলেন–

در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست

هر جا که هست پر تو روی حبیب هست[১৭]

'প্রেমের খানকা বা পানশালার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই

প্রত্যেক স্থানই তোমার আনন্দের উজ্জ্বল্যে সমুদ্ভাসিত।'

প্রেম মানবজীবনের একটি শাশ্বত প্রত্যয়। জীবন কিংবা প্রেম কোনটিই বিচ্ছিন্ন অংশ নয়। মহান আল্লাহ মানবজাতিকে অবয়ব, আকার, আকৃতি ও স্বভাবের দিক থেকে সবচেয়ে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। আরেফ তথা আল্লাহওয়ালাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। তাদের ভাষায় মানুষ হলো আল্লাহর

পরিপূর্ণ প্রকাশস্থল। আল্লাহর পূর্ণাঙ্গরূপ প্রদর্শনকারী দর্পন। তার রূপ ও সৌন্দর্যই সৃষ্টিরূপে প্রকাশ লাভ করেছে।[১৮] জগতের মানবসৃষ্টির সূচনাই হয়েছে প্রেমের মাধ্যমে। এদিক ইঙ্গিত করে কবি বলেন-

طفیل هستی عشقند آدمی و پری
ارادتی بنما تا سعادتی ببری
بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش
که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری
می صبوح و شکر خواب صبحدم تا چند
به عذر نیم شبی کوش و گریه سحری[১৯]

'প্রেমের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে মানুষ ও জিন-পরি
একটা ইচ্ছা কর, যাতে সৌভাগ্য লাভ করতে পারো।
হাফিজ! চেষ্টা কর, প্রেম হতে যেন বঞ্চিত না হও
কারণ অদক্ষতায় দোষ পেলে কেউ গোলাম খরিদ করে না।
প্রভাতী শরাব আর ভোরের মিষ্ট নিদ্রা আর কতকাল
মধ্যরাতে ক্ষমা প্রার্থনা আর শেষ রাতের কান্না দিয়ে চেষ্টা কর।

তাসাউফের পথ-পরিক্রমা বন্ধুর ও দুর্গম। এ পথে পদে পদে রয়েছে নানা কষ্ট ও যাতনা। প্রেমের পরশ ছাড়া এ পথ অতিক্রম করা যায় না। বলা যায় তাসাউফের নির্যাস হলো প্রেম।[২০] তাসাউফ বা আধ্যাত্মিক সাধনায় কবি হাফিজও তাই প্রেমকে বেছে নিয়েছিলেন। মূলত কবি হাফিজ ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক প্রেমের কবি। তাঁর দিওয়ান কাব্যের প্রতিটি গজলের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার পরিস্ফুটন দেখা যায়। হাফিজের মতে, প্রেম-ভালোবাসা এমন এক ঐশী চেতনা যা মানুষকে তার প্রেমের মূলে তথা প্রেমাস্পদের সান্নিধ্য লাভে উদ্বুদ্ধ করে। স্রষ্টার আকর্ষণ তার মধ্যে এমনিভাবে এক বিশাল আকার ধারণ করে যে, সৃষ্টির যে কোন সৌন্দর্যই তাকে স্রষ্টার স্মরণে আকুল করে তোলে। কবি এ প্রেমকে এমন এক মূল্যবান অর্ঘ্য বলে মনে করেন যার প্রাপ্তি কেবল তাঁর প্রেমাস্পদের একান্ত অনুগ্রহে সম্ভব। হাফিজ মনে করেন, তাঁর মাঝে যে ঐশী প্রেম বিদ্যমান রয়েছে তা কেবল স্রষ্টার বিশেষ অনুগ্রহ ও দান। এদিকে ইঙ্গিত করে হাফিজ বলেন-

تعالی الله چه دولت دارم امشب
که آمد ناگهان دلدارم امشب
چو دیدم روی خوبش سجده کردم
بحمد الله نکو کر دارم امشب
نهال عیشم از وصلش بر آورد
زبخت خویش بر خور دارم امشب
کشد نقش انا الحق بر زمین خون
چو منصور را کشی بردارم امشب
برات لیلة القدری بدستم
رسید از طالع بیدام امشب

بر آن عزمم كه گر خود ميرود سر
كه سر پوش از طبق بردارم امشب
تو صاحب نعمتى من مستحقم
زكواة حسن ده حق دارم امشب
همى ترسم كه حافظ محور گردد
ازين شورى كه در سردارم امشب[২১]

'মহান আল্লাহ আজ রজনীতে কি সম্পদ পেলাম
আজ রজনীতে হঠাৎ প্রাণবন্ধু আগমন করল।
যখন তার সুন্দর মুখ দেখলাম তখন সেজদা করলাম
আল্লাহর হাজার শোকর আজ রজনীতে ভালোই করেছি।
তার মিলনের আনন্দে আমার জীবনতরুতে ফুল ফুটেছে
সৌভাগ্য বশত আজ রজনীতে সফলকাম হয়েছি।
রক্তবিন্দু জমিনের উপর 'আনাল হক' এঁকেছে
যদি আজ রজনীতে মনসুরের মত আমাকে শূলে চড়াও।
আজকে লাইলাতুল কদরের পুণ্য আমার হস্তগত
আজকে ভাগ্য আমার করতলগত ।
এই সংকল্প করেছি যদি আমার মস্তক দ্বিখণ্ডিতও হয়
গুপ্তরহস্যের ঢাকনা আমি উন্মোচন করব।
তুমি নেয়ামতের অধিকারী আর আমি উপযুক্ত (ভিখারী)
সৌন্দর্যের যাকাত দাও, আজ রাতে খুশি থাকব।
আমি ভয় পাচ্ছি যে, হাফিজ কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে,
আজ রাতে এই উদ্বেগ বা আবেক আমার মাথায়।'

যে সকল কবিতায় পাকপবিত্রতা, তাকওয়া পরহেজগারি, ফানাফিল্লাহ, সাধনায় পরিভ্রমণ. মোরাকাবা, মোহাসাবা, শেষ রাত্রের ক্রন্দন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও ইঙ্গিত রয়েছে সেগুলো সঠিক ও সত্য। এ কবিতাগুলো কবির শেষ জীবনের। এই কবিতাগুলো আধ্যাত্মিক ভাবধারায় পরিপূর্ণ।

হাফিজ তাঁর গজল ও রোবাঈগুলোতে বিশুদ্ধ প্রেমের মাহাত্ম্য ও খোদা প্রাপ্তির তথা খোদার নৈকট্য লাভের উপায় বর্ণনা করেছেন। হাফিজের কাব্যে ধর্মের ভান বা প্রতারণার অবকাশ নেই। তাঁর মতে, খোদার প্রেমে অবগাহন করে যে নিজেকে বিলীন করে দিতে পারে সেই প্রকৃত খোদাপ্রেমিক। তবে ধর্মের নামে লোকদেখানো, ভণ্ডামি, মিথ্যা, লোভ, প্রতারণা, চাটুকারিতাকে তিনি চরমভাবে ঘৃণা করেছেন।[২২] এ সর্ম্পকে কবি নিজেকে সম্বোধন করে বলেন-

آتش زهد و ريا خر من دين خواهد سوخت
حافظ اين خرقه پشمينه بينداز و برو[২৩]

'কপটতা ও প্রতারণার আগুন ধর্মের ভাণ্ডারকে অবশ্যই জ্বালিয়ে ফেলবে
হে হাফিজ! এ দরবেশি পোশাক পরিত্যাগ করে সামনে অগ্রসর হও।'

কবি অন্যত্র আরো বলেন-

گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود

تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود[২৪]

'শহরের ওয়াজি মাওলানার কাছে যদিও কথাটি সহজ নয়

যার লোক দেখানো ভণ্ডামি আছে, সে মুসলমান নয়।'

কবি হাফিজ ছিলেন আল্লাহর আশেক, আর তাঁর মাশুক হলেন মহান আল্লাহ। তাই তিনি মাশুক তথা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য সর্বদা ব্যাকুল ছিলেন। তবে আল্লাহকে পেতে হলে পার্থিব জগতের সবকিছুকে ছেড়ে দিতে হবে। এ সম্পর্কে কবি নিজেকে সম্বোধন করে বলেন-

حضوری گر همی خواهی، ازو غایب مشو حافظ

متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها[২৫]

'হে হাফিজ! প্রিয়ার (আল্লাহর) সান্নিধ্য পেতে হলে তাঁর থেকে মুহূর্তও দূরে থেক না

কাঙ্ক্ষিত প্রিয়ার সান্নিধ্য পেতে হলে পৃথিবী ও তার সবকিছু পরিহার কর।'

কবি হাফিজ একজন আধ্যাত্মিক প্রেমের কবি। তিনি মূলত খোদাপ্রেমে আপ্লুত হয়ে তাঁর কবিতায় এশ্ক (খোদাপ্রেম), শরাব (মদ), খাল (তিলক), গিসু (বেণী বা চুল), মেইখানে (সরই বা পানশালা), সাকি (পরিবেশনকারী), ইয়ার (বন্ধু) ইত্যাদি প্রতীকধর্মী শব্দ ব্যবহার করেছেণ। ফারসি কাব্যসাহিত্য এসব শব্দের সাধারণ অর্থ ছাড়াও অপর একটি আধ্যাত্মিক অর্থ বা ব্যাখা রয়েছে। যেমন এশ্ক অর্থ খোদাপ্রেম, শরাব অর্থ আল্লাহকে পাবার মাদকতা, প্রেম ইত্যাদি। কাজেই হাফিজের কাব্যকর্মে যেসকল প্রতীকধর্মী শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে সেসব মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছার বিভিন্ন পথ, যা খোদাপ্রেমকে কেন্দ্র করেই প্রকাশিত।

শরাব

শরাব (شراب) এবং মেই (می) শব্দদ্বয় হাফিজের কাব্যে বহুল ব্যবহৃত দুটি পারিভাষিক শব্দ। এই শব্দ দুটি আভিধানিক অর্থ হলো মদ, সুরা, আঙ্গুরের রস, এক জাতীয় পানোপযোগী পানীয়। পরিভাষায় ঐ জাতীয় পানীয়কে শরাব বলা হয় যা ইসলামি আইন শাস্ত্রবিদগণের মতামতের ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে সুফি-সাধকদের পরিভাষায় একে বলা হয় প্রেম। শরাব আধ্যাত্মিকতা সাধকদের নিকট প্রেম, ভালোবাসা, উন্মাদনা, মত্ততা এবং নেশাগ্রস্থতা , প্রকৃত প্রেমিকদের অর্জিত ফলাফল, নীরব ভাবাবিষ্ট আধ্যাত্মিকতা-সাধকদের আলোয় জ্যোতি যা তার অন্তরকে প্রত্যক্ষভাবে দগ্ধ করে এবং আত্মাকে আলোচিত তথা প্রেমোজ্জ্বল করে।[২৬]

মূলত শরাবের আধ্যাত্মিক অর্থ হলো আল্লাহর পথে বিলীন হবার মাদকতা, যার মাধ্যমে একজন সালিক বেহুশ হয়ে পার্থিব সকল চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেকে মুক্ত করে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যান। কবি হাফিজের মতে, শরাব ব্যতীত মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা সম্ভব নয়। যেমন কবি বলেন-

شراب بی غش و ساقی خوش دو دام رهند

که زیر کان جهان از کمندشان نرهند[২৭]

‘খাঁটি শরাব এবং সাকি উভয় আনন্দময়
কেউ এদুটির বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারে না ।’

হাফিজ তাঁর কাব্যে মেই (می) কে রূপক উপমা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। গবেষকগণের দৃষ্টিতে কবি তাঁর কাব্যে ব্যবহৃত মেই (می) দ্বারা কখনোও আঙ্গুরি (انگوری) বা আঙ্গুরের তৈরি আবার কখনো এরফানি বা আধ্যাত্মিক শরাবের কথা বুঝিয়েছেন। তবে সেই আঙ্গুরি বলতে যামিনি (زميني) বা ইনসানি (انسانی) অর্থাৎ বৈষয়িক শরাব পানের মাধ্যমে ভোগ-বিলাসের কথা বুঝানো হয়েছে। যার প্রয়োগ নিমোক্ত কবিতার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে-

روزه یکسو شد و عید آمد و دلها برخاست
می ز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست
وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست
نوبه زهد فروشان گران جان بگذشت
چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم
باده از خون رزانست نه از خون شماست[২৮]

‘রোজা শেষ হয়েছে, ঈদ এসেছে, হৃদয় আনন্দে আন্দোলিত হয়েছে
শরাব খানায় মদিরার উদ্দীপনা এসেছে, অবশ্যই শরাব চাওয়া দরকার।
পরহেযগার ব্যবসায়ীদের পালা শেষ হয়েছে
মাতালদের মাতলামি ও চালবাজি করার সময় এসেছে।
যদি তুমি ও আমি কয়েক পেয়ালা শরাব পান করি, তবে কি আসে যায়?
শরাব আঙ্গুরের রস হতে তৈরি, তোমার রক্ত হতে নয়।’

মেইয়ে এরফানি (می عرفانی) বলতে আধ্যাত্মিক শরাব পানের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত মাশুকের সান্নিধ্য প্রাপ্তির কথা বুঝানো হয়েছে। প্রেমিকের জন্য তার প্রকৃত মাশুকের দীদার লাভের চাইতে অতীব মূল্যায়ন আর কিছুই হতে পারে না। এমন কি তার সান্নিধ্য পেতে সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। আর সত্যিকার অর্থে একসময় প্রকৃত মাশুক তথা প্রেমিকের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হবে। এ প্রসঙ্গে হাফিজ বলেন-

می دهد صبح و گله بسته صحاب
الصبوح الصبوح یا اصحاب
میچکد ژاله بر رخ لاله
المدام المدام یا احباب
می وزد در چمن نسیم بهشت
خوش بنوشید دائما می ناب
در میخانه بسته اند مگر
افتتح یا مفتح الأبواب
در چنین موسمی عجب باشد
که به بندند میکده بشتاب
زاهدا بنوش رندانه

فاتقوا الله یا اولی الالباب
گر نشان ز آب زندگی جوئی
می نوشین بجو ببانگ رباب
حافظا غم مخور که شاهد بخت
عاقبت بر کشد از چهره نقاب[২৯]

‘প্রভাত কিরণ ফুটে উঠেছে, আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে
হে বন্ধু শরাব নিয়ে এসো।
টিউলিপের মুখাবয়বে শিশির বিন্দু ঝরছে
হে বন্ধূ শরাব নিয়ে এসো শরাব নিয়ে এসো।
পুষ্পোদ্যান হতে নন্দন কাননের সমীরণ বইছে
খুশিতে সর্বদা উজ্জল শরাব পান কর।
শরাব খানার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে
হে দরজা খোলনেওয়ালা দরজা খোল।
বড় আশ্চর্যের ব্যাপার যে এমনই সুন্দর মৌসুমে
শরাব খানার দরজা এত দ্রুত বন্ধ করে দিয়েছ।
হে নেককার পরহেজগার ব্যাক্তি মাতালের মত শরাব পান কর!
হে জ্ঞাণী! মহান আল্লাহকে ভয় কর।
যদি তুমি জীবন উৎসাহের সন্ধান কর
তবে উৎকৃষ্ট নির্ভেজাল মদ খাও আর বীণার ঝংকার শোনো।
হে হাফিজ! দুঃখ করো না, ভাগ্যের বন্ধু
শেষ পর্যন্ত মুখ হতে নেকাব খুলবে।’

শরাবের বর্ণনা হাফিজের কাব্যে অসংখ্যবার এসেছে। কারণ তিনি শরাবকে দুঃখ-বেদনা লাঘবের উপশম মনে করেছেন। হাফিজের মতে, শরাবই একমাত্র বস্তু যার মাধ্যমে জীবনের যত রকমের তিক্ততা ও বিস্বাদ আছে তা বিদূরিত করা যেতে পারে। তাই শরাব পান করার মাঝে দোষের কিছু নেই। আবার কপটতাও নেই। হাফিজ বলেন-

ساقیا برخیز و در ده جام را
خاک بر سر کن غم ایام را[৩০]

‘হে সাকি! ওঠ, আমাকে শরাবের পেয়ালা দাও
আর দুঃখের দিনের শিরে, ধূলি নিক্ষেপ কর।’

কবি আরো বলেছেন-

چه ملامت بود آن را که چنین باده خورد

این چه عیب است بدین بیخردی وین چه خطاست

باده نوشی که درو روی و ریائی نبود

بهتر از زهد فروشی که درو روی و ریاست[৩১]

'যারা শরাব পানে অভ্যস্ত তাদের ভর্ৎসনা করার কি আছে,

মাতাল প্রেমিকের নিকট এটি দোষ বা ত্রুটি নয়।

শরাব পানে কোনো কপটতা ও অহংকার নেই

এতো কপট ধর্ম ব্যবসায়ী ও অহংকারীদের চেয়ে ভালো।

কবি আরো বলেছেন-

می ده که هر که آخر کار جهان بدید

از غم سبک بر آمد و رطل گران گرفت

فرصت نگر که فتنه چو در عالم او فتاد

عارف بجام میزد و از غم گران گرفت[৩২]

'শরাব দাও, কেননা যে ব্যক্তি দুনিয়ার কাজের সমাধান দেখছে

সে শরাবের পেয়ালা গ্রহণ করেছে এবং দুঃখ হালকা অনুভব করেছে।

সুযোগ লক্ষ কর, কেননা দুনিয়াতে বিপদ যে ঘুরছে

সাধক পেয়ালার শরাব পূর্ণ করে, আর দুঃখ হতে কিনারা প্রাপ্ত হয়েছে।'

হাফিজের কাব্যে শরাব ও উন্মত্ততার যে বহিঃপ্রকাশ তার অন্তর্নিহিত ও গুঢ়রহস্য অত্যন্ত ব্যাপক। হাফিজের এই উন্মত্ততা এই জন্য নয় যে, তিনি কিছুক্ষণের জন্য শরাব পান করে নিজেকে সতেজ, সজীব ও প্রাণবন্ত করে তার প্রেমাস্পদের বা আরাধ্যের সমীপে উপস্থিত হবেন। তাছাড়া তিনি চাচ্ছেন প্রেমের এই শরাব পান করে তাঁর মধ্যে এমন একটি যোগ্যতা সৃষ্টি করবেন যাতে তিনি একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেকে প্রেমাস্পদের সম্মুখে হাজির করতে পারেন। হাফিজ তাঁর কাব্যে ঐ শরাবের কথা কখনো বলেননি, যে শরাব পান করলে মানুষ তার ধর্মীয় জ্ঞান ও অনুভূতি হারিয়ে ফেলে। তাই তো কবি বলেন-

ترسم آن قوم که بر درد کشان میخندند

در سرکار خرابات کنند ایمان را[৩৩]

'আমি ঐ সম্প্রদায়কে ভয় করি যারা ব্যথিতের ব্যাথায় হাস্য করে

সুরার সেবার খেয়ালে ঈমানকে হারিও না।

হাফিজ মূলত শরাব দ্বারা আধ্যাত্মিক শরাব বা আল্লাহ প্রেমকে বুঝিয়েছেন এবং আল্লাহর পথে বিলীন হবার মাদকতাকে বুঝিয়েছেন। কেননা একজন সাধক বেহুশ হয়ে পার্থিব সকল চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেকে সরিয়ে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যান। তাঁর মতে শরাব পান ব্যতীত আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব নয়। তাই শরাব পানকে কখনো কখনো নিজের ধর্ম হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। হাফিজ লিখেছেন-

من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می

زاهدان معذور داریم که اینم مذهب است[৩৪]

'আমার বন্ধুর লাল ঠোঁট এবং শরাব ত্যাগ করব না,

হে নেককার পরহেজগার ব্যক্তি আমি অক্ষম, এটি আমার ধর্ম।'

তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হাফিজ বাহ্যিক শরাবের মাধ্যমে খোদাপ্রেমকে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। হাফিজের প্রেম (Love) ও শরাব (Wine) শব্দদ্বয়ের ব্যবহার সম্পর্কে Tanwir Ahmed বলেছেন: The theme of Hafiz's poetry apparently is that of Love, wine and beloved, but the language being equivocal can be interpreted in two quite different, and opposite ways. The Love affairs dealt in his ghazals are sometimes profane (مجازی) and sometimes sacred (حقیقی).[৩৫]

পরিশেষে বলা যায়, ফারসি কাব্যসাহিত্যে হাফিজ শিরাজি এক অনন্য প্রতিভা। তিনি ছিলেন ইরানের একজন বিখ্যাত আধ্যাত্মিক প্রেমের কবি। তিনি তাঁর কাব্যে একদিকে যেমন বিশুদ্ধ প্রেমের মহাত্ম ও খোদাপ্রাপ্তি তথা খোদার সান্নিধ্য লাভের উপায় বর্ণনা করেছেন, অপর দিকে শরাব দ্বারা আধ্যাত্মিক শরাব বা মহান আল্লাহর পথে বিলিন হবার মাদকতাকে বুঝিয়েছেন। তিনি তাঁর কাব্য প্রতিভা ও দর্শনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপি সাহিত্য প্রেমীদের নিকট অমর হয়ে রয়েছেন।

তথ্যনির্দেশ

১. ইরায শাহবাযি, *সুখানে অশনা* (তেহরান: এনতেশারাতে রুযানে ১৩৯৬ হি. শা.), পৃ. ১৪; ড. সাইয়্যেদ জিয়াউদ্দিন সাজ্জাদি, মোকাদ্দামে বার মাবানিয়ে এরফান ও তাসাউফ (তেহরান : সাযেমানে মুতালিয়া ওয়া তাদভিনে কুতুবে উলুমে ইনসানি দানেশগাহা, পঞ্চম প্রকাশ, ১৩৭৫ হি. শা.); পৃ. ১৯৩; মির্জা মকবুল বেগ বাদাখশানি, আদাবনামেয়ে ইরান (লাহোর : ইউনিভার্সিটি বুক এজেন্সি, তা. বি.), পৃ. ৫৫৫-৫৫৭; Edward G Browre, A Literary History of Persia, Vol-III (London : Cambridge University Press, 1951), p. 283।

২. মুহাম্মাদ রেযা বাতেনি (সম্পা.) *ফারহাঙ্গে মোয়াসেরে কুচেক ইনগিলিসি-ফারসি* (তেহরান: ফারহাঙ্গে মোয়াসের প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮১ হি. শা.), পৃ. ৩৮৩; জামিল চৌধুরি (সম্পা.) বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৮৮৬।

৩. হুজ্জাতুল ইসলাম হজরত ইমাম গাযযালী (রহ.), মাওলানা নূরুর রহমান (অনু.), *কিমিয়ায়ে সা'আদাত* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, দশম মুদ্রণ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৩৪০।

৪. সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী, *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩ খ্রি.), পৃ. ৭।

৫. আলহাজ ছৈয়দ আহমাদুল হক, *মসনবী শরীফের পায়গাম ও তাফসীর বাণী ও ভাষ্য* (চট্টগ্রাম: আল্লামা রুমী সোসাইটি, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৭৫।

৬. আহমাদ আল্লামা ফালসাফি, *ফারহাঙ্গে যাবানে ফারসি* (তেহরান: এনতেশারাতে পায়ামে অযাদি, প্রথম প্রকাশ,১৩৮১ হি. শা.), পৃ. ৪৩৭।

৭. উস্তাদ মুর্তাজা মোতাহহারি, *এরফানে হাফিজ*, (তেহরান: এনতেশারাতে সদরা; ১৩৭৩ হি. শা.), পৃ. ৫৯-৬০।

৮. আল্লামা কাযভিনি ও ড. কাসেম গানি (সম্পাদিত), *দিওয়ানে হাফিজ*, (তেহরান: এনতেশারাতে আসাতির, পঞ্চম প্রকাশ; ১৩৭৪ হি. শা.), পৃ. ৩০৮।

৯. তদেব, পৃ. ৩১৫।
১০. তদেব, পৃ. ৩২০।
১১. শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহহারি, মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস বাদশা (অনূ.) *হাফিজের আধ্যাত্মিক দর্শন* (ঢাকা: কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, প্রথম প্রকাশ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৮৭।
১২. কাযভিনি ও গানি (সম্পা.), *দিওয়ানে হাফিজ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭।
১৩. তদেব, পৃ. ৩৪৩।
১৪. *হাফিজের আধ্যাত্মিক দর্শন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩।
১৫. কাযভিনি ও গানি (সম্পা.), *দিওয়ানে হাফিজ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬।
১৬. তদেব, পৃ. ১৩৬।
১৭. তদেব, পৃ. ১২৬।
১৮. *এরফানে হাফিজ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯।
১৯. কাযভিনি ও গানি (সম্পা.), *দিওয়ানে হাফিজ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৩।
২০. সৈয়দ শামসুল হক, 'রবীন্দ্রনাথ ও সুফি কবি অভিন্ন চিত্রপটে বীক্ষণ', কালের খেয়া (দৈনিক সমকাল সাময়িকী ঢাকা: ০৩ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রি.), পৃ. ৪।
২১. মাওলানা শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ হাফিজ শিরাজি, সাজ্জাদ হুসাইন কৃত উর্দু অনুবাদ, ড. মুহাম্মাদ আকরাম একরাম কর্তৃক (সম্পা.), *দিওয়ানে হাফিজ* (ইসলামাবাদ : মারকাযে তাহকিকাতে ফারসি ইরান ওয়া পাকিস্তান, ১৯৮০ খ্রি.) পৃ. ৪১-৪৩।
২২. ড. তারিক সিরাজী, *'আধ্যাত্মিক কবি হাফিজ ও তাঁর কবিতা' নিউজ লেটার*, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯ (ঢাকা : কালচারাল কাউন্সেলরের দপ্তর, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ২০১৯ খ্রি.) পৃ. ২২।
২৩. কাযভিনি ও গানি (সম্পা.), *দিওয়ানে হাফিজ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৬।
২৪. তদেব, পৃ. ২১৬।
২৫. তদেব, পৃ. ৯৭।
২৬. সম্পাদনা পরিষদ, *ফার্সী-বাংলা-ইংরেজী অভিধান* (ঢাকা : ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮ খ্রি.) পৃ. ৫২০; ফারহাঙ্গে যাবানে ফারসি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮১।
২৭. কাযভিনি ও গানি (সম্পা.), *দিওয়ানে হাফিজ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০২।
২৮. তদেব, পৃ. ১০৬-১০৭।
২৯. ড. মুহাম্মাদ আকরাম একরাম (সম্পা.), দিওয়ানে হাফিজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫।
৩০. কাযভিনি ও গানি (সম্পা.), *দিওয়ানে হাফিজ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০।
৩১. তদেব, পৃ. ১০৬।
৩২. ড. মুহাম্মাদ আকরাম একরাম (সম্পা.), দিওয়ানে হাফিজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬।
৩৩. কাযভিনি ও গানি (সম্পা.), *দিওয়ানে হাফিজ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১।
৩৪. তদেব, পৃ. ১১১।
৩৫. *Tanwir Ahmad, A Short History of Persian Literature (Calcutta: Naaz Publishing Center, 2nd edition, 1991), P. 212.*

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা ও তাঁর ফারসি গ্রন্থ 'নামে হক' : একটি পর্যালোচনা
(Sheikh Sharfuddin Abu Tawwamah and his persian book 'Nam-a Haq' : An analytical survey)

মো. রাব্বি সরকার*

Abstract: Sharafuddin Abu Tawwamah was an Islamic versatile scholar, teacher, author and Muhaddith based in the subcontinent. He was born in Bukhara and educated in Khurasan. Thereafter at the instance of Sultan Ghiyasuddin Balban he came to Sonargoan with his family along with his brother, Maulana Hafiz Zainuddin probably in 1270 AD (668 AH). The reason for moving was the Sultan of Delhi feared that the scholar's influence was becoming a threat to his dominion and so tactfully induced him to journey to Sonargaon. Abu Tawwama settled down at Sonargoan, and built there his madrasa and continued his courses of teaching for about ten years. He taught religious subject's like tafsir, hadith, fiqh, and other branches of Islamic learning. The teaching of *Saheeh Bukhari* and *Muslim* were started in Bangladesh for the first time in this subcontinent. For long 22 years he had given teaching on *Saheehayn* (*Bukhari* and *Muslim*) at Sonargaon. This made Sonargoan an animated centre of learning renowned not only in Bengal, but also in the whole of the Indian subcontinent. Tawwamah died in 1300 and was buried in a small tomb located in Mograpara, Sonargaon. It is fame that Abu Tawwama had written a book on spirituality called *Maqamat* and a Persian poetry book on Islamic jurisprudence titled *Nam-a-Haq*. The book of *Maqamat* was an old Bengali literature but it has not come down to posterity. Another Persian book *Nam-a-Haq* was printed from Kanpur in 1885 AD. At present it is preserved in the library of the Asiatic Society, Calcutta. Now in this article I will try to discuss Abu Tawwamah's biography and the basic topic of his Persian poetry book *Nam-a-Haq*.

ভূমিকা

উপমহাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশ এশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত। ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সুবিশাল এ ভূমিতে অজস্র ভাষা, গোত্র ও ধর্ম রয়েছে। প্রাকৃতিকভাবে সাগর, পর্বত, বনভূমি, সমভূমি, মরুভূমি প্রভৃতি ভৌগলিক পরিমণ্ডলে গড়ে উঠেছিল এ অঞ্চল। অনন্য বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশ আর অফুরন্ত সম্পদে ভরপুর এ অঞ্চল আকৃষ্ট করেছিল বহু জ্ঞানী-গুণী, বিদ্বান, পর্যটক ও বিভিন্ন জাতি সত্তার মানুষকে। কেউ এখানে এসে জ্ঞান আহরণ করেছেন, আবার কেউ করেছেন জ্ঞান বিতরণ। আবার বিজয়ের নেশায় উত্তাল সমুদ্র ও ঋজু গিরিপথ পাড়ি দিয়ে এতদঞ্চলে এসেছিল আরবীয়, মিশরীয়, আফগানি, তুর্কি, ইরানি ও ইংরেজ। এ সকল বিদেশি আক্রমণকারীদের আধিপত্য বিস্তারের কারণে অনেক সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটেছিল। ফলশ্রুতিতে উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং ভাষা ও সাহিত্যিক অঙ্গনে রয়েছে বিদেশি জাতি গোষ্ঠীর শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মতবাদের ব্যাপক প্রভাব। দীর্ঘদিন আফগান ও ইরানি শাসকগণ এতদঞ্চল শাসন করার দরুন ফারসি ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি এ উপমহাদেশে বিকশিত হয়। কবি সাহিত্যিকগণ ফারসি ভাষায় গদ্য ও পদ্য চর্চা করেন, ঐতিহাসিকগণ ইতিহাস চর্চা করেন এবং আলেম-ওলামাগণ ইসলামি সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে মানুষের কাছে ইসলামের বিধি-বিধান তুলে ধরেন। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজি বঙ্গ বিজয় করলে বাংলাসহ সমগ্র উপমহাদেশে ফারসি ভাষায়

* এম. ফিল গবেষক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

কুরআন অনুবাদ ও তাফসির প্রণয়ন, হাদিস ও ফিকহ বিশ্লেষণ এবং ইসলামি ভাবধারায় কাব্য রচনার দুয়ার উন্মুক্ত হয়। যে সমস্ত আলেম উপমহাদেশে ফারসি চর্চা করে এ ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে ঢাকার সোনারগাঁয়ের বিখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা অন্যতম। আলোচ্য প্রবন্ধে শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ফারসি ভাষায় তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *'নামে হক'* সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার সংক্ষিপ্ত জীবনী

বর্তমান উজবেকিস্তানের ঐতিহাসিক নগরী বোখারায় শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ ও পারিবারিক পরিচয় সম্পর্কে বিস্তরিত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কোনো ঐতিহাসিক ও গবেষক এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছুই লেখেননি। সকলেই তাঁর কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা করেছেন। তদ্রুপ তাঁর শিক্ষা জীবন সম্বন্ধেও কোনো ঐতিহাসিক গ্রন্থে তথ্য মওজুদ নেই। তবে এতটুকু নিশ্চিত যে, তিনি তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ দুর্গম মরু পাহাড়ী শহর খোরাসান থেকে জ্ঞানপিপাসা নিবারণ করেছেন। তিনি রসায়ন ও প্রকৃতি বিজ্ঞানসহ ইসলামি শরিয়তের সকল শাখায় সমান পারদর্শী ছিলেন। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর ইলমের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি তিন স্তরের ব্যবধানে হাদিস শাস্ত্রের কালজয়ী প্রাণপুরুষ ইমাম বুখারির প্রশিষ্য। অনেকের মতে, তিনি আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁর পূর্বপুরুষগণ বোখারায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। বোখারায় তখন ইমাম বুখারির প্রশিষ্যগণ সহিহ বুখারির দারস দিতেন। আবু তাওয়ামা সে সকল দারসের মজলিসে অংশগ্রহণের মাধ্যমে হাদিস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অতঃপর তিনি সহিহ বুখারির প্রামাণ্য নুস্খাসহ দিল্লিতে আগমন করেন।[১] ১২৬০ অথবা ১২৭০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সপরিবারে দিল্লিতে উপস্থিত হন। তাঁর পরিবারের সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে শায়খের এক মেয়ের সাথে তাঁর বিখ্যাত ছাত্র মাখদুম শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মানেরীর বিবাহ হয়। তাদের একমাত্র সন্তান মাখদুম যকিউদ্দীন সোনারগাঁয়ে জন্মগ্রহণ করে।[২] এছাড়াও শায়খের ছোট ভাই প্রখ্যাত ক্বারী যয়নুদ্দীন তাঁর সাথে দিল্লিতে আসেন।[৩] যয়নুদ্দীনকে কেউ কেউ মুঈনুদ্দীন নামেও অভিহিত করেছেন।[৪] অতঃপর তিনি দিল্লিতে একটি মসজিদ ভিত্তিক মাদ্রাসায় দারস অব্যাহত রাখেন। ক্রমেই ভারত বর্ষের চতুর্দিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। দেশ-বিদেশের ছাত্ররা তাদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণের জন্য তাঁর মাদ্রাসা প্রাঙ্গনকে মুখরিত করে। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও স্বনামধন্য লেখক ড. মুহাম্মাদ মোহর আলী লিখেছেন, 'It is stated that while at Delhi his wisdom, holiness and learning spread in the western region of India, nay in Arabia, Iran and other countries'.[৫] অর্থাৎ 'উল্লেখ্য যে, দিল্লিতে থাকাকালীন তাঁর পাণ্ডিত্য, ধর্মভীরুতা এবং শিক্ষা ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে, আরব, ইরান ও অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল'। এতে তাঁর ভক্ত ও ছাত্র সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে সময় দিল্লি শাসন করতেন সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন (১২৬৬-৮৬ খ্রি.)। তিনি আবু তাওয়ামাকে যথেষ্ট সম্মান করতেন ও গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু তাঁর আমির-উমারাগণ শায়খের খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা সুলতানকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, আবু তাওয়ামার জনপ্রিয়তা এক সময় সুলতানের সিংহাসন হারানোর কারণ হতে পারে।[৬] তারা ক্রমাগত সুলতানের কানভারি করতে থাকলে বলবন ক্ষমতার মোহে পড়ে আবু তাওয়ামাকে দিল্লি ত্যাগের নির্দেশ দেন। সুলতানের নির্দেশ পেয়ে কাল বিলম্ব না করে তিনি ঢাকার সোনারগাঁয়ে চলে আসেন। পথিমধ্যে বিহারের মানেরে যাত্রা বিরতিকালে শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মানেরী আবু তাওয়ামার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর সাথেই সোনারগাঁয়ে এসে জ্ঞান সাধনায় অবগাহন করেন। আবু তাওয়ামার সোনারগাঁয়ে আসার সময় ও তারিখ ইতিহাসের একটি অমিমাংসিত বিষয়। এ তারিখ নিয়ে জীবনীকার ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে। সর্বশেষ যুক্তিসঙ্গত মতানুসারে, আবু তাওয়ামা

১২৮২-৮৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সোনারগাঁয়ে এসেছিলেন।[৭] তৎকালীন বাংলার রাজধানীতে এসেই তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন বাংলাকে ইলমের ইলাহি আলোক ধারায় আলোকিত করে তুলতে সক্ষম হন। তিনি মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করে অহির দ্যুতি বিতরণে আত্মনিয়োগ করেন। ঐতিহাসিক ড. এম. এ. রহিম বলেছেন, 'Sonargoan was a lively seat of learning from the later years of the thirteenth century. It began under the propitious patronage of the renowned scholar Maulana Sharf-al-Din Abu Tawwama. Maulana Abu Tawwama founded this seminary of advanced learning and devoted his life to teaching at his place, His renown as a scholar attracted students from far and near'.[৮] অর্থাৎ 'ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরবর্তী বছর থেকে সোনারগাঁ একটি প্রাণবন্ত বিদ্যাপীঠ ছিল। এটি প্রখ্যাত পণ্ডিত মাওলানা শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার পৃষ্ঠপোষকতার শুভক্ষণে শুরু হয়েছিল। উন্নত শিক্ষার নিমিত্তে মাওলানা আবু তাওয়ামা এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে শিক্ষকতায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। একজন বিদ্বান হিসাবে তাঁর খ্যাতি দূর-দূরান্তের শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করেছিল'। শায়খ দীর্ঘ ৩২ বছর সোনারগাঁয়ে অবস্থান করে গভীর অধিনিবেশ সহকারে হাদিস শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন।[৯] তাঁর হাত ধরেই বাংলায় সর্ব প্রথম সহিহ বুখারি ও মুসলিমের দারস শুরু হয়।[১০] বর্তমান সোনারগাঁয়ে অবস্থিত আবু তাওয়ামা প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার বিলুপ্ত প্রায় ধ্বংসাবশেষ সে স্মৃতিচিহ্নই বহন করছে। আজও লতা-পাতায় ঘেরা জীর্ণ-শীর্ণ দেওয়ালের ফাটলে কান পাতলে যেন সুললিত কণ্ঠে ভেসে আসে হাদিস পাঠের সুমধুর ধ্বনি 'ক্বলা রাসূলুল্লাহি (সা.)'!

এই প্রতিষ্ঠানটির মহতী কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন সমকালীন বিশ্বখ্যাত মুফাস্‌সির আল্লামা তকিউদ্দীন, শায়খ শরফুদ্দীনের ছোট ভাই হযরত যয়নুদ্দীন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী পাণ্ডুয়ার শায়খ আলাউল হক। শায়খ শরফুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ইব্রাহিম দানেশমান্দ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[১১] শায়খ আবু তাওয়ামার অসংখ্য ছাত্রের মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম জানা যায়। তন্মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মানেরী (৬৬১-৭৮২ হি.) এছাড়া আরো রয়েছেন হযরত বদরুদ্দীন যাহেদ (মৃ. ১৪৪০ খ্রি.), হযরত যইন ইরাকি এবং হযরত ইব্রাহিম দানেশমান্দ প্রমুখ।[১২] শায়খ শুধুমাত্র ইলমে হাদিস চর্চাতেই ব্যস্ত থাকতেন না বরং রাজনীতিতেও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সোনারগাঁয়ের শাসকের উপদেষ্টা ছিলেন। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিষয়ে সোনারগাঁয়ের শাসক আবু তাওয়ামার পরামর্শ নিতেন।[১৩] শায়খ ইসলাম প্রচারের স্বার্থে সমসাময়িক হিন্দু রাজা ও মগ অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে স্বীয় ছাত্রদের মাধ্যমে সফল নৌ অভিযান পরিচালনা করেন। চট্টগ্রামের মগ অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে ১৬০টি নৌকাসহ চার হাজার কর্মীর বিশাল বহর নিয়ে বদরুদ্দীন যাহেদ তাঁর নির্দেশে সফল অভিযান পরিচালনা করেন। এছাড়াও বদরুদ্দীন শায়খের নির্দেশে সুলতান হুসাইন শাহের সহায়তায় দিনাজপুরের অত্যাচারী রাজা মহেসকে পরাজিত করেন। রাজমহলের এক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বদরুদ্দীন নৌপথে এবং যইন ইরাকি স্থলপথে গমন করেন। বৃহত্তর রাজশাহীর ঐতিহাসিক 'ঘোড়াঘাট' নামক স্থানে অপর এক বিরোধের জেরে যইন ইরাকি ও বদরুদ্দীন সম্মিলিত অভিযান পরিচালনা করেন।[১৪] এভাবেই শায়খ আবু তাওয়ামা নিজের জীবনের মূল্যবান সময় মহান আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করতে করতে ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দের ৭০০ হিজরির কোনো এক ক্ষণে ইহজীবন ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমান।[১৫] তাঁর লিখিত মোট ৩টি বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে তাসাউফ সম্পর্কিত '*মাকামাত*' বইটির কোনো কপি বর্তমানে অবশিষ্ট নেই।[১৬] দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক আখতার উল-আলমের তথ্য মতে, বাগদাদের গ্রন্থাগারে ফারসি ভাষায় আবু তাওয়ামা লিখিত সহিহ বুখারির ভাষ্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি মওজুদ রয়েছে।[১৭] বর্তমানে ফিকহি বিধি-বিধান ও মাসআলা-মাসায়েল সম্বলিত ফারসি ভাষায় রচিত তাঁর *নামে হাক* গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয়েছে।

নামে হক পরিচিতি

ফারসি ভাষায় রচিত *নামে হক (نام حق)* একটি মছনভি (দ্বিপদী) জাতীয় কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থে ইসলামের মৌলিক বিষয় যেমন-তাওহিদ, ওজু, তায়াম্মুম, গোসল, নামাজ, রোজা ইত্যাদির ফিকহি বিধি-বিধান কাব্যাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থের শুরুতে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (সা.)-এর প্রশংসায় কবিতা লেখা হয়েছে। অতঃপর একটি ভূমিকা, ১০টি অধ্যায়, ১১টি পরিচ্ছদ ও উপসংহারে গ্রন্থের কলেবর সাজানো হয়েছে। প্রথম অধ্যায়কে ৪টি পরিচ্ছদে বিভক্ত করে ওজুর বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ওজু ভঙ্গের কারণ, তৃতীয় অধ্যায়ের ৩টি পরিচ্ছদ জুড়ে গোসলের বিধান, চতুর্থ অধ্যায়ে গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ, পঞ্চম অধ্যায়ে তায়াম্মুম, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৪টি পরিচ্ছদে নামাজের হুকুম-আহকাম, সপ্তম অধ্যায়ে ফরজ নামাজের রাক'আত সংখ্যা, অষ্টম অধ্যায়ে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ নামাজ, নবম অধ্যায়ে রামাজানের রোজা এবং দশম অধ্যায়ে রোজার কাফ্ফারা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত فاعلاتن مفاعلن فع لن ওজনে بحر خفیف مسدس ছন্দে লেখা হয়েছে। সকল অধ্যায় ও পরিচ্ছদ মিলে সর্বসাকুল্যে ১৮২ পঙক্তিতে বিস্তৃত রয়েছে। যদিও স্বয়ং কাব্যকার স্বীয় কবিতায় ১০টি অধ্যায় ও ১৮০ চরণের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৮] কিন্তু গণনায় ২ চরণ বেশি পাওয়া যায়। সংক্ষিপ্ত এ গ্রন্থটি কবে লেখা শুরু হয়েছে সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে কবিতার চরণে গ্রন্থ রচনার সমাপ্তিকালের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন কবি লিখেছেন,

نود و سه برفت و ششصد سال + از وفات رسول تا امسال
نیمهٔ از جمادی الاول + بود کاین نظم گشت مستکمل

'৯৩ বছর আরো ৬০০ সাল হলো অতিক্রান্ত + রাসূলের ওফাত থেকে এ বছর পর্যন্ত।
জুমাদিউল আওয়াল মাসের প্রথমার্ধে + এই কাব্য শেষ হয়েছিল সে অব্দে'।[১৯]

উদ্ধৃতাংশ থেকে বোঝা যায় যে, রাসূল (সা.)-এর মৃত্যুর ৬৯৩ বছর পর তথা ৭০৩-৪ হিজরির জুমাদিউল আওয়াল মাসের প্রথমার্ধে কাব্য গ্রন্থটি লেখা শেষ হয়। এ গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে।[২০] বাংলাপিডিয়া ও খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ড. আব্দুল করিমের তথ্যানুসারে গ্রন্থটি ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের বোম্বাই থেকে এবং ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে কানপুর থেকে প্রকাশিত হয়।[২১] তবে একটি পুরাতন সংস্করণের শেষ পৃষ্ঠায় বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী, *নামে হক* ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাস মোতাবেক ১৩০২ হিজরির শাওয়াল মাসে কানপুর থেকে প্রকাশিত হয়। যেমন বলা হচ্ছে,

الحمدلله و المنة که نسخه ی جامع مسائل ضروری نماز و روزه موافق مذهب امام ابی حنیفة علیه الثناء و التحیة، موسوم به نام حق از تصنیف مولانا شرف الدین بخاری عفی الله عنه الباری، بمطبع فیض منبع نامی گرامی جمهور منشی نولکشور صاحب واقع شهر کانپور بماه آگست سنة ۱۸۸۵ م مطابق ماه شوال سنة ۱۳۰۲ هجری طبع گردید -

অর্থাৎ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যাঁর অপার অনুগ্রহে নামাজ রোজা সম্পর্কিত বিস্তারিত জরুরী মাসায়েল ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাজহাব মতে *নামে হাক্ব* শিরোনামে মাওলানা শরফুদ্দীন বুখারির (আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন) কাব্যগ্রন্থ, নওলকিশোর ছাপাখানার স্বনামধন্য সচিব সাহেবের অসীম কৃপায় কানপুর শহর থেকে ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাস মোতাবেক ১৩০২ হিজরির শাওয়াল মাসে মুদ্রিত হলো'।[২২]

নামে হকের প্রকৃত রচয়িতা

গ্রন্থটির প্রকৃত রচয়িতা কে সেটা নিয়ে জীবনীকার এবং ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট সংশয় ও দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়। কারো মতে এটি শায়খ শরফুদ্দীনের নিজের লিখিত এবং কারো মতে তাঁর বিভিন্ন বিষয়ের

বক্তব্য তাঁর কোনো ছাত্র সংকলন করেছেন এ গ্রন্থে। তবে অধিকাংশের মতে গ্রন্থটি আবু তাওয়ামা রচিত। যেমন মাওলানা ওবাইদুল হক শায়খের ছাত্র ও জামাতা মাখদুম আল-মুলক শায়খ শরফুদ্দীন আহমাদ ইয়াহ্ইয়া আল-মানেরী (৬৬১-৭৮২ হি.) লিখিত *'খাওয়ানে পুর নে'মত'* গ্রন্থের বরাতে লিখেছেন, 'মাওলানা শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা একজন বড় আলেম ছিলেন এবং সমস্ত ভারতবর্ষের লোক তাঁহাকে সম্মান করিতেন, তাঁহার জ্ঞান ও এলেম সম্পর্কে দ্বিমত ছিল না। *নামে হক* কিতাবটি তাঁহারই রচিত'।[২৩] বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও ঐতিহাসিক সগির হাসান আল-মা'সুমী (১৯১৮-১৯৯৬ খ্রি.) তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, 'His great book on Islamic Jurisprudence called *Nami Haq* that has come down to us'.[২৪] অর্থাৎ 'ইসলামি আইনশাস্ত্রের উপর লিখিত তাঁর অনন্য গ্রন্থ *নামে হক* আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে'। শায়খ তাওয়ামার জীবনী লেখক মফিজউদ্দিন আহমাদ লিখেছেন, 'তিনি প্রধানত ফারসি ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করতেন। তাঁর রচিত সমস্ত গ্রন্থের নাম জানা যায় না। এ পর্যন্ত তাঁর রচিত দুটি গ্রন্থের নাম জানা গেছে। গ্রন্থ দুটির একটির নাম *'মাকামা'* এবং অন্যটির নাম *'নামে হক'*।[২৫] অপরদিকে ড. আব্দুল করিম মনে করেন, গ্রন্থটি আবু তাওয়ামার উপদেশাবলির উপর ভিত্তি করে তাঁর কোনো ছাত্র রচনা করেছিলেন। তিনি তাঁর মতের স্বপক্ষে *নামে হক*-এর ভূমিকা থেকে শেষের দশ চরণ উল্লেখপূর্বক কিছু সংশয় প্রকাশ করেছেন। যেমন *নামে হক*-এর ভূমিকার শেষে লেখা হয়েছে,

این ترا یادگار از شرف است + نام او در جهان بهر طرف است
از بخارا ست مولد و نسبش + و ز خراسان علوم مکتبش

'তোমাদের তরে শরফের পক্ষ থেকে এ এক স্মৃতিচারণ + যার যশ-খ্যাতি পৃথিবীব্যাপী হয়েছে বিস্তরণ
বোখারার বুকে সে ও তাঁর পূর্বপুরুষ জন্মেছে + খোরাসান থেকে সে জ্ঞানতৃঞ্চা নিবারণ করেছে'।

উপরোক্ত কবিতায় বলা হয়েছে, এই কাব্যগ্রন্থটি 'শরফ' নামক ব্যক্তির স্মৃতিচারণ যার খ্যাতি পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে এবং তিনি ও তাঁর পূর্বপুরুষ বোখারায় জন্মগ্রহণ করেছেন। অতঃপর খোরাসানে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। ড. আব্দুল করিম এই চরণগুলোর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, 'সুতরাং শ্লোকের শরফকে মাওলানা শরফউদ্দীন আবু তাওয়ামা রূপে শনাক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু এগুলো এটাও ইঙ্গিত দেয় যে, তিনি নিজেই এ গ্রন্থ রচনা করেননি। বরঞ্চ তাঁর শিক্ষা থেকে অন্য কেউ, খুব সম্ভব তাঁর ছাত্রদের মধ্যে একজন গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। প্রথমত, যদি তিনি নিজেই (শরফ) রচয়িতা হয়ে থাকেন তবে নিজেকে তৃতীয় পুরুষে পরিচয় দিতেন না যেখানে প্রথম থেকে সপ্তম শ্লোকগুলোতে তিনি সবসময় উত্তম পুরুষ ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয়ত, শরফ নিজেই রচয়িতা হলে পূর্ববর্তী শ্লোকগুলোতে নিজেকে নম্রভাবে প্রকাশ করে পরে নিজেকে সারা বিশ্বে সুখ্যাত বলে দাবি করতেন না'।[২৬]

এটা স্রেফ অনুমাননির্ভর যুক্তি মাত্র, কোনো শক্তিশালী প্রমাণ নয়। কারণ প্রথমত, শ্লোকদ্বয় পড়ে বোঝা যাচ্ছে লেখক ভাষাকে আকর্ষণীয় করতে অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রয়োগ করেছেন। সেজন্য সরাসরি আমার পক্ষ থেকে না লিখে নিজেকে তৃতীয় পুরুষে উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো লেখক জনসম্মুখে নিজের লিখিত বইয়ের পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন, 'এই বইটা লেখকের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য উপহার। যেটা ইতিমধ্যে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছে'। এই কথাটি লেখক উপস্থিত থেকে নিজেই নিজের দিকে ইঙ্গিত করে বলছেন এবং নিজের বইয়ের প্রশংসা করছেন। এখানেও তৃতীয় পুরুষ ব্যবহার করা হচ্ছে। শায়খ শরফুদ্দীন নিজের বইয়ের পরিচয় দিতে গিয়ে সে কাজটিই করেছেন। সুতরাং উদাহরণে যেমন তৃতীয় পুরুষ ব্যবহারের অর্থ এই নয় যে, লেখক বলতে অন্য কাউকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তদ্রুপ উপরিউক্ত কবিতার শ্লোকে তৃতীয় পুরুষ ব্যবহার করে প্রশংসা করার অর্থও এমন নয় যে, এ গ্রন্থে সংকলিত বক্তব্য তাঁর ছাত্রের বরং শায়খ শরফুদ্দীনের নিজেরই। উপরন্তু এখানে শায়খ শরফুদ্দীনের ফারসি ভাষার বালাগাত ব্যবহারের পারদর্শিতা এবং তাঁর উজ্জ্বল প্রতিভার স্বাক্ষর ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয়ত, সম্পূর্ণ গ্রন্থে কেবল এক

জায়গাতেই এভাবে তৃতীয় পুরুষ ব্যবহার করা হয়েছে। আবার পরক্ষণেই উত্তম পুরুষ ব্যবহার করে নিজের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, 'হে আল্লাহ! আমাকে গবেষণা করার তাওফিক দিন'।[২৭]

সুতরাং শুধুমাত্র একটা শ্লোকের ভিত্তিতে গ্রন্থটির প্রকৃত রচয়িতা শায়খ শরফুদ্দীনের কোনো ছাত্র একথা বলা আদৌ সমিচীন নয়।

নামে হক গ্রন্থের বিষয়বস্তু

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, *নামে হক্ব* গ্রন্থে ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির শারঈ বিধান আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও এতে ইসলাম সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো :

তাওহিদের তত্ত্বকথা : তাওহিদ অর্থ একত্ববাদ। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যস্থিত সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং রিযিকদাতা মহান আল্লাহ। যার সৃষ্টিতে এবং সৃষ্ট জগৎ পরিচালনায় কোনো শরিক নেই। তিনিই কেবল ইবাদত পাওয়ার একক সত্তা-এ বিশ্বাসকেই তাওহিদ বলা হয়। ঈমানের মোট ছয়টি রুকনের মধ্যে প্রথম রুকন হলো আল্লাহর উপর ঈমান তথা তাওহিদে বিশ্বাস করা। তাওহিদের বিপরীত হলো শিরক অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রভুত্বের স্বীকৃতি দেওয়া। কোনো মুসলিমের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে আল্লাহর গুণাবলি সদৃশ ধারণা করা হারাম বা নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا অর্থাৎ 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না'।[২৮] ইসলাম তাওহিদে বিশ্বাসের এই মৌলিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। শায়খ শরফুদ্দীন তাঁর কাব্যগ্রন্থের শুরুতেই আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে সংক্ষিপ্তাকারে তাওহিদের মৌলিক সারনির্যাস অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। ফারসি সাহিত্যের ক্লাসিক কবি যেমন মাওলানা রূমি, মাওলানা ফরিদুদ্দীন আত্তার, মাওলানা আব্দুর রহমান জামি, শেখ সাদি, আবুল কাসেম ফেরদৌসি প্রমুখ কবিগণ তাঁদের কাব্যগ্রন্থ আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর প্রশংসার মাধ্যমে শুরু করেছেন। তদ্রুপ এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ ইসলামি ভাবধারায় রচিত হলেও ফারসি সাহিত্যের ক্লাসিক কবিদের ন্যায় আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে লেখক স্বীয় গ্রন্থ রচনা শুরু করেছেন। তিনি লিখেছেন,

نام حق بر زبان همی راننیم + که بجان و دلش همی خوانیم
مالک و صانع و قدیم و حکیم + خالق و رازق و رؤف و رحیم

'আল্লাহ নামের গুণগানে মোরা যবান করি তাজা,
তনু মনে তাঁরই নামের যিকির করি সদা।
তিনি অধিপতি, আদি, মহাজ্ঞানী ও তিনিই পালনকর্তা,
তিনি সৃষ্টিকর্তা, ক্ষমাকারী, দয়ালু আর তিনিই রিযিকদাতা'।[২৯]

পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহর আনুগত্য করা ফরজে আইন তথা আবশ্যিক। আল্লাহর আনুগত্য তাওহিদের মূল সারবস্তু। আল্লাহ আমাদের জন্য কুরআন মাজিদ নাজিল করে আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। কুরআন মাজিদে মানুষকে বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত করেছেন। পৃথিবীর সমস্ত মাখলুককে আমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। যে আল্লাহ এত কিছু দিয়ে তাঁর বান্দাদের প্রতিপালন করছেন, তার প্রতিদানে আল্লাহর আনুগত্য আমাদের জন্য ঋণস্বরূপ হয়ে যায়। সেদিকে ইঙ্গিত করে কবি বলেন,

طاعت اوست فرض عین شده + بر همه خلق هم چو دین شده
داد ما را کتاب تا خوانیم + کرد ما را خطاب تا دانیم
هر چه او گفت آن کنیم همه + طاعت او بجان کنیم همه

'তাঁর আনুগত্যের বিধান ফরজে আইন + সৃষ্টিকুলের তরে তা যেন এক অমোঘ ঋণ
তিনি আমাদের দিলেন বিস্ময়কর কুরআন পড়তে + আমাদের দিলেন খেতাব পরস্পরকে জানতে
যা কিছু বলেন তিনি আমরা সাগ্রহে করি + জীবন দিয়ে তাঁর আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করি'।[৩০]

রাসূল (সা.)-এর প্রশংসা : আল্লাহ তা'আলার পরে যাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ছাড়া মুসলমানদের ঈমান পরিপূর্ণ হবে না তিনি হলেন বিশ্ব মানবতার নবি মুহাম্মাদ (সা.)। তিনি ভুলে ভরা, ঘুণে ধরা, পথহারা মানুষদেরকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর আগমনের মাধ্যমে নবুঅতের সিলসিলা বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি। তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ অলঙ্ঘনীয় ইসলামি শরিয়ত এবং মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এই জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাসূল (সা.)-এর সাথে তাঁর বিশিষ্ট সাহাবি হযরত আবু বকর (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.) ও আলি (রা.) নিজের জীবনের শেষ রক্তবিন্দু অবশিষ্ট থাকা অবধি বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। সেজন্য কবি মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রশংসার পাশাপাশি উক্ত চার খলিফার কথা স্মরণ করে তাঁদের জন্য দো'আ করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

شکر حق را که پیشوا داریم + پیشوا چون مصتفی داریم

مهتر و بهتر و گزین همه + سرور و خاتم و نگین همه
او شریعت بیان کند ما را + او طریقت عیان کند ما را
امت او و دوست دار وی ایم + دوست دار چهار یار وی ایم
چون ابو بکر و هم عمر عثمان + مرتضی دان علیهم الرّضوان

'প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের পথ প্রদর্শক দিয়েছেন + পথ প্রদর্শক করে মুহাম্মাদ (সা.)-কে দিয়েছেন
যিনি মহান, শ্রেষ্ঠ, যিনি মনোনীত + যিনি বিশ্ব নেতা, শেষ নবি, যিনি আলোকোজ্জ্বল মুক্তা
তিনি আমাদের জন্য শরিয়ত প্রণয়ন করেছেন + তিনি আমাদের জান্নাতের পথ দেখিয়েছেন
আমরা তাঁর উম্মত ও তাঁর বন্ধুদের ভালোবাসি + আমরা তাঁর চার বন্ধুকে ভালোবাসি
যেমন আবু বকর, উমর, উসমান + মুর্তজা আলিকে জানো, তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক'।[৩১]

পবিত্রতা অর্জনের উপায় : পবিত্রতা দুই ধরনের যথা : দৈহিক পবিত্রতা ও আত্মিক পবিত্রতা। ইসলামে দৈহিক পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম হলো ওজু, তায়াম্মুম ও গোসল। অপরদিকে শিরকসহ যাবতীয় পাপকর্ম পরিহার করে হৃদয়ে শুধু আল্লাহর ভয় ধারণ করার মাধ্যমে আত্মিক পবিত্রতা অর্জিত হয়। মুসলিমের দৈহিক পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে আন্তরিক প্রশান্তির দ্বারা যে ইলাহি আবেশ জাগ্রত হয়, সে অনুভূতিই মুসলিমকে আত্মিক পবিত্রতা অর্জনের পথে ধাবিত করে। সেদিকে ইঙ্গিত করে কবি লিখেছেন,

ای مصلّی! بیا طهارت کن + خانهٔ دینِ خود عمارت کن
چون بیاری طهارتِ ظاهر + باطنت نیز حق کند طاهر

'হে মুসল্লি! এসো পবিত্র হও + তোমার দ্বীনের ভিত্তি মজবুত বানাও
কেননা বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জন হলে + আল্লাহ অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা দান করবেন'।[৩২]

কবি দৈহিক পবিত্রতা অর্জনের ৩টি মাধ্যমেরই সুন্নতি পদ্ধতি সংক্ষিপ্তাকারে সুবিন্যস্তভাবে স্বীয় মছনভিতে আলোচনা করেছেন। এতে ওজুর ফরজ, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মাকরুহ এবং ওজু ভঙ্গের কারণও রয়েছে। তদ্রুপ গোসলের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত এবং ওজু ও গোসলে কতটুকু পানি ব্যবহার করা শরিয়তসম্মত সেটাও

বর্ণিত হয়েছে। পরিশেষে তায়াম্মুমের পদ্ধতি, ফরজিয়াত ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে অলোকপাত করা হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

ক. ওজু : নামাযের পূর্বে পবিত্র হওয়ার জন্য ইসলামি শরিয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী ওজু করা অন্যতম শর্ত। ওজু বিহীন নামাজ গ্রহণযোগ্য নয়। ওজুর শারঈ হুকুম কুরআন ও হাদিসে মওজুদ রয়েছে। লেখক সেই হুকুম-আহকামগুলো কাব্যাকারে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। যেমন ওজুর ৪টি ফরজের কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। যেখানে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা নামাজের জন্য প্রস্তুত হও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুই সমেত ধৌত করো এবং তোমাদের মাথা মাসাহ করো ও পদযুগল টাখনু সমেত ধৌত করো'... ।[৩৩] লেখক ওজুর এ বিধানকে কবিতায় লেখেন,

در صباح و رواح و لیل و نهار + در وضو نیست جز فریضهٔ چهار
شستن روی و دست و مسح سراست + شستن پای نیز معتبر است

'সকাল ও সন্ধ্যা এবং রাত ও দিনে + ওজু হয়না চার ফরজ আদায় বিনে
মুখ, হাত ধও ও মাথা মাসাহ করো + পা ধোয়াকেও অবশ্যই বৈধ মনে করো' ।[৩৪]

খ. তায়াম্মুম : পানির অনুপস্থিতিতে ওজু কিংবা গোসলের পরিবর্তে পবিত্র হওয়ার ইসলামি পন্থাকে তায়াম্মুম বলা হয়। পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্র হওয়া যাবে না। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ অর্থাৎ 'আর যদি তোমরা পীড়িত হও কিংবা সফরে থাক অথবা সৌচাগার থেকে আসো কিংবা স্ত্রী স্পর্শ করে থাকো, অতঃপর পানি না পাও, তাহলে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা 'তায়াম্মুম' করো এবং তা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসাহ করো'... ।[৩৫]

উক্ত আয়াতাংশ এবং বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থ অবলম্বনে তায়াম্মুমের পদ্ধতি হলো, মনে মনে নিয়াত করে দুই হস্তালু পবিত্র মাটিতে একবার স্পর্শ করতে হবে। অতঃপর দু'হাত উঠিয়ে ফুঁ দিয়ে উভয় হাত দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল এবং দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে।[৩৬] এখানে উল্লেখ্য যে, আবু দাঊদ শরিফের ৩৩০ নম্বর হাদিস অনুযায়ী তায়াম্মুমের সময় দুইবার মাটিতে হাত স্পর্শ করতে হবে এবং কনুই পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে। অবশ্য হাদিসবেত্তাদের মতে এ হাদিসের সনদ দূর্বল। লেখক বলেন,

چون زودی هر دو پنجه را بر خاک + پس بمالش برو که گردی پاک
پس دگر بار پنجه زدن در حال + هر دو ساعد بمرفقین بمال

'যখন তুমি দু'হাতকে মাটিতে স্পর্শ করবে + অতঃপর মুখমণ্ডলে মাসাহ করবে যেন পবিত্র হও
পরক্ষণেই দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত স্পর্শ করবে + দুই হাতের কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত মাসাহ করবে' ।[৩৭]

যে সমস্ত কারণে ওজু ভেঙ্গে যায় সে একই কারণে তায়াম্মুম ভেঙ্গে যায়। আবার পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুমের বিধান বাতিল হয়ে যায়। হাদিসে উল্লিখিত এ সকল বিষয় তুলে ধরে কবি বলেন,

هر چه آن ناقص وضو باشد + ناقص اندر تیمّم او باشد
و آنکه قادر شود بر آب طهور + زو شود در زمان تیمّم دور

'যা কিছু ওজুকে ভেঙ্গে দেয় + তায়াম্মুমেও সে কারণ বিদ্যমান
যদি কেউ পবিত্র পানি পেতে সক্ষম হয় + সে সময় হতে তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যায়' ।[৩৮]

গ. গোসল : গোসলের ফরজিয়াতের অধ্যায়ের শুরুতে কবি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখেছেন। সেখানে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন ইসলামি শরিয়ত শেখার ক্ষেত্রে পরিশ্রম করতে হবে, অন্তরকে ইসলামের পথে বিগলিত করতে হবে এবং লজ্জা করা যাবে না। লজ্জা করতে হলে কেবল আল্লাহকে লজ্জা করতে হবে কোন মানুষকে নয়। অতঃপর তিনি কী কী কারণে গোসল ফরজ হয় তা বর্ণনা করেন। পূর্বোক্ত অধ্যায়ে অবশ্য গোসলের ফরজ, সুন্নাত ও পানি ব্যবহারের পরিমাণ উল্লেখ করেছেন। যাহোক ইসলামি শরিয়তে গোসল দুই ধরনের যথা : ফরজ (অপরিহার্য) গোসল ও মুস্তাহাব (অপরিহার্য নয়) গোসল। সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের মোট পাঁচটি কারণে গোসল ফরজ হয়। নারী-পুরুষের স্বপ্নদোষ হলে, হায়েজ ও নেফাস বন্ধ হয়ে গেলে, হায়েজের নির্ধারিত দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলে এবং স্বামী-স্ত্রী মিলনে (বীর্যপাত হোক বা না হোক)। এ সমস্ত কারণ ছাড়া গোসল করা মুস্তাহাব। শায়খ বলেন,

گر تو خواهی که شرع آموزی + بایدت جد و جهد و دل سوزی
غسل از پنج چیز فرض شود + بر زن و مرد هم چو فرض شود
چون شود پاک زن ز حیض و نفاس + غسل واجب شود بشرع و قیاس

'যদি তুমি শরিয়ত শিখতে চাও + মনে প্রাণে প্রচেষ্টা করা চাই
পাঁচটি কারণে গোসল ফরজ হয় + নারী-পুরুষ সকলে এ বিধান জেনে নাও
নারী যখন হায়েজ নেফাস থেকে পবিত্র হয় + শরিয়ত ও কিয়াস বলে গোসল ফরজ হয়'।[৩৯]

নামাজের গুরুত্ব বর্ণনা

ঈমান আনার পরে একজন মুমিনের প্রথম কর্তব্য হলো দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা। যে ব্যক্তি শরিয়ত সম্মত কারণ ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দিবে কিংবা নামাজকে অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে। হাদিসে নামাজ তরক করাকে কুফরি বলা হয়েছে।[৪০] তবে ইসলামিক স্কলারদের মতে, ঈমানের দাবিদার কোনো ব্যক্তি সামান্য অজুহাতে কিংবা অলসতা করে নামাজ না পড়লে সে অবশ্যই ফাসিক হবে। হাদিসে এসেছে, ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার নামাজের। নামাজের হিসাব সঠিক হলে তার সমস্ত আমল সঠিক হবে। আর নামাজের হিসাব বেঠিক হলে তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে।[৪১] এ হাদিস অবলম্বনে নামাজের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে কবি বলেন,

روز محشر که جان گداز بود + اوّلین پرسش نماز بود
پس مکن در نمازها تقصیر + تا در آن روز باشدت توقیر

'কিয়ামতের দিনের শোচনীয় মুহূর্তে + প্রথম নামাজের হিসাব হবে
তাই নামাজ করো না কভু বিনষ্ট + যেন সেদিন সম্মান হাসিল করতে পারো'।[৪২]

নামাজের হুকুম-আহকাম

নামাজ মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য ফরজ। নামাজের ভিতরে বাইরে রয়েছে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নিষিদ্ধ বিষয়াবলি। কবি নামাজকে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম সহ মোট তিন অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে ৬ষ্ঠ অধ্যায়কে আবার ৪টি পরিচ্ছেদে ভাগ করে সেখানে যথাক্রমে প্রথম পরিচ্ছেদে নামাজের ভিতর ও বাইরের ফরজ কাজ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ওয়াজিব কাজ, তৃতীয় পরিচ্ছেদে সাহু সিজদাহ্‌র হুকুম ও আদায় পদ্ধতি এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে নামাজের ভিতরের সুন্নাত যা মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে করতে হয় এবং যা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে করতে হয় সেগুলো চমৎকার কাব্যিক ছন্দে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে যথাক্রমে ৫ ওয়াক্ত নামাজের ফরজ ও সুন্নাত রাক'আত সংখ্যা বর্ণনা করেন। হাদিসের গ্রন্থাবলিতে বিদ্যমান

হাদিস অনুযায়ী ৫ ওয়াক্ত নামাজে ১৭ রাক'আত ফরজ এবং ১২ রাক'আত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ নামাজ রয়েছে। কবি বলেন,

آنچه فرض ست در شبا روزی + هفت ده رکعت بود گر آموزی

علماء گفته اند، بی شبهت + هست سنت دوازده رکعت

'নামাজে ফরজ যতটুকু আছে দিনে-রাতে + ১৭ রাক'আত ফরজ ছিল জেনে নাও সবে

আলেমগণ বলেছেন কোনোরূপ সন্দেহ ছাড়া + দিনে-রাতে ১২ রাক'আত পাবে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ'।[৪৩]

রামাজানের রোজা ও রোজার কাফ্ফারা

রামাজান মাসের রোজা দ্বিতীয় হিজরি সনে মুসলমান বালেগ নারী-পুরুষের জন্য ফরজ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হলো, যেমন তা ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হতে পারো'।[৪৪] লেখক তদীয় মছনভিতে সর্বশেষ ৯ম ও ১০ম অধ্যায়ে রোজা ভঙ্গের কারণ ও রোজার কাফ্ফারা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি প্রথমেই ফরজ ও নফল রোজার নিয়াতের গুরুত্ব ও কখন নিয়াত করা বৈধ সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। এছাড়াও রোজা অবস্থায় গলায় মশা-মাছি ঢুকে গেলে, লবণ ও ঝাঁজ জাতীয় জিনিস চেখে দেখলে, চোখে সুরমা লাগালে, ছোট বাচ্চাকে রুটি জাতীয় খাবার জরুরী অবস্থায় চিবিয়ে দিলে যে রোজার কোনো ক্ষতি হয় না এ বিষয়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে। অপরদিকে রোজা ভঙ্গের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করে কিংবা দিনের বেলা স্ত্রী মিলন করে তাহলে তাকে কাফ্ফারা স্বরূপ ৬০ জন মিসকিন খাওয়াতে হবে অথবা একজন গোলাম আযাদ করতে হবে অথবা একটানা দুই মাস রোজা রাখতে হবে'।[৪৫] সিয়ামের এই মাসায়েলগুলো লেখক স্বীয় কবিতায় কাব্যিক রূপদান করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

نمک و سرکه از دهان بچشید + روزه باقی ست گر فرو نکشید
گر کسی قصد کرد در خوردن + بنهار و مجامعت کردن
شصت مسکین طعام باید داد + یا یکی بنده کردنش آزاد

'লবণ ও ঝাঁজালো জিনিসের স্বাদ নিলে + রোজা ভাঙ্গে না যদি না গিলে ফেলে
যদি কেউ ইচ্ছা করে খেয়ে ফেলে + দুপুরে অথবা স্ত্রী মিলন করলে
ষাট মিসকিনকে অবশ্যই খাবার খাওয়াবে + সম্ভব না হলে একজন গোলাম মুক্ত করবে'।[৪৬]

দুনিয়া বিমুখতার শিক্ষা

পরকালে বিশ্বাসী প্রতিটি মুমিনের জন্য এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী আবাসস্থল। দুনিয়ার মোহ-মায়া ত্যাগ করে একদিন আমাদের সবাইকে পরকালের পথে যেতে হবে। তাই হাদিসে মুমিনদের জন্য দুনিয়ার জীবনকে জেলখানার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অপরদিকে কাফেরদের জন্য দুনিয়াকে জান্নাত বলা হয়েছে।[৪৭] কেননা তারা বিশ্বাস করে এই দুনিয়াই তাদের শেষ আশ্রয়স্থল। এরপর আর কোনোই পুনরুত্থান নেই। আজ আমরাও দুনিয়ার মোহে পড়ে দুনিয়ার জীবনকে বেশি প্রাধান্য দেই। সে কারণে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, 'কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাক। অথচ আখিরাত উত্তম ও চিরস্থায়ী'।[৪৮] হাদিসে বর্ণিত আছে, সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যদি দুনিয়ার মূল্য আল্লাহর কাছে মাছির একটি পাখার সমমূল্য হতো, তাহলে তিনি কোনো কাফিরকে এক ঢোকও পানি পান করতে দিতেন না।[৪৯] বর্ণিত আয়াত ও হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে চাকচিক্যময় এই দুনিয়ার কোনোই

মূল্য নেই। সে কারণে কুরআন ও হাদিসে অসংখ্যবার দুনিয়াকে পেছনে ফেলে পরকালকে প্রাধান্য দিতে বলা হয়েছে। তাই কবি দুনিয়া বিমুখতার শিক্ষা দিয়ে লিখেছেন,

غم دین خور که غم غم دین ست + همه غم ها فروتر از این ست
غم دنیا مخور که بی هودست + هیچ کس در جهان نیا سودست

'দ্বীনের মোহে আচ্ছন্ন হও কেননা দ্বীনের মোহ প্রকৃত মোহ + সমস্ত মোহ দ্বীনের মোহ থেকে গুরুত্বহীন বেহুদা দুনিয়ার মোহে পড়ো না + এই দুনিয়ায় কেউ লাভবান হতে আসে নি'।[৫০]

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা একাধারে বিজ্ঞ মুহাদ্দিস, ফকিহ, শিক্ষাবিদ, রজনীতিবিদ এবং সেনাপতি ছিলেন। হাদিস শাস্ত্রে তাঁর মননশীলতা বাংলার বুকে ইলমে হাদিসের পাঠ ও পঠনের ক্ষেত্রে প্রথম সূতিকাগার হওয়ার গৌরবোজ্জ্বল সোনালী অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি একদিকে যেমন হাদিস শিক্ষাদানের মাধ্যমে বাংলা অঞ্চলের শিক্ষাহীনতার অন্ধকার দূরীভূত করেছেন। অপরদিকে নিজের সুযোগ্য ছাত্রদের মাধ্যমে অত্যাচারীর খড়্গ হস্তকে ধূলিস্মাৎ করে ইসলামের সুমহান শান্তির বাণীকে বিভিন্ন এলাকায় বুলন্দ করেছেন। ইসলামের পথে তাঁর নিবেদিতপ্রাণ আধ্যাত্মিক শক্তি এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে বজ্রকঠিন দৃঢ় নীতি খোদ দুনিয়ার সুলতানদেরও নতি স্বীকার করতে বাধ্য করেছে। *নামে হক্* গ্রন্থে তাঁর জ্ঞানের প্রতিভা এবং ইসলামি জ্ঞান শিক্ষাদানের প্রমাণ ভাস্বর হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে ঘুণে ধরা তিমির সমাজকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে আধুনিক করার যে উদ্যোগ তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তা হয়ত তাঁর মৃত্যুর পরে সুযোগ্য উত্তরাধিকারের অভাবে অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি। সে কারণে তাঁর অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণ করতে এবং আগামী প্রজন্মের মাঝে তাঁর স্মৃতি জাগ্রত রাখতে এ প্রজন্মের জ্ঞানীদের 'শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা' নামে অন্ততঃপক্ষে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

তথ্যনির্দেশ

১. মুহিউদ্দীন খান, *জ্ঞান সাধক হযরত আবু তাওয়ামা*, মাসিক মদীনা (১৬শ বর্ষ : ১ম সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৮০), পৃ. ১৭।
২. মফিজউদ্দীন আহ্‌মদ, *শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৮৪), পৃ. ৩০।
৩. মফিজউদ্দীন আহ্‌মদ, *শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা*, পৃ. ৪২।
৪. ড. মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম আল-মারুফ, *বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সূফীবাদের প্রভাব* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০১৮) পৃ. ২৫২; কে এস সিদ্দিকী, বঙ্গে প্রথম বোখারী শরীফ পড়ান সোনারগাঁয়ে শেখ আবু তাওয়ামা, দৈনিক ইনকিলাব, ২৩শে জানুয়ারী ২০১৬, পৃ. ১১।
৫. Muhammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal* (Dhaka : Islamic foundation Bangladesh, 2nd edition, November 2003), Voll- I B, page. 834।
৬. মফিজউদ্দীন আহ্‌মদ, *শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা*, পৃ. ১৮।
৭. আবদুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস* (ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ, মে ২০২১), পৃ. ১২৮।
৮. *Social and Cultural History of bengal*, Voll-11 Karachi, 1st edn. 1967, page. 289; উদ্ধৃতি ডক্টর গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী সাধক* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অষ্টম সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৯), পৃ. ২০৮।
৯. মুহিউদ্দীন খান, জ্ঞান সাধক হযরত আবু তাওয়ামা, মাসিক মদীনা, পৃ. ২২।
১০. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, *আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ* (রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় প্রকাশ, জানুয়ারী ২০১১), পৃ. ২৩৫।
১১. ড. মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম আল-মারুফ, *বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সূফীবাদের প্রভাব*, পৃ. ২৫২।
১২. মফিজউদ্দীন আহ্‌মদ, *শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা*, পৃ. ২৯-৩০।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৪০।

১৫. ডক্টর গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী সাধক*, পৃ. ২০৯।
১৬. আবদুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*, পৃ. ১২৯।
১৭. মুহাম্মাদ আসাদল্লাহ আল-গালিব, *আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ*, পৃ. ২৪৩, ৫০ নং টীকা দ্রষ্টব্য; দৈনিক ইনকিলাব, ২৩শে জানুয়ারী ২০১৬, পৃ. ১১।
১৮. শায়খ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা, *নামে হক*, (লাক্ষ্ণৌ : নওলকিশোর, ১৮৮৫ খ্রি.), ভূমিকা অংশ, ১৯ নং চরণ দ্রষ্টব্য।
১৯. প্রাগুক্ত, উপসংহার অংশ, ৩ ও ৪ নং চরণ দ্রষ্টব্য।
২০. সাইয়েদ কিয়ামুদ্দীন নিযামী কাদেরী আল-ফেরদৌসী, *নামে হক*, উর্দু অনুবাদ (করাচি, পাকিস্তান : নিযামী একাডেমি, প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০১৪), পৃ. ৩।
২১. আবদুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*, পৃ. ১৪০, ২৪ নং তথ্য নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য।
২২. *নামে হক*, (লাক্ষ্ণৌ : নওলকিশোর, ১৮৮৫ খ্রি.), শেষ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
২৩. দৈনিক ইনকিলাব, ২৩শে জানুয়ারী ২০১৬, পৃ. ১১।
২৪. M. Saghir Hasan Al Ma'sumi, Sunargaon's Contribution to Islamic Learning, p. 11।
২৫. মফিজউদ্দীন আহ্মদ, *শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা*, পৃ. ৫৩।
২৬. আবদুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*, পৃ.১৩০।
২৮. یا الٰهی بده تو توفیقم + راه بنام بسوی تحقیقم
২৮. *আল-কুরআন*, সূরা নিসা : আয়াত ৩৬।
২৯. *নামে হক*, (লাক্ষ্ণৌ : নওলকিশোর, ১৮৮৫ খ্রি.), তাওহীদ অধ্যায়, ১ম ও ২য় চরণ দ্রষ্টব্য।
৩০. প্রাগুক্ত, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ চরণ দ্রষ্টব্য।
৩১. প্রাগুক্ত, নাতে রাসূল (সা.) অধ্যায়, ১ম, ২য়, ৩য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ চরণ দ্রষ্টব্য।
৩২. প্রাগুক্ত, ভূমিকা অংশ, ১ম ও ২য় চরণ দ্রষ্টব্য।
৩৩. *আল-কুরআন*, সূরা মায়েদাহ : আয়াত ৬।
৩৪. প্রাগুক্ত, ১ম অধ্যায়, ১ম পরিচ্ছদ, ওজুর ফরজের বর্ণনা, ১ম ও ২য় চরণ দ্রষ্টব্য।
৩৫. *আল-কুরআন*, সূরা মায়েদাহ : আয়াত ৬।
৩৬. *মিশকাত* হাদিস নং ৫২৮, *বুখারী* হাদিস নং ৩৩৮, *মুসলিম* হাদিস নং ৩৬৮।
৩৭. *নামে হক*, ৫ম অধ্যায়, তায়াম্মুমের বর্ণনা, ৪র্থ ও ৫ম চরণ দ্রষ্টব্য।
৩৮. প্রাগুক্ত, ৫ম অধ্যায়, তায়াম্মুমের বর্ণনা, ৮ম ও ৯ম চরণ দ্রষ্টব্য।
৩৯. প্রাগুক্ত, ৪র্থ অধ্যায়, ফরজ গোসল, ১ম, ৪র্থ ও ৫ম চরণ দ্রষ্টব্য।
৪০. *মুসলিম*, *মিশকাত* হাদিস নং ৫৬৯।
৪১. *সিলসিলা সহীহাহ* হাদিস নং ১৩৫৮, *মিশকাত* হাদিস নং ১৩৩০।
৪২. *নামে হক*, ভূমিকা অংশ, ৮ম ও ৯ম চরণ দ্রষ্টব্য।
৪৩. প্রাগুক্ত, ৭ম অধ্যায়, ফরজ নামাজ, ১ম চরণ; ৮ম অধ্যায়, সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ নামাজ, ১ম চরণ দ্রষ্টব্য।
৪৪. *আল-কুরআন*, সূরা বাক্বারাহ : আয়াত ১৮৩।
৪৫. *আল-কুরআন*, সূরা নিসা : আয়াত ৯২; সূরা মুজাদালাহ : আয়াত ৪।
৪৬. প্রাগুক্ত, ৯ম অধ্যায়, রামাযানের রোজা, ৯ম চরণ; ১০ম অধ্যায়, রোজার কাফ্ফারা, ১ম ও ২য় চরণ দ্রষ্টব্য।
৪৭. *মিশকাত* হাদিস নং ৫১৫৮।
৪৮. *আল-কুরআন*, সূরা আ'লা : আয়াত ১৬-১৭।
৪৯. *মিশকাত* হাদিস নং ৫১৭৭।
৫০. *নামে হক*, ভূমিকা অংশ, ১১ ও ১২তম চরণ দ্রষ্টব্য।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

ভাস ও ভাসের নাটকচক্র
(Bhasa and The Circle of Dramas of Bhasa)

ড. শেখ মো. নূরুজ্জামান *

Abstract: Before 1912 Bhasa was known only by reputation, having been honoured by Kalidasa and Bana as a great predecessor and author of a number of plays and praised and cited by a succession of writers in later times. Between 1912 and 1915, T. Ganapati Shastri published from Trivandrum thirteen plays of varying size and merit, which bore no evidence of authorship, but which, on account of certain remarkable characteristics, he ascribed to the far-famed Bhasa. All the plays appear to have been based upon legendary material, but some draw their theme from the Epic and Puranic sources. The plays were hailed with enthusiasm as the long lost works of Bhasa, but the rather hasty approbation of a novelty soon died down in a whirlwind of prolonged controversy. We have tried to show the merits of these 13 Sanskrit plays. We may conclude with this statement that all these plays are more or less faulty, and are not as great as they are often represented to be. Judgement must ultimately pass in respect of the Svapna and the Pratijna, which have the greater probability, at least the literary point of view, being attributed to Bhasa. What appeals most to a student of the Sanskrit drama in these, as well as in other plays, is their rapidity of action, directness of characterisation and simplicity of diction. The number of characters appearing never worries our author, but the stage is never overcrowded by rich variety, minor characters are not normally neglected.

ভারতীর সাহিত্যের ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের পুরনো এবং তার প্রাচীনতম ধারাটি বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃত ভাষার আশ্রয়ে বহুদা ব্যাপ্ত ও বিকশিত হয়ে অদ্যাবধি অক্ষুণ্ন ও ক্রিয়াশীল। বলতে গেলে মানবজাতির সুপ্রাচীন সাহিত্যকৃতির অনেকগুলো নমুনা ভারতীয়দের পূর্বপুরুষদেরই সৃষ্টি। একেবারে সরল কথ্যরূপ দিয়ে শুরু করে অত্যন্ত পরিশীলিত জটিল বাক্যবদ্ধ পর্যন্ত নানা রকম রচনার বৈচিত্র্যে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সাহিত্যভাণ্ডার আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। সব রচনা সমান সার্থক হয় না। সমাজ ইতিহাসের 'পতন অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা' ধরে শিল্প সংস্কৃতিকে অগ্রসর হতে হয়। আমাদের আধুনিক মনের প্রত্যাশা অনুযায়ী অনেক কিছুই প্রাচীন সাহিত্যে উপস্থিত থাকার কথা নয়। সতর্ক দৃষ্টি, ইতিহাস চেতনা এবং শিল্পবোধের সমন্বয় ঘটানো প্রাচীন শিল্পসাহিত্যচর্চায় অত্যাবশ্যক। আনন্দ ও গর্বের বিষয়, হাজার দু'হাজার বছরের ব্যবধানে বসেও বিস্ময়ে আনন্দে পুলকিত হওয়ার মতো সৃষ্টি বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচুর। এরাই ভারতীয় পরিচিতির বাহক।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার দুটি ধারা- বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃত প্রথমটির অবসানে দ্বিতীয়টির উদ্ভব কিংবা প্রথমটি দ্বিতীয়টির জননী, এমন ভাবে কিন্তু বলা যায় না। বরং বলা যায় বৈদিক ভাষা বেশি প্রাচীন এবং সংস্কাররহিত, কথ্য ও স্বচ্ছন্দ। মুখের এই ভাষাই তার নিজস্ব প্রাণশক্তিতে এবং পরিবেশের প্রভাবে কালক্রমে প্রাকৃত অপভ্রংশ স্তর পেরিয়ে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার নানারূপে পরিণত হয়েছে। আর বৈদিক সাহিত্য পরিমণ্ডলের বাইরে লোকভাষার বিকশিত আঞ্চলিক রূপগুলোর মধ্যে আর্যাবর্তের সমাজ সংস্কৃতির পুরোধা জন সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত রূপটিই মান্য সংস্কৃত মর্যদায় অভিষিক্ত। বৈদিক সাহিত্যের লিরিকধর্মী নিসর্গ বন্দনাগুলো কতভাবে যে ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যে ফিরে এসেছে তার ইয়ত্তা নেই। সংস্কৃত মহাকাব্য,

* প্রফেসর, সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

খণ্ডকাব্য, গদ্যকাব্য সর্বত্র নিসর্গ জগতের অগ্রগণ্য স্থান। প্রাকৃতিক পরিবেশের পাদপীঠে মানুষের প্রেম, ক্রোধ, সাহস, ভয়, বিস্ময়, নির্বেদের কাহিনী লিখেছেন সংস্কৃত কবিকুল। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ভাণ্ডারও বিশাল। বহু প্রাচীন কাহিনী নবকলেবরে নতুন নতুন নাট্যকাব্য রূপ পরিগ্রহ করেছে।

বৈদিক সাহিত্যও ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের যোজক হল এপিক সাহিত্য মহাভারত, প্রাচীন পুরাণ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত ভাষাকে এপিক সাহিত্য বলে। বেদব্যাসের নামে প্রচলিত মহাভারতকে একাধারে ইতিহাস, ধর্মগ্রন্থ ও মহাকাব্য বলা হয়ে থাকে। ভগবদ্গীতার মতো দার্শনিক কবিতাবলি, শান্তিপর্বে রাজধর্মনীতিসংক্রান্ত উপদেশ, রামায়ণের রামোপাখ্যান, নল-দময়ন্তীর প্রেম সবই মহাভারতের পক্ষপুটে আশ্রয় পেয়েছিল। কাব্যকলার বিচারে মহাভারত ও পুরাণগুলো তেমন মূল্যবান নয় কিন্তু পরবর্তী ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের বীজ এখানেই নিহিত।

মহাভারত থেকে কাহিনী নিয়ে ভাসের দূতবাক্য, দূতঘটোৎকচ, মধ্যমব্যায়োগ, পঞ্চরাত্র, কর্ণভার ও উরুভঙ্গ নাট্যগ্রন্থের সৃষ্টি। অভিষেক নাটক ও প্রতিমা নাটক রামায়ণ থেকে নেওয়া হয়েছে। বালচরিত মহাভারতের হরিবংশ অনুসরণে লেখা। অবিমারক, যৌগন্ধরায়ণ ও স্বপ্নবাসবদত্তার উৎস গুণাঢ্যের বৃহৎকথা। চারুদত্ত লোককাহিনী শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকে আরও বর্ধিত রূপ পেয়েছিল। চরিত্রসৃষ্টি ও রসসৃষ্টির প্রয়োজনে ভাস মূলকাহিনীর অদলবদলে কুণ্ঠিত হননি। ভাসের নাট্যকলার জন্য তিনি পূর্বসূরিদের কাছে কতটা ঋণী ছিলেন তা জানা যায় না। তবে তাঁর নাট্যকলার বিষয় থেকে বোঝা যায় যে ব্যাস বাল্মিকির কাছে তাঁর ঋণ বিস্তর। এই দুই মহাকাব্য তাকে শুধু কথাবস্তুরই যোগান দেয়নি, বিশুদ্ধ কাব্যের অনুপ্রেরণাও জুগিয়েছে। আবার অনেকের রচনাতেই মেলে। এদের মধ্যে আছেন শূদ্রক, বিক্রমদত্ত, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ প্রমুখ। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক সম্ভবত ভাসরচিত চারুদত্তেরই বর্ধিত সংস্করণ। খ্রি. চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে ভাস তাঁর শিল্পকলার তন্ত্রীগুলোকে অনুপ্রাণিত করেছেন। সেই অনুরণনের তরঙ্গে স্নাত হয়েছেন কালিদাস এবং কালিদাসোত্তর নাট্যকারেরা।

ভাসের পরিচয় ও আবির্ভাবসময়: অধকাংশ সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যকারদের কাল নির্ণয় ও ব্যক্তিপরিচয় দেয়া একটি দুরূহ ব্যাপার। কারণ, সংস্কৃত লেখকেরা নিজ নিজ গ্রন্থে ব্যক্তিগত পরিচয় ও সময় সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট তথ্য উল্লেখ করেননি। গবেষকগণ নিজেদের যুক্তি অনুসারে তথ্য দিতে চেষ্টা করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এটি একটি তমসাচ্ছন্ন অধ্যায়। তাই কবি, নাট্যকার ও লেখকদের পিতৃমাতৃপরিচয়, জন্মস্থান, আবির্ভাবকাল এগুলো পরবর্তীকালে গবেষণা করে তথ্য ও উপাত্ত থেকে খুঁজে বের করতে হয়েছে। লেখকদের পরিচয় গ্রন্থপ্রারম্ভে বা শেষে বা রচনামধ্যে কিছুটা পাওয়া গেলেও রচনাকাল নিয়ে তর্ক-বিতর্ক রয়েছে। তাই বিভিন্ন তথ্যকে বিশ্লেষণ করে ভাসের পরিচয়, আবির্ভাবকাল ও ভাস-নাটকচক্র সম্পর্কে একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে

বেদ, পুরাণ ও আদি মহাকাব্যের পর দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্যের পরিমণ্ডলে সংস্কৃত সাহিত্যের পদচারণা। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভাস কেবল নামেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর রচনার কোনো নিদর্শন ছিল না। কোনো কোনো আলঙ্কারিক অথবা কোষকার ভাসরচিত দু'একটি শ্লোকের উল্লেখ করেছেন মাত্র। ধারণা করা হয়, খ্রি. একাদশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভাসের রচনা সহজলভ্য ছিল। এর পর আর কেউ তাঁর নাম উল্লেখ করেননি। পরবর্তিতে অনেকের মধ্যে ধারণা জন্মে কালিদাসপূর্বযুগে কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়নি। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে কালিদাস মধ্যমণি বলে বিবেচিত হলেও স্বয়ং কালিদাস তাঁর পূর্ববর্তী নাট্যকার হিসেবে ভাস, সৌমিল্ল ও কবিপুত্রের নাম *মালবিকাগ্নিমিত্রম্* নাটকের প্রস্তাবনায় উল্লেখ করেছেন।[১] বাণভট্ট এবং দণ্ডী একাধিক নাটকের রচয়িতারূপে ভাসের নাম উল্লেখ করেছেন।[২] রাজশেখর *সূক্তিমুক্তাবলীতে* ভাসনাটকচক্রের কথা এবং এই নাটকচক্রের অন্তর্ভুক্ত *স্বপ্নবাসবদত্তের* নামও বলেছেন:

"ভাসনাটকচক্রেঽপি ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্ ।

স্বপবাসবদত্তস্য দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ ॥"[৩]

কৌটিল্য *অর্থশাস্ত্রে* যুদ্ধে প্রাণত্যাগকারী বীরগণের বিষয়ে ভাস রচিত *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ* নাটক থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন।[৪] দণ্ডী *কাব্যাদর্শে* ভাসের *বালচরিত* নাটকে প্রাপ্ত শ্লোকের উল্লেখ করেছেন[৫] কিন্তু ভাস বা তাঁর রচিত নাটকের নাম উল্লেখ করেননি। জয়দেব *প্রসন্নরাঘব* শীর্ষক গ্রন্থে ভাসকে সরস্বতীর হাস্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ থেকেই বোঝা যায় কালিদাসপূর্ববর্তী ভাসের নামের সঙ্গে রাজশেখর, দণ্ডী, বাণভট্ট সকলেই পরিচিত ছিলেন কিন্তু ভাসের রচনার সঙ্গে কারও পরিচিতি ছিল না। আচার্য দণ্ডী তাঁর *অবন্তীসুন্দরী* কথা কাব্যের ভূমিকায় বলেছেন:

"সুবিভক্তমুখাদ্যঙ্গৈর্ব্যক্তলক্ষণবৃত্তিভিঃ।

পরতেঽপি স্থিতো ভাসঃ শরীরৈরিব নাটকৈঃ॥"

অর্থাৎ নাটকের মধ্য দিয়ে ভাস তাঁর অসীম শক্তির পরিচয় দিয়েছেন এবং নাটকরূপ শরীরেই তাঁর যশ মূর্ত হয়ে উঠেছে। এ.বি.কীথ মন্তব্য করেছেন: "Until 1910 the existence of any drama of Bhasa's was unknown in Europe, and only in 1912 appeared under the editorship of T. Ganapati Castrin, the first of a series of thirteen dramas which their discoverer attributed to that poet. The fact, however, that the dramas themselves are silent as to the authorship rendered careful research necessary to determine their provenance and the proofs adduced have not won entire satisfaction."[৬]

নাট্যকার ভাসের পিতৃমাতৃপরিচয় বা ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে কোনো তথ্য উদ্ঘাটিত হয়নি। তাঁর বিভিন্ন রচনা থেকে অনুমান করা হয় তিনি বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। তিনি অশেষ যশের অধিকারী ছিলেন, এ বিষয়টি পরবর্তী কবিদের সাক্ষ্য থেকেই প্রমাণিত হয়। ১৯০৯ থেকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পণ্ডিত টি. গণপতি শাস্ত্রী দক্ষিণভারতে কেরল অঞ্চলে তেরোটি নাট্যগ্রন্থ আবিষ্কার করেন এবং উক্ত নাটকগুলি ভাসের বলে মত পোষণ করেন। বিষয়বস্তু অনুসারে ভাসের উক্ত নাটকসমূহকে চারভাগে বিভক্ত করা হয়-

(ক) রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত- *প্রতিমা* ও *অভিষেকনাটক* ।

(খ) মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত- *পঞ্চরাত্র*, *দূতঘটোৎকচ*, *মধ্যমব্যায়োগ*, *কর্ণভার*, *উরুভঙ্গ*, *দূতবাক্য* ও *বালচরিত*।

(গ) ঐতিহাসিক বা প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে রচিত- *স্বপ্নবাসবদত্ত* ও *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ* ।

(ঘ) কল্পিত বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত- *চারুদত্ত*, *অবিমারক*।

শাস্ত্রী মহাশয় নানা যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে স্থির করেন যে এগুলো সবই ভাসনাটকচক্রের নিদর্শন। আবিষ্কৃত তালপাতার পুঁথিতে লেখা তেরোটি নাটক ভাসের রচনা কিনা এ নিয়ে শুরু হয় পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ। কীথ, টমাস, পরাঞ্জপে, দেবধর প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে এগুলো সবই ভাসবিরচিত। পক্ষান্তরে বার্ণেট, জনস্টন, পিসারোতি মন্তব্য করেন এগুলো ভাসের রচনা নয়। এ থেকেই সৃষ্ট হয় ভাসসমস্যা।

আবিষ্কৃত তেরোটি গ্রন্থের মধ্যে নিম্নোক্ত সাধারণ লক্ষণগুলো বর্তমান। যা তেরোটি নাটক ও ভাস-সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখবে।

ভাস-সমস্যার সপক্ষে যুক্তিগুলো হচ্ছে:

(ক) সূত্রধারের উপস্থিতির পর নান্দী উচ্চারণ করা হয়েছে, এতে নাটকের চরিত্রসমূহ সম্বন্ধে অস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

(খ) প্রস্তাবনাকে স্থাপনা নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

(গ) সব নাটকে 'রাজসিংহঃ প্রশাস্ত নঃ' এই জাতীয় ভরতবাক্য পরিলক্ষিত হয়।

(ঘ) পাণিনীয় ব্যাকরণ অনুসারে অশুদ্ধ প্রয়োগ সব নাটকেই বর্তমান।

(ঙ) আলঙ্কারিকেরা ভাসের *স্বপ্নবাসবদত্তের* নাম উল্লেখ করেছেন এবং তা থেকে কিছু কিছু শ্লোকও উদ্ধার করেছেন। গণপতি শাস্ত্রী আবিষ্কৃত নাটকের মধ্যে স্বপ্ননাটক নামে একটি নাটক রয়েছে।

(চ) প্রাপ্ত নাটকসমূহের প্রায় প্রত্যেকটিতেই 'নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সুত্রধারঃ' বলে সুত্রধারের মুখে নান্দীবচন দিয়ে নাটকের প্রারম্ভ সূচিত হয়েছে।

ভাস-সমস্যার বিপক্ষে যুক্তিগুলো হচ্ছে:

(ক) যে-সব লক্ষণকে ভাসরচিত নাটকসমূহের বিশিষ্ট লক্ষণ বলে মত পোষণ করা হয় সে সমস্ত লক্ষণ *মত্তবিলাস-প্রহসণ* এবং অন্য অনেক নাটকেই বর্তমান। দক্ষিণভারতে প্রাপ্ত নাটকসমূহের বৈশিষ্ট এটি। তাই মালাবারে প্রাপ্ত নাটকগুলো ভাসবিরচিত বলে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়।

(খ) অপাণিনীয় প্রয়োগগুলো লিপিকরের প্রমাদ বলেও ধরে নেয়া যায়।

(গ) ভাস *স্বপ্নবাসবদত্ত* এবং অন্যান্য নাটক রচনা করেছেন। কিন্তু আলঙ্কারিকেরা যে *স্বপ্নবাসবদত্তের* উল্লেখ করেছেন তাতে ভাসবিরচিত *স্বপ্নবাসবদত্তের* সমস্ত শ্লোক পাওয়া যায়নি। বার্ণেট বলেছেন অন্তত ছয়জন নাট্যকার *স্বপ্নবাসবদত্ত* নামে নাটক রচনা করেছিলেন।

মূলত, যে স্থলে কোনো শ্লোক উদ্ধৃত করে ভাসের নাম উল্লেখ করা হয়েছে গণপতি শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত *স্বপ্নবাসবদত্তে* সেই শ্লোক পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে এ. বি. কীথের মন্তব্য লক্ষণীয়।[৭] এভাবে ভাসই নবাবিস্কৃত নাটকগুলোর রচয়িতা কিনা এ নিয়ে পক্ষ ও বিপক্ষের সৃষ্টি হয়েছে এবং উভয় পক্ষ থেকে এত যুক্তি অবতারণা করা হয়েছে যে অকাট্য প্রমাণের অভাবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এটিই 'ভাস-সমস্যা' নামে পরিচিত। এ সমস্যা সমাধানে একটি মধ্যপন্থা গৃহীত হয়েছে। এদের মতে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উদ্দেশ্যে ভাস-রচিত নাটকগুলোকে অভিযোজিত করা হয়েছিল বলে আমরা ভাসের মূল রচনাগুলোকে পাইনি। এস. কে. দে'র মতে নাটকগুলো মঞ্চে অভিনয়ের জন্য সংক্ষিপ্ত ছিল। উপসংহারে এস. কে. দে. মহোদয়ের মত উদ্ধৃত করে একথা বলাই সমীচিন যে- "The thirteen Trivandrum plays reveal undoubted similarities not only verbal and structural, but also stylistic and ideological which might suggest unity of authorship."[৮] কেউ কেউ অনুমান করেন যে, আলোচ্য নাটকগুলোর ভরতবাক্যে যে পল্লবরাজের উল্লেখ আছে তিনি পল্লবরাজ দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণ। সম্ভবত তাঁর রাজসভাতেই আলোচিত নাটকগুলো অভিযোজিত হতো বলে নাট্যপ্রযোজক তাঁর নামের সঙ্গেই গ্রন্থের নাম যুক্ত করেছিলেন।

ভাসের কালনির্ণয় নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন। টি. গণপতি শাস্ত্রী, দীক্ষিতর, পুসলকর প্রমুখসহ পণ্ডিতপ্রবর মনে করেন ভাস খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে কোনো এক সময়ে জীবিত ছিলেন। রামাবতার শর্মা, রেড্ডি শাস্ত্রী প্রমুখের মতে খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর কোনো এক সময়ে

ভাস আবির্ভূত হয়েছিলেন। অপরাপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের এই দুই সীমারেখার মধ্যে বিভিন্ন কাল নির্ণয় করেছেন। ভাসের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে শাস্ত্রী মহাশয়ের যুক্তি ও বিভিন্ন মতামত পর্যালোচনা করে একটি সময়সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

গণপতি শাস্ত্রীর মতে-

(ক) দণ্ডী, ভামহ এবং বামন ভাসরচিত ১৩টি নাটক থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অতএব ভাস তাঁদের পূর্ববর্তী।

(খ) খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে আবির্ভূত রাজশেখর বসু, তাঁর *সূক্তিমুক্তাবলী* নামে গ্রন্থে বলেছেন- ভাসের নাটকচক্র সমালোচনার অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হলে কেবলমাত্র *স্বপ্নবাসবদত্ত* নাটকই দগ্ধ হয়নি। এতে প্রমাণিত হয় *স্বপ্নবাসবদত্ত* নাটক সর্বোকৃষ্ট ছিল এবং সর্বাঙ্গীন সাদৃশ হেতু অপর ১২টি নাটকও ভাস বিরচিত।

(গ) নাটক রচনায় ভাস প্রচলিত ভরতের নাট্যশাস্ত্রের অনুসরণ করেননি। এতে মনে হয় ভরতের নাট্যশাস্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে পাণিনি কতৃর্ক উল্লিখিত নটসূত্র কিংবা অন্য কোনো প্রাচীনতর নাট্যশাস্ত্রের অনুসরণ করে ভাস তার নাটকগুলো রচনা করেছেন। ভরতের *নাট্যশাস্ত্রে* মঞ্চোপরি নিদ্রা, যুদ্ধ, মিলন, মৃত্যু ও বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ। ভাসের *স্বপ্নবাসবদত্তে* নিদ্রা, বালচরিতে যুদ্ধ ও উরুভঙ্গে মৃত্যু দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। তাই ধরে নেয়া যায় ভাস ভরতের পূর্ববর্তী ছিলেন।

(ঘ) খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যে কোনো এক সময়ে পতঞ্জলির আবির্ভাব হয়েছিল বলে মনে করা হয়। সে সময়ে সংস্কৃত কথ্যভাষারূপে স্বীকৃত না পাওয়ায় পাণিনির সুত্রগুলো সুসংহত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভাসের রচনাশৈলী দেখে মনে হয় সংস্কৃত কথ্যভাষা থাকাকালে ভাসের আবির্ভাব হয়েছিল

(ঙ) কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে* ভাসের দুটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। ভাসের রচনায় অপাণিনীয় ব্যবহারকেই এর কারণ মনে করা হয়। সম্ভবত কৌটিল্য ‘নবং শরাবং’ শ্লোকটি ভাসের *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ* নামক নাটক থেকে উদ্ধৃত করেছিলেন। ভাস কৌটিল্যের পূর্ববর্তী। আর্থশাস্ত্রের রচনাকাল খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বে নয়।

(চ) ভাসের রচনায় যে পাটলিপুত্র নগরের উল্লেখ রয়েছে তা বুদ্ধের পরবর্তী সময়ে কালাশোকের সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

বিভিন্ন উৎস ও প্রমুখ পণ্ডিতের মতামত থেকে-

ভাসের নাটকের সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা কালিদাসের নাটকে ব্যবহৃত এই দুই ভাষার চেয়ে প্রাচীন। কালিদাসের গদ্য রচনার তুলনায় ভাসের গদ্য রচনা অনাড়ম্বর, স্বাভাবিক ও সহজবোধ্য। কালিদাসের নাটকে রাজসভার চিত্রের তুলনায় ভাসের নাটকের রাজসভার চিত্র অধিকতর সরল ও অনাড়ম্বর। কালিদাসের নাটকে রাজার সেনাবাহিনীর মধ্যে যবনীদের উল্লেখ আছে কিন্তু ভাসের নাটকে কোথাও এরূপ উল্লেখ নেই। ভাসের নাটকসমূহের মধ্যে স্থানে স্থানে ভাষা, ভাব ও চিত্রগত অনুকরণের প্রমাণ পওয়া যায়। এ সমস্ত প্রমাণ থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভাস কালিদাসের পূর্ববতী ছিলেন। ভাস অশ্বঘোষের পরবর্তীকালের। অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিতকে* লক্ষ্য করে *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণের* একটি শ্লোক রচনা করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। ভাসের রচিত নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত অশ্বঘোষের প্রাকৃতের চেয়ে প্রাচীন। এ থেকে মনে করা যায় ভাস অশ্বঘোষ ও কালিদাসের অন্তবর্তীকালে কোনো এক সময়ে বর্তমান ছিলেন। ভিন্টারনিৎস মনে করেন ভাস অশ্বঘোষ অপেক্ষাও কালিদাসের নিকটবর্তী ছিলেন।[৯]

ভাসের আবির্ভাবকাল নির্ণয় বিষয়ে টি. গণপতি শাস্ত্রীর সিদ্ধান্ত অতিশয়োক্তি হতে পারে। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন পাণিনি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ববর্তী ছিলেন। সে ক্ষেত্রে ভাস পাণিনির পূর্ববর্তী এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ভাস বৃহস্পতির অর্থশাস্ত্রের নাম উল্লেখ করেছেন। কৌটিল্যের বা চাণক্যের বলে উল্লেখ করেননি। তাই চাণক্য ভাসের নাটক থেকে উদ্ধৃত করেছেন এ সিদ্ধান্তে ভাসের ৭টি নাটকের ভরতবাক্যে 'রাজসিংহ' নামের উল্লেখ আছে। অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন নাম নয় উপাধি মাত্র। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নন্দবংশীয় কোনো রাজাকে এই রাজসিংহ বলে মনে করেন।

সবশেষে বলা যায়, ভাসের কাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া না গেলেও, ১৩টি নাটক অশ্বঘোষ ও কালিদাসের মধ্যবর্তী সময়ের এবং ভাসই এ সকল নাটকের রচয়িতা। কারণ, এই নাটকগুলোর ভাষা ও রচনাপদ্ধতি অশ্বঘোষের চেয়ে কালিদাসের নিকটবর্তী। সুতরাং অশ্বঘোষ যদি প্রথম খ্রিস্টাব্দে এবং কালিদাস তৃতীয় খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে কিংবা চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে আবির্ভূত হয়ে থাকেন তাহলে ভাসকে দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দের নাট্যকার বলা যায়। ভাস ভামহের পূর্ববর্তী। ভামহের কাল আনুমানিক খ্রি.পূ. প্রথম শতক। সেই হিসাবেও ভাসকে খ্রি.পূ. দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতকের নাট্যকার বলে ধরে নেওয়া হয়। অতএব একথা বলা যেতে পারে তেরোখানি নাটকের রচয়িতা ভাস কালিদাস থেকে একশত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ খ্রি. তৃতীয় শতকে ভাসের আবির্ভাবকাল।

ভাসের নাটকচক্রের পরিচয়:

ভাসের আবিষ্কৃত তেরোটি নাটককে ভাসের নাটকচক্র বলা হয়। ভাসের নাটকচক্রের নাট্যকাহিনীর বর্ণনাসহ কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নে আলোকপাত করা হল-

(১) *স্বপ্নবাসবদত্তঃ* কালিদাস পূর্ববর্তী নাট্যকার ভাসবিরচিত ছয় অঙ্কের নাটক *স্বপ্নবাসবদত্ত*। অন্যান্য লেখকের রচনায় নাট্যকার ভাসের নাম উল্লেখ ছাড়া ভাস সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য লিপিবদ্ধ হয়নি। দক্ষিণ ভারতের ত্রিবান্দ্রাম অঞ্চলে পুঁথি আকারে ১৯১৩ থেকে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আবিস্কৃত ১৩ খানা নাটকের মধ্যে অন্যতম নাটক *স্বপ্নবাসবদত্তম্*। এই নাটকের প্রারম্ভে "নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ" এ ধরনের বাক্য উচ্চারিত হওয়ার পর সূত্রধার প্রবেশ করেন এবং মঙ্গলাচরণ সূচক একটি শ্লোক পাঠ করেন। এই নাটকে প্রস্তাবনা শব্দের পরিবর্তে 'স্থাপনা' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। এই নাটকটি লোকবৃত্তান্ত অবলম্বনে রচিত। *স্বপ্নবাসবদত্তের* কাহিনী প্রাচীন কাল থেকে আগত উদয়ন বাসবদত্তার কাহিনী। সুপ্রচলিত বৃত্তান্ত ক্ষেমেন্দ্রের *বৃহৎকথামঞ্জরী* কাহিনীর উৎস একথাও বলা হয়। উদয়ন ও বাসবদত্তার কাহিনী সোমদেবের *কথাসরিৎসাগর*, গুণাঢ্যের *বৃহৎকথা*, শ্রীহর্ষের *প্রিয়দর্শিকা* নাটক, ধম্মপদ ও মজ্‌ঝিমনিকা গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। 'স্বপ্নপ্রধানং বাসবদত্তম্' অর্থাৎ যে বাসবদত্তা নাটকে স্বপ্নই প্রধান। অনেকে মনে করেন *স্বপ্নবাসবদত্তম্* নামকরণ সঠিক হয়নি। বাসবদত্তার পরিচয় উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রয়োজনীয় হলেও এটি নাটকের কেন্দ্রিয় ঘটনা নয়। পঞ্চম অঙ্কে সমুদ্রগৃহে স্বপ্ন ও বাস্তবের সংমিশ্রণে উদয়নের সঙ্গে বাসবদত্তার আকস্মিক মিলন সংঘটিত হয়েছিল। এই মিলন বাসবদত্তার পক্ষে বাস্তব কিন্তু বৎসরাজ উদয়নের পক্ষে 'স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু'। বাসবদত্তা স্বপ্নের মতই অদৃশ্য হয়েছিলেন। এটি স্বপ্ননাটক নামেও পরিচিত। নামের বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে স্বপ্নে দৃষ্টা। স্বপ্নদৃষ্টা বাসবদত্তা স্বপ্নবাসবদত্তা। স্বপ্নবাসবদত্তম্ অধিকৃত্য কৃতং যৎ নাটকম্ *স্বপ্নবাসবদত্তম্*'।

স্বপ্নবাসবদত্তের কাহিনী ভাসরচিত, *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণের* কাহিনীর পরবর্তী অংশ। বৎসরাজ উদয়ন অবন্তীদেশের রাজকন্যা বাসবদত্তাকে বিয়ে করে সুখে কালাতিপাত করছিলেন। সহসা তাঁর শত্রু আরুণি বৎসরাজ্যের কিছু অংশ অধিকার করলে উদয়ন পাত্রমিত্রসহ রাজধানী পরিত্যাগ করে লাবাণক নামক এক স্থানে অজ্ঞাতবাস করতে থাকেন। এর আগে দৈবজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন মগধরাজ দর্শকের ভগিনী

পদ্মাবতী উদয়নের মহিষী হলে বৎসরাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি হবে। তাই উদয়নের বিশ্বস্ত মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ চিন্তা করলেন উদয়নের সঙ্গে পদ্মাবতীর বিয়ে হলে মগধরাজ দর্শকের প্রত্যক্ষ সহায়তায় বৎসরাজ্য পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে। কিন্তু প্রিয়মহিষী বাসবদত্তার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগবশত উদয়ন অন্য কোনো রমণীকে বিয়ে করবেন এ সম্ভাবনা ছিল না। এ কারণেই মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ নৃপতি উদয়ন মৃগয়ায় গেলে গোপনে অগ্নিসংযোগ করে লাবাণকের রাজগৃহ ভস্মীভূত করলেন এবং বাসবদত্তা ও স্বয়ং যৌগন্ধরায়ণ সে আগুনে ভস্মীভূত হয়েছেন এ মিথ্যা সংবাদ প্রচার করলেন। এরপর পরিব্রাজকবেশে যৌগন্ধরায়ণ এবং অবন্তিকা বেশধারিণী বাসবদত্তাকে নিয়ে গোপনে মগধদেশের এক তপোবনে উপস্থিত হলেন। ঘটনাক্রমে সেখানে পদ্মাবতীর সাক্ষাৎ লাভ করে তাঁর হাতে বাসবদত্তাকে কিছু সময়ের জন্য সমর্পণ করে অন্যত্র চলে গেলেন। পদ্মাবতী বাসবদত্তাকে ন্যাসরূপে গচ্ছিত রাখতে সম্মত হলেন।

সে সময়ে একজন ব্রহ্মচারী আশ্রমে প্রবেশ করলেন। ব্রহ্মচারীর বর্ণনা থেকে জানা গেল- লাবাণকগ্রামে অগ্নিদাহের পর বিশ্বস্ত মন্ত্রীরা উদয়নকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যান। বিদ্যাশিক্ষার্থে লাবাণকে গেলেও ব্রহ্মচারী গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছেন। ব্রহ্মচারীর মুখে যৌগন্ধরায়ণ রাজার বর্তমান অবস্থা এবং বাসবদত্তাও তাঁর প্রতি রাজার আতিশয্যের কথা জেনে প্রীত হলেন। পদ্মাবতীও পত্নী বিয়োগকাতর উদয়নের প্রতি সমবেদনা অনুভব করলেন। কিছুদিন পর বিশেষ কাজে উদয়ন মগধরাজধানীতে এসে পৌঁছালেন। উদয়নের উচ্চকুল, জ্ঞান, বয়স ও রূপে মুগ্ধ হয়ে মগধরাজ দর্শক উদয়নকে অনুরোধ করলে উদয়ন মগধরাজকন্যা পদ্মবতীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে রাজি হন। চেটীমুখে বাসবদত্তা এই বিয়ের সংবাদ জানলেন। উদয়ন পদ্মাবতীর বিয়ে উপলক্ষ্যে সমগ্র মগধরাজ্য আনন্দে পরিপূর্ণ, কেবলমাত্র বাসবদত্তাই উদয়নকে হারানোর দুঃখে কাতর হয়ে একাকী প্রমোদবনে কালাতিপাত করছিলেন। এমন সময় চেটী এসে জানালেন মগধরাজমাহিষীর নির্দেশমত বাসবদত্তাকেই পদ্মাবতীর বিয়ের মালা গেঁথে দিতে হবে। বাসবদত্তাও দুঃখ সংবরণ করে মালা গেঁথে দিলেন।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথমাংশে পদ্মাবতী, বাসবদত্তা ও চেটীর সাক্ষাৎ মেলে। পদ্মাবতী শেফালিকাগুচ্ছের শোভায় বিমুগ্ধা। উদয়ন বিদূষককে সঙ্গে নিয়ে প্রমোদবনে এসে উপস্থিত হন। উদয়ন ও বিদূষককে একসঙ্গে দেখে বাসবদত্তার মনে পূর্বস্মৃতি জাগে। সেখানেই ভ্রমরের ইতস্তত বিচরণে প্রমোদবন থেকে সকলে মণ্ডপের সামনে অবস্থান নিলেন। প্রমোদবনকে জনশূন্য মনে করে বিদূষক রাজার কাছে পূর্বের দেবী বাসবদত্তা এবং আর্যা পদ্মাবতী এই দু'জনের মধ্যে উদয়নের কাছে কে বেশী প্রিয় জানতে চাইলে রাজা জানালেন 'পদ্মাবতী রূপে গুণে তাঁর প্রিয়পাত্রী হলেও বাসবদত্তার প্রতি প্রেমাবদ্ধ তাঁর মনকে এখনও হরণ করতে পরেননি'।[১০]

একদিন পদ্মাবতীর শিরঃপীড়ার কথা শুনে তাকে দেখার জন্য বাসবদত্তা সমুদ্রগৃহে যান। সেখানে ক্ষীণ প্রদীপের অস্পষ্ট আলোকে এক শয্যায় উদয়ন নিদ্রিত ছিলেন। বাসবদত্তা তাঁকেই পদ্মাবতী মনে করে তার পাশে শুয়ে পড়েন। এমন সময় স্বপ্ন দেখে উদয়ন 'হা বাসবদত্তা' বলে সম্বোধন করলেন এবং বাসবদত্তার উদ্দেশ্যে অনেক কথা বলেন। স্বপ্নের শেষ পর্যায়ে উদয়ন বিরচিকার জন্য বাসবদত্তাকে প্রসন্ন করার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ালেন। কেউ দেখে ফেলতে পারে এই আশঙ্কায় বাসবদত্তা সেই মুহূর্তে সেই স্থান পরিত্যাগ করতে উদ্যত হলেন। যাওয়ার আগে উদয়নের যে হাত শয্যা থেকে ঝুলে পড়েছিল তা শয্যায় তুলে দিতে গেলে সে স্পর্শে উদয়নে জেগে উঠলেন। বাসবদত্তাকে দেখে তাঁকে ধরতে গেলেন, কিন্তু দরজায় বাধা পাওয়ায় তাঁর গতি রুদ্ধ হল। ইত্যবসরে বাসবদত্তা প্রস্থান করলেন। এরপর বিদূষক ফিরে এলে রাজা তাঁকে বাসবদত্তাকে দেখার কথা জানালে বিদূষক বললেন রাজা বাসবদত্তার চিন্তায় মগ্ন। তাই তাঁকে তিনি স্বপ্নে দেখেছেন সে কথা শুনে উদয়ন বললেন: 'এ যদি তাঁর স্বপ্ন হয় তাহলে সে স্বপ্ন না ভাঙাই ভালো। এ যদি দৃষ্টিবিভ্রম হয় তাহলে সে ভ্রম যেন চিরস্থায়ী হয়'।[১১] সমগ্র নাট্যকাহিনীর বিস্তারে, এই স্বপ্ন দৃশ্যের অবতারণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর অব্যবহিত পরেই কাঞ্চুকীয়ের মারফৎ সংবাদ এল, মগধরাজ দর্শক এবং উদয়নের মন্ত্রী

রুমণ্বান সসৈন্যে উদয়নের শত্রু আরুণির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করার জন্য সজ্জিত হয়ে অপেক্ষা করছেন। একথা শুনে উদয়ন ও যুদ্ধযাত্রার জন্য উদ্যোগী হলেন। এখানেই পঞ্চম অঙ্কের সমাপ্তি।

উদয়ন সসৈন্যে শত্রুকে পরাজিত করে বৎসরাজ্য উদ্ধার করলেন। পদ্মাবতীর সঙ্গে বিবাহের পর মগধরাজের সহায়তায় উদয়ন বৎসরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু উদয়নের মনে বাসবদত্তার স্মৃতি এখনও অম্লান। এসময়ে একদিন অবন্তীরাজ্য থেকে বাসবদত্তার পিতা প্রদ্যোত ও মাতা মহাদেবী উদয়নের বিজয়লাভে আনন্দিত হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানানোর জন্য কাঞ্চুকীয় ও বাসবদত্তার ধাত্রীকে বৎসরাজ্যে প্রেরণ করলেন। বাসবদত্তার অগ্নিদগ্ধা হয়ে মৃত্যুবরণ করার সংবাদ তাঁরা জেনেছিলেন। উদয়নের চিত্তবিনোদনের জন্য উদয়ন বাসবদত্তার দু'টি ছবি কাঞ্চুকীয় ও ধাত্রীর মাধ্যমে উদয়নের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। উদয়নের সঙ্গে উপবিষ্ট পদ্মাবতী ছবি দেখতে আগ্রহী হলেন। চিত্রে অঙ্কিত বাসবদত্তার প্রতিকৃতি দেখে পদ্মাবতী জানালেন, এই প্রতিকৃতিসদৃশ এক রমণী তারই অন্তঃপুরে বসবাস করছেন। এক ব্রাহ্মণ ভগিনী পরিচয়ে তাঁকে তাঁর কাছে ন্যাসরূপে রেখেছেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই ব্রাহ্মণবেশী যোগন্ধরায়ণ পদ্মাবতীর কাছে ন্যাসরূপে রক্ষিতা ভগিনী বাসবদত্তাকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য সেখানে এলেন। উদয়নের হিতার্থেই বাসবদত্তাকে উদয়নের কাছ থেকে যৌগন্ধরায়ণ দূরে রেখেছিলেন। বর্তমানে তাঁর উদ্দেশ্য সফল। উদয়নও সমৃদ্ধিলাভ করেছেন। উদয়ন সব কিছু জানার পর কি বলবেন এই চিন্তায় তাঁর মন উদ্বিগ্ন ছিল। এরপর আবন্তিকাবেশী বাসবদত্তাকে রাজসভায় নিয়ে আসা হল, বাসবদত্তার ধাত্রী তাঁকে দেখেই চিনে ফেলেন। বাসবদত্তা ও যৌগন্ধারায়ণ উভয়েই আত্মপ্রকাশ করে উদয়নের জয়বার্তা ঘোষণা করেন। বাসবদত্তাকে অপসারিত করার জন্য যৌগন্ধরায়ণ রাজার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। রাজা উদয়ন, বিচক্ষণের মত তাঁর হিতৈষণা ও কর্মকুশলতার প্রশংসা করেন।[১২] বাসবদত্তার দর্শনে উন্মুখ উদয়ন তখন বলেন- 'একি সত্য না স্বপ্ন যে আমি তাঁকে পুনরায় দেখতে পাচ্ছি'।[১৩] পদ্মাবতী ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী বাসবদত্তার কাছে নতমস্তকে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এভাবে উদয়ন বসবদত্তার পুনর্মিলন সংঘটিত হল। বাসবদত্তাও সাদরে পদ্মাবতীকে গ্রহণ করলেন। বাসবদত্তার পিতামাতাকে কন্যার কুশলবার্তা জানানোর জন্য স্থির হল যে তারা সকলে পদ্মাবতীসহ অবন্তীরাজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। এরপর ভরতবাক্য পাঠের মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি ঘটল।

স্ত্রীচরিত্রে এরূপ উদারতা, নিষ্কামতা ও দাম্পত্য সুখের বাসবদত্তাই এই নাটকের প্রধান নায়িকা। নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাসবদত্তার ভুমিকাই প্রধান। যৌগন্ধরায়ণের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির তিনিই প্রধান অবলম্বন। এই কাহিনী সোমদেবের কথাসরিৎসাগরের কাহিনীরই প্রতিচ্ছবি বললে অত্যুক্তি হয় না। নিচের উদ্ধৃতিই তার জ্বলন্ত প্রমাণ-

"এবং স রাজা বৎসেশঃ ক্রমেণ সুতরামভূৎ।

প্রাপ্তবাসবদত্তস্তৎসুখাসক্তৈকমানসঃ ॥"[১৪]

তাই যথার্থই বলা যায়: "The Svapnavasavadatta is a noble creation of the poet't brain. It depicts conjugal love in a most exalted form and is a noble heritage left to us by the great poet"[১৫]

(২) ***প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ*:** সংস্কৃত সাহিত্যে ভাসের চার অঙ্কের একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক নাটিকা। নাটিকাটির প্রধান ইতিবৃত্তই রাজনৈতিক। রাজনৈতিক হলেও উদয়ন ও বাসবদত্তার প্রেম কাহিনীই প্রধান বিষয় হিসেবে পাঠক সমাজের কাছে বিবেচিত। উজ্জয়িনীর রাজা মহাসেন প্রদ্যোত নিজ কন্যা বাসবদত্তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধে আবদ্ধ করার ইচ্ছায় বৎসরাজ-উদয়নকে বন্দী করেন। তৎক্ষণাৎ বিচক্ষণ ও কৌশলী মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ প্রভু উদয়নকে কারাগার থেকে মুক্ত করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন এবং অবশেষে সে প্রতিজ্ঞা সফলও করতে পেরেছেন। একারণেই নাটিকাটির নাম *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ*।

(৩) ***প্রতিমানাটক:*** *রামায়ণের* অযোদ্ধা ও অরণ্য কাণ্ডের কাহিনী অবলম্বনে ভাস নিজ কল্পনার বিস্তার ঘটিয়ে সাত অঙ্কের উৎকৃষ্ট এই নাটক সৃষ্টি করেছেন। রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সময় কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার বনগমন, রাজা দশরথের মৃত্যু, মাতুলালয় থেকে ভরতের অযোদ্ধায় প্রত্যাগমন এবং রামকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁর বনগমন, রামকর্তৃক ভরতকে প্রত্যাখ্যান, রাবণের কর্তৃক সীতার অপহরণ, রামচন্দ্রের সীতা উদ্ধার, অযোদ্ধায় প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যভার গ্রহণ পর্যন্ত বৃত্তান্ত সুন্দরভাবে নাটকটিতে বর্ণনা করা হয়েছে। মাঝপথে ভরত মাতুলালয় থেকে অযোদ্ধায় উপনীত হয়ে এক দেবমন্দিরে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে দেখলেন তাঁর স্বর্গত পিতৃপুরুষদের সঙ্গে পিতা দশরথের প্রতিমাও স্থান পেয়েছে, এথেকেই তিনি পিতার মৃত্যুর কথা বুঝতে পারলেন। এই কারণেই নাটকটির নাম হয়েছে *প্রতিমানাটক*।

(৪) ***অভিষেকনাটক:*** *রামায়ণের* কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর ও লঙ্কাকাণ্ডের ঘটনাবলী অবলম্বনে ছয় অঙ্কের এই নাটক। সীতাহরণের পর রামচন্দ্রের বালীবধ, সুগ্রীবের মৈত্রীলাভ, হনুমানের সীতা অন্বেষণ, অশোকবনে সীতার সাথে রাবণের ও পরে হনুমানের কথোপকথন, হনুমান কর্তৃক লঙ্কাদহন, রাবণের ভাই বিভীষণের রামচন্দ্রের কাছে আশ্রয়গ্রহণ, যুদ্ধে রাম কর্তৃক রাবণের মৃত্যু, সীতাকে উদ্ধার ও তাঁর অগ্নিপরীক্ষা এবং রামের অভিষেক পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ নাটকে পাওয়া যায়। সুগ্রীব, বিভীষণ এবং রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের উল্লেখ থাকায় নাটকের নামকরণ হয়েছে *অভিষেকনাটক*।

(৫) ***পঞ্চরাত্র:*** *মহাভারতের* বিরাট পর্বের বিষয় অবলম্বন করে তিন অঙ্কের এই নাটকটি রচিত। বার বছর বনবাসের পর দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবগণ বিরাটরাজের প্রাসাদে ছদ্মবেশে বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হয়ে অজ্ঞাতবাস করছিলেন। অতি নিকট ভবিষ্যতে কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে এক মহাযুদ্ধ অশঙ্কা করে দ্রোণাচার্য উভয় পক্ষকে ঐক্যবদ্ধ করবার চেষ্ঠা করছিলেন। এজন্য তিনি দুর্যোধনকে এক যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ দিলেন। যজ্ঞ শেষে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলে দ্রোণাচার্য পাণ্ডবদের জন্য অর্ধেক রাজ্য দাবী করেন। শকুনির পরামর্শে দুর্যোধন পাঁচ রাত্রির মধ্যে অজ্ঞাতবাসী পাণ্ডবদের সন্ধান করতে পারলে, দ্রোণকে অর্ধেকরাজ্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। তারপর দুর্যোধন কর্ণসহ সকলে গোধন-অপহরণ করার জন্য সৈন্যসামন্তসহ বিরাট রাজ্যে গেলেন। কিন্তু ছদ্মবেশী অর্জুনের সহয়াতায় বিরাট রাজার সৈন্যদল যুদ্ধে জয়লাভ করে। অবশেষে ভীষ্মের কাছে পাণ্ডবদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং দুর্যোধন প্রতিশ্রুতিমত অর্ধেকরাজ্য প্রদান করেন। পাঁচ রাত্রির মধ্যে পাণ্ডবদের সন্ধান সংগ্রহের বিষয়টি থাকায় নাটকটির নামকরণ সার্থক হয়েছে।

(৬) ***দূতঘটোৎকচ:*** *মহাভারতের* কাহিনী অবলম্বনে একাঙ্ক নাটক। কৌরবপক্ষের সপ্তরথী অন্যায় যুদ্ধে অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু কৌরবদের হাতে নিহত হন। শোকাহত ও ক্রুদ্ধ অর্জুন পুত্রহত্যাকারীকে বধ করার জন্য প্রতিজ্ঞা করেন। সেই সময় ভীমপুত্র ঘটোৎকচ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত হন এবং কৌরব সভায় উপস্থিত হয়ে কৌরবদের আসন্ন অমঙ্গলের কথা জানালে দুর্যোধনের সঙ্গে তাঁর যে বাদানুবাদ হয় সেটিই এই নাটকের বিষয়বস্তু। স্বল্পপরিসরে এই নাটকে ৫২টি শ্লোক ঠাঁই করে নিয়েছে কিন্তু নাটকীয়তা কোথাও ব্যাহত হয়নি।

(৭) ***মধ্যমব্যায়োগ:*** সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের মধ্যে ব্যায়োগ নামে যে ভেদটি রয়েছে এই একাঙ্ক নাটক যে তারই উদাহরণ তা নাটকের নামকরণই বলে দেয়। মহাভারতীয় চরিত্র অবলম্বনে রচিত হলেও নাটকীয় বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে মহাকবি ভাসের কল্পনা প্রসূত। মধ্যম পাণ্ডব ভীমের রাক্ষসীপত্নী হিড়িম্বার গর্ভজাত পুত্র ঘটোৎকচ। কেশবদাস নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁর তিনপুত্র ও পত্নীসহ বনের মধ্যে উপস্থিত। জননীর নররক্তপিপাসা চরিতার্থ করতে ঐ ব্রাহ্মণ দম্পতীর কাছে মধ্যম পুত্রকে দাবী করেন। কোনো উপায় না পেয়ে ব্রাহ্মণ পুত্রকে রক্ষার জন্য, ভীমের কাছে প্রার্থনা করেন। ভীম এবং ঘটোৎকচ অর্থাৎ পিতা এবং পুত্র পরস্পরের কাছে অচেনা ছিলেন। ব্রাহ্মণপুত্র বনের মধ্যে থেকে জল পিপাসা শেষ করে আসতে দেরী দেখে ঘটোৎকচ মধ্যম মধ্যম বলে সজোরে ডাকতে থাকেন। ব্রাহ্মণের মধ্যমপুত্রের পরিবর্তে মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেন

এসে উপস্থিত হন এবং ব্রাহ্মণপুত্রকে ছেড়ে দিতে বলেন। শুরু হয় দুই বীরের মধ্যে যুদ্ধ। অবশেষে হিড়িম্বার মাধ্যমে পিতাপুত্রের পরিচয় প্রকাশ পায় এবং তাঁদের মিলন ঘটে। পক্ষান্তরে মধ্যম পুত্রসহ ব্রাহ্মণ পরিবারও রক্ষা পায়। বনবাসকালে মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেনের সঙ্গে তাঁর পুত্র ঘটোৎকচ ও পত্নী হিড়িম্বার মিলন ঘটানোই নাট্যকারের উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্য লেখকের সিদ্ধ হয়েছে।

(৮) ***কর্ণভার:*** *মহাভারতের* বিষয়বস্তু অবলম্বনে ভাসের নাটকচক্রের মধ্যে সর্বাধিক ক্ষুদ্র একাঙ্ক নাটক। অর্জুনের সঙ্গে কর্ণ যুদ্ধ করার জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এমন সময় ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ইন্দ্র এসে দান প্রার্থনা করেন। ব্রাহ্মণ যা চাই তা দিতে কর্ণ প্রতিশ্রুতি দিলেন। কর্ণের যে আত্মরক্ষার উপকরণ অতীন্দ্রিয় কবচকুণ্ডল ছিল কর্ণ কী করে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশী ইন্দ্রের চাতুর্য্যে তাঁকে তা দান করেন নাটকে তাই-ই দেখানো হয়েছে। দান পেযে পরিতৃপ্ত ইন্দ্র চলে যাওয়ার পরেই এক দেবদূত জানালেন যে কবচকুণ্ডল গ্রহণ করে ইন্দ্র অনুতপ্ত হয়ে প্রতিদান স্বরূপ 'বিমলা' নামক অস্ত্র দিয়েছেন। কর্ণ প্রতিদান গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন কিন্তু ব্রাহ্মণবাক্যের অন্যথা করতে পারলেন না। মহাভারতের ভাগ্যবিড়ম্বিত কর্ণচরিত্রের ঔদার্য, মহত্ব ও দানগৌরব দেখানো নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল এবং সে উদ্দেশ্যে তিনি সফল হয়েছেন।

(৯) ***উরুভঙ্গ:*** ভাসের একাঙ্ক এই নাটকের অপর নাম *'গদাযুদ্ধম্'*। ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের যতগুলো সংস্কৃত নাটক আছে তার মধ্যে ভাসের করুণরসাত্মক উরুভঙ্গই একমাত্র বিয়োগান্ত নাটক। ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ, ভীম কর্তৃক অন্যায়ভাবে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ, দুর্যোধনকে দেখার জন্য ধৃতরাষ্ট্র গান্ধাবীর কুরুক্ষেত্রে গমন, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধাবীর শোক, অশ্বত্থামার আগমন ও রাত্রিতে পাণ্ডবদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করার প্রতিজ্ঞা, অশ্বত্থামা কর্তৃক দুর্যোধনের পুত্র দুর্জয়কে রাজা বলে ঘোষণা, দুর্যোধনের সন্তোষ ও রঙ্গমঞ্চেই মৃত্যু, ধৃতরাষ্ট্রের তপোবনে গমনের সংকল্প এবং অশ্বত্থামার ঘুমন্ত পাণ্ডবদেরকে হত্যা করার জন্য প্রস্থান নাটকের বিষয়বস্তু।

(১০) ***দূতবাক্য:*** *মহাভারতের* সভাপর্বের কাহিনীই এর বিষয়বস্তু। আসন্ন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে কৌরব-পাণ্ডব উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের আগ্রহ ও প্রচেষ্ঠা এই একাঙ্ক নাটকের উপজীব্য। এই নাটকে শান্তিপ্রস্তাব নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের দূতরূপে কৌরবসভায় আগমন, দুর্যোধন কর্তৃক কৃষ্ণের প্রস্তাব অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখান এবং যুদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণ, অবমানিত শ্রীষ্ণের দ্বারা বিশ্বরূপ প্রদর্শন এবং ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসাপূর্বক আতিথ্যপ্রদর্শন ইত্যাদি ঘটনা পর পর নাটকে বর্ণিত হয়েছে।

(১১) ***বালচরিত:*** *মহাভারতের* পরিশিষ্ট 'হরিবংশ' অবলম্বনে কৃষ্ণের বাল্যকালীন অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপকে কেন্দ্র কওে পাঁচ অঙ্কের বালচরিত নাটকটি রচিত হয়েছে। এই নাটকে ভাস কৃষ্ণকে সম্পূর্ণভাবেই ভগবান বিষ্ণুর অবতাররূপে কল্পনা করে ভক্তিরসাপ্লুত চিত্তে তাঁর মহিমা বর্ণনা করেছেন। কংসের কারাগৃহে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হতে আরম্ভ করে কংসবধ ও উগ্রসেনের অভিষেক পর্যন্ত তাঁর সমস্ত বাল্যলীলা ও অলৌকিক কার্যাবলী নাটকে সন্নিবেশিত হয়েছে।

(১২) ***চারুদত্ত:*** ভাসের কাল্পনিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই প্রকরণটি এবং এটির কথাবস্তু যুবক-যুবতীর পারস্পরিক ভালোবাসা। প্রকরণটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে এবং চারটি অঙ্ক আছে। চরিত্রসৃষ্টি ও রসসৃষ্টির প্রয়োজনে ভাস মূলকাহিনীর অদলবদলে কুণ্ঠিত হননি। শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক* সম্ভবত ভাসরচিত চারুদত্তেরই বর্ধিত সংস্করণ। এই জন্য প্রকরণের অধিকতর বিকাশ হয়েছে পরবর্তীকালে রচিত শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণে। ভাসের এই প্রকরণটির কল্পিত বিষয়বস্তু অবলম্বন করে শূদ্রক দশ অঙ্কের *মৃচ্ছকটিক* রচনা করেছেন বলে অনেকেই মনে করেন। শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণের মতোই চারুদত্তের কাহিনীও ব্রাহ্মণ চারুদত্তের ও গণিকা বসন্তসেনার প্রেমকাহিনীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। প্রকরণ দুটির শুধুমাত্র কাহিনীতেই নয়, ঘটনাবিন্যাসেও মিল আছে, এমন কি কিছু কিছু শ্লোকও একই প্রকারের। এই সমস্ত মিল থেকে সমস্যা

দেখা দিয়েছে যে, কোন্ প্রকরণটি পূর্ববর্তী এবং ভাস ও শূদ্রক এদের কে কার থেকে বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন। চারুদত্তের লুপ্ত অংশটি পাওয়া না গেলে এ সমস্যার সঠিক সমাধান হবে মনে হয় না।

(১৩) ***অবিমারক*: **অজ্ঞাতপরিচয় এক চণ্ডালযুবকের সঙ্গে রাজকন্যার প্রেমকাহিনী অবলম্বনে ছয় অঙ্কের মিলনাত্মক নাটক। নাটকটির বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ স্বকপোল-কল্পিত। প্রকৃতপক্ষে চণ্ডালযুবক সৌবীররাজের পুত্র বিষ্ণুসেন; ঋষির অভিশাপে তিনি এক বছরের জন্য চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত ও মেষের রূপধারী হয়ে কুন্তীভোজনগরে বাস করার সময়ে অবি নামক এক অসুরকে হত্যা করে '*অবিমারক*' নামে খ্যাত হন। একদিন বিষ্ণুসেন মাতুল-কন্যা কুরঙ্গীকে এক বন্য হাতির হাত থেকে রক্ষা করেন। সেই ঘটনার পর থেকে উভয়ের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হয়। কিন্তু তাঁর চণ্ডালপরিচয় কুরঙ্গীর সঙ্গে প্রেমে বাধা সৃষ্টি করে। তিনি এবং কুরঙ্গী দুজনেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আত্মহত্যায় উদ্যত হন, কিন্তু অলৌকিভাবে উভয়েরই প্রাণরক্ষা হয়। পরে নারদমুনি এসে কুন্তীভোজকে আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত জানালেন এবং তার নির্দেশে কুন্তীভোজ অবিমারকের (বিষ্ণুসেন) সঙ্গে কুন্তীর বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করলেন।

ভাস কালিদাস পূর্বযুগের একজন প্রতিথ যশা শক্তিমান্ নাট্যকার। তেরো খানি নাটকই যে একই ব্যক্তির অথাৎ ভাসের রচনা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। রচনাশৈলী, বিষয় বর্ণনায় নৈপূণ্য, চরিত্র চিত্রণের চাতুর্য, ভাষার সারল্য, ভাবের গাম্ভীর্য, অপূর্ব শব্দচয়ন কৌশল, ভাসের নাটকচক্রের প্রায় সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. "প্রথিতযশসাং ভাসকবিপুত্রসৌমিল্লকাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্তমান কবেঃ কালিদাসস্য ক্রিয়ায়াং কথং পরিষদো বহুমানঃ।"–কালিদাস, *মালবিকাগ্নিমিত্রম্*, হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ সম্পা.(নকীপুর: সিদ্ধান্তযন্ত্র, ২য় সংস্করণ, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ), ১ম অঙ্ক, পৃ. ৭।

২. "সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ।

৩. সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব ॥"–বাণভট্ট, *হর্ষচরিতম্* , পি. ভি. কানে সম্পা. (বোম্বে: নির্ণয় সাগর প্রেস, ১৯১৮), ১/১৫, পৃ. ২।

৪. Bhasa, *Svapnavasavadattam*, M. R. Kale, ed. (Delhi: Motilal Banarasidass Publishers Ltd., Reprint, 1991), Introduction, p. xxi.

৫. "নবং শরাবং সলিলস্য পূর্ণং সুসংস্কৃতং দর্ভকৃতোত্তরীয়ম্।

৬. তত্তস্য মা ভূন্নরকং চ গচ্ছেৎ যো ভর্তৃপিণ্ডস্য কৃতে ন যুধ্যেৎ ইতি ॥" কৌটিল্য, *কৌটিলীয়ার্থশাস্ত্রম্*, ২য় খণ্ড, মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা.(কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০১), ১০.৩.৫, পৃ. ৪৯২।

৭. "লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ।

৮. অসৎপুরুষসেবেব দৃষ্টির্বিফলতাং গতা ॥" *ভাসনাটকচক্রম্* সি. আর. দেবধর সম্পাদিত, (পুণা: ওরিয়েন্টাল বুক এজেন্সি, ১৯৩৭ খ্রি.)। (বালচরিত, ভাস)

A. B. Keith, *The Sanakrit Drama* (London: Oxford University Press, 1924), p. 91.

৯. "The ascription of the Svapnavasavadtta to Bhasa gives us the right to accept his authorship of the rest if internal evidence supports it. That this is so undeniable even by those who suspect the attributon to Bhasa, the coincidences in technique, in the Prakrits, in metre and in style are overwhelming." A. B. Keith, *The Sanskrit Drama*, op. cit., p. 93.

১০. S. K. De, *History of Sanskrit Literature* (Calcutta: Calcutta University press, 1947), P.107.

১১. "In language and style the dramas are nearly to Kalidasa than Asvaghosa .... I don't believe that he preceded Kalidasa by more than a hundred years." M. Winternitz, *A History of Sanskrit Literature*, vol.1(Calcutta: University of Calcutta, 1928), p. 25.

১২. "পদ্মাবতী বহুমতা মম যদ্যপি রূপশীলমাধুর্যৈঃ।

১৩. বাসবদত্তবদ্ধং ন তু তাবন্মে মনো হরতি ॥" Bhasa, *Svapnavasavadattam,* M. R. Kale, ed.(Delhi: Motilal Banarasidass Publishers Ltd., 3rd edtn, 1991), 4/4, p. 35.

---

১৪. "যদি তাবদয়ং স্বপ্নো ধন্যমপ্রতিবোধনম্।
১৫. অথায়ং বিভ্রমো বা স্যাদ্ বিভ্রমো হ্যস্তু মে চিরম্ ॥" *Ibid.*, 5/9, p. 50.
১৬. "মিথ্যোন্মাদৈশ্চ যুদ্ধৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ মন্ত্রিতৈঃ।
১৭. ভবদ্‌যন্তৈঃ খলু বয়ং মজ্জমানাঃ সমুদ্ধৃতাঃ ॥" *Ibid.*, 6/18, p. 64.
১৮. "কিং নু সত্যমিদং স্বপ্নঃ সা ভূয়ো দৃশ্যতে ময়া।" *Ibid.*, 6/17, p. 64.
১৯. সোমদেবভট্ট, *কথাসরিৎসাগর*, কে. পি. পরব সম্পা(বোম্বেঃ নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৮৮৯ খ্রি.), ১/৩, পৃ.৩৫।
২০. *Ibid.*, p. xxxiii.

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

শিবলী নুমানী ও উর্দু গদ্য সাহিত্য : একটি পর্যালোচনা
(A Review of Shibli Numani and Urdu Prose Literature)

মোসা: নাহিদা আক্তার [*]

Abstract: Allama Shibli Nomani was an Islamic scholar, poet, philosopher, historian, educational thinker, author, orator, reformer and critic of orientalists from Indian subcontinent during the British Raj. He is regarded as the father of Urdu historiography. He was also proficient in Arabic and Persian languages. He is considered as the father of modern history writing in Urdu language. He is considered one of the first historical critic in Urdu literature. He has a foothold in all branches of literature. An attempt was made to reconcile the old traditions of Islam with modern thought The Islamic literature produced in Urdu from 1910 to 1936 is largely Shibli's ancient and The result of the coordination of mode. His influence on the religious sentiments of the Muslims in the sub-continent is not insignificant Urdu literature became more rich with the touch of his versatile talent. His contribution to the revival of scholarly society, the accurate portrayal of Islamic traditions and the creation of literary groups inspired by Islamic values is unforgettable.

ভূমিকা

উর্দু সাহিত্যের বিখ্যাত একজন লেখক হলেন আল্লামা শিবলী নু'মানী। স্যার সাইয়্যেদ আহমদ, মোহাম্মদ হোসাইন আযাদ, ডেপুটি নযির আহমদ, আলতাফ হোসাইন হালি এবং শিবলী উর্দু সাহিত্যের মাঝে যে অবদান রেখেছেন তা আজও চির অক্ষয় হয়ে আছে। শিবলী ইসলামি সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তার ক্ষুরধার লেখার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। সিরাত থেকে শুরু করে জীবনী সাহিত্য, গজল, কাসিদা, মার্ছিয়া সকল শাখায় তার কলম চলেছিল বিরামহীন। তাঁর প্রায় লেখার মাঝেই ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামী ও অসত্য বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করার দিকটি ফুটে উঠেছে। ইসলামি আকীদা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নির্ভুল বিষয়গুলো তিনি তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর লেখায় বুদ্ধি ও যুক্তিভিত্তিক কিছু নিয়ম দেখা যায়।

শিবলীর লেখায় ছিল উদারতার বহিঃপ্রকাশ। আলিগড় যাবার পূর্বে শিবলী শুধু একজন মৌলভি ছিলেন। এই রত্ন মানুষটির প্রতি স্যার সাইয়্যেদ আহমদের দৃষ্টি পড়ে। তিনি তাকে নিজের কাছে নিয়ে যান। তাঁর কলেজের প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ দান করেন। স্যার সাইয়্যেদ আহমদের সহচার্য, তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমৃদ্ধশালী গ্রন্থশালা মৌলভী শিবলীকে ক্ষুরধার সাহিত্যিকে পরিণত করে। ইসলামের হারানো ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে তিনি "ইসলামে খ্যাতিমান লোকদের অবদান" শীর্ষক আলোচনার অধিনে খ্যাতিমান লোকদের জীবন চরিত রচনা করেন। এদের মধ্যে খলিফা মামুনুর রশিদ, ইমাম আবু হানিফা, মাওলানা রুমী, ফারুকে আযম হযরত ওমর (রাঃ) এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনী রচনা শিবলীর অসাধারণ কৃতিত্ব।[১]

ক্ষণজন্মা এই মানুষটি ৪ জুন ১৮৫৭ সালে ভারতের আযমগড়ে বিন্দুল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পিতা আযমগড়ের একজন খ্যাতিমান উকিল ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা মাদ্রাসায়ে চশমায়ে রহমত গাজীপুর থেকে অর্জন করেন। ফারসি ও আরবি ভাষায় পন্ডিত শিক্ষক মাওলানা ফারুক চিড়িয়াকোটি তাঁর প্রাথমিক শিক্ষক ছিলেন। নয় বছর থেকে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। শিবলী নু'মানী ছাত্র জীবন থেকেই ফিকাহ শাস্ত্রের

[*] এম.ফিল গবেষক, উর্দু বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উপর বাহাস ও লেখার জগতে সম্পাদনার কাজে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। "রিসালা জিল্লুল গমাম ফি মাসআলাতে কেরাত খলফাল ইমাম" এবং "রিসালা ইসকাতুল মুতাআদদি আলা ইনসাতিল মুতাআদি" ঐ সময়কার অবদান। শিবলী উনিশ বছর বয়সে ১৮৭৬ সালে স্বপরিবারে হজ্জে গমন করেন। ১৮৮২ সালে আলিগড় যান এবং স্যার সাইয়্যেদ আহমদের সাক্ষাত লাভ করেন। ১৮৮৩ সালে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসর পদে নিয়োগ পান। ১৮৮৩ সালের ২০শে জুন শিবলী ন্যাশনাল স্কুলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।[২]

স্যার সাইয়্যেদ আহমদ এবং প্রফেসর আরল্যান্ড, শিবলীর মাঝে অদম্য জ্ঞান স্পৃহা জাগিয়ে তোলেন। শিবলীর কলম চলতে থাকে। ছোট ছোট ঐতিহাসিক প্রবন্ধ এবং জাতীয় কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে শিবলীর পথ চলা শুরু হয়। ১৮৮৮ সালে শিবলী তাঁর জনপ্রিয় প্রবন্ধ 'মুসলমানুকি গুযাসতা তা'লিমা এবং মসনবী সুবহে উমিদ রচনা করেন। এর পরপরই তিনি ইসলামে খ্যাতিমান ব্যক্তিদের নিয়ে লেখা শুরু করেন। ১৮৮৮ সালে তিনি কাসিদা লেখা শুরু করেন। ১৮৮৯ সালে "আল যিযিয়া" নামক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৮৯০ সালে রচনা করেন "সিরাতুন নো'মান"। ১৮৯১ সালে ছাত্রদের জন্য "বদউল ইসলাম" নামক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ঐ বছরে তিনি আলিগড় কলেজের জন্য একটি ফারসি কবিতা লেখেন। ১৮৯২ সালে রচনা করেন "কুতুব খানায়ে এসকান্দারিয়া"।[৩] ১৮৯৩ সালে তাঁর রচিত "সফর নামায়ে রুম মিসর ওয়া সাম" এবং "কুল্লিয়্যাতে শিবলী" প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪ সালে তৎকালীন ভারত সরকার তাঁকে শামসুল উলামা উপাধিতে ভূষিত করে। ১৮৯৪ সালের এপ্রিল মাসে কানপুরের একটি জনসভায় শিবলী নদওয়াতুল উলামার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। এরপর হায়দারাবাদে প্রতিষ্ঠিত করেন দায়েরাতুল মা'রেফ। ১৮৯৫ সালে রচনা করেন "হুকুকুয্ যিম্মিয়াইন" নামক একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ। জাতীয় রাজনীতিতে শিবলী ছিলেন তুর্কী সমর্থক। ১৮৯৫ সালে আর্মেনীয়া এবং তুর্কী স্থানের মাঝে গোলযোগ সৃষ্টি হলে জাতীয় চেতনায় শিবলী ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। ভারতীয় রাজনীতিতে শিবলী ছিলেন ন্যাশনাল কংগ্রেস এর সমর্থক। ১৮৯৭ সালে শিবলীর রচিত "রেসালায়ে শিবলী" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[৪]

এতে তিনি বর্তমানে হারিয়ে যাওয়া ইসলামি আদর্শগুলো তুলে ধরেন। ১৮৯৮ সালে স্যার সাইয়্যেদ এর মৃত্যুর পর শিবলী আলিগড় থেকে চলে আসেন। জুলাই ১৮৯৮ সালে সুস্থতা লাভে শিবলী কাশ্মির গমন করেন। তাঁর জনপ্রিয় গ্রন্থ "আল ফারুক" এর দ্বিতীয় অংশটি এখানেই লিখে শেষ করেন । ১৮৯৮ সালে '"আল ফারুক" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।[৫] শিবলী ১৯০১ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত হায়দারাবাদে "সরে রেশতায়ে উলুম ওয়া ফুনুন" এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। হায়দারাবাদ থাকাকালীন রচনা করেন "আল গাজ্জালি" (আগষ্ট ১৯০২) এবং "ইলমুল কালাম" (১৯০৩)। ১৯০৩ সালে শিবলী সিরাতুন্নবীর কাজ শুরু করেছিলেন। কাজের ধারাবাহিকতা মনঃপুত না হওয়ায় কিছুদিন এর কাজ বন্ধ রাখেন। ১৯০৪ সালে তাঁর রচিত "আল কালাম" বইটি প্রকাশিত হয়। "সাওয়ানেহে মাওলানা রুম" হায়দারাবাদ অবস্থানকালে রচনা করেন। কিন্তু ১৯০৬ সালে এটির প্রথম সংস্করণ কানপুর থেকে প্রকাশিত হয়। "মুওয়াযানায়ে আনিস ও দাবির" বইটিও এখান থেকে রচিত হয়েছে। "শে'রুল আযম" গ্রন্থটির বিন্যাস মুওয়াযানায়ে আনিস ও দাবির এর পূর্বেই করেছিলেন। কিন্তু এটি পরে প্রকাশিত হয়। হায়দারাবাদের এই দিন গুলিতে শিবলীর অনেক অবদান আজও অমর হয়ে আছে। এই সময়টিতে শিবলী আঞ্জুমানে তারাক্কিয়ে উর্দু এর সেক্রেটারী পদে নিয়োজিত থাকেন। মাওলানা সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী, মাওলানা আব্দুস সালাম নদভী, মাওলানা মাসুদ আলী নদভী প্রমুখ খ্যাতিমান লেখকগণ হলেন শিবলীর এই সময়ের পরিশ্রমের স্বার্থক ফসল । ১৯০৫ সালে শিবলী চাকরি থেকে অব্যহতি নিয়ে লক্ষ্মৌ চলে যান। এবং "নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্মৌ" এর শিক্ষা সচিব পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯১৩ সাল পর্যন্ত শিবলী এই দায়িত্ব পালন করেন।[৬]

ভারতবর্ষের তৎকালীন জনপ্রিয় পত্রিকা "আন্ নদওয়া" মাওলানা শিবলীর অবদান। এটি ১৯০৫ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত শিবলীর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়। ১৯০৬ সালে শিবলী মুম্বাই সফর করেন। সেখানকার মুগ্ধ পরিবেশে ফারসি ভাষায় রচিত হয়েছে তাঁর অমর কীর্তি "দস্তাদায়ে গুল"। ১৯০৭ সালে শিবলীর ভারতের আযমগড়ে আসেন। দুর্ঘটনায় শিবলীর একটি পা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই সময় শিবলী শে'রুল আযম গ্রন্থটি রচনায় বিভোর থাকেন। গ্রন্থটি প্রথম খন্ড ১৯০৮ সালে, দ্বিতীয় খন্ড ১৯০৯ সালে, তৃতীয় খন্ড ১৯১০ সালে, চতুর্থ খন্ড ১৯১২ সালে এবং পঞ্চম খন্ড তাঁর মৃত্যুর পর ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯০৯ সালে মাওলানা মোহাম্মদ আলী যাওহারের অনুরোধে রচনা করেন "আরওঙ্গজেব আলমগীর পর এক নজর"। ১৯০৯ সালে খ্রিষ্টান ইতিহাসবেত্তা যিরযি যায়দানের বই "তারিখ আত্তামাদ্দুনীল ইসলামি" এর জবাবদানে রচনা করেন "আল ইন্তেকাদ আলাত্তামাদ্দুনীল ইসলামি"। অক্টোবর ১৯১১ সালে আন্ নদওয়া পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়। ১৯১২ সালে তুর্কী শাসকদের বিরুদ্ধে বলকান অঞ্চলের লোকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে শিবলী "শহরে আশুবে ইসলাম" নামক একটি ব্যাঙ্গাত্বক কবিতা রচনা করেন। ঐ সময়টি সমগ্র মুসলিম জাহানে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯১২ সালে শিবলী পুনরায় "সিরাতুন্নবী" গ্রন্থটি লেখা শুরু করেন এবং এর প্রথম খন্ডটি লেখা শেষ করেন। কোলকাতা থেকে প্রকাশিত "আল হেলাল" পত্রিকায় মাওলানা আবুল কালাম আযাদ এই গ্রন্থটির ভূমিকা ছাপিয়ে দেন। আল্লামা শিবলী নু'মানীর শেষ জীবনের এই অমর কীর্তি আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে । গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডটি শিবলীর কলমেই রচিত হয়েছে।[৭]

ইতিহাস খ্যাত "দারুল মুসান্নিফিন" ছিল শিবলীর স্বপ্নের বাস্তবতা। নদওয়া থেকে শিবলী নু'মানী পৃথক হয়ে যান। মাদরাসাতুল ইসলাহ সরায়ে মীরের দায়িত্ব নেন। দারুল মুসান্নিফিন এবং মাদরাসাতুল ইসলাহ এর সমন্বয়ে একটি গবেষণাগার তৈরীর পরিকল্পনা করেন। ১৯১৪ সালে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত মাওলানা আবুল কালাম আযাদের "আল হেলাল" পত্রিকায় দারুন মুসান্নিফিন সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরী হয়। দারুল মুসান্নিফিন এর পূর্ণ রূপ রেখা এবং এর প্রধান কার্যালয়ের জন্য শিবলী তাঁর নিজের ও আত্মীয়দের কাছ থেকে জমিজমা ওয়াক্ফ করান এবং এর জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। শিক্ষা গবেষণা ও সম্পাদনার জন্য মাওলানা হামিদ উদ্দিন ফারাহী ও মাওলানা সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভীকে নিযুক্ত করেন ও সার্বিক সহযোগীতার ক্ষেত্রে মাওলানা মাসুদ আলী নদভীর নাম উল্লেখ করেন। আপন স্বপ্নের পূর্ণ বাস্তবরূপ প্রত্যক্ষ করার আগেই শামসুল উলামা আল্লামা শিবলী নু'মানীর পরকালের পথে ডাক এসে যায়। ১৯১৪ সালের ১৮ই নভেম্বর ভারতবর্ষের খ্যাতিমান এই ইতিহাসবিদ স্রষ্টারপানে চির বিদায় হয়ে যায়। শিবলী নু'মানীর ইন্তেকালের পর তাঁর অসমাপ্ত রচনা মা'কাতেবে শিবলী দুই খন্ড, কুল্লিয়্যাতে শিবলী (উর্দু) প্রবন্ধের আট খন্ড এবং খুতবাতে শিবলী সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী রচনা করেন।[৮]

মাওলানা শিবলী নুমানী প্রথম সারির জীবনীকার ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ লেখা ও বিষয়েই। এছাড়াও তিনি দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বক্তা, সাহিত্য সমালোচক, প্রাবন্ধিক হিসেবে তাঁর স্থান দখল রেখেছেন। শিবলী উর্দু গদ্য সাহিত্যের সেরা পাঁচজনের একজন। তিনিই প্রথম উর্দু গদ্য সাহিত্যে আধুনিক ভাবধারা প্রবর্তন করেন। শিবলী নুমানীর ভাষা মনোমুগ্ধকর। পাঠকের মাঝে তিনি তাঁর লেখা যুক্তি প্রমাণ দিয়ে উপস্থাপন করে সহজেই পাঠকের মাঝে স্থান করে নিয়েছেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তাঁর গদ্য সাহিত্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।[৯]

১. আলমামূন (المامون)

মাওলানা শিবলী নু'মানী মুসলিম ইতিহাস তুলে ধরতে তৎপর ছিলেন। এর ধারাবাহিকতায় লেখা শুরু করেন نامورفرمان روایان اسلام বিখ্যাত মুসলিম শাসক সিরিজ। এ সিরিজের প্রথম বই হলো আলমামূন

(المامون)। গ্রন্থটি তিনি ১৮৮৭ সালে লেখা শুরু করেন। ১৮৮৯ সালে গ্রন্থটি প্রথম ছাপা হয়। এ গ্রন্থটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠার ইতিহাস রয়েছে। মামূনুর রশীদ পর্যন্ত সংঘটিত বিভিন্ন গৃহযুদ্ধের বর্ণনাও রয়েছে। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে খলীফা মামূনুর রশীদের ব্যক্তি ও রাজনৈতিক জীবন। এতে আলোচনা করেছেন মামুনুর রশীদের জন্ম, শিক্ষা, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব লাভ, রাষ্ট্র পরিচালনা, ভ্রমণ, মৃত্যু। মায়ুনের মর্যাদা, কৃতিত্ব, জ্ঞানী লোকদের সম্মান জানানোর গুণ, স্বভাব-চরিত্র ও ধর্ম নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।[১০] গৃহযুদ্ধ বা অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এখানে লেখক গৃহযুদ্ধে মামূনুর রশীদের পক্ষ নিয়ে তার আত্মীয় স্বজনের দমন ও হত্যা বৈধ মনে করেছেন যা সমালোচনা সাহিত্যের দৃষ্টিতে আপত্তিকর বিষয়। স্যার সায়্যিদ শিবলীর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের পর অনেক খুশী হন। তিনি শিবলীর এ রচনাকে যথাযথ নিয়মে লেখা বলে মন্তব্য করেন।[১১]

২. আলফারূক (الفارق)

শিবলী নু'মানীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জীবনী গ্রন্থ হলো আলফারূক। এ গ্রন্থ রচনায় তিনি অনেক পরিশ্রম করেছেন। ইরান ও তুরস্ক সফরে এ বিষয়ে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এ গ্রন্থটি তিনি ১৮৯৮ সালের মধ্যে লেখেন। গ্রন্থটিকে তিনি দু'ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম অংশে হযরত 'উমার (রা.) এর নাম, পরিচয়, জন্ম-মৃত্যুসহ তার বিজয়ের তালিকা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে হযরত 'উমার (রা.) এর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলী তুলে ধরা হয়েছে। 'উমার (রা.)-এর ব্যক্তি চরিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে তার বীরত্বপূর্ণ ত্যাগী জীবনের অনেক ঘটনাই স্থান পেয়েছে এতে।[১২]

প্রথম খণ্ডের ব্যাপ্তি ১৮৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। এতে 'উমার (রা.) বংশীয় পরিচয় দেয়ার পর, 'উমার (রা.)-এর ঐতিহাসিক ইসলাম গ্রহণের কাহিনী, হিজরত, মদীনায় রাসূলের সাথে, মদীনায় আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর 'উমার (রাঃ) এর বিজয় গাঁথা তুলে ধরা হয়েছে! তিনি একে একে বিজয় করেছেন ইরাক, সিরিয়া, কাদিসিয়া, দামেশক, হিমস, ইয়ারমুক, বায়তুল মুকাদ্দাস, কায়সারিয়া, খুযিস্তান, ইরান, আজারবাইজান, পারস্য, কারামান, সীস্তান, খুরাসান, মিশর, ইস্কান্দরিয়া ইত্যাদি। প্রাসঙ্গিকক্রমে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব থেকে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)কে বরখাস্ত করার ঘটনাও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 'উমার (রা.) এর শাহাদাতের বর্ণনার মাধ্যমে ১ম খণ্ড শেষ হয়েছে। হযরত উমার (রাঃ) এর মৃত্যুকালীন ওসীয়ত শিবলী নু'মানীর ভাষায় তুলে ধরা হলো-

حضرت عمرکوقوم اورملک کی بہبودی کا جو خیال تھا اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ
مین کرب و تکلیف کی حالت میں جہاں تک ان کی قوت اورحواس نے یاری دی اسی
دھن میں مصروف رہے۔ لوگوں کومخاطب کرکےکہاکہ جوشخص خلیفہ منتخب ہواس کو
میں وصیت کرتا ہوں کہ پانچ فرقوں کے حقوق کا نہایت خیال رکھے۔ ا. مہاجرین،
۲. انصار، ۳.اعراب، ۴. وہ اہل عرب جو اور شہروں جا کر آباد ہو گئے ہیں،
۵. اہل ذمہ (یعنی عیساتی یہوی پارسی جواسلام کی رعایا تھے)-[১৩]

অনুবাদঃ জাতি ও দেশের কল্যাণে হজরত ওমরের চিন্তা-ভাবনা এ থেকেই অনুমান করা যায় যন্ত্রণা ও যন্ত্রণার অবস্থায় তিনি একই সুরে মগ্ন ছিলেন যতদূর তার শক্তি ও ইন্দ্রিয় তাকে সাহায্য করতে পারে। জনগণের উদ্দেশে তিনি বলেন, যিনি খলিফা নির্বাচিত হন, আমি তাকে ওসিয়ত করছি যেন তিনি পাঁচটি সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষা করেন। ১. উদ্বাস্তু, ২. আনসার, ৩. আরব, ৪. যে আরবরা অন্য শহরে বসতি স্থাপন করেছে, ৫. আহলে ওয়াসবি (অর্থাৎ, পারের মেসানী স্ত্রী যিনি ইসলামের একজন প্রজা ছিলেন।

আলফারূকের দ্বিতীয় খণ্ড ২৫৬ পৃষ্ঠায় শেষ হয়েছে। এতে শিবলী নু'মানী আলোচনা করেছেন- "উমার(রা.)এর বিজয় একনজরে, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, পরিবর্তন ও উন্নয়ন, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণ প্রদেশ ও জেলার মাধ্যমে। রাজস্ব আদায়, অন্যান্য কর, আদালত বা বিচার ব্যবস্থা, ইফতা বা ফাতওয়া দান, ফৌজদারী, পুলিশ, বাইতুল মাল বা রাজভান্ডার, জনহিতকর কার্যাবলী, শহর আবাদ করা, সৈন্য গঠন, শিক্ষা উন্নয়ন, ধর্মীয় কার্যাবলী, যিম্মীদের অধিকার, দাস প্রথা নিরুৎসাহিত করণ, সুবিচার প্রতিষ্ঠা, ইমামত, ইজতিহাদ ইত্যাদি। সেই সাথে 'উমার (রা.)এর ব্যক্তি চরিত্র ও বৈবাহিক অবস্থাও আলোচনা করা হয়েছে।

এসব তথ্য বর্ণনা করতে যেয়ে প্রয়োজনীয় কুরআন, হাদীসের যুক্তিও পেশ করেছেন শিবলী নু'মানী । আলফারূক শুধু উর্দুতেই নয়, 'উমার(রা.)এর জীবনী হিসেবে আরবী কিতাবগুলোর মাঝেও অনন্য অবস্থানে আছে।[১৪]

৩। সীরাতুন নু'মান (سيرت النعمان)

হযরত ইমাম আযম আবূ হানীফা আলাইহি রাহমাহ এর জীবনী গ্রন্থ হলো সীরাতুন নু'মান। এ গ্রন্থটিও ২ খণ্ডে শেষ হয়েছে। এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডে আবূ হানীফার নাম, বংশ, পরিচয়, শিক্ষা, উস্তাদ, শায়খ, কুরআন গবেষণা, হাদীস গবেষণা, শিক্ষাদান, ইফতা বা ফাতওয়া দান ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে দরবারের সাথে সম্পর্ক, মৃত্যু, ব্যক্তি চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি, মেধা, আচরণ ইত্যাদিও সুন্দরভাবে আলোচনা কর হয়েছে। ১৪২ পৃষ্ঠায় শেষ হয়েছে ১ম খণ্ড।[১৫]

দ্বিতীয় খণ্ড শুরু হয়েছে ১৪৩ পৃষ্ঠা থেকে। শেষ হয়েছে ৩৯৮ পৃষ্ঠা শেষে। দ্বিতীয় খণ্ড শেষে লেখা শেষ হবার তারিখ লেখা আছে ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রসঙ্গ এসেছে আবূ হানীফার লেখালেখি-গ্রন্থাবলী, ফিক্হ্ চর্চা, 'আকাইদ বা বিশ্বাস, আবূ হানীফার মৌলনীতি, হাদীস ও উসূলে হাদীস, ইমাম আবূ হানীফার মুহাদ্দিস বা হাফিযুল হাদীস হওয়া, অন্যান্য ইমামের সাথে সম্পর্ক, যুক্তি বা যুক্তি দানের মৌলনীতি ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে। শিবলী নু'মানী এ গ্রন্থে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন হাদীস শাস্ত্রে আবূ হানীফা পিছিয়ে ছিলেন না বরং অনেক হাদীস তিনি জানতেন।[১৬]

৪. আলগাযালী (الغزالى)

ইমাম আবূ হামিদ মুহাম্মাদ আলগাযালী মুসলিম দর্শন ও আধ্যাত্মবাদে অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবন, চিন্তা, দর্শন ও লেখালেখি নিয়ে শিবলী নু'মানী রচনা করেন আলগাযালী। হায়দারাবাদে অবস্থানকালে ১৯০১ সালের ডিসেম্বরে এ গ্রন্থ লেখা শেষ করেন। গ্রন্থটিকে দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অংশে ইমাম গাযালীর জীবনী যা ৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে ইমাম গাযালীর চিন্তা দর্শন ও রচনাবলী নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেই সাথে তৎকালীন বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা তুলে এনেছেন ২৭২ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে। গ্রন্থটির ব্যাপারে জীবনীর চেয়ে আনুষাঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা বেশী করার অভিযোগ আছে। তবে তখন পর্যন্ত উপকরণ কম থাকায় এর বেশী লেখতে পারেননি শিবলী নু'মানী।[১৭]

৫. সাওয়ানেহে মাওলানা রূম (سوانح مولانا روم)

তাসাওউফ জগতে মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী এক পরিচিত ব্যক্তিত্ব। এ পরিচিত ব্যক্তিকেই শিবলী উপমহাদেশে আরো বেশী পরিচয় করিয়ে দিতে রচনা করেন সাওয়ানেহে মাওলানা রূম (سوانح مولانا روم)। তবে গ্রন্থটির নাম হিসেবে অমৃতসর থেকে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে লেখা রয়েছে সাওয়ানেহে মৌলবী রূম (سوانح مولوی روم)। অবশ্য গ্রন্থের ভেতরের সব পাতায় মাওলানা রূম লেখা । সকল প্রবন্ধ-নিবন্ধেও সাওয়ানেহে মাওলানা রূম লেখা রয়েছে।[১৮]

এ গ্রন্থটি শিবলী নু'মানী লেখেছিলেন ১৯০২ সালে। ২০০ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে মাওলানা জালালুদ্দীন রূমীর জন্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, শামস তিবরীযীর সাথে সম্পর্ক, বিয়ে-সন্তানাদি, আত্ম সংশোধন, রূমীর রচনাবলী - দীওয়ান, মাসনবী, ইলমে কালাম। ইলমে কালামের অধীনে আল্লাহ, নুবুওয়াত, মুশাহাদায়ে মালাইকা, মু'জিযা, রূহ পুনরুত্থান, জবর ও কদর, তাসাওউফের ওয়াহদাতুল উজ্জুদ, ফানা-বাকা ইত্যাদি আলোচনা করেছেন শিবলী নু'মানী। শিবলী নু'মানী আলোচনা করতে যেয়ে দর্শন বিষয় বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন।[১৯]

৬। সীরাতুন্নবী (১ম ও ২য় খণ্ড) (سيرت النبى)

আল্লামা শিবলী নু'মানী এর অন্যতম গ্রন্থ হলো সীরাতুন্নবী (সা.)। এমন গ্রন্থ অন্য ভাষায়ও পাওয়া কঠিন। আল্লামা শিবলী নু'মানী ৫ খণ্ডে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার ইচ্ছায় একটি ছক করে লেখা শুরু করেন ১৯০৬ সালে।

১ম খণ্ড- আরব, কা'বার ইতিহাস, নবীজীর জীবনী, যুদ্ধ, চরিত্র ও সন্তানাদি।

২য় খণ্ড- নুবুওয়াতের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৩য় খণ্ড- কুরআন শরীফের ইতিহাস, তত্ত্ব ও রহস্য।

৪র্থ খণ্ড-মু'জিযার স্বরূপ ও বিচার-বিশ্লেষণ।

৫ম খণ্ড- ইউরোপিয়ানদের লেখায় রাসূলের জীবন বিষয়ে তাদের অভিযোগ ও জবাব। প্রথম খণ্ডের কাজ শেষ করতেই আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে হয়। তাই পূর্ণাঙ্গ সীরাত রচনা করা সম্ভব হয়নি। তার লেখা প্রথম খণ্ডটি আকারে বড় হয়ে যাওয়ায় ২ ভলিয়মে ১৯১৮ সালে তা প্রকাশ করা হয়। বাকী ৪ খণ্ড তারই ছাত্র সুলায়মান নদবী তারই স্টাইলে রচনা করে সীরাতুন্নবী গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ করেন।[২০]

শিবলী নু'মানী লিখিত সীরাতুন্নবীতে আলোচিত হয়েছে ইসলাম পূর্ব আরবের ইয়াহুদী খৃস্টান, পারসিক ও হানাফীদের ধর্মীয় অবস্থা, ইসমাঈল (আঃ) কর্তৃক মক্কা আবাদ, কুরবানীর ঘটনা, কাবা নির্মাণ, কুরায়শ বংশের গোড়াপত্তন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্ম, লালন-পালন, মায়ের সাথে মদীনা ভ্রমণ, ইয়াতীম নবীজীর তত্ত্বাবধান, সিরিয়া ভ্রমণ, হালফুল ফ্যুল, ব্যবসা, বিয়ে, নুবুওয়াত লাভ এর বিরোধিতা, হাবশায় হিজরত, শি'আবে আবূ তালিবে অন্তরীণ, মদীনায় হিজরত, মসজিদ নির্মাণ মদীনায় বিভিন্ন ঘটনা, বদর ও উহুদসহ বিভিন্ন যুদ্ধ, মক্কা বিজয়, রাষ্ট্র পরিচালনা, কাফিরদের উৎপীড়ন দমন, আরবের বাহিরে ইসলাম প্রচার, ইন্তিকাল ইত্যাদি। এছাড়াও শরীয়তের বিভিন্ন হুকুমও তার পেছনে যুক্তি, বাস্তবায়ন, হালাল-হারাম প্রসঙ্গ, রাসূলের খানাপিনা, মজলিস, কথাবলা, পারিবারিক জীবন ইত্যাদিও আলোচনা করেছেন 'আল্লামা শিবলী নু'মানী।[২১]

৭। ইলমুল কালাম (علم الكلام)

কালাম শাস্ত্র সম্পর্কে তখন খুব আলোচনা হতো। সেসময় কালাম শাস্ত্র জানা না থাকলে বিজ্ঞ জ্ঞানী হিসেবে আখ্যায়িত করা হত না। তাই শবলী নুমানী ইলমুল কালাম লেখেন। এতে তিনি কালাম শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা, কালাম শাস্ত্রের জন্ম ও উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ইত্যাদি তুলে ধরেন।[২২]

৮। আলকালাম (الكلام)

আলকালাম গ্রন্থটিকে ইলমুল কালামের দ্বিতীয় খণ্ড বলা যায়। এ গ্রন্থটিতে তিনি কালাম শাস্ত্রের আধুনিক রূপ দর্শন সম্পর্কে তৈরি করেন। তৎকালে দর্শণ শিক্ষার নামে নতুন প্রজন্ম নাস্তিকতার জোয়ারে ভেসে যাচ্ছিল

তাই তিনি আধুনিক শিক্ষা ও দর্শন বিষয়ে লেখেন। তিনি ইসলামের আহকামকেও দর্শনের আয়নায় সুচিন্তিত ও যথার্থ প্রমাণ করেন।[২৩]

৯। মুওয়াযানায়ে আনীস ও দবীর (موازنہ انیس ودبیر)

উর্দু সাহিত্যের দুজন মরসিয়া কবি, ভারতের গৌরব মীর আনীস ও মির্যা দবীর-এর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে শিবলী নুমানী মুওয়াযানায়ে আনীস ও দবীর। এ গ্রন্থের মাধ্যমে উর্দু মরসিয়ার জন্মদাতা মীর আনীস এবং মরসিয়ার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী মীর্যা দবীর-এর সাথে তুলনা করার সুযোগ হয়েছে। যদিও শিবলী নুমানীর ব্যাপারে অভিযোগ আছে। শিবলী পক্ষপাতিত্ব করে মীর আনীসের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন। শিবলী নুমানী উভয়ের সাহত্যি প্রতিভা তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে। সমালোচনা সাহিত্যের একটি গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে এ গ্রন্থটি। এর মাধ্যমে শিবলী সমালোচনা সাহিত্যিক হিসেবেও তাঁর স্থান দখল করে নিতে পেরেছেন।[২৪]

১০। শে'রুল 'আজম (شعر العجم)

শিবলী নুমানীর অমর কীর্তি হলো শে'রুল 'আজম'। ১১০০ পৃষ্ঠার ৫ খণ্ডের এ গ্রন্থের মাধ্যমে উপমহাদেশের ফর্সী কবিদের জীবনী ও তাঁদের সাহিত্য কর্ম তুলে ধরেছেন বিশ্বদরবারে। প্রথম খণ্ডের কাজ শুরু করেন ১৯০৬ সালের ৬ মার্চ। দেড় বছর পর ৬ সেপ্টেম্বর ১৯০৭ সালে তা শেষ করেন, এবং এটি প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালে। দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ শুরু করে ১৯০৮ সালে আর প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে। ১৯১০ সালে ও ১৯১২ সালে যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়। ৫ম খণ্ড লিখে যান তাঁর জীবদ্দশায় কিন্তু প্রাকশিত হয় তার মৃত্যুর পর। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে ফার্সী কবিতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র চব্বিশ জন কবি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের জীবনী লিখে তাদের কবিতা উল্লেখ করে পর্যালোচনা করা হয়েছে। ৫ম খণ্ডে কাব্যের বিভিন্ন শাখা, ইশক, চরিত্র, দর্শন, তাসাউউফ ইত্যাদি আলোকপাত করা হয়েছে।[২৫]

মাকালাতে শিবলী (مقالات شبلی)

শিক্ষার উন্নয়ন, সমাজ সংস্কার, মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্য, ধর্মের উন্নতি, রাজনৈতিক সচেতনতা দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন 'আল্লামা শিবলী নু'মানী তার এসব প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এসব প্রবন্ধ পরবর্তীতে দারুল মুসান্নিফীন প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। তবে প্রকাশিত-অপ্রকাশিত প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশ হয় মাকালাতে শিবলী (**مقالات شبلی**)। এ প্রবন্ধ সংকলনটি ৮ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এ সংকলনের আলোকে তার প্রবন্ধগুলো আলোচনা করা হলো।

১ম খণ্ডে স্থান পেয়েছে ৮ টি প্রবন্ধ। দ্বিতীয় খণ্ডে শিক্ষামূলক প্রবন্ধের সংখ্যা ১১টি।

১. "মুসলমানোঁ কী গুযাশতা তা'লীম' (مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم)

মুসলমানদের শিক্ষার উৎস, মুসলমানদের শিক্ষা প্রচার পদ্ধতি নিয়ে লেখা ৩৬ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ এটি । এতে কুরআন শিক্ষা, কুরআন বুঝার জন্য হাদীস শিক্ষা, হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের ধারা, কুরআন-হাদীস বুঝার জন্য নাহু-সরফ শিক্ষা, ইউনানী দর্শন শিক্ষা, ফিক্‌হ শিক্ষা, উসূলুল ফিক্‌হ শিক্ষার পদ্ধতি ও ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রবন্ধে সাহাবা যুগে মুসলমানদের শিক্ষা, বিভিন্ন শাসকের সময়ে শিক্ষার উন্নতি বিশেষ করে খলীফা মানসূর, মামূন, হারূনুর রশীদ প্রমুখের সময়ে জ্ঞান চর্চার অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে এ প্রবন্ধে । প্রবন্ধের শেষের দিকে দর্শনসহ অন্যান্য বিষয়ে অনুবাদ হয়ে আসা শতাধিক বইয়ের তালিকাও রয়েছে। এ

প্রবন্ধের মাধ্যমে মুসলমানদের বিশেষ করে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের শিক্ষা সচেতনতা ও শিক্ষা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয় যায়।[২৬]

২. 'মাদরাসে আওর দারুল উলূম (مدرسے اور دارالعلوم)

ইসলামী শিক্ষা প্রথমে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল। পরবর্তীতে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হতে থাকে বিভিন্ন শাসকের আমলে। কোথায়, কোন মাদরাসা হয়েছে এর দীর্ঘ তালিকা স্থান পেয়েছে এ প্রবন্ধে। নিযামুল মুলকের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায়ে নিযামিয়ার প্রসঙ্গে গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন 'আল্লামা শিবলী নু'মানী। তবে তিনি এটিকে প্রথম মাদ্রাসা মানতে রাজি নন। শিবলী নু'মানী যদিও মাদ্রাসায়ে নিযামিয়াকে প্রথম মাদ্রাসা মানতে রাজি হননি তথাপিও এর প্রশংসা ও ইতিহাস বর্ণনা করতে দ্বিধা করেননি। এ মাদ্রাসার অবদানের কথাও তিনি তুলে ধরেন। তৎকালের বাগদাদের আরো ৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও অবস্থান তুলে ধরেন তার এই প্রবন্ধে।

আব্বাসী যুগে, নূরুদ্দীন ও সালাহুদ্দীনের যুগে, তুর্কী আমলে, ভারতে, ইউরোপে কোথায় কোন মাদ্রাসা ছিল তারও তালিকা ও বর্ণনা ৪০ পৃষ্ঠার প্রবন্ধে তিনি উপস্থাপন করেছেন।[২৭]

৩. 'কাদীম তা'লীম' (قدیم تعلیم)

প্রাচীন শিক্ষা বিষয়ে শিবলী নু'মানীর এ প্রবন্ধে শিক্ষা, শিক্ষার ব্যাপকতা, উচ্চশিক্ষা, শিক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে। মাদ্রাসা যুগের শুরু, মাদরাসা শিক্ষায়, ধর্মীয় প্রভাব, রাজনৈতিক প্রভাব ইত্যাদিও স্থান পেয়েছে এতে। এ প্রবন্ধটি মাত্র ১৩ পৃষ্ঠায় শেষ হয়েছে।[২৮]

৪. 'মুল্লা নিযামুদ্দীন (র.)' (ملانظام الدین علیہ الرحمہ)

মাঅ'রিফ পত্রিকায় ১৯০০ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশ হয় দরসে নিযামিয়ার প্রতিষ্ঠাত মুল্লা নিযামুদ্দীন আলাইহির রহমাহ। অনেকেই দরসে নিযামী বলতে সেলজুক বাদশাহ নিযামুদ্দীন প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায়ে নিযামিয়ার সিলেবাস বুঝে থাকে। মূলত দরসে নিযামীর প্রতিষ্ঠাতা হলেন লক্ষ্ণৌর মুল্লা নিযামুদ্দীন (র.)। এ বিষয়টি শিবলী নু'মানী প্রথমেই আলোচনায় এনেছেন এ প্রবন্ধে। মুল্লা নিযামুদ্দীন ১১৬১ হিজরীর ৯ জুমাদাল উলা ইন্তিকাল করেন। শিবলী নু'মানী বলেছেন বর্তমানে দরসে নিযামী বলতে যা বুঝানো হয় তাতে অনেক পরিবর্তন চলে এসেছে।[২৯]

৫. 'দরসে নিযামিয়াহ' (درس نظامیہ)

১৯০১ সালের ১১ ডিসেম্বরে আননাদওয়ায় প্রকাশিত হয় শিবলী নু'মানীর মূল্যায়নধর্মী প্রবন্ধ দরসে নিযামিয়াহ। এ প্রবন্ধে দরসে নিযামীর উৎপত্তি লক্ষ্ণৌর ফিরিঙ্গী মহলে তা আলোচনা করা হয়েছে। দরসে নিযামীর প্রধান প্রবর্তক মুল্লা নিযামুদ্দীন ও তার পরিবারের শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদানের কথা তুলে ধরেছেন এ প্রবন্ধে। তিনি মুল্লা নিযামুদ্দীনের বিশেষ ছাত্র মাওলানা আব্দুল আলী বাহারুল উলূম-এর অবদান, বিশেষ করে দরসে নিযামীর পাঠ্যগ্রন্থ তৈরীতে তার অবদানের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। তিনি এ প্রবন্ধে দরসে নিযামীর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। যার সার-সংক্ষেপ হলো- দরসে নিযামী মূলত সংক্ষিপ্ত শিক্ষা কোর্স, প্রত্যেক বিষয়ের দু-একটি কিতাব পড়ানো হয়। বড় কিতাবের নির্বাচিত অংশ পড়ানো হয়। তবে প্রত্যেক বিষয়ে সবচেয়ে কঠিন গ্রন্থগুলো পড়ানো হয় যেন অন্য সহজ গ্রন্থগুলোও বুঝতে পারে। এ শিক্ষায় মানতিক বা যুক্তিবিদ্যার প্রাধান্য রয়েছে।[৩০]

৬. "নাদওয়া আওর নিসাবে তা'লীম' (ندوہ اورنساب تعلیم)

পুরাতন দরসে নিযামিয়ায় যে সব সমস্যা ছিল তা দূর করে যুগের সাথে মিল করে যোগ্য নাগরিক ও ধর্ম বিশেষজ্ঞ তৈরী করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামা। নাদওয়ার সিলেবাস পর্যালোচনা করে লেখা তার এ প্রবন্ধটি আননাদওয়ার প্রথম খণ্ড ২য় সংখ্যা জুমাদাল উখরা ১৩২২ হি প্রকাশিত হয়।[৩১]

৭. 'তা'লীমে কাদীম ও জাদীদ' (تعليم قديم وجديد)

প্রাচীন শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা এ দুটোর কোনটি কি অপ্রয়োজনীয়? এ দু'টোর কি কোন বিরোধ আছে? এগুলোর মধ্যে কোন সংস্কারের প্রয়োজন আছে কি? উভয়টি মিলে কিভাবে চলা যায়? এ সব প্রশ্ন রেখে শিবলী নু'মানী এ প্রবন্ধ শুরু করেন। এর জবাবও তিনি দেন এর পাতায় পাতায়। তার বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে এ প্রবন্ধে। নাদওয়া, আলীগড় ও দেওবন্দ সব শিক্ষার একটা গুণ (মেজায) আছে তা তিনি তুলে ধরেছেন। সম্মিলিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি তিনি গুরুত্ব দেন। এ প্রবন্ধটি আননাদওয়া ৭ম খণ্ড ৯ম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ১৯১০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৩২]

৮. 'রিয়াসাতে হায়দারাবাদ কী মাশরিকী ইউনিভার্সিটি' (رياست حيدرآ بادكی مشرقی يونيورسٹی)

শিবলী নু'মানী মুসলিম ইউনিভার্সিটির স্বপ্ন দেখতেন। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই তার দ্বারা সেই ভার্সিটি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তবে হায়দারাবাদ স্টেটের দ্বারা এ খরচ বহন করা সম্ভব। তাই তিনি হায়দারাবাদে একটি প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয় করার প্রস্তাব রাখেন। তার প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ে এ প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। তার এ প্রস্তাব তার জীবদ্দশায় বাস্তবায়িত না হলেও পরবর্তীতে 'উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছিল। তার এ প্রবন্ধটি আননাদওয়ার ৬ষ্ঠ খণ্ড ২য় সংখ্যা মার্চ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ হয়।[৩৩]

৯. 'ইহইয়ায়ে 'উলূম আরাবিয়া আওর এক রেডিকেল' (احياءعلوم عربيه اور أيكرڈيكل)

রেডিকেল ছদ্মনামে একব্যক্তি মাসিক আলীগড় পত্রিকায় আরবী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নেই বলে এক প্রবন্ধ লেখেন। এ প্রবন্ধে আরবী শিক্ষার বিরোধিতায় যে সব বক্তব্য দেয়া হয়েছে তার জবাব শিবলী নু'মানী দিয়েছেন সূক্ষ যুক্তির মাধ্যমে, ঐতিহাসিক বিষয় উপস্থাপনের মাধ্যমে। শিবলী নু'মানী আরবী ভাষাকে মূর্খ জাহিলদের আখ্যায়িত করা, ধর্মীয় ভাষা হিসেবে আরবীকে স্বীকৃতি না দিয়ে প্রবন্ধে যে মন্তব্য করা হয়েছে তার জোর বিরোধিতা করেন। শিবলী নু'মানী ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না; বরং অনেককেই ইংরেজী শিখতে উৎসাহিত করেছেন। যারা ইংরেজী শিক্ষায় অন্ধ হয়ে আরবী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নেই বলে বেড়ায় তাদেরকে জাতির অধপতনের কারণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি লেখেন-

عربی کی تحقیرنےثابت کردیاکہ قوم واقعی ذلت کے اخیردرجہ پرپہنچ گئی ہےکیونکہ

کوئی قوم اس وقت تک ذلیل نہیں ہوتی جب تک وہ خوداپنےآپ کوذلیل نہ سمجھے

اوریہ درجہ اب قوم نے حاصل کر لیا

অনুবাদঃ আরবি ভাষার অপমান প্রমাণ করে যে জাতি সত্যিই অপমানের শেষ স্তরে পৌঁছেছে কারণ একটি জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত অপমানিত হয় না যতক্ষণ না সে নিজেকে অপমানিত মনে করে আর এই মর্যাদা এখন জাতি অর্জন করেছে।

শিবলীর লেখা এ প্রবন্ধটি ১৯০৪ সালের মে মাসে দাকিন রিভিউ'তে প্রকাশ হয়। মাকালাতে শিবলীর ৫ম খণ্ডে ইসলামের মহান ব্যক্তিদের জীবনী ও অবদান তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে।[৩৪]

মাকালাতে শিবলীর ৬ষ্ঠ খণ্ডে ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। ৬ষ্ঠ খণ্ডের প্রবন্ধগুলো হলো-

১. তারাজীম' (تراجم)

মুসলমানরা শিক্ষার ক্ষেত্রে উদার। সব কিছু থেকেই শিক্ষা নিতে আগ্রহী। এ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন ভাষা থেকে গ্রন্থাবলী অনুবাদ করিয়েছে। এসব অনুবাদকৃত গ্রন্থের দীর্ঘ তালিকা, অনুবাদগুলোর ধরন, বিষয়বস্তু ইত্যাদি নিয়ে ১১২ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ হলো তারাজীম (অনুবাদ সমূহ)। এ প্রবন্ধটি গবেষণা প্রবন্ধ অবশ্যই। এতে সুরইয়ানী, ল্যাটিন, গ্রীক, ইবরানী, নাবতী, কিবতী, সংস্কৃত ও পার্সিয়ান ইত্যাদি ভাষা থেকে অনূদিত গ্রন্থের আলোচনা তুলে ধরেন। গ্রন্থগুলোকে বিষয় ভিত্তিক ভাগ করেছেন দর্শন, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা, ইতিহাস, সঙ্গীত ও প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদিতে।[৩৫]

২. 'কুতুব খানায়ে ইসকানদরিয়া' (کتب خانئه اسکندریه)

মুসলিম জাতি শিক্ষাকে সম্মান করতে জানে। শিক্ষা অর্জনকে ফরয মনে করে। এ মুসলিমজাতির বিরুদ্ধে ইউরোপিয়ানদের একটি অভিযোগ হলো- উমার ইবনুল খাত্তাবের নির্দেশে 'আমর ইবনুল আস মিশরের ইস্কানদরিয়ার লাইব্রেরী জ্বালিয়ে দিয়েছেন। এ অভিযোগটি শিবলী গুরুত্বের সাথে নেন।

এ ব্যাপারে ব্যাপক গবেষণার পর তিনি এ প্রবন্থটি লেখেন। ৪০ পৃষ্ঠার এ গবেষণা প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করেন 'আমর ইবনুল 'আসের বিজয়ের সময় ইসকানদরিয়া লাইব্রেরী ছিল-ই না। তা জ্বালিয়ে দেয়ার ঘটনা ইউরোপিয়ানদের মনগড়া কথা।[৩৬]

৩. 'ইসলামী কুতুবখানে' (اسلامی کتب خانے)

শিবলী মুসলিম আমলের কুতুবখানা বা পাঠাগার সম্পর্কে ২৪ পৃষ্ঠার ইতিহাসধর্মী প্রবন্ধ লেখেন ইসলামী কুতুবখানা নামে । এতে ইসলামী পাঠাগারের উৎপত্তি, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পাঠাগার তৈরী, বায়তুল হিকম্ হ প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা, পাবলিক পাঠাগার তৈরী ইত্যাদির ইতিহাস তুলে ধরেন । গ্রন্থ সম্পর্কেও আলোচনা করেন এ প্রবন্ধে।

৪. "ইসলামী হুকূমতেঁ আওর শেফাখানে' (اسلامی حکومتیں اورشفاخانے)

বিভিন্ন সময়ে হাসপাতাল কোথায় ছিল, কেমন ছিল? কিভাবে, কেমন চিকিৎসা করা হতো এসব নিয়ে ১৮ পৃষ্ঠার এ প্রবন্ধ। এতে সংক্ষেপে ইসলামী যুগে হাসপাতালের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রবন্ধটি রাসায়েলে শিবলী গ্রন্থে প্রথম ছাপা হয়েছিল।

৫. 'হিন্দুস্তান মে ইসলামী হুকুমত কে তামাদ্দুন কা আসর' (ہندستان میں اسلامی حکومت کے تمدن کا اثر)

ভারতে মুসলিম শাসকদের আগমনে ভারতের কি কি উন্নতি হয়েছিল, সাংস্কৃতিক উন্নতি কি হয়েছিল এসব নিয়ে আলোচনা করেছেন শিবলী নু'মানী। মুসলিম শাসকদের পূর্বে কি অবস্থা ছিল তাও প্রাসঙ্গিক ক্রমে নিয়ে এসেছেন। ২৩ পৃষ্ঠার এ প্রবন্ধে ভারতের একটা সাংস্কৃতিক চিত্র ফুটে উঠে।[৩৭]

৬. 'মুসলমানোঁ কি 'ইলমী বেতা'আস্‌সুবী আওর হামারে হিন্দু ভাইয়ো কি নাসিপাসী (مسلمانوں کی علمی بےتعصبی اورہمارےہندوبھائیوں کی ناسپاس)

মুসলমানরা জ্ঞান আহরণে সবসময় উদার, তারা অন্য ধর্মের, অন্য ভাষার জ্ঞান অনুবাদের মাধ্যমে গ্রহণ করে থাকে। এ বিষয়টি শিবলী তুলে ধরেছেন এ প্রবন্ধে। ১৮ পৃষ্ঠার এ প্রবন্ধে মুসলমানরা হিন্দুদের গ্রন্থাবলী ও ইতিহাস থেকে যে সব বিষয় নিয়েছে তা তুলে ধরেছেন।

৭. 'মেকানিক্স আওর মুসলমান' (مکانکس اورمسلماں)

কারিগরী শিক্ষা ইসলাম বিরোধিতা করে না, বরং ইসলামের উন্নতির যুগে মুসলমানরা অনেক জিনিস আবিষ্কার করেছিল। ঘড়ি আবিষ্কার তো মুসলমানরাই করেছে। এসব আবিষ্কারের কথা আলোচনায় এনে প্রবন্ধ লেখেন মেকানিক্স আওর মুসলমান।[৩৮]

মাকালাতে শিবলী ৭ম খণ্ড শিবলীর দার্শনিক প্রবন্ধ দিয়ে সাজানো হয়েছে। এ খণ্ডে মোট ১২টি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলো হলোঃ

১. 'ফালসাফায়ে ইউনান আওর ইসলাম' (فاسفه یونان اوراسلام)

গ্রীক দর্শন ও ইসলাম বিষয়ক এ প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। গ্রীক দর্শনে এরিস্টটলের মতাদর্শে কি কি ভুল ছিল তা তুলে ধরা হয়েছে এ প্রবন্ধে।

২. ফালসাফায়ে ইউনান আওর ইসলামঃ ইউনানী মানতিক কি গলতিয়া' (فلسفه یونان اور اسلام : یونانی منطق کی غلطیاں)

গ্রীক যুক্তিবিদ্যায় কি কি ভুল রয়েছে এসব আলোচনা করে দার্শনিক শিবলী নু'মানী এ প্রবন্ধটি লেখেন । প্রবন্ধটি আননাদওয়া পত্রিকায় ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

৩. 'ফালসাফায়ে ইউনান আওর ইসলামীঃ ইউনানী মানতিক কি গলতিয়া' (فلسفه یونان اوراسلام : یونانی منطق کی غلطیاں)

গ্রীক যুক্তিবিদ্যার বিশেষ ব্যবহারিক শব্দ যেমন জাতি, আরজী, কিয়াস, শিকলে আউয়াল ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এ প্রবন্ধে। গ্রীক যুক্তিবিদ্যার ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দেয়া হয়েছে । প্রবন্ধটি আননাদওয়া ১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা শা'বান ১৩২২ হিঃ সংখ্যায় প্রকাশ হয়েছে।

৪. 'ফালসাফায়ে ইউনান আওর ইসলামীঃ আজরামে ফালাকী (فلسفه یونان اوراسلام: اجرام فلکی)

আকাশ নিয়ে গ্রীক দর্শনের কথা আলোচনা করেছেন। সেই সাথে কুরআন হাদীসের আলোকে সৌরজগৎ সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করেছেন। এ প্রবন্ধটি আননাদওয়া ৩য় খণ্ড ১০ম সংখ্যা নভেম্বর ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

৫. 'ফালসাফায়ে ইউনান আওর ইসলামঃ ফালসাফায়ে কাদীম ও জাদীদ' (فلسفہ یونان اوراسلام: فلسفہ قدیم وجدید)

৬. 'উলূমে জাদীদাহ 'ইলম কী হাকীকত' (علوم جدیده علم کی حقیقت)

৭. 'জযব ইয়া কাশাশ' (جذب یاکشش)

আকর্ষণ বিকর্ষণ নিয়ে লেখা এ প্রবন্ধ । এ সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধটি আননাদওয়ার ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয়।

৮. 'মাসআলায়ে ইরতিকা আওর ডারউইন' (مسئله ارتقاء اورڈرین)

মানব ক্রমবিকাশ ও ডারউইনের মতবাদ নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করেছেন এ প্রবন্ধে । অনেক যুক্তি তর্ক এনেছেন এতে । এ প্রবন্ধটি আননাদওয়ার ৪র্থ খণ্ড ৫ম সংখ্যা জুমাদাল উলা ১৩২৫ হি. মুতাবিক জুন ১৯০৭ সালে প্রকাশ হয়েছে ।

৯. 'ডক্টর ব্রাটন আওর তারীখে ফালাসাফায়ে ইসলাম' (ڈاکڑبرطن اورتاریخ فلسفه اسلام)

ইসলামী দর্শন সম্পর্কে ডক্টর ব্রাটন অনেক জ্ঞান রাখেন। তার লিখিত ইসলামী দর্শনের ইতিহাস নিয়ে সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধ এটি। প্রবন্ধটি আননাদওয়া, খণ্ড ৫. সংখ্যা ৬-এ জুন ১৯০৯ সালে প্রকাশ হয়।

১০. 'ফালসাফা আওর ফার্সী শাইরী' (فلسفه اورفارسی شاعری)

ফার্সী কবিতায় দর্শনের ব্যবহার তুলে ধরেন এ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি আননাদওয়া খণ্ড ৪, সংখ্যা-৮ এ সেপ্টেম্বর ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয়।

১১. হাকায়েকে আশ্ইয়া আওর মা'আশূকে হাকীকী' (حقائق اشیااور معشوق حقیقی)

প্রবন্ধটি আননাদওয়ার খণ্ড ৭, সংখ্যা ৭-এ জুলাই ১৯১০ সালে প্রকাশ হয়।

১২. 'নাদওয়াতুল উলামা কা ইজলাসে সালানা আওর ইলমী নুমায়েশ গাহ' (ندوة العلماءکا اجلاس سالانہ اورعلمی نمایشگاہ)

আননাদওয়া খণ্ড-৩, সংখ্যা ২-এ প্রবন্ধটি ছাপা হয়।

মাকালাতে শিবলীর ৮ম খণ্ডে ৪৭ টি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে শিবলী নু'মানীর। ধর্মীয় বিষয়ক ৯টি প্রবন্ধ। এগুলো হলো-

১. 'সিগায়ে ইশা'আতে ইসলাম' **(صیغه اشماعت اسلام)**

২. 'নওমুসলিম রাজপুত আওর হেফাযতে ইসলাম' **(نومسلم راجپوت اور خفاظت اسلام)**

৩. 'হেফাযত ও ইশা'আতে ইসলাম' **(حفاظت واشاعت اسلام)**

৪. 'নওমুসলিমো কো দূবারাহ হিন্দু হো জানে সে বাচানে কে লিয়ে তামাম বেরাদরানে ইসলাম কি খেদমত মে ফরিয়াদ' **(نومسلمون کودوباره ہندوہوجانےسےبچانےکیلئےتمام برادارن اسلام کی خدمت میں فریاد)**

৫. 'কার রাওয়াতী আন্‌জুমানে ওয়াকফ 'আলাল আওলাদ' **(کارروائی انجمن وقف علی الاولاد)**

৬. 'ওয়াকফে আওলাদ কি কার রাওয়ায়ী কাহা তক পৌঁচি **(وقف اولادکی کارروائی کہانتک پہنچی)**

৭. 'আওকাফে ইসলামী' **(اوقاف اسلامی)**

৮. 'ওয়াকফে আওলাদ' **(وقف اولاد)**

৯. মেমোরিয়াল মুতাআল্লিকা নামাযে জুম'আ' **(مموریل متعلقه نمازجمعه)**

১০. 'আঁ হযরত (সা.) কি মুফাসসাল ও মুসতানাদ সাওয়ানেহে 'উমরী মুরাত্তাব কারনে কি তাজবীয' (آحضرت صلی اللہ علیه وسلم کی مفصل ومستندسوانح عمری مرتب کرنےکی تجویز)

১১. 'এক আওর আফতাবে ইলম গুরূব হু গায়া' (ایك اورآفتاب علم غروب هوگیا)

১২. 'ইবনে রুশদ' (ابن رشدا)

১৩. 'আলমামূন' (المامون)

১৪. 'ইশা'আতে কুতুবে কাদীমা' (اشاعت کتب قدیمه)

১৫. 'আঙ্গরেজী কুরআন মজীদ কা তরজমা আওর নাদওয়াতুল 'উলামা' (انگریزی قرآن مجیدکاترجمہ اورندوۃ العلماء)

১৬. 'মজলিসে ইলমে কালাম' (مجلس علم کلام)

১৭. 'এক আহাম তাজবীয' (ایك اهم تجویز)

১৮. "ইসবাতে ওয়াজিবুল ওজুদ' (اثبات واجب الوجود)

১৯. "নাদওয়াতুল উলামা কা গিয়ারওয়া সালানা ইজলাস বেনারস মেঁ আওর ইলমী নুমাইশ' (ندوۃ العلماءکا گیارھوانسالانه اجلاس اورعلمی نهایش)

শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ (تعلیمی)

১. 'নাদওয়াতুল উলামা কেয়া কার রাহা হায়' (ندوۃ العلماءکیاکررهاهے)
২. 'নাদওয়া কি নঈ যিনদিগী কা আগায (ندوه کی نئی زندگی کاآغاز)
৩. 'খাতুনানে কাউম কি ইযযত আওর ইয়াদগার' (خاتونان قوم کی عزت اوریادگار)
৪. "যিনদাহ যুবাইদা খাতুন' (زندهزبیده خاتون)
৫. 'এক মাযহাবী ইউনিভার্সিটি' (ایك ندهبی یونیورسٹی)
৬. 'দারুল উলুম নাদওয়াতুল 'উলামা কে সঙ্গে বুনিয়াদ কা আযীমুশ শান জলসা' (دارالعلوم ندوۃ العلماءکےسنگ بنیادکاعظیم الشان جلسہ)
৭. 'এক মাযহাবী মাদরাসায়ে আযম কি ইমারত কে লিয়ে তামাম হিন্দুস্তানকে মুসলমানা সে দরখাস্ত (ایک مذہبی مدرسہ اعظم کی عمارت کےلئےتمام ہندستان کےمسلماناں سےدرخواست)
৮. 'জলসায়ে দাসতারবন্দী নাদওয়াতুল 'উলামা' (جلسته دستار بندی ندوةا العلماء)
৯. ' হিয্‌হাইন্স স্যার আগা খান নাদওয়াতুল 'উলামা মেঁ' (ہزہائنس سرآغاخانندوۃ العلمامیں)
১০. 'দারুল ইকামাকে কামরো কি তৈয়ারী' (دارالاقامه کےکمروں کتیاری)
১১. 'মিশর কী ইউনিভার্সিটী' (مصرکی یونیورسٹی)
১২. 'ভূপাল মে নাদওয়াতুল 'উলামা কা ওয়াফদ' (بهوپال میں ندوۃ العلما کاوفد)
১৩. 'নাদওয়াতুল 'উলামা কা নয়া দাউর' (ندوۃ العلماء کانیادور)
১৪. 'আলবাশীর আওর নাদওয়াতুল উলামা' (البشیر اورندوۃ العلماء)
১৫. 'মৌলবী আব্দুল কারীম সাহিব কী মু'আততালী (مولوی عبد الکریم صاحب کی معطلی)
১৬. 'মাওলানা আব্দুল বারী কি শাহাদাত' (مولانا عبد الباری کی شهادت)
১৭. 'স্ট্রাইক কা সবব কোন থা?" (اسڑایك کاسبب کون تها؟)

১৮. “ইসলাহে নাদওয়া আওর হামদর্দ' **(اصلاح ندوه اور همدود)**

১৯. 'জলসায়ে দিহলী কে মুতায়াল্লাক্বাহ এক আম গলত ফাহমী কী তারদীদ' **(جلسه دہلی کے متعلقہ ایک عام غلط فهمی کی تردید)**

২০. 'দারুল উলূম নাদওয়া কী এক আওর খুসূসিয়াত' **(دارالعلوم ندوه کی ایک اور خصوصیت)**

২১. 'ইলমী গুরুহ' **(علمی گروه)**

মাওলানা শিবলী নু'মানীর এসব প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকা, ম্যাগাজিন থেকে নেয়া হয়েছে যাতে বিভিন্ন সংবাদ রয়েছে, বিভিন্ন প্রস্তাব রয়েছে। এক কথায় এ সব প্রবন্ধে শিবলী নু'মানীর জীবনের বিভিন্ন বিষয় এক নজরে চলে আসে। ইসলাম প্রচার, আওকাফে ইসলামী, তা'তীলে নামাযে জুম'আ ইত্যাদি ধর্মীয় বিষয় যেমন স্থান পেয়েছে সেই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়ক, রাজনৈতিক প্রবন্ধও স্থান পেয়েছে এতে।[৩৯]

উপসংহার

উপরোক্ত আলোকপাতের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, শিবলী নুমানী উর্দু গদ্য সাহিত্যেকে সকলের সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। শিবলীর ভাষা ছিল স্বচ্ছ, বর্ণনা সাবলীল, সতেজ, চিত্তাকর্ষক। শিবলী রচিত বই ও প্রবন্ধগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে উল্লেখিত বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে সামনে ভেসে উঠে। তাঁর দর্শন ও ইতিহাস নির্ভর আলোচনাগুলো উর্দু সাহিত্যের বিশালতায় বহু অধ্যায়ে রঙ্গে রাঙ্গিয়ে তুলেছেন শিবলী নুমানী। তিনি ইতিহাস, সিরাত রচনা, গদ্য রচনা এবং কাব্য সাহিত্য রচনাতেও তাঁর অসাধারণ যোগ্যতার রং ফুটিয়ে তুলেছেন।

তথ্যনির্দেশ

১ ইকবাল সোহাইল, *সিরাতে শিবলী*, আল ইসলাহ্, নভেম্বর ১৯৩৬, পৃ. ৫২।

২ সাইয়েদ সুলাইমান নদভী, *হায়াতে শিবলী*, আযমগড়, মা'রেফ প্রেস, ১৯৪৩, পৃ. ৫৯।

৩ সফর আহমদ সিদ্দিকী, *শিবলী কি সফলে হায়াত*, আযমগড় মা'রেফ প্রেস, ১৯৭৮, পৃ. ১৪।

৪ সাইয়েদ সুলাইমান নদভী, *হায়াতে শিবলী*, আযমগড় মা'রেফ প্রেস, ১৯৪৩, পৃ. ৫১।

৫ চৌধুরী মো: রজিউদ্দিন, *মাশরেকি উত্তর প্রদেশ কী নও মুসলিম রওতার রাজপুতু কী এবতেদায়ী তারিখ*, পৃ. ১৬-১৭।

৬ শিবলী নুমানী, *শে'রুল আযম* (চতুর্থ খণ্ড), পৃ. ১৪।

৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

৮ ড. মুফতী মুহাম্মদ গোলাম রব্বনী (২০১৪), *উর্দু সাহিত্যে খ্যাতিমান আলিমদের অবদান* (ঢাকা: বাংলাবাজার, মাকাতাবাতুত তাকওয়া), পৃ. ৬৪।

৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

১০ শিবলী নুমানী, *আল মামুন*, (লাহোর: মুবারক আলী তাজের কুতুব খানা, আন্দুরন লোহার গেট), পৃ. ১৪।

১১ শায়েখ মো: আকরাম, *শিবলী নামা* (লাহোর: এদারায়ে সাকাফিয়্যাতে ইসলামিয়া), পৃ. ২৪৭।

১২ সোলায়মান নদভী, *মাকাতীবে শিবলী*, আযমগর, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯২৭, পৃ. ২৬৬।

১৩ শিবলী নুমানী, *আল ফারূক*, প্রথম খণ্ড (দিল্লি: আফজালুল মাতাবে, ১৯৮৯), পৃ. ১৩।

১৪ শিবলী নুমানী, *আল ফারূক*, দ্বিতীয় খণ্ড (দিল্লি: আফজালুল মাতাবে, ১৯৮৯), পৃ. ১৬১।

১৫ শিবলী নুমানী, *সীরাতে আননু'মান* (লাহোর: এম. সানাউল্লাহ, তা.বি.), পৃ. ১৮১।

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২।

১৭ শায়েখ মো: আকরাম, *শিবলী নামা* (লাহোর: এদারায়ে সাকাফিয়্যাতে ইসলামিয়া), পৃ. ২৪৭।

১৮ আল্লামা শিবলী নুমানী, *সাওয়ানেহে মৌলবী রূম* (অমৃতসর: রোস বাসার স্টীম ট্রেস, তা.বি.), প্রথম পৃষ্ঠা।

১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

২০ শিবলী নুমানী, *সিরাতুন্নবী*, প্রথম খণ্ড, দারুল মুসান্নিফিন, আযমগড়, ১৯২৯, পৃ. ৫৮।

২১ শিবলী নুমানী, *সিরাতুন নোমান* (লাহোর: এম সানাউল্লাহ খান, রেলওয়ে রোড), পৃ. ১৩।

২২ আব্দুল মওদুদ, *মুসলিম মনীষী* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, চতুর্থ মুদ্রন, জুন, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ২৭৮।

২৩ আবু সালমান শাহজাহানপুরি, *মাকাতীবে আবুল কালাম আযাদ* (আযমগড়ঃ দারুল মুসান্নিফীন, ১৯৩৮), পৃ. ৩৩১।
২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩।
২৫ শাকির, উবায়দুল্লাহ (২০১৬), *আকাবিরে উম্মাতের সোনালী জীবন* (ঢাকাঃ বাংলা বাজার, আশরাফিয়া বুক হাউজ), পৃ. ২৫।
২৬ সায়্যিদ শাহ আলী, *'সাওয়ানেহ নেগারী বা দরজা উর্দু আদব মেঁ'*, *উর্দু মে সাওয়ানেহ নেগারী* (করাচিঃ গোল্ড পাবলিশিং হাউজ, প্রথম প্রকাশ), ১৯৬১।
২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।
২৮ সিদ্দীকী, সাইফুল ইসলাম (২০১৯), *মুসলিম দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও বৈজ্ঞানিক* (ঢাকাঃ রহিম রাশাদ প্রকাশনি), পৃ. ৪২৩।
২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৫।
৩০ সায়্যিদ সুলায়মান নাবি, *'দীবাচা'*, *মাকালাতে শিবলী* (আযমগড়ঃ দারুল মুসান্নিফীন, ১৯৩৮), পৃ. ৭৮।
৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।
৩২ সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী, *হায়াতে শিবলী* (আযমগড়ঃ মা'রেফ প্রেস), পৃ. ১৫৪।
৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।
৩৪ সায়্যিদ সালাহুদ্দীন আব্দুর রহমান, *সালাতিনে হিন্দ কি আদাবী খিদমত* (করাচিঃ মানযিল একাডেমি, ২০০৫), পৃ. ৩১৩।
৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫।
৩৬ আল্লামা শিবলী নুমানী, *'কুতুব খানায়ে ইসকানদরিয়া'*, মাকালাতে শিবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২৫।
৩৭ সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, *'দীবাচা'*, *মাকালাতে শিবলী*, ৮ম খণ্ড (আযমগড়ঃ দারুল মুসান্নিফীন, ১৯৩৮), পৃ. ৩২।
৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।
৩৯ ড. মুফতী মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী (২০১৪), *উর্দু সাহিত্যে খ্যাতিমান আলিমদের অবদান* (ঢাকাঃ বাংলাবাজার, মাকাতাবাতুত তাকওয়া), পৃ. ২৬৭।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

আল-হাদীছের অর্থালংকার : একটি পর্যালোচনা
(Meaning of Al-Hadith : A Review)

ড. মো. মতিউর রহমান*

Abstract: Hadith literally means sayings, statements, narratives, news etc. Human words even that the message of Allah recorded in Quran is also termed as Hadith. But in the terminology of Islamic Shariah. Hadith refers to the sayings, doing and approval either verbal or tacit specifically of Prophet Muhammad (pbuh) has been termed as Hadith. His speech was full of sweetness and very lucid. He always talked to people with a smiling face and avoided verbosity. His expressions were succinct and aphoristic. This is why he is called "Jawamiul kalam". He adopted the best language among Arabs. So, he has also been titled as "Afshahul Arab". His diction was excellent, spontaneous, vivid and full of aphorism. So, it is very important to have a good knowledge of rhetoric to analyze hadith of Prophet Muhammad (pbuh). Generally rhetoric of any language is expressed mainly in two ways. linguistically and semantically. To make language ornamental by giving importance to meaning is referred as meaning rhetoric in Arabic rhetoric. There are some specific rules to creat the beauty of a language. This article attempts to analyze the ornaments of Hadith by referring to some important rules and their applications used in Hadith.

ভূমিকা

হাদীছ মানে কথা, বাণী, সংবাদ, খবর ইত্যাদি। মানুষের কথাকে যেমন হাদীছ বলা হয়; তেমনিভাবে আল্লাহর বাণী আল-কুরআনকেও হাদীছ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তবে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় হাদীছ বলতে রাসূল (স.)-এর কথা, কাজ এবং অনুমোদন, সাথে সাথে ছাহাবা এবং তাবি'য়ীদের কথা, কাজ এবং অনুমোদনকে হাদীছ বলে গণ্য করা হয়। এখানে হাদীছ বলতে মূলত এককভাবে রাসূল (স.)-এর বাণীকেই বুঝানো হয়েছে। রাসূল (স.)-এর মুখের ভাষা ছিল অত্যন্ত সাবলীল ও প্রাঞ্জল। মানুষের সাথে তিনি সব সময় হাসিমুখে কথা বলতেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলতেন না। অল্প কথায় বেশি ভাব প্রকাশ করতেন। এজন্য তাঁকে 'জাওয়ামিউল কালাম' বলা হয়। তিনি আরবদের মাঝে সর্বোত্তম এবং স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতেন। তাই তাঁকে 'আফছাহুল আরব' বলেও ভূষিত করা হয়। রাসূল (স.)-এর শব্দ চয়ন অত্যন্ত য্যুৎসই। তাঁর বাণী ছিল অলংকারপূর্ণ। তাই রাসূল (স.)-এর বাণী বা আল-হাদীছের অলংকার বিশ্লেষণ একটি অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভাষা অলংকার সাধারণত দুভাবে হয়ে থাকে। শব্দগতভাবে এবং অর্থগতভাবে। অর্থের দিক থেকে ভাষা অলংকারপূর্ণ হওয়াকে আরবী অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় المحسنات المعنوية বা অর্থালংকার বলা হয়। আরবী অলংকার শাস্ত্রের অর্থালংকারের কিছু সুনির্দিষ্ট সূত্র রয়েছে। যেমন الطباق -التورية -المقابلة -المبالغة ইত্যাদি। আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লেখযোগ্য সূত্রের পরিচয় তুলে ধরে হাদীছের মাঝে সেগুলোর ব্যবহার পর্যালোচনার মাধ্যমে এখানে আল-হাদীছের অর্থালংকার বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পাবো।

التورية পরিচিতি ও আল-হাদীছে এর ব্যবহার

التورية আরবী অলংকার শাস্ত্রের একটি বিশেষ পরিভাষা। যা علم البديع অংশের المحسنات المعنوية -এর একটি অন্যতম সূত্র। التورية-এর ব্যবহারের মাধ্যমে আরবী ভাষার সৌন্দর্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। এ পর্যায়ে التورية-এর পরিচয় ও আল-হাদীছে এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

---

* প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

التورية পরিচিতি

التورية শব্দটি و-ر-ى মূল অক্ষর থেকে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ: লুকানো, গোপন করা, পরোক্ষ উল্লেখ, অলংকার শাস্ত্রে দ্ব্যর্থবোধক উক্তি।[১] শব্দটির মৌলিকত্ব ও অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

التورية لغة: مصدر وريت الخبر تورية، إذا أسرته، وأظهرت غيره-[২]

'التورية শব্দটি مصدر। বলা হয় وريت الخبر تورية অর্থাৎ- আমি যথাযথভাবে খবরটি গোপন করলাম। এটা তখন বলা হয় যখন আমি প্রকৃত খবরটি গোপন করি এবং অন্য খবরটি প্রকাশ করি।'

অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় التورية হলো-

التورية هي أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان، قريب ظاهر غير مراد، والأخر بعيد خفي هو المراد.[৩]

'বক্তা কর্তৃক এমন একটি শব্দ উল্লেখ করা যা দুটি অর্থ বহন করে। একটি নিকটবর্তী ও স্পষ্ট অর্থ যা বক্তার উদ্দেশ্য নয়। অপর অর্থটি দূরবর্তী ও অস্পষ্ট, অথচ সেটিই বক্তার উদ্দেশ্য।'

উদ্ধৃত সংজ্ঞা থেকে এভাবে বলা যায়। বক্তা কর্তৃক কোন বাক্যে এমন শব্দ ব্যবহার করা; যার দু'টি অর্থ থাকে। একটি স্পষ্ট অর্থ অপরটি অস্পষ্ট অর্থ। বক্তা কর্তৃক স্পষ্ট অর্থ বাদ দিয়ে অস্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করাকে অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় التورية বলা হয়। যেমন আল্লাহর বানী: [৪] وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ 'তৃণলতা ও বৃক্ষাদি তাহারই সিজদায় রত রহিয়াছে।' আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত النجم শব্দের দু'টি অর্থ রয়েছে প্রথম অর্থ হলো আকাশের তারকা যা নিকটবর্তী ও স্পষ্ট অর্থ। আর দ্বিতীয় অর্থ হলো কাণ্ডবিহীন গাছ বা গুল্মলতা যা অস্পষ্ট ও দূরবর্তী অর্থ। অত্র আয়াতে النجم শব্দ দ্বারা দূরবর্তী অর্থকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তাই এই আয়াতে التورية-এর অলংকার প্রকাশ পেয়েছে।

আল-হাদীছে التورية-এর ব্যবহার

التورية-এর সংজ্ঞার আলোকে রাসূল (স.)-এর হাদীছের মাঝে এমন অনেক বাক্য রয়েছে; যেগুলোর মাঝে التورية-এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ পর্যায়ে হাদীছের এমন কিছু উক্তি তুলে ধরছি, যেখানে التورية-এর অর্থালংকার ফুটে উঠেছে। রাসূল (স.)-এর হাদীছে এসেছে-

أَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ وَهْوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ، وَنَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَابٌّ لاَ يُعْرَفُ، قَالَ فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ يَا أَبَا بَكْرٍ، مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ فَيَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ. قَالَ فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي الطَّرِيقَ، وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ-[৫]

'আল্লাহর নবী (স.) যখন মদিনায় এলেন তখন উটের পিঠে আবু বকর (রা.) তাঁর পেছনে ছিলেন। আবু বকর (রা.) ছিলেন বয়োজ্যষ্ঠ ও পরিচিত। আর আল্লাহর নবী (স.) ছিলেন যুবক ও অপরিচিত। বর্ণনাকারী বলেন, যখন আবু বকরের সাথে কারো সাক্ষাত হত, সে জিজ্ঞাসা করত হে আবু বকর (রা.) তোমার সম্মুখে বসা ঐ ব্যক্তি কে? আবু বকর (রা.) বলেন, তিনি আমার পথ প্রদর্শক। রাবী বলেন, প্রশ্নকারী সধারণ পথ মনে করেছেন এবং আবু বকর (রা.) সত্যপথ উদ্দেশ্য করেছেন।'

রাসূল (স.)-এর এই হাদীছটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখানে হাদীছের মাঝে যে سبيل শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে; তা দু'রকম অর্থ নির্দেশ করে। প্রথমত سبيل দ্বারা জমিনে চলাচলের পথ বা রাস্তা বুঝায় আর

এটাই শব্দটির নিকটবর্তী ও স্পষ্ট অর্থ। দ্বিতীয়ত سبيل দ্বারা ইসলামের পথ, কল্যাণের পথ বা হিদায়েতের পথ বুঝায়। যা শব্দটির অস্পষ্ট বা দূরবর্তী অর্থ। আর এ হাদীছে سبيل দ্বারা অস্পষ্ট বা দূরবর্তী অর্থকেই বুঝানো হয়েছে। তাই سبيل শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অত্র হাদীছে অলংকার শাস্ত্রের অর্থালংকার ফুটে উঠেছে।

الطباق পরিচিতি ও আল-হাদীছে এর ব্যবহার

الطباق আরবী অলংকার শাস্ত্রের অর্থালংকারের একটি অন্যতম উপাদান। আরবী ভাষার অনেক স্থানেই الطباق -এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। রাসূল (স.)-এর বাণীতেও অনেক বাক্য পাওয়া যায়; যার মাঝে طباق এর ব্যবহার হয়েছে। এ পর্যায়ে طباق -এর পরিচয় তুলে ধরে আল-হাদীছে এর ব্যবহার পর্যালোচনা করা হলো।

الطباق পরিচিতি

الطباق শব্দটি باب مفاعلة -এর مصدر। যার শব্দমূল ط-ب-ق -এর শাব্দিক অর্থ: মিল, সঙ্গতি, সামঞ্জস্য, সামঞ্জস্যপূর্ণ, অলংকার শাস্ত্রে একে বিরোধালংকার বলা হয়।[৬]

অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় الطباق হলো-[৭] الطباق هو الجمع بين الشيئ وضده فى الكلام

'বাক্যে একটি শব্দের সাথে তার বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহার করাকে الطباق বা বিরোধালংকার বলা হয়।'

স্মর্তব্য যে, الطباق -এর মাঝে যে দু'টি বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহার হবে, সে শব্দ দু'টি কখনো দু'টি اسم -এর মাঝে হবে। যেমন: هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ[৮] 'তিনিই আদি, তিনিই অন্ত।' আবার কখনো দু'টি فعل -এর মাঝে হবে। যেমন:[৯] ثُمَّ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَا 'অতঃপর সেথায় সে মরিবেও না, বাঁচিবেও না।' আবার কখনো দু'টি حرف এর মাঝে হয়ে থাকে। যেমন: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ[১০]

'নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাহাদের উপর পুরুষদের।'

উপর্যুক্ত সংজ্ঞা থেকে বুঝা যায়। কোন বাক্যে একটি শব্দ ব্যবহার করার পর একই বাক্যে তার বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহার করে বক্তব্য প্রদান করাকে অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় الطباق বলা হয়।

الطباق-এর প্রকারভেদ

অলংকার শাস্ত্রে الطباق দু' প্রকার। (১) طباق الإيجاب (২) طباق السلب

طباق الإيجاب হলো-[১১] هو ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا 'বিপরীতার্থক শব্দ দু'টি হ্যাঁ সূচক এবং না সূচক হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বিরোধ না হওয়াকে طباق الإيجاب বলা হয়।' যেমন:[১২] وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآء

'যাহাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর, আর যাহাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর।'

আর طباق السلب বলতে-[১৩] وهو ما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا 'বিপরীতার্থক শব্দ দু'টি হ্যাঁ সূচক এবং না সূচক হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বিরোধ থাকলে তাকে طباق السلب বলা হয়।'

যেমন: يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ [১৪]

'তাহারা মানুষ হইতে গোপন করিতে চাহে কিন্তু আল্লাহ হইতে গোপন করে না।'

আল-হাদীছে الطباق -এর ব্যবহার

আরবী ভাষায় الطباق -এর ব্যবহারের মাধ্যমে ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। হাদীছের বাণী আরবী ভাষায় হওয়ার কারণে হাদীছের অনেক বাক্যেই الطباق-এর ব্যবহার দেখা যায়। এর মাধ্যমে হাদীছের মাঝে বিপরীতার্থক অলংকার ফুটে উঠে। এ পর্যায়ে আল-হাদীছে الطباق-এর ব্যবহার পর্যালোচনা করা হলো।

রাসূল (স.) বলেন: [১৫]. تَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ 'তুমি পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে সালাম দিবে।'

আলোচ্য হাদীছে عرفت এবং لم تعرف শব্দ দু'টির মাঝে طباق -এর ব্যবহার ঘটেছে। প্রকারভেদের দিক থেকে এটি طباق السلب এর অন্তর্ভূক্ত। এখানে দু'টি فعل এর মাঝে طباق সংঘটিত হওয়ার কারণে হাদীছের মাঝে طباق এর সৌন্দর্য ফুঠে উঠেছে।

রাসূল (স.) অন্যত্র বলেন: يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ[১৬] 'আরোহী ব্যক্তি পথচারীকে, পথচারী ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যককে সালাম করবে।'

অত্র হাদীছে الراكب ও الماشي এবং القليل ও الكثير এ শব্দগুলোর মাঝে বিপরীত অর্থ প্রকাশ হওয়ার কারণে এখানে হাদীছের মাঝে طباق الإيجاب এর অর্থালংকার প্রকাশ পেয়েছে।

রাসূল (স.) আরো বলেন: يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا[১৭] 'তোমরা সহজ আচরণ করবে, কঠিন আচরণ করবে না। তোমরা সুসংবাদ দিবে, অনীহা সৃষ্টি করবে না।'

আলোচ্য হাদীছে يسرا ও لا تعسرا এবং بشرا ও لا تنفرا শব্দগুলোর মাঝে বিপরীত অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। পাশাপাশি দু'টি স্থানে হ্যাঁ সূচক এবং না সূচক শব্দ বিদ্যমান থাকার কারণে এখানে طباق السلب এর অলংকার প্রকাশ পেয়েছে। রাসূল (স.) বলেন: كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ[১৮]

'দুটি কালিমা যেগুলো দয়াময় আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়, উচ্চারণে খুব সহজ, ওযনের পাল্লায় অত্যন্ত ভারী।'

বর্ণিত হাদীছে خفيفتان এবং ثقيلتان শব্দ দু'টির মাঝে বিপরীত অর্থ প্রকাশ হওয়ার কারণে এখানে طباق الإيجاب এর সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। এভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, হাদীছের অনেক বাক্যেই কোথাও طباق الإيجاب আবার কোথাও طباق السلب -এর ব্যবহারের মাধ্যমে বিপরীতার্থক সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে।

مقابلة পরিচিতি ও আল হাদীছে এর ব্যবহার

مقابلة আরবী অলংকার শাস্ত্রে অর্থালংকারের একটি অন্যতম সূত্র। আরবী ভাষায় مقابلة এর ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আল কুরআনে যেমন مقابلة এর ব্যবহার দেখা যায়; তেমনিভাবে হাদীছেও অনেক স্থানে مقابلة

এর ব্যবহার পাওয়া যায়। যার মাধ্যমে হাদীছের মাঝে অর্থালংকার অনেকাংশেই বৃদ্ধি পেয়েছে। এ পর্যায়ে مقابلة এর পরিচিতি তুলে ধরে হাদীছে এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

مقابلة পরিচিতি

مقابلة শব্দটি باب مفاعلة এর مصدر। শব্দটি আরবী ق-ب-ل মূল অক্ষর থেকে উৎপত্তি ঘটেছে। এর শাব্দিক অর্থ সামনা-সামনি অবস্থান, বিপরীত অবস্থান।[১৯] অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায়-

المقابلة وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على سبيل الترتيب-[২০]

'কোন বাক্যে বক্তা কর্তৃক একইরূপ অর্থবোধক দুই বা ততোধিক শব্দ ব্যবহার করে পর্যায়ক্রমে সেগুলোর বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহার করাকে مقابلة বলা হয়।'

যেমন আল্লাহর বানী: الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ[২১]

'সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে, তৃণলতা ও বৃক্ষাদি তাহারই সিজদায় রত রহিয়াছে।'

আলোচ্য আয়াতে আকাশের দুটি বস্তু شمس এবং قمر এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এরপর আকাশের বিপরীতে জমিনে উদগত نجم এবং شجر এর বর্ণনা এসেছে। তাই এখানে مقابلة এর অর্থ ফুটে উঠেছে।

আল হাদীছে مقابلة-এর ব্যবহার

রাসূল (স.) এর অনেক বাণী রয়েছে। যার মাঝে مقابلة এর ব্যবহার ঘটেছে। এর মাধ্যমে হাদীছের অর্থালংকার প্রকাশ পেয়েছে। مقابلة এর পরিচয় উল্লেখের পর এ পর্যায়ে হাদীছের মাঝে مقابلة এর ব্যবহার পর্যালোচনা করা হলো। রাসূল (স.) বলেন:

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ-[২২]

'তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে এ কাজই ধ্বংস করেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করত, তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন তাদের মধ্যে কোন দূর্বল লোক চুরি করত, তখন তার উপর হদ বা দণ্ড কায়েম করত।'

আলোচ্য হাদীছটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়। হাদীছে উল্লিখিত شريف শব্দ দ্বারা সম্ভ্রান্ত লোকদের বুঝানো হয়েছে। تركوه শব্দ দ্বারা শাস্তি না দিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে পরবর্তী ضعيف শব্দ দ্বারা দূর্বল লোকদের বুঝানো হয়েছে। এবং أقاموا عليه الحد বলে দুর্বল লোকদের উপর দণ্ড কায়েম করার কথা বলা হয়েছে। তাই এখানে হাদীছের শব্দাবলীর মাঝে مقابلة এর সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে।

مراعاة النظير পরিচিতি ও আল হাদীছে এর ব্যবহার

مراعاة النظير আরবী অলংকার শাস্ত্রে অর্থালংকারের একটি বিশেষ উপাদান। আরবী ভাষায় এ উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে ভাষার সৌন্দর্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ পর্যায়ে مراعاة النظير -এর পরিচয় তুলে ধরে আল-হাদীছে এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

مراعاة النظير পরিচিতি

مراعاة النظير শব্দটি একটি যৌগিক শব্দ। এখানে দু'টি শব্দ রয়েছে। প্রথমটি مراعاة যা ر-ع-ى মূল অক্ষর থেকে باب مفاعلة -এর مصدر। এর শাব্দিক অর্থ: লক্ষ্য করা, দৃষ্টি দেয়া ইত্যাদি।[২৩]

দ্বিতীয় শব্দটি نظير যা فعيل এর ওযনে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ: সমকক্ষ, সাদৃশ্যপূর্ণ, অনুরূপ ইত্যাদি।[২৪] তাই مراعاة النظير এর অর্থ হবে সমকক্ষের প্রতি দৃষ্টি দেয়া, মনোযোগ দেয়া, লক্ষ্য করা ইত্যাদি। অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় مراعاة النظير হলো- [২৫] هي أن يجمع فى الكلام بين أمر وما يناسبه لا بالتضاد

'বাক্যে কোন বিষয় ও তার সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় একত্রিত হওয়া বিপরীত বিষয় নয়।'

উল্লিখিত সংজ্ঞা থেকে বলা যায়, কোন বৈপরীত্য ছাড়া বাক্যে কোন একটি বিষয়ের শব্দের সাথে তার সামঞ্জস্য অর্থপূর্ণ একাধিক শব্দ একত্রিত করাকে مراعاة النظير বলা হয়।

আল-হাদীছে مراعاة النظير-এর ব্যবহার

আরবী অলংকার শাস্ত্রে مراعاة النظير এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আরবী ভাষায় যার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। আল কুরআনে যেমন এর ব্যবহার পাওয়া যায়; হাদীছেও এর অনেক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এর মাধ্যমে রাসূল (স.)-এর বাণীর সৌন্দর্য ফুঠে উঠেছে। এ পর্যায়ে হাদীছ শাস্ত্রে مراعاة النظير-এর ব্যবহার পর্যালোচনা করা হলো। রাসূল (স.) বলেন: [২৬] آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

'মুনাফিকের আলামত তিনটি: যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে, আর আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে।'

আলোচ্য হাদীছটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখানে মুনাফিকের তিনটি গুণ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ গুণাবলীর মাঝে সামঞ্জস্য বিদ্যমান রয়েছে। এবং কোন বৈপরীত্য নেই। তাই এ হাদীছের মাঝে مراعاة النظير-এর ব্যবহার ঘটেছে। এর মাধ্যমে রাসূল (স.)-এর বাণীর মাঝে অর্থালংকার ফুটে উঠেছে। রাসূল (স.) আরো বলেন: مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ[২৭] 'মুসলিম ব্যক্তির উপর যে সকল যাতনা, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আপতিত হয়, এমন কি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এ সবের দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।'

বর্ণিত হাদীছে একজন মুসলিম সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। একজন মুসলিম ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ বেশ কিছু বিষয়ের কথা এখানে বলা হয়েছে। বিষয়গুলোর মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। তাই এখানে হাদীছের মাঝে مراعاة النظير-এর অলংকার ফুটে উঠেছে।

المبالغة পরিচিতি ও আল-হাদীছে এর ব্যবহার

المبالغة আরবী অলংকার শাস্ত্রের একটি অন্যতম উপাদান। আরবী শব্দের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে المبالغة -এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এ পর্যায়ে المبالغة পরিচিতি ও আল হাদীছে এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

المبالغة পরিচিতি

مبالغة শব্দটি باب مفاعلة এর مصدر। যা আরবী ب-ل-غ মূল অক্ষর থেকে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ অতিরঞ্জন আতিশয্য, জোরদান ইত্যাদি।[২৮] অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় مبالغة হলো-

أن يذكر المتكلم وصفا فيزيد فيه حتى يكون أبلغ في المعنى الذى قصده-[২৯]

'বক্তা কর্তৃক কোন গুণকে এমনভাবে প্রকাশ করা যার মাধ্যমে বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থটি পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়।'

আরবী ভাষায় مبالغة এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে কখনো কখনো কোন গুণকে অধিক গুরুত্বারোপসহ প্রকাশ করা হয়। আবার কখনো কখনো مبالغة এর জন্য কিছু নির্দিষ্ট শব্দরূপ আছে সেগুলোর ওযনে শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে বাক্যে مبالغة এর অর্থ প্রকাশ করা হয়। مبالغة-এর শব্দরূপগুলো-

فعلان এর ওযনে رحمن, فعيل এর ওযনে رحيم, فعال এর ওযনে رزاق, فعول এর ওযনে غفور, فعل এর ওযনে حذر ইত্যাদি।[৩০]

আল-হাদীছে مبالغة-এর ব্যবহার

হাদীছে এমন অনেক বাক্য রয়েছে যেখানে সরাসরি مبالغة-এর অর্থ প্রকাশ পেয়েছে, আবার এমন বাক্য রয়েছে যেখানে مبالغة-এর নির্দিষ্ট শব্দরূপের ওযনে শব্দ ব্যবহার করে বাক্যে مبالغة-এর ব্যবহার হয়েছে। مبالغة-এর পরিচিতি আলোচনার পর এ পর্যায়ে হাদীছের মাঝে مبالغة-এর ব্যবহার পর্যালোচনা করা হলো। রাসূল (স.) বলেন: الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ [৩১]

'ঈমানের শাখা সত্তরটিরও অধিক অথবা ষাটটিরও অধিক। এগুলোর সর্বোত্তম হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, আর সর্বনিম্ন হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা।'

আলোচ্য হাদীছে ঈমানের শাখা প্রশাখার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এখানে ঈমানের শাখার সংখ্যা নির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি বরং ৭০টির অধিক বলা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে ঈমানের শাখার নির্দিষ্ট সংখ্যা না বলে এর আধিক্য বুঝানো হয়েছে। তাই এখানে হাদীছের মাঝে مبالغة-এর অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। রাসূল (স.) বলেন:

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ [৩২]

'যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির জানাযায় উপস্থিত হয়ে নামায আদায় করবে বা তার জন্য দুয়া করবে ঐ ব্যক্তির জন্য এক কীরাত, আর যে ঐ মৃত ব্যক্তির দাফন হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে, তার জন্য দু'কীরাত। জিজ্ঞাসা করা হল দু'কীরাত কি? তিনি বললেন, দু'টি বিশাল পাহাড়।'

আলোচ্য হাদীছে قيراط শব্দ ব্যবহার করে নেকী বা কল্যাণের আধিক্য বুঝানো হয়েছে, যা হাদীছের শেষাংশ থেকে বুঝা যায়। তাই এখানে নেকী বা কল্যাণের আধিক্যতার অর্থ প্রকাশক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে হাদীছের মাঝে مبالغة-এর সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। রাসূল (স.) আরো বলেন:

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ-[৩৩]

'যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হাজ্জ পালন করলো এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ হতে বিরত থাকলো, সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে হাজ্জ থেকে ফিরে আসবে যেদিন তাকে তার মা জন্ম দিয়েছিল।'

বর্ণিত হাদীছে হাজ্জের গুরুত্বারোপ করে বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি সঠিকভাবে হাজ্জ পালন করে এবং এর মধ্যে কোন অন্যায় কাজ করে না, অনর্থক কথা বলে না এবং সকল প্রকার যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকে। সে ব্যক্তি এমনভাবে নিষ্পাপ হয়ে যায়। যেমন কোন সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সময় নিষ্পাপ থাকে। তাই বলা যায় এ হাদীছের মাঝে সঠিকভাবে হাজ্জ পালনকারী ব্যক্তির নিষ্পাপ হওয়ার ক্ষেত্রে আধিক্যের কথা বলার মাধ্যমে مبالغة-এর অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। রাসূল (স.) বলেন: لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ-[৩৪] 'যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কান্না করলো সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না যতক্ষন না দুধ স্তনে পুনঃপ্রবেশ করবে।'

অত্র হাদীছে বলা হয়েছে। কোন ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদলে তার জাহান্নামে যাওয়া অসম্ভব যেমনভাবে স্তনের বাট থেকে দুধ বের করে তার মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করানো অসম্ভব। তাই এখানে হাদীছের মাঝে অসম্ভবতার আধিক্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে مبالغة-এর অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। রাসূল (সা.) আরো বলেন: الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ-[৩৫] 'করুণাময়ীদের প্রতি পরম করুণাময় করুণা করেন। তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি করুণা করবে তাহলে আকাশবাসী তোমাদের উপর করুণা করবেন।'

অত্র হাদীছে আল্লাহর গুণবাচক নাম الرحمن শব্দটি مبالغة-এর فعلان ওযনে এসেছে। رحمن শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এখানে আল্লাহর গুণাগুণকে অতি মাত্রায় প্রকাশ করা হয়েছে। তাই এখানে مبالغة-এর অর্থ প্রকাশ পেয়েছে।

الجمع পরিচিতি ও আল-হাদীছে এর ব্যবহার

الجمع আরবী অলংকার শাস্ত্রে অর্থালংকারের একটি অতি পরিচিত উপাদান, হাদীছের মাঝে এ উপাদানটি ব্যবহারের মাধ্যমে হাদীছের অর্থালংকার প্রকাশ পেয়েছে। এ পর্যায়ে الجمع-এর পরিচিতি তুলে ধরে হাদীছে এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

الجمع পরিচিতি

الجمع শব্দটি আরবী ج-م-ع মূল অক্ষর থেকে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ জমাকরণ, একত্রকরণ, অন্তর্ভুক্তকরণ।[৩৬] অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় الجمع হলো-[৩৭] هو أن يجمع بين شيئين أو أشياء متعددة في حكم

'একই হুকুমের অধীনে দুই বা ততোধিক বিষয় একত্রিত হওয়াকে جمع বলা হয়।'

আল-হাদীছে الجمع-এর ব্যবহার

হাদীছের অনেক বাক্যে جمع-এর ব্যবহার ঘটেছে। যার মাধ্যমে হাদীছের অর্থালংকার প্রকাশ পেয়েছে। جمع-এর পরিচিতির পর এখানে আল-হাদীছে جمع-এর ব্যবহার পর্যালোচনা করা হলো।

রাসূল (স.) বলেন:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.[৩৮]

'রাসূলুল্লাহ (স.) প্রত্যেক গোলাম, আযাদ, পুরুষ, নারী, প্রাপ্ত বয়স্ক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, মুসলিমের উপর এক সা পরিমান খেজুর অথবা গম সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ফরয করেছেন।'

আলোচ্য হাদীছে যাকাতুল ফিতর সম্পর্কে বলা হয়েছে। যাকাতুল ফিতর কাদেরকে আদায় করতে হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখানে যাকাতুল ফিতর আদায়ের অধীনে স্বাধীন, দাস, নারী, পুরুষ, ছোট, বড় বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে একত্রিত করা হয়েছে। একটি বিষয়ের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে একত্রিত করার মাধ্যমে এখানে جمع-এর অর্থালংকার প্রকাশ পেয়েছে।

রাসূল (স.) বলেন: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-[৩৯]

'যে ব্যক্তি ঈমানসহ সাওয়াবের আশায় রমাযান মাসে সিয়াম পালন করবে, তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে।'

আলোচ্য হাদীছে রমাযানের রোজার সাথে ঈমান এবং ইহতিসাব দুটি বিষয়কে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাই এখানে جمع-এর অর্থালংকার ফুটে উঠেছে। রাসূল (স.) আরো বলেন:

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ-[৪০]

'যে ব্যক্তি আল-কুরআন পাঠ করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে, কিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে মুকুট পরানো হবে।'

আলোচ্য হাদীছে কিয়ামতের দিন পিতা-মাতাকে মুকুট পরানোর ক্ষেত্রে আল-কুরআন পাঠ এবং আল-কুরআনের নির্দেশের প্রতি আমল এ দুটি বিষয়কে একত্রিত করা হয়েছে। তাই এখানে جمع-এর অলংকার প্রকাশ পেয়েছে।

الجمع والتفريق পরিচিতি ও আল-হাদীছে এর ব্যবহার

الجمع والتفريق অলংকার শাস্ত্রে অর্থালংকারের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। আরবী ভাষায় এর ব্যবহারের মাধ্যমে এ ভাষার সৌন্দর্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। এ পর্যায়ে الجمع والتفريق-এর পরিচয় ও আল-হাদীছে এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

الجمع والتفريق পরিচিতি

الجمع والتفريق এখানে দুটি শব্দ রয়েছে। الجمع শব্দের অর্থ একত্রিকরণ।[৪১] আর التفريق শব্দের অর্থ পার্থক্যকরণ।[৪২] তাই শব্দ দুটির যৌগিক অর্থ হলো একত্রীকরণ ও পার্থক্যকরণ। এ পরিভাষাটি অনেক সময় الجمع مع التفريق বা পার্থক্যকরণসহ একত্রীকরণ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।[৪৩] অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় الجمع والتفريق হলো- هو أن يدخل شيئان فى معنى واحد، ويفرق بين جهتى الإدخال[৪৪]

'দুটি বস্তুকে একই অর্থের অন্তর্ভুক্ত করে অন্তর্ভুক্তিকরণের দিক থেকে বস্তু দুটির মাঝে পার্থক্য করা।'

আল-হাদীছে الجمع والتفريق-এর ব্যবহার

আল-হাদীছে অনেক বাক্য রয়েছে যেখানে الجمع والتفريق-এর ব্যবহার ঘটেছে। এ পর্যায়ে আল-হাদীছে الجمع والتفريق-এর ব্যবহার সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হলো। রাসূল (স.) বলেনঃ إِنَّ اللهَ لا يَنْظُرُ إِلى صُوَرِكُمْ و أموالكم، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وأعمالكم-[৪৫] 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও সম্পদের প্রতি নযর দেন না; বরং তিনি নযর দেন তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি।'

আলোচ্য হাদীছে প্রথমে মানুষের চেহারা বা আকৃতি ও ধন-সম্পদকে একটি বাক্যে এবং মানুষের অন্তর ও আমলকে অপর বাক্যে একত্র করা হয়েছে। অতপর বিষয়গুলোকে হ্যাঁ বাচক এবং না বাচক বাক্যের মাধ্যমে পার্থক্য করা হয়েছে। তাই অত্র হাদীছে পার্থক্যকরণসহ একত্রিকরণের বা الجمع والتفريق-এর সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে। রাসূল (স.) আরো বলেনঃ

السخي قريبٌ من الله قريبٌ من الجنة قريبٌ من الناس بعيدٌ من النار، والبخيل بعيدٌ من الله بعيدٌ من الجنة بعيدٌ من الناس قريبٌ من النار-[৪৬]

'দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী, মানুষেরও নিকটবর্তী। অথচ জাহান্নাম থেকে দূরবর্তী। আর কৃপণব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে তবে জাহান্নামের নিকটে।'

অত্র হাদীছে প্রথমাংশে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া, জান্নাতের নিকটবর্তী হওয়া এবং মানুষের নিকটবর্তী হওয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। অতপর দ্বিতীয়াংশে আল্লাহ থেকে দূরবর্তী হওয়া, মানুষের দূরবর্তী হওয়া এবং জান্নাতের দূরবর্তী হওয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ বিষয়গুলোর মাঝে দানশীলতা এবং কৃপণতা দুটি গুণের মাধ্যমে পার্থক্য করা হয়েছে। তাই এখানে الجمع والتفريق-এর অর্থালঙ্কার প্রকাশ পেয়েছে।

التدبيج পরিচিতি ও আল হাদীছে এর ব্যবহার

التدبيج আরবী অলংকারশাস্ত্রে অর্থালংকারের একটি অন্যতম প্রকার। আরবী ভাষায় التدبيج-এর অনেক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। হাদীছের মাঝে অনেক বাক্য পাওয়া যায় যেগুলোতে التدبيج-এর ব্যবহার হয়েছে। এর মাধ্যমে হাদীছের মাঝে অর্থগত দিক থেকে অলংকার ফুটে উঠেছে। এ পর্যায়ে التدبيج-এর পরিচয় তুলে ধরে হাদীছে এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

التدبيج পরিচিতি

التدبيج শব্দটি باب تفعيل-এর مصدر। শব্দটির د-ب-ج মূল অক্ষর থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ: বঞ্চিতকরণ, সজ্জিতকরণ, অলংকরণ ইত্যাদি।[৪৭] অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায়- أن يؤتى في أثناء الكلام بذكر ألوان يراد بها التورية أو الكناية.[৪৮] 'বাক্যের মাঝে রঙের কথা উল্লেখ করে দ্ব্যর্থবোধক কিংবা লক্ষণাত্নক অর্থ বুঝানোকে التدبيج বলা হয়।' যেমন আল্লাহর বাণী: [৪৯] يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ 'সেদিন কিছু মুখ উজ্জ্বল হবে এবং কিছু মুখ কালো হবে।'

আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতের দিন কিছু মানুষের চেহারা সাদা বা শুভ্র হয়ে যাওয়া বলে তাদের সফলতাকে বুঝানো হয়েছে। আবার কিছু মানুষের চেহারা কালো হয়ে যাওয়া বলে তাদের ব্যর্থতা ও অপমানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই এ আয়াতে রঙের কথা উল্লেখের মাধ্যমে التدبيج-এর অলংকার ফুটে উঠেছে।

আল হাদীছে التدبيج-এর ব্যবহার

হাদীছের মাঝে রাসূল (স.)-এর অনেক বাণী রয়েছে; যেগুলোর মাঝে التدبيج-এর ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থালংকার ফুটে উঠেছে। التدبيج-এর পরিচয় তুলে ধরার পর এ পর্যায়ে হাদীছের মাঝে التدبيج-এর ব্যবহার পর্যালোচনা করা হলো। রাসূল (সা.) বলেন: حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنْ اللَّبَنِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنْ الْمِسْكِ[৫০]

‘আমার হাউযের প্রশস্ততা এক মাসের পথের সমান। তার পানি দুধের চেয়ে সাদা, তার ঘ্রাণ মিশকের চেয়ে বেশী সুগন্ধযুক্ত।’

আলোচ্য হাদীছের মাঝে হাউয কাওসারের পানির গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে; হাউয কাওসারের পানির রং দুধের চেয়েও সাদা হবে। এখানে দুধের চেয়েও অধিক সাদা হওয়ার কথা উল্লেখ করে মূলত সেই পানির অধিক পরিস্কার ও স্বচ্ছতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই এখানে হাদীছের মাঝে রঙের কথা উল্লেখের মধ্য দিয়ে التدبيج-এর অর্থালংকার ফুটে উঠেছে। রাসূল (স.) আরো বলেন: إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.[৫১] ‘কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে এমন অবস্থায় আহবান করা হবে যে, ওযুর প্রভাবে তাদের হাত-পা ও মুখমণ্ডল উজ্জ্বল থাকবে। তাই তোমাদের মধ্যে যে এ উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নিতে পারে, সে যেন তা করে।’

আলোচ্য হাদীছে ব্যবহৃত غرا শব্দটির শাব্দিক অর্থ অধিক সাদা হওয়া, শুভ্র হওয়া বা উজ্জ্বল হওয়া।[৫২] এখানে غرا محجلين শব্দটি ব্যবহার করে কিয়ামতের দিন উম্মতে মুহাম্মাদির ওজুর জায়গাগুলো সাদা ও উজ্জ্বল হওয়ার কথা বলে তাদের সফলতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই এখানে التدبيج-এর অলংকার প্রকাশ পেয়েছে।

الإطراد পরিচিতি ও আল হাদীছে এর ব্যবহার

الإطراد আরবী অলংকার শাস্ত্রের অর্থালংকারের একটি বিশেষ পরিভাষা। আরবী বাক্যেالإطراد-এর ব্যবহারের মাধ্যমে আরবী ভাষার সৌন্দর্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। এ পর্যায়ে الإطراد-এর পরিচয় ও আল হাদীছে এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

الإطراد পরিচিতি

الإطراد শব্দটি باب افتعال এর مصدر। এর শাব্দিক অর্থ চলমানতা, নিয়মতান্ত্রিকতা, ধারাবাহিকতা ইত্যাদি।[৫৩] অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় الإطراد হলো-

هو أن يذكر اسم الممدوح و اسم من يمكن من ابائه على ترتيب الولادة ليزداد إبانة و توضيحا على ترتيب صحيح و نسق مستقيم من غير تكلف و لا تعسف.[৫৪]

'কোনো বাক্যে বক্তা কর্তৃক প্রশংসিত ব্যক্তির নাম এবং তার বাপ-দাদার নামগুলো প্রতিষ্ঠিত জন্ম ধারাবাহিকতায় উল্লেখ করা। যাতে করে কোনরূপ অসুবিধা ও ভুল-ভ্রান্তি ছাড়াই সে ব্যক্তি সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে উঠে।'

যেমন আল্লাহর বাণী: قَالُواْ نَعۡبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ [৫৫]

'তারা তখন বলেছিল, 'আমরা আপনার ইলাহ-এর এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমা'ঈল ও ইসহাকের ইলাহ-এরই 'ইবাদত করব।'

এ আয়াতটিতে ইয়াকুব (আ.)-এর সন্তানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাঁরা তাঁদের পিতা ইয়াকুব (আ.) এবং তাঁর পূর্বপুরুষগণ যে রবের উপাসনা করেছেন তাঁরাও সে উপাস্যের উপাসনা করবে বলে স্বীকার করে। এখানে ইয়াকুব (আ.)-এর পূর্বপুরুষ ইসহাক, ইসমাঈল এবং ইব্রাহীম (আ.) ছিলেন সে পরিচয়ও স্পষ্ট করা হয়েছে।

আল হাদীছে الإطراد -এর ব্যবহার

الإطراد-এর সংজ্ঞার আলোকে রাসূল (সা.)-এর হাদীছে এমন কিছু বাক্য পাওয়া যায়; যেগুলোর মাঝে الإطراد -এর ব্যবহার ঘটেছে। এ পর্যায়ে হাদীছের এমন কিছু বাক্য পর্যালোচনা করা হলো যার মাঝে الإطراد-এর অলংকার ফুটে উঠেছে।

রাসূল(সা.)-এর বাণী: الْكَرِيمُ ابنُ الكَرِيمِ ابْنِ الكَرِيمِ ابْنِ الكَرِيمِ: يُوسُفُ بنُ يَعْقُوبَ بنِ إسْحاقَ بنِ إبْراهِيمَ. [৫৬]

'সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র সম্মানিত, সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র সম্মানিত, সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র সম্মানিত, সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র সম্মানিত, ইব্রাহীমের পুত্র ইসহাক, ইসহাকের পুত্র ইয়াকুব, ইয়াকুবের পুত্র ইউসুফ।'

আলোচ্য হাদীছে বলা হয়েছে, ইউসুফ (আ.) ইয়াকুব (আ.)-এর পুত্র, ইয়াকুব (আ.) ইসহাক (আ.)-এর পুত্র এবং ইসহাক (আ.) ইব্রাহীম(আ.)-এর পুত্র। এখানে যেমন ভাবে ইউসুফ (আ.)-এর পরিচয় স্পষ্ট করা হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে তাঁর বংশীয় মর্যাদা ও সম্মানের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এ হাদীছের মাঝে الإطراد -এর অর্থালংকার ফুঠে উঠেছে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, এভাবে রাসূল (স.)-এর হাদীছের প্রতি গভীর দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রত্যেকটি হাদীছের মাঝে অলংকার শাস্ত্রের কোন না কোন সূত্রের ব্যবহার ঘটেছে। আরবী অলংকার শাস্ত্রের অর্থালংকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অলংকার শাস্ত্রে অর্থালংকারের যেমন অনেক সূত্র রয়েছে তেমনিভাবে হাদীছ শাস্ত্রের পরিধিও অনেক বিস্তৃত। তাই একটি প্রবন্ধে অর্থালংকারের সকল সূত্র বিশ্লেষণ করে আল-হাদীছে সেগুলোর ব্যবহার পর্যালোচনা করা কঠিন। সেদিকে লক্ষ্য রেখে আলোচ্য প্রবন্ধে অলংকার শাস্ত্রের অর্থালংকারের উল্লেখযোগ্য কিছু বিশেষ বিশেষ সূত্রের পরিচয় তুলে ধরে উদাহরণ স্বরূপ রাসূল (স.)-এর কিছু হাদীছের মাঝে সেগুলোর ব্যবহার পর্যালোচনার মাধ্যমে সংক্ষিপ্তাকারে আল-হাদীছের অর্থালংকারের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আশা করা যায়, পাঠক সমাজ অত্র প্রবন্ধ থেকে আল-হাদীছের অর্থালংকার সম্পর্কে একটি ধারনা পেতে সক্ষম হবেন।

তথ্যনির্দেশ

১ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৭৯।
২ আস-সাইয়িদ আহমাদ আল-হাশিমী, *জাওয়াহির আল-বালাগাহ* (কায়রো: মুআস্‌সাসাতু আল-মুখতার, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৮৯।
৩ আলী আল-জারিম ও মুস্তফা আমীন, *আল-বালাগাহ আল-ওয়াযিহাহ* (দেওবন্দ: আল-মাকতাবাহ আত-থানূভী, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ২৭৩।
৪ সূরা আর-রহমান, আয়াত নং- ৬।
৫ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আল-জামি আল-মুসনাদ-আছ ছহীহ* (বৈরূত, লেবানন: দারু আত-তাসীল, মারকাযু আল-বুহূছ ওয়া তাকনিয়্যাতু আল-মা'লূমাত, ৩য় সংস্করণ, ২০২০ খ্রি.), পৃ. ৮১৩, হাদীছ নং ৩৯০৪।
৬ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩৬।
৭ আলী আল-জারিম ও মুস্তফা আমীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭।
৮ সূরা আল-হাদীদ, আয়াত নং- ৩।
৯ সূরা আল-আ'লা, আয়াত নং- ১৩।
১০ সূরা আল-বাকারা, আয়াত নং- ২২৮।
১১ আলী আল-জারিম ও মুস্তফা আমীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭।
১২ সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং- ২৬।
১৩ আলী আল-জারিম ও মুস্তফা আমীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭।
১৪ সূরা আন-নিসা, আয়াত নং- ১০৮।
১৫ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০, হাদীছ নং ১২।
১৬ মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ, *ছহীহ মুসলিম* (কায়রো: দারু আল-হাদীছ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৭০৬, হাদীছ নং ২১৬০।
১৭ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০০, হাদীছ নং ৪৩২৪।
১৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৯৪, হাদীছ নং ৭৫৬০।
১৯ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১৩।
২০ আহমাদ মুস্তফা আল-মারাগী, *উলূমু আল-বালাগাহ* (বৈরূত: আল-মাকতাবাহ আল-আসরিয়্যাহ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৭১।
২১ সূরা আর-রহমান, আয়াত নং- ৫-৬।
২২ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩০, হাদীছ নং ৩৪৭৫।
২৩ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫৪।
২৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯০।
২৫ জালালুদ্দীন আল-খাতীব আল-কাযবীনী, *আল-ঈযাহ ফী উলূমি আল-বালাগাহ* (বৈরূত: মুআসসাসাতু আল-কুতুব আছ-ছাকাফিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ, তা. বি.), পৃ. ১৯৪।
২৬ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪, হাদীছ নং ৩৩।
২৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১১, হাদীছ নং ৫৬৪১।
২৮ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০৫।
২৯ হাফিয জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান আস-সয়ূতী, *আল-ইতকান ফী 'উলূমি আল-কুরআন*, ৩য় খণ্ড (কায়রো: দারু আল-হাদীছ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২৪০।
৩০ *তদেব*।
৩১ মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮, হাদীছ নং ৫৮।
৩২ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৫, হাদীছ নং ১৩৩৫।
৩৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৭, হাদীছ নং ১৫৩৫।
৩৪ মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানু আত-তিরমিযী* (রিয়াদ: মাকতাবাতু আল-মা'আরিফ লি আন-নাশরি ওয়া আত-তাওদী, ২য় সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৩৮৪, হাদীছ নং ১৬৩৩।
৩৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৯, হাদীছ নং ১৯২৪।
৩৬ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১০।
৩৭ হাফিয জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান আস-সয়ূতী, ৩য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৩।
৩৮ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৪, হাদীছ নং ১৫১৭।
৩৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৯, হাদীছ নং ১৯১৩।

৪০ সুলায়মান ইবন আশ'আছ, *সুনানু আবি দাউদ* (রিয়াদ: মাকতাবাতু আল-মা'আরিফ লি আন-নাশরি ওয়া আত-তাওদী, ২য় সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ২৫১, হাদীছ নং ১৪৫৩।
৪১ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১০।
৪২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১।
৪৩ আহমাদ মুস্তফা আল-মারাগী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮০।
৪৪ নাসীফ আল-ইয়াযিজী, *মাজমু'উ আল-আদব* (বৈরূতঃ আল-মাতবা'আহ আল-আমীরকানিয়্যাহ, ৯ম সংস্করণ, ১৯৩২), পৃ. ১৪৯। উদ্ধৃতঃ ডঃ মোঃ গোলাম মাওলা, *আল-কুরআনুল কারীম-এর আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৩৫৭।
৪৫ মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১৯, হাদীছ নং ২৫৬৪।
৪৬ মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪৬, হাদীছ নং ১৯৬১।
৪৭ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৮।
৪৮ নাসীফ আল-ইয়াযিজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪।
৪৯ সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং- ১০৬।
৫০ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮৪, হাদীছ নং ৬৫৮৯।
৫১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০, হাদীছ নং ১৪০।
৫২ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮৯।
৫৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩।
৫৪ আহমাদ মুস্তফা আল-মারাগী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯২।
৫৫ সূরা আল-বাকারা, আয়াত নং- ১৩৩।
৫৬ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০৭, ৭০৯ ও ৯৮২, হাদীছ নং ৩৩৮৬, ৩৩৯৫ ও ৪৬৬৯।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০২৩, ISSN 1813-0402

‘বঙ্গবন্ধু’ বিষয়ক রচনাবলির আরবি অনুবাদ : একটি পর্যালোচনা
(Arabic Translations of Essays on 'Bangabandhu': A Review)

ড. আবু সালেহ মুহাম্মদ তোহা*

Abstract: The art of translation serves as a fundamental means of bringing together ideas, ideals and cultures among people of different languages. Through translation, an opportunity to know, understand and understand foreign literature, culture and ideas is created. Through the art of translation, the people of different countries can share their experiences with each other and enrich themselves by imitating other nations in matters lacking in one nation. All languages have a special tradition of translation. The translation industry has also contributed significantly to the enrichment of the Arabic language. Under the patronage of the Islamic caliphs, various translation centers were established and various knowledge and sciences of the world including Greece and Europe were translated into Arabic. Again, with the expansion of the scope of Islam for religious reasons, in the first stage, the Qur'an-Sunnah and gradually other sciences were translated from Arabic into other languages. Ever since the arrival of Muslims in our country, the people of this country have developed an affinity with Arabs and the Arabic language. In that continuity, necessary Arabic works have been translated into Bengali and to a lesser extent Bengali works have also been translated into Arabic. Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the architect of independent Bangladesh, is an undisputed leader of Bangladesh. He is hailed as a great leader all over the world. His speeches, statements and his biographical works given in Bengali language have been translated into various languages of the world including Arabic. The article reviews the context of the Arabic translation of Bangabandhu's essays.

ভূমিকা

আরবি– পৃথিবীর প্রাচীন ও জীবন্ত একটি ভাষা। ইসলাম ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে আরবি ভাষাও বিশ্বের বেশিরভাগ অংশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং মুসলমানদের জীবনের সাথে যুক্ত হয়েছে। সবভাষার মুসলমান কম-বেশি আরবি চর্চা করে থাকে। বঙ্গদেশে যখন থেকে মুসলমানদের আগমন হয়েছে তখন থেকেই আরবদের সাথে এবং আরবি ভাষার সাথে এদেশের মানুষের সখ্যতা গড়ে উঠেছে। আরবি ভাষা ও সাহিত্য তার প্রাচীন ধারাকে অপরিবর্তিত রেখে আধুনিক সকল শাখায় সমানভাবে বিচরণ করছে। নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, রম্য, প্রবন্ধ, সাংবাদিকতা ও চলচ্চিত্রসহ সর্বত্রই আরবি সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বিচরণ রয়েছে। আরবি অনুবাদ সাহিত্যও অনেক সমৃদ্ধ। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার রচনাবলি আরবিতে অনুবাদ হয়েছে। বাংলা রচনাবলিরও আরবি অনুবাদ পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের এক অবিসংবাদিত নেতা। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক একটি দেশের আবির্ভাব হয়েছে। তিনি সারা পৃথিবীতে মহান নেতা হিসেবে সমাদৃত। ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর তিনি বিশ্ব শান্তি পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ‘জুলিও কুরি’ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বাংলা ভাষায় দেওয়া তাঁর বক্তৃতা, বিবৃতি এবং জীবনীবিষয়ক রচনাবলি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হওয়ার পাশাপাশি আরবি ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে।

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণা পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য

'বঙ্গবন্ধু' বিষয়ক রচনাবলির আরবি অনুবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রধানত পর্যালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি হলো লিখিত বা মুদ্রিত বিভিন্ন উপকরণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সবিস্তর জানা। উৎসগত শ্রেণি বিন্যাস অনুযায়ী প্রবন্ধটিতে যে সকল তথ্য-উপাত্ত তা মূলত দুই ধরনের। এর একটি– প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত; যা বঙ্গবন্ধু বিষয়ক বাংলা রচনাবলির আরবি অনুবাদ গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনাবলি। দ্বিতীয়টি– সহায়ক উপকরণ; যা প্রবন্ধ সংশ্লিষ্ট বই-পুস্তক। আলোচিত প্রবন্ধে বাংলা ভাষায় রচিত বঙ্গবন্ধু বিষয়ক গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনাবলির আরবি অনুবাদ গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা ও জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায়– আরব বিশ্ব ও আরবি ভাষার সাথে সংশ্লিষ্টদের বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধিতে– এ গবেষণা অনবদ্য ভূমিকা পালন করবে। ফলে আরবিভাষীদের মধ্যে বাংলা ও বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসা ও আকর্ষণ তৈরি হবে এবং উভয় জাতির মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে।

বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের আরবি অনুবাদ

অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থ পরিচিতি: 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' হলো– স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান[১] এর আত্মজীবনীমূলক আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি গ্রন্থ। ২০১২ সালে এটি প্রকাশিত হয়। আসলে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' সম্পূর্ণ কোনো গ্রন্থ নয়, বরং বঙ্গবন্ধুর জীবনের একটি অসমাপ্ত আখ্যান। ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় তিনি বেশ কিছু সময় লেখালেখি করেন। ২০০৪ সালে বঙ্গবন্ধুর হাতে লেখা চারটি খাতা আকস্মিকভাবে তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তগত হয়। খাতাগুলো ছিলো খুবই পুরানো এবং প্রতিটি পাতা ছিলো জীর্ণ। খাতাগুলো থেকে পাঠ উদ্ধারের পর অধ্যাপক শামসুজ্জামান খানের সম্পাদনায় আত্মজীবনীমূলক লেখাগুলোকে গ্রন্থে রূপান্তরিত করা হয় এবং প্রকাশিত হয়।[২]

ডেইলি স্টার সাহিত্য পাতায় প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধুর তিনটি বইয়ের বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা' শিরোনামের পর্যালোচনায় বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থের যথার্থ বিবরণ ফুটে উঠেছে। সেখানে বলা হয়েছে–

> 'বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী মূলত রাজনৈতিক সাহিত্য। কিন্তু কথা সাহিত্যের বিচারে এটি বাঙালির জ্ঞান-ইতিহাসের নতুন পাঠ। প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানে এমন গভীরতা-সম্পন্ন ঘটনাবলীর বিবরণ ইতিহাসে তুলনাহীন। আবার যে ইতিহাসের নির্মাতা লেখক নিজেই। ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ঘটনাপ্রবাহ জানার সবচেয়ে আকরগ্রন্থ এটি। এটি শুধু বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত কিংবা রাজনৈতিক সংগ্রামের বিবরণ নয়। এদেশের সমাজ জীবনেরও আলেখ্য। এটি অসমাপ্ত হলেও আবেদন অপরিসীম। বাঙালির রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আর সংগ্রামের সাবলীল আত্মকথন এটি। ইতিহাসের তথ্যসমৃদ্ধ বই আত্মজীবনী নিছক স্মৃতিকথার সীমানা পেরিয়ে রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য, সমাজ ও সাংস্কৃতিক অনন্য অনুপম ভাষ্য হয়ে উঠেছে।'[৩]

বিভিন্ন ভাষায় অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থের অনুবাদ

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'- প্রকাশিত হওয়ার পর খুব অল্প সময়ে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং সুধী মহলে সমাদৃত হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- গ্রন্থটি এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ২০১২ সালের ১২ জুন বাংলা সংস্করণের সাথে ইংরেজি সংস্করণও প্রকাশিত হয়। ইংরেজি সংস্করণের

অনুবাদ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রফেসর ফকরুল আলম।[৪] ২০১৫ সালের ২ আগস্ট গ্রন্থটির জাপানি সংস্করণের মোড়ক উন্মোচিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন কাজুহিরো ওয়াতানাবে। চীনা ভাষায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ২০১৬ সালের ২৮ জানুয়ারি। এর অনুবাদক চাই সি। ২০১৭ সালের ২৬ মার্চ ফারসি ভাষায় এবং ২০১৭ সালের ৮ এপ্রিল হিন্দি ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। ইংরেজি, জাপানি, চীনা, ফারসি ও তুর্কি ভাষার পর আরবি ভাষায়ও তরজমা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'।[৫]

অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থের আরবি অনুবাদ

ঢাকাস্থ ফিলিস্তিন দূতাবাসের উদ্যোগে গ্রন্থটির আরবি অনুবাদ হয়। অনুবাদ করেন ফিলিস্তিনের অনুবাদক মুহাম্মাদ দাবাজাহ [৬] এবং সম্পাদনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের প্রফেসর ড. আবদুল্লাহ আল মারুফ। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের আরবি অনুবাদ গ্রন্থের নাম– مذكّرات لم تكتمل যার বাংলা উচ্চারণ– 'মুযাক্কিরাতুন লাম-তাকতামিল'। আরবি অনুবাদ সম্পাদনা বিষয়ে প্রফেসর ড. সাইয়েদ আবদুল্লাহ আল মারুফ বলেন,

> "সন্দেহ নেই মুহাম্মাদ দাবাজাহ একজন দক্ষ অনুবাদক। কিন্তু যে গ্যাপ ছিল তা হল, তিনি ইংরেজি থেকে আরবি অনুবাদ করেছেন। ফলে অনেক জায়গায় লেখকের মূল বক্তব্য ফুটে ওঠেনি। তা ছাড়া বঙ্গবন্ধুর ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তার পরিচয় না থাকায় আরবি অনুবাদ অনেকটা নিরস হয়ে পড়ে। প্রাণহীন এ অনুবাদকে প্রাণময় ও প্রেমময় করে মূল লেখকের আবেগ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। সে ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পুরো বইটিই আবার নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজাতে হয়েছে।"[৭]

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটির আরবি অনুবাদ ফিলিস্তিনের রামাল্লাহ থেকে দার আর-রু'ইয়া লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি' (দার আর-রু'ইয়া ফর পাবলিশিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন) ২০১৬ সালে প্রথম এবং ২০১৮ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৯৪।[৮] ২০১৬ সালের ১২ ডিসেম্বর গণভবনে ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. রিয়াদ এন. এ. মালকি– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে বইটির আরবি সংস্করণের অনুলিপি তাঁর হাতে তুলে দেন। এ গ্রন্থের মাধ্যমে আরব বিশ্বে বঙ্গবন্ধুকে তুলে ধরার বড় সুযোগ তৈরি হয়েছে।

আরবি অনুবাদের নমুনা

আরবি অনুবাদের নমুনা হিসেবে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের ভূমিকার প্রথম অনুচ্ছেদের আরবি অনুবাদ[৯] তুলে ধরা হলো–

> اقتضت الظروف من والدي بانغو بوندو شيخ مجيب الرحمن أن يدخل السجن مرارا وتكرارا ويقضي زهرة شبابه وراء القضبان وفي العزل الانفرادي لانخراطه في العديد من الحركات السياسيه المطالبه باستعادة حقوق شعبه من مغتصبي تلك الحقوق. فكان المناضل الصلب الذي لم يساوم يوما على مبادئه وعجز حبل المشنقة ان يدخل الرهبة الى قلبه. وخلال مسيرته النضالية تلك كانت قضية شعبه ومعاناته في طليعة اهتماماته. قال على نفسه ان يعيد البسمة الى وجوه فقراء بنغلاديش وان يجعل بلاده نفسها تواكب البلدان المزدهرة. وكان لديه ايمان راسخ بان الشعب البنغالي سيعيش حياة حرة كريمة عندما بكامل حقوقه الاساسية ويتوفر له المئكل والملبس والمسكن والتعليم والصحة ويخرج من براثن

كابوس الفقر . وفي سبيل هذه الغاية تخلى شيخ مجيب عن كافة اشكال رفاهية الحياة ورخائها وتابع نضاله الى كلل ولا هوادة لبلوغ هدفه الى ان تكلل هذا النضال بالنجاح وتحققت لبلاده الحرية وارتقى بشعبه البنغالي الى مستوي رفيع بين الامم وبني له الدولة المستقلة ذات السيادة وحقق له حلم الحرية التي ناضل من اجلها هذا الشعب على مدى الف عام. غير انه عندما حقق لبلاده التحرر السياسي والبناء والاقتصادي اغتالته رصاصات غادرت اطلقتها ايد اثمة فروي بدمائه الزكية ارض بنغلاديش التي احبها والتي ناضل من اجل حريتها لتبقي حادثة الاغتيال وصمة عار دائمة في جبين الشعب البنغالي.

আরবি অনুবাদ পর্যালোচনা: 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আরবি অনূদিত অংশে তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ–

> "আমার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জীবনের সব থেকে মূল্যবান সময়গুলো কারাবন্দি হিসেবেই কাটাতে হয়েছে। জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়েই তাঁর জীবনে বারবার এই দুঃসহ নিঃসঙ্গ কারাজীবন নেমে আসে। তবে তিনি কখনও আপোষ করেন নাই। ফাঁসির দড়িকেও ভয় করেন নাই। তাঁর জীবনে জনগণই ছিল অন্তঃপ্রাণ। মানুষের দুঃখে তাঁর মন কাঁদত। বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাবেন, সোনার বাংলা গড়বেন– এটাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য– এই মৌলিক অধিকারগুলো পূরণের মাধ্যমে মানুষ উন্নত জীবন পাবে, দারিদ্রের কষাঘাত থেকে মুক্তি পাবে, সেই চিন্তাই ছিল প্রতিনিয়ত তাঁর মনে। যে কারণে তিনি নিজের জীবনের সব সুখ আরাম আয়েশ ত্যাগ করে জনগণের দাবি আদায়ের জন্য এক আদর্শবাদী ও আত্মত্যাগী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, বাঙালি জাতিকে দিয়েছেন স্বাধীনতা। বাঙালি জাতিকে বীর হিসেবে বিশ্বে দিয়েছেন অনন্য মর্যাদা, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামে বিশ্বে এক রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন। বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন সফল করেছেন। বাংলার মানুষের মুক্তির এই মহানায়ক স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষে যখন জাতীয় পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন নিশ্চিত করছিলেন তখনই ঘাতকের নির্মল বুলেট তাঁকে জনগণের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। স্বাধীন বাংলার সবুজ ঘাস তাঁর রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। বাঙালি জাতির ললাটে চিরদিনের জন্য কলঙ্কের টিকা এঁকে দিয়েছে খুনিরা।"[১০]

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য উল্লিখিত আরবি অনুচ্ছেদে অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীলভাবে ফুটে উঠেছে। আরবি ভাষা জানা যে কোন মানুষ আরবি অনুচ্ছেদটুকু পড়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য উদ্ধার করতে সক্ষম হবেন।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের আরবি অনুবাদ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সমবেত জনসমুদ্রে জাতির উদ্দেশে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তাঁর এই ভাষণ জাতিকে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করে। ২০১৭ সালে ইউনেস্কো এই ঐতিহাসিক ভাষণকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ ভাষণকে স্বীকৃতি দিয়ে মেমরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যশনাল রেজিস্টারে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। এটি প্রথম কোন বাংলাদেশি দলিল যা মেমরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যশনাল রেজিস্টারে আনুষ্ঠানিক ও স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হবে। ভাষণটি বিভিন্ন ভাষার

পাশাপাশি আরবি ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন’ এর গবেষণা ত্রৈমাসিক– ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা’ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮ সংখ্যায় এ বিষয়ে আরবি ভাষার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধের শিরোনাম–

خطبة صديق البنغال أبو الشعب شيخ مجيب الرحمن فى ٧ مارس ١٩٧١م: خلفيتها وأهميتها

(খুতবাতু সদিকিল বান্গাল আবুশ শা'বি শেখ মুজিবুর রহমান ফি ৭ মার্চ ১৯৭১ খ্রি.: খলফিয়াতুহা ওয়া আহাম্মিয়াতুহা) অর্থাৎ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ: প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব। প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণের প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব আলোচনার পাশাপাশি পুরো ভাষণের আরবি অনুবাদ উপস্থাপিত হয়েছে।[১১]

এছাড়া روائع الخطب العربية (রওয়ায়ি'উল খুতাবিল আরাবিয়্যাহ) শীর্ষক আরবি গ্রন্থে বিশ্ব বরেণ্য মনীষীদের বক্তৃতা আরবি ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের পুরো ভাষণের আরবি অনুবাদ উপস্থাপিত হয়েছে। ঐতিহাসিক এ ভাষণের শেষাংশ নিম্নরূপ–

> ‘এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান বাঙালি অবাঙালি যারা আছে, তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনেন, তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নিবার পারে। কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে চালাবেন। কিন্তু যদি এ দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।’[১২]

ঐতিহাসিক এই ভাষণ সুখপাঠ্য ও সাবলীল আরবি ভাষায় ফুটে উঠেছে। উল্লিখিত অংশের আরবি অনুবাদ[১৩] নিম্নরূপ–

> إن الهندوس والمسلمين والبنغالية وغير البنغالية كل أولئك الذين يعيشون في هذا البلد هم إخواننا. إن مسؤولية حمايتهم تقع على عاتقنا. ألا فلا تتلطخ سمعتنا بأي شكل من الأشكال. أقول لموظفى الإذاعة والتلفزيون، إذا كانت كلماتنا لا تبث في الراديو، فلا أحد من البنغاليين يباشر عمله في محطة الإذاعة.
>
> وإذا لم يتم بث أخبارنا في التلفزيون فلا أحد من البنغاليين يباشر عمله في محطة الإذاعة. ستظل البنوك مفتوحة لمدة ساعتين كل يوم حتى يتمكن الناس من الحصول على رواتبهم. ولكن لن نسمح بتحويل فلسة واحدة من شرق باكستان إلى غربها. خدمة الهاتف والتلغراف ستظل سارية في البنغالية الشرقية يجب أن تداوموا على إرسال أخبارنا لوسائل الإعلام الدولية. ولكن

إذا كانت أي خطوة شريرة أو حركة خبيثة للقضاء على شعب هذا البلد فعليكم أن تعملوا على حذر للغاية.

أهيبكم بتشكيل لجنة المقاومة تحت قيادة رابطة عوامي في كل قرية وفي كل حي، وكونوا على استعداد بكل ما لديكم ولا تنسون أننا ضحينا بنفوسنا ودمائنا وسنضحى بدماء أكثر، فسنحرر شعب هذا البلد إن شاء الله.

إن هذا الكفاح من أجل حريتنا، وإن هذا النضال من أجل استعلالنا. **غلبت البنغالة**

'বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন' গ্রন্থের আরবি অনুবাদ

'বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন' গ্রন্থ পরিচিতি: আবু হেনা মুস্তাফা কামাল রচিত– 'বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন' গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিষয়ে বিশটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে। প্রকাশক– ইসলামিক ফাউন্ডেশন; প্রকাশকাল– ১ম সংস্করণ: সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ এবং ২য় সংস্করণ– ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ। পৃষ্ঠা সংখ্যা– ৯৬।

প্রবন্ধগুলো নিম্নরূপ–

- বঙ্গবন্ধু ও ইসলামের প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালোবাসা
- ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও এর প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- ইসলাম প্রচার ও প্রসারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: ইতিহাসের একটি নাম
- বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী
- ইসলামের প্রচার ও প্রসারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সাফল্যের অর্জন
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারুল-আরকাম ইবতিদায়ি মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা
- সারা দেশে ৫৬০টি মসজিদ ও ইসলামিক সংস্কৃতি কেন্দ্র নির্মাণে শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ
- দারুল-আরকাম হাফেজদের জন্য একটি জনপ্রিয় প্রকল্প
- মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা শেখ হাসিনা সরকারের একটি চমৎকার প্রকল্প
- বাংলাদেশের উন্নয়ন বিশ্বকে অবাক করে
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংক্ষিপ্ত জীবনী
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে দুই পবিত্র মসজিদের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং মসজিদে নববীর ইমাম ও খতীবের বাংলাদেশ ভ্রমণ
- আলিমদের কাজে লাগাতে শেখ হাসিনার অর্জন
- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ও রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রস্তাব
- সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস কর্মকাণ্ড মোকাবেলায় শেখ হাসিনা সরকারের অর্জন
- সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা এবং ন্যায়বিচারকে ইসলাম গুরুত্ব দেয়
- বাংলাদেশের সংবিধানে মদিনা সনদের প্রতিফলন
- ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচয়
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সমৃদ্ধির নয় বছর।[১৪]

আরবি অনুবাদ: ‘বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন’ গ্রন্থের আরবি অনুবাদ করেছেন– ড. মাহমুদুল হাসান। আরবি অনূদিত গ্রন্থের নাম–

حبيب البنغال وشيخ حسينة و المؤسسة الإسلامية

(হাবিবুল বান্‌গাল ওয়া শেখ হাসিনা ওয়াল মুয়াসসাসাতুল ইসলামিয়্যাহ)

প্রকাশক– ইসলামিক ফাউন্ডেশন; প্রকাশকাল– সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ। পৃষ্ঠা সংখ্যা– ৯২। গ্রন্থে উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলোর আরবি শিরোনাম নিম্নরূপ– [১৫]

- بنغوبندو وحبه الصادق للإسلام.
- المؤسسة الإسلامية مؤسسها أبو الشعب بنغوبندو شيخ مجيب الرحمن.
- إنجازات أبي الشعب بنغوبندو شيخ مجيب الرحمن في إشاعة الإسلام ونشرها.
- بنغوبندو شيخ مجيب الرحمن : اسم في التاريخ.
- السيرة الذاتية غير تام لبنغوبندو.
- إنجازات نجاح حكومة رئيسة الوزراء شيخ حسينة في إشاعة الإسلام ونشرها.
- فخامة رئيسة الوزراء شيخ حسينة مؤسسة مدرسة دار الأرقم الابتدائية.
- مبادرة متميزة من قبل شيخ حسينة في بناء المساجد بعدد ٥٦٠ ومركز الثقافة الإسلامية أنحاء البلاد.
- مدرسة دار الأرقم لحفاظ القرآن مشروع شعبي.
- برنامج تعليم الأطفال والكبار عبر المساجد مشروع رائع لحكومة شيخ حسينة.
- تنمية بنغلاديش: مفاجأة العالم.
- نبذة مختصرة عن حياة فخامة رئيسة الوزراء شيخ حسينة.
- زيارة نائب رئيس رئاسة الحرمين الشريفين وإمام وخطيب المسجد النبوي لدولة بنغلاديش من دعوة كريمة من قبل رئيسة الوزراء شيخ حسينة .
- إنجازات شيخ حسينة في تشغيل العلماء.
- الجمعية العامة للأمم المتحدة ومقترحات فخامة رئيسة الوزراء شيخ حسينة لحلول أزمات "الروهينغا".
- إنجازات حكومة فخامة شيخ حسينة في محاكفة الإرهاب والأعمال العنفية.
- الأخوة العالمية والتسامح والعدل التي يعتني بها الإسلام.
- انعكاس وثقية المدينة المنورة في دستور دولة بنغلاديش.
- التعريف بالمؤسسة الإسلامية.
- تسع سنوات من ازدهار المؤسسة الإسلامية.

‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবার-পরিজন’ গ্রন্থের আরবি অনুবাদ

‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবার-পরিজন’ গ্রন্থ পরিচিতি: নুরুল ইসলাম মানিক রচিত– ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবার-পরিজন’ গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর

পরিবারের ১০জন সদস্যের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। প্রকাশক– ইসলামিক ফাউন্ডেশন; প্রকাশকাল– ১ম সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ও ২য় সংস্করণ– অক্টোবর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ। পৃষ্ঠা সংখ্যা– ৬৪।

গ্রন্থে আলোচিত শিরোনামগুলো নিম্নরূপ–

- বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ
- বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেসা মুজিব
- শেখ হাসিনা
- শেখ কামাল
- শেখ জামাল
- শেখ রেহানা
- শেখ রাসেল
- সজিব ওয়াজেদ জয়
- সায়মা ওয়াজেদ পুতুল
- টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিকী
- রেদোয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি
- শেষের কথা।[১৬]

আরবি অনুবাদ: ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবার-পরিজন’ গ্রন্থের আরবি অনুবাদ করেছেন– ড. মুহাম্মাদ শামসুল হক সাদিক। আরবি অনূদিত গ্রন্থের নাম–

ابو الشعب بنغو بندو شيخ مجيب الرحمن وأفراد اسرته

(আবুশ শা'বি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওয়া আফরাদু উসরতিহি)

প্রকাশক– ইসলামিক ফাউন্ডেশন; প্রকাশকাল– সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ। পৃষ্ঠা সংখ্যা– ৬০। গ্রন্থে আলোচিত বিষয়গুলোর আরবি শিরোনাম নিম্নরূপ–[১৭]

- بنغو بندو وبنغلاديش
- بنغو ماتا (ام البنغال)بيغم فضيله النساء مجيب
- شيخ حسينة
- شيخ كمال
- شيخ جمال
- شيخ ريحانة
- شيخ راسل
- سجيب واجد جاي
- صائمة واجد بوتول
- تيوليب رضوانة صديقى
- رضوان مجيب صديق بوبى
- كلمة اخيرة

‘শেখ হাসিনার উদ্যোগে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমন এবং আলেম-ওলামার কর্মসংস্থান’ গ্রন্থের আরবি অনুবাদ

‘শেখ হাসিনার উদ্যোগে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমন এবং আলেম-ওলামার কর্মসংস্থান’ গ্রন্থ পরিচিতি: সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক– ‘শেখ হাসিনার উদ্যোগে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমন এবং আলেম-ওলামার কর্মসংস্থান’ পুস্তিকায় ইসলামের প্রচার-প্রসারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অবদান থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমন এবং আলেম-ওলামার কর্মসংস্থানে তাঁর সরকারের নানা সাফল্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রকাশক– ইসলামিক ফাউন্ডেশন; প্রকাশকাল– মার্চ, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ। পৃষ্ঠা সংখ্যা– ৪০।

গ্রন্থে আলোচিত প্রবন্ধগুলোর শিরোনাম নিম্নরূপ–

- ইসলাম প্রচার-প্রসারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
- ইসলামের প্রচার-প্রসারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
- সরকারের সাফল্যচিত্র
- ইসলাম সম্পর্কে অপব্যাখ্যা রোধ
- উগ্রবাদ ইসলামে নিষিদ্ধ
- ধর্ম পালনের অধিকার: সাংবিধানিক নিশ্চয়তা
- মদিনা সনদের চেতনা
- সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ইসলাম
- সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে শেখ হাসিনা সরকারের সাফল্য
- মাদ্রাসা শিক্ষা পাঠ্যক্রম
- দ্বীনি শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
- ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচালিত দারুল আরকাম মাদ্রাসা
- আরবী ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা
- দ্বীনী দাওয়াত ও ইসলামী রাজনীতি
- আলেম-ওলামাগণের কর্মসংস্থান
- ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যলয়ের যৌথ উদ্যোগে ‘এটুআই’ কর্মসূচির আওতায় আলেম-ওলামাগণের আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ
- ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় আলেম-ওলামার কর্মসংস্থান
- ডিজিটাল বাংলাদেশ।[১৮]

আরবি অনুবাদ: ‘শেখ হাসিনার উদ্যোগে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমন এবং আলেম-ওলামার কর্মসংস্থান’ পুস্তিকার আরবি অনুবাদ করেছেন– ড. মাহমুদুল হাসান। আরবি অনূদিত গ্রন্থের নাম–

مبادرة شيخ حسينة في مكافحة الارهاب والاعمال العنفية وفي تشغيل العلماء

(মুবাদারাতু শেখ হাসিনা ফি মুকাফাহাতিল ইরহাব ওয়াল ‘আমালিল ‘আনফিয়্যাহ ওয়া ফি তাশগিলিল উলামা)

প্রকাশক– ইসলামিক ফাউন্ডেশন; প্রকাশকাল– সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ। পৃষ্ঠা সংখ্যা– ৬৮। গ্রন্থে আলোচিত বিষয়গুলোর আরবি শিরোনাম নিম্নরূপ–[১৯]

- دور ابي الشعب بنغو بندو في اشاعة الاسلام ونشره

- صور انجازات حكومة رئيسة الوزراء شيخ حسينة في اشاعة الاسلام ونشرها
- مكافحه التاويل الخاطي حول الاسلام
- الترطف ممنوع في الاسلام
- الضمان الدستوري لحقوق اداء الدين
- وعي ميثاق المدينة
- الاسلام في مقاومة الارهاب والاعمال العنفية
- انجازات حكومة شيخ حسينة في مكافحة الارهاب والاعمال العنفية
- مناهج تعليم المدارس الدينية
- التاريخ الموجز للتعليم الديني
- مدرسة دار الارقام تحت ادارة المؤسسة الاسلامية
- ضرورة تعليم اللغة العربية
- الدعوه الدينية والسياسه الاسلامية
- انشاء فرص الاشغال للعلماء
- تدريب العلماء على التشغيل الذاتي اقيم بالتعاون بين المؤسسة الاسلامية وبرنامج الدخول الى المعلومات بمكتب رئيسة الوزراء
- تشغيل العلماء بالدعم المالي من البنوك
- بنغلاديش الرقمية (ديجيتال بنغلاديش)

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও বিশ্লেষণ

১. 'বঙ্গবন্ধু বিষয়ক রচনাবলির আরবি অনুবাদ' সম্প্রসারিত হলে আরব বিশ্বের সাথে বাংলাভাষীদের যোগাযোগের ক্ষেত্র বিস্তৃত হবে।

২. এ গবেষণা সাধারণ জনমনে আরবি ভাষার প্রতি অনুরাগ ও আগ্রহ বৃদ্ধি করবে।

৩. বাংলাদেশের আরবি সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা এর মাধ্যমে উপকৃত হবেন।

৪. অনুবাদের মাধ্যমেই পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পকলা সম্পর্কে সাধারণ পাঠক জ্ঞান লাভ করে এবং ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বৈশ্বিক যোগাযোগ সুদৃঢ় হয়। বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশ থেকে প্রতিনিয়ত আরব দেশগুলোতে প্রচুর জনশক্তি রপ্তানী হয়। বঙ্গবন্ধু বিষয়ক রচনাবলির আরবি অনুবাদ এ ক্ষেত্রে বহুমূখী কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

৫. বঙ্গবন্ধু বিষয়ক রচনাবলির আরবি অনুবাদ আরব বিশ্বে বাংলাদেশের পরিবেশ-পরিস্থিতি, শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ধর্ম-দর্শনকে ফুটিয়ে তুলবে।

৬. আরবি ভাষা ইসলাম ধর্মের প্রভাবে নৈতিকতার অনন্য সমাহার। আরবি-বাংলা সুসম্পর্ক সংশ্লিষ্টদের মধ্যে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও ন্যায়বোধ জাগ্রত করতে সহায়ক হতে পারে। ফলে কল্যাণকামী মানব সম্পদ গড়ে উঠার মাধ্যমে দেশ ও জাতির টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতে পারে।

৭. আরবি পৃথিবীর প্রাচীন ও অন্যতম একটি সমৃদ্ধ ভাষা। এটি জাতিসংঘেরও দাপ্তরিক ভাষা। এ ভাষার জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য ও ধর্ম বিষয়ক নানাবিধ গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

এ ছাড়াও রয়েছে আরবি ভাষায় লিখিত ইন্টারনেট ভিত্তিক নানা তথ্য। বাংলা-আরবি অনুবাদ সাহিত্য এ বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে ব্যাপক অবদান রাখতে পারে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, আরবি রচনাবলির বাংলা অনুবাদ যে মাত্রায় রয়েছে; বাংলা রচনাবলির আরবি অনুবাদ সেই মাত্রায় ধারে কাছেও নেই। কেবল যেসব ক্ষণজন্মা মনীষীদের প্রতিভার আলো বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে তাদের জীবন ও কর্ম বিশ্বের প্রভাবশালী ভাষাসমূহের সাথে আরবিতেও অনুবাদ হয়েছে। এজন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আরবি ভাষায় অনূদিত হয়েছেন। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতায় বাংলা-আরবি অনুবাদ কেন্দ্র গড়ে তুলে ক্রমান্বয়ে বাংলা রচনাবলির আরবি অনুবাদ আরব বিশ্বে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা নিলে অতিদ্রুত বাংলাদেশের ভাবধারা আরব বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা- শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতা– সায়েরা খাতুন। গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে মেট্রিক, কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে আই. এ., কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাশ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে অধ্যয়ন করেন। ১৯৫৩ সালের ৯ জুলাই বঙ্গবন্ধু আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালের ২১ অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দটা প্রত্যাহার করা হয়। তখন বঙ্গবন্ধু পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারের শিল্প-বানিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোর সম্মেলনে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন। ১৯৬৬ সালের ১ মার্চ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালের তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ১৯৭১ সালের ৭মার্চ রেসকোর্সের জনসমুদ্র থেকে ঘোষণা করেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।' ১৯৭১ সালের ২৫মার্চ রাত আনুমানিক ১২ টা ২০ মিনিটে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে (গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে) তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তাকে রাষ্ট্রপতি করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়। ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় এবং এর ভিত্তিতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তিনি 'জাতির পিতা' হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেন। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে ছাত্র-জনতা সংবর্ধনা সমাবেশে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু' উপাধীতে ভূষিত হন। ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর তিনি বিশ্ব শান্তি পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত 'জুলিও কুরি' পুরস্কারে ভূষিত হন। আগস্ট ১৯৭৫ সালে দেশি-বিদেশী ষড়যন্ত্রে সামরিক বাহিনীর কতিপয় সদস্যদের হাতে সপরিবারে নিহত হন। তথ্যসূত্রঃ Shahryar Iqbal (ed.), Sheikh Mujib in Parliament (1955-58), Dhaka 1997; Muhammad H.R Talukder (ed.), Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy, Dhaka 1987; Zillur Rahman Khan, The Third World Charismata: Sheikh Mujib and the Srtuggle for Freedom, Dhaka 1994; A. Majeed Khan (ed.), Twenty Great Bengalis, Dhaka 2008; S. A. Karim, Sheikh Mujib: Triump And Tragedy, Dhaka 2005. Archer K. Blood, The Cruel Birth of Bangladesh: Memories of an American Diplomat, Dhaka 2002; Harun-or-Rashid, Statehood Ideal of Bengalis and the Emergence of Independent Bangladesh (Bangla), Dhaka 2003; Monayem Sarkar (ed.), Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman: A Political Biography (Bangla), 2 volumes, Dhaka, 2008. দ্র. https://bn.banglapedia.org/index.php/রহমান,_বঙ্গবন্ধু_শেখ_মুজিবুর (15.06.2023)

২ শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পঞ্চম মুদ্রণ. জানুয়ারি ২০১৯), ভূমিকা, পৃ. x-xiii।

৩ চৌধুরী শহীদ কাদের, বঙ্গবন্ধুর তিনটি বইয়ের বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা, ডেইলি স্টার, সাহিত্য পাতা, ১৬ এপ্রিল, ২০২৩; https://bangla.thedailystar.net/literature/news-470716 (16.06.2023)

৪ *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ভুমিকা, পৃ. xiii।

৫ মিরাজ রহমান, *বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র আরবি সংস্করণ প্রকাশ করলো ঢাকাস্থ ফিলিস্তিন দূতাবাস* (প্রিয়.কম) ২৩ আগস্ট২০১৭। https://m.priyo.com/articles/arabic-version-of-bangabandhu-s-unfinished- (17.06.2023)

৬ তিনি ১৯৪৫ সালে ফিলিস্তিনে জন্ম গ্রহণ করেন। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে উচ্চতর ডিগ্রিধারী একজন প্রসিদ্ধ অনুবাদক হিসেবে তিনি বেশ পরিচিত। ২০০৯ সাল থেকে তিনি ফ্রান্সে অবস্থান করছেন। মুহাম্মাদ দাবাজাহর ফিলিস্তিনের অবিসাংবাদিত নেতা প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও) এর চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাতের অনুবাদক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ইয়াসির আরাফাতের গ্রন্থগুলো অনুবাদের কাজ করেছেন এবং দোভাষী হিসেবে তার সঙ্গে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সফরে যোগদান করেছেন। দ্র. https://m.priyo.com/articles/arabic-version-of-bangabandhu-s-unfinished-(17.06.2023)

৭ *বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী আরবি ভাষায়*, দৈনিক যুগান্তর, ১০ আগস্ট ২০১৮, ইসলাম ও জীবন পাতায় প্রকাশিত আল ফাতাহ মামুনের নেওয়া ড. সাইয়েদ আবদুল্লাহ আল মারুফ এর সাক্ষাৎকার। https://www.jugantor.com/todays-paper/features/islam-and-life/(18.06.2023)

৮ দ্র. শেখ মুজিবুর রহমান, *মুযাক্কিরাতুন লাম-তাকতামিল*, রামাল্লাহ-ফিলিস্তিন: দার আর-রু'ইয়া ফর পাবলিশিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন, ২০১৬।

৯ *মুযাক্কিরাতুন লাম-তাকতামিল*, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ১।

১০ *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ভুমিকা, পৃ. ix

১১ দ্র. মুহাম্মাদ হারুনুর রশিদ, *খুতবাতু সদিকিল বান্‌গাল আবুশ শা'বি শেখ মুজিবুর রহমান ফি ৭ মার্চ ১৯৭১ খ্রি.: খলফিয়াতুহা ওয়া আহাম্মিয়াতুহা*, (আরবি প্রবন্ধ) ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৫৭ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন), পৃ. ১০৯-১১৪।

১২ https://bn.banglapedia.org/index.php?title=সাতই- মার্চের-ভাষণ (18.06.2023)

১৩ মুহাম্মাদ আবুল ফুতুহ, *রওয়ায়ি'উল খুতাবিল আরাবিয়্যাহ* (ঢাকা: সালেহা পাবলিকেশান, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ১৪২-১৪৯।

১৪ আবু হেনা মুস্তাফা কামাল, *বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৫ সূচীপত্র।

১৫ আবু হেনা মুস্তাফা কামাল, *হাবিবুল বান্‌গাল ওয়া শেখ হাসিনা ওয়াল মুয়াসসাসাতুল ইসলামিয়্যাহ*, ড. মাহমুদুল হাসান কর্তৃক আরবি অনুবাদ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৮খ্রি.), পৃ. ৫ সূচীপত্র।

১৬ নুরুল ইসলাম মানিক, *জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবার-পরিজন* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৭খ্রি.), পৃ. ৪, সূচীপত্র।

১৭ নুরুল ইসলাম মানিক, *আবুশ শা'বি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওয়া আফরাদু উসরতিহি*, ড. মুহাম্মাদ শামসুল হক সাদিক কর্তৃক আরবি অনুবাদ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৮খ্রি.), পৃ. ৪, সূচীপত্র।

১৮ সম্পাদনা পরিষদ, *শেখ হাসিনার উদ্যোগে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমন এবং আলেম-ওলামার কর্মসংস্থান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ১ সূচীপত্র।

১৯ সম্পাদনা পরিষদ, *মুবাদারাতু শেখ হাসিনা ফি মুকাফাহাতিল ইরহাব ওয়াল 'আমালিল 'আনফিয়্যাহ ওয়া ফি তাশগিলিল উলামা*, ড. মাহমুদুল হাসান কর্তৃক আরবি অনুবাদ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৮খ্রি.), পৃ. ৪, সূচীপত্র।